পল্লী-সংসার

জাতীয় উপাখ্যান

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম-প্রণীত

ইস্‌লামিক্ পাবলিশিং হাউস

কলিকাতা—১৩২৫।

পল্লী-সংসার

জাতীয় উপাখ্যান

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম-প্রণীত

ইস্‌লামিক্ পাব্‌লিশিং হাউস

কলিকাতা—১৩২৫।

Out-of-Print

প্রকাশক
মোহাম্মদ ফাজেল।
ইস্‌লামিক্ পাব্‌লিশিং হাউস ;
১৩৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস।
মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৩৪নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য দুই টাকা।

উৎসর্গ পত্র

বঙ্গীয় মোস্‌লেম-সমাজের জাতীয়-স্বার্থ সংরক্ষণ-কল্পে

যে মহাত্মাদ্বয়

জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয়দাতারূপে দণ্ডায়মান

হইয়াছেন,

যাঁহাদের দানশীলতায় ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য পরম উপকৃত

হইতেছে,

সমাজ-গগনের সেই উজ্জ্বলতম নক্ষত্র

জনাব

মোল্লা এনামুল হক সাহেব

ও

মোল্লা আতাউল্‌ হক সাহেব

ভ্রাতৃদ্বয়ের কর-পদ্মে

এই

জাতীয় উপন্যাসখানি

আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ

দীনাতিদীন

গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক প্রীতিভরে অর্পিত হইল।

মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব-প্রণীত

গ্রন্থ-মালা

১। শরেহ-বেকায়া

জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থের সরল প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ ;

মূল্য—৩৲ টাকা।

২। পল্লী-সংসার

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবৃহৎ সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস ;

মূল্য—২৲ টাকা।

৩। বিষাদ-লহরী

মনোরম প্রাণস্পর্শী বিয়োগান্ত প্রেমোপাখ্যান ;

মূল্য—১।৹ আনা।

৪। ভারতবিজয় কাব্য

শ্রেষ্ঠতম জাতীয় মহাকাব্য ; মূল্য—২৲ টাকা।

৫। কবিতা-লহরী

বিবিধ-বিষয়িনী উচ্ছ্বাসময়ী কবিতা-মালা ;

মূল্য—১৲ টাকা।

৬। বঙ্গসাহিত্যে মোসলমান

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস ;

মূল্য—১॥৹ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—ইস্‌লামিক্ পাব্‌লিশিং হাউস।

১৩৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাচীনতম একনিষ্ঠ সাধক—মিহির ও সুধাকর, মোস্‌লেম-হিতৈষী, হাফেজ, মোস্‌লেম-প্রতিভা প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-সমূহের খ্যাতনামা সম্পাদক—এবং হজরত মোহাম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্ম্মনীতি, ইস্‌লাম-তত্ত্ব, ইস্‌লাম-ইতিবৃত্ত ও নামাজ-শিক্ষা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা

প্রবীণ সাহিত্যিক

মুন্‌শী শেখ আবদর রহিম সাহেব-লিখিত

ভূমিকা।

পল্লী-সংসার আমার পরম স্নেহাস্পদ মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব-প্রণীত একখানি সুবৃহৎ জাতীয় উপন্যাস—বঙ্গীয় পল্লী-সংসারের একখানি নিখুঁত ছায়াচিত্র—এবং মুসলমানের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের একটী অনুপম মধুর আদর্শ। আমি পল্লী-সংসারের আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া প্রকৃতই মুগ্ধ হইয়াছি; সুতরাং সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, মোস্‌লেম-সমাজে এরূপ উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস এ পর্য্যন্ত একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ ধর্ম্মভাবপূর্ণ উন্নত চরিত্র-সমন্বিত উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে বিরল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। সাহিত্যের নামে অসার অশ্লীল পুস্তকাদি প্রচারের এই স্রোতময় যুগে এরূপ একখানি সৎগ্রন্থ পাঠের সৌভাগ্য লাভ করিয়া যারপর নাই আনন্দ অনুভব করিতেছি।

পল্লী-সংসার গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যমের ফল; কিন্তু এই প্রথম উদ্যমেই তাঁহার যেরূপ বিশিষ্ট শক্তির উন্মেষ পরিলক্ষিত হইতেছে, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে যেরূপ ধীরতা ও বিচক্ষণতার বিকাশ পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি যেরূপ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, সাধনা ও অধ্যবসায় অটুট থাকিলে উপন্যাস-সাহিত্যের শূন্য সিংহাসন অধিকার করিতে তাঁহার পক্ষে বড় বেশী সময়ের আবশ্যক হইবে না।

পল্লী-সংসারের চরিত্রগুলি বঙ্গ-সাহিত্যে অতুল-অনুপম—যেন এক একটী ফুটন্ত বসরা-গোলাপ শোভা ও সৌন্দর্য্যে দিক আলো করিয়া সৌরভ ও গৌরবে টলমল্ করিতেছে। আবুল ফজল পল্লী-সংসারের অমূল্য অলঙ্কার! গ্রন্থকার তাঁহার তেজোদৃপ্ত

করিয়াছেন যে, জগতের যে কোন গৌরবোন্নত জাতি তাঁহাকে লইয়া শ্লাঘা করিতে পারেন। আবদুল হকের চরিত্র দোষে গুণে মণ্ডিত। সতীশের চরিত্রটী যেন উভয়ের সামঞ্জস্য সাধনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। পল্লী-সংসারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আজিজা! লেখক আজিজার মহিমামণ্ডিত উজ্জ্বল চরিত্রে মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি ও স্নেহ-করুণার ধারা এত অধিক পরিমাণে ঢালিয়া দিয়াছেন যে, একমাত্র তাঁহারই চরিত্র-মাহাত্ম্যে সমস্ত পল্লী-সংসার সৌন্দর্য্য ও সৌরভে যেন ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। পল্লী-সংসারের দ্বিতীয় সম্পদ রমণী-রত্ন সালেমা! সালেমা প্রথম দৃষ্টিতে যেন প্রখর বিদ্যুৎপ্রতিমা; তাঁহার সৌন্দর্য্যে নয়ন ঝলসিয়া যায়—তাঁহার দৃষ্টিতে দেহে কম্পন এবং বাক্যে হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়! কিন্তু লেখক স্বীয় প্রতিভাবলে স্বাভাবিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সেই সালেমাকে এমন ভাবে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার সৌন্দর্য্যকে এমন মধুর এবং প্রাণটীকে এমন সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন যে, সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুরীতে কেবল যে আবুল ফজলের হৃদয়াকাশই রঞ্জিত হইয়াছে তাহা নহে, বরং সমস্ত পল্লী-সংসারই তাহাতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। পল্লী-সংসারের আর দুইটী শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—প্রভাত নলিনী ও সমীরন। লেখকের ভাষায়—"একটী বাসন্তি-প্রভাতের ফুল্ল-নলিনী; অপরটী শরতের শিশির-সিক্ত শুভ্র সেফালিকা।" কাহাকে রাখিয়া কাহার প্রশংসা করিব? ফলতঃ প্রভাত-নলিনীর দ্বারা যে কোন হিন্দুগৃহ অলঙ্কৃত এবং সমীরনের দ্বারা যে কোন মোস্‌লেম-পরিবার গৌরবান্বিত হইতে পারে। অন্যান্য চরিত্রগুলি দোষগুণে জড়িত হইলেও গ্রন্থকার সেগুলি এমন সহানুভূতির সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন,—এমন ভাবে সকলকে নিজের উন্নত আদর্শের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন যে, তদ্দর্শনে লেখকের সহৃদয়তার প্রতি মনে স্বভাবতঃই শ্রদ্ধার উদয় হয়। বিশেষতঃ পল্লী-সংসারের চরিত্রগুলি এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক যে, আমরা উহার যে কোনটীকে আমাদের গৃহ-সংসারে সাদরে বরণ করিয়া লইতে পারি।

সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই যে, পল্লী-সংসারের আদ্যোপান্ত ধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রভায় বিমণ্ডিত। তথাকথিত কাব্য-সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ-প্রদর্শনের অজুহাতে গ্রন্থকার কোথাও ধর্ম্মের গণ্ডি অতিক্রম কিংবা নীতির মর্য্যাদা পদদলিত করেন নাই এবং আধুনিক পুস্তকাদির ন্যায় তাঁহার লেখায় 'আর্টের' আড়ালে বিদেশী বিকৃত ভাবের

রস-রচনা পর্য্যন্ত সংযম ও শ্লীলতার একটা পুরু পর্দ্দায় আবৃত রহিয়াছে। তরুণ-বয়স্ক লেখকের পক্ষে ইহা কম প্রশংসার কথা নহে।

পল্লী-সংসারের ভাষাটীও অতি সুন্দর। উহা না সংস্কৃতগন্ধী জটিল সমাস-সমস্তা বহুল, না প্রাদেশিকতার পাপে প্রপীড়িত এবং না আধুনিক হেঁয়ালির বিষাক্ত হাওয়ায় দুষিত;—বরং উহা যেরূপ সরল ও প্রাঞ্জল, সেইরূপ মধুর ও সহজগতিবিশিষ্ট। আমি এইরূপ ভাষারই পক্ষপাতী। লেখক জাতীয়তার দোহাই দিয়া অকারণে ঝাকে ঝাকে বিদেশী শব্দ ব্যবহার পূর্ব্বক ভাষার পবিত্রতা নষ্ট না করিয়াও জাতীয় ভাব-বৈশিষ্টটুকু বেশ ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পল্লী-সংসারের আর এক বিশিষ্টতা এই যে, শুধু অসার গল্পগুজবেই ইহার কলেবর পূর্ণ হয় নাই; বরং ধর্ম্মতত্ব, সমাজতত্ব, শিক্ষা ও সদুপদেশ প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় সমাজগঠন ও লোকশিক্ষার জন্য বিশেষ আবশ্যক, তাহা এই পুস্তকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। সুতরাং ইহাতে একাধারে উপন্যাস পাঠের আনন্দ উপভোগের সহিত নানাবিষয়ে শিক্ষা লাভেরও প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল পল্লী-সংসারের গুণগুলি বর্ণনা করিয়াছি। এইবার ইহার একটা দোষ প্রদর্শন করিব। পল্লী-সংসারের প্রধান দোষ—ইহা বড়ই বৃহৎ সংসার। এরূপ বৃহৎ সংসার অনেকের পক্ষে শুধু দুরধিগম্য নহে, বরং দুর্ব্বহও বটে! তবে সহরের সঙ্কীর্ণ সংসারের পরিবর্ত্তে পল্লী-সংসারের আদর্শে আমাদের সংসার গঠিত হইলে—আমাদের পথভ্রান্ত লক্ষ্যহীন জাতির মুক্তির দ্বার যে মুক্ত হইয়া আসিবে, তাহাতে অবশ্য কোনই সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, পরিশেষে আমি খোদাতালার নিকট প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ করি, আবদুল হাকিম সাহেবের সাহিত্য-সাধনা সাফল্য লাভ করুক; তাঁহার প্রতিভা ও পরিশ্রম পুরস্কৃত হইয়া সুযশ ও সুখ্যাতির স্বর্ণ-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

কলিকাতা,
আশ্বিন—১৩২৫।

আবদর রহিম।

নিবেদন

পরম করুণাময় আল্লাহতাআলার অপার কৃপায় এতদিন পরে পল্লী-সংসার জন-সমাজে প্রকাশিত হইল। সুদীর্ঘ দুইটী বৎসর পাণ্ডুলিপির সঙ্কীর্ণ কক্ষে এবং পূর্ণ একটী বৎসর প্রেস-কারাগারে আবদ্ধ থাকিবার পর পল্লী-সংসারের ভাগ্যে এই সৌভাগ্যটুকুর উদয় হইয়াছে।

বঙ্গীয় পল্লী-সংসারের একটা উন্নত আদর্শ কল্পনা করিয়া পল্লী-সংসার লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার কল্পনা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, এবং পুস্তকখানি স্বীয় নামের পবিত্রতা ও মর্য্যাদা কতদূর রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তাহার বিচার-ভার সসঙ্কোচে দেশবাসীর উপর অর্পণ করিতেছি।

পল্লী-সংসার উদ্দেশ্যমূলক উপাখ্যান; সুতরাং ইহার মধ্যে ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষা-নীতি সম্বন্ধে এমন অনেক কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাহা পরিহার করিলেও উপাখ্যানের কোনরূপ অঙ্গহানি হইত না। কিন্তু স্বীয় উদ্দেশ্যের আনুকূল্য হেতু আমি ইচ্ছা করিয়াই সেগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছি। কথা-সাহিত্যের এই সুপ্রথা নব্য আর্টপ্রিয় ভ্রাতা-ভগিনীদিগের প্রীতিদায়ক হইবে কি না, জানি না; কিন্তু আমার পক্ষে উহা অপরিহার্য্য। কারণ আমার মতে লোকশিক্ষাশূন্য সাহিত্য এবং ধর্ম্ম ও নীতিহীন চরিত্র ও সৌন্দর্য্যের কোনই মুল্য নাই।

পুস্তকখানি যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ ভাবেই মুদ্রিত হইয়াছে। সময়াভাব প্রভৃতি নানা কারণে আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা সংশোধনাদি করিতে পারি নাই।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন—প্রবীণ সাহিত্যিক মুন্‌শী শেখ আবদর রহিম সাহেব এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধন পুর্ব্বক ইহার একটী সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং এই সুযোগে তাঁহাকে আমার আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার সাহিত্য-সাধনার উৎসাহদাতৃগণের মধ্যে প্রথিতনামা কবিবর মোজাম্মেল হক সাহেব, ইস্‌লাম-রবি-সম্পাদক মৌলবী নজির-উদ্দিন আহমদ সাহেব, ধর্ম্ম সাহিত্যের ছত্রপতি মওলানা রুহোল আমিন সাহেব ও মৌলবী আবদুল গনী ফরিদপুরী সাহেব—এবং সুহৃদ্বর মৌলবী আলতাফ হোসেন বি-এ সাহেব, মৌলবী আবুল বশর বি-এ সাহেব, মৌলবী আবদুল গনী বি-এ সাহেব, মৌলবী এ, এফ, এম আবদুল মজীদ সাহেব, সুকবি শেখ হবিবর রহমান সাহেব ও সুলেখক আলি হাসান সাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলিতে কি, তাঁহাদেরই উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমার নিরস প্রাণে অনেক সময়ে রসের ফোয়ারা উৎসারিত হইয়াছে,—হৃদয়-মরুভূমে আনন্দ-কানন সৃষ্ট হইয়া পত্র-পুস্প-ফলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের অনুপম প্রিয় স্মৃতি আমার জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনার সহিত অন্তরে চিরকাল জাগরূক থাকিবে।

নগর-সুন্দরদী।) বিনয়াবনত

পল্লী-সংসার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আলিনগর।

আলিনগর জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত একখানি সুন্দর পল্লীগ্রাম; ফরিদপুর জেলার সদর হইতে প্রায় পঞ্চবিংশতি মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অনুকূল অবস্থান-গুণে গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর; সমস্ত গ্রামখানি আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি সুখাদ্য ফলোদ্যান দ্বারা পরিবৃত ও আচ্ছাদিত; মাঝে মাঝে নারিকেল ও সুপারীর বাগিচা উহার স্বভাব-সৌন্দর্য্য আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছে; স্থানে স্থানে দুই একটী অশ্বথ, বট ও তেঁতুল তরু তরুকুল-সম্রাটের ন্যায় স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বীয় পদের মহত্ব-গরিমা প্রকাশ করিতেছে; কোথাও বা সারি সারি তালতরু পাগড়ীবাঁধা প্রহরীর ন্যায় গর্ব্বিত শির উচ্চে তুলিয়া শন্ শন্ শব্দে তরুকুলারি পবন-দেবের গমনাগমন-সংবাদের সহিত আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। উদ্যানসমূহের পাশে পাশে প্রান্তর-কোলে লতা-পত্র-বিজড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুঝোপগুলি মার্জ্জিতরুচি নব্য সমাজের নিকট কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন সমাজের ন্যায় আবর্জ্জনা স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে দুই চারিটী অযত্ন বা সযত্ন রোপিত কুসুমতরু পত্র-পুষ্পে বিভূষিত হইয়া সৌন্দর্য্য-উপাসক উন্নতিশীল উদীয়মান

সমাজের ন্যায় আপনাপন গুণগ্রাম, প্রীতি-পবিত্রতা ও শোভা-সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিয়া জন-সাধারণের নয়ন-মন আকর্ষণ করিতেছে।

আলিনগর কানন-কুন্তলা পল্লী মাত্র। এখানে শহরের ন্যায় বাড়ী বাড়ী অভ্রভেদী সুদৃশ্য অট্টালিকা নাই; পাড়ায় পাড়ায় স্কুল কলেজ কিংবা আমোদ-প্রমোদের প্রমোদভবন নাই; যেখানে সেখানে মনোহর 'মনোহারী' দোকান বা হাট বাজার নাই; নগ্নপদে গমনের অযোগ্য ইষ্টক বা চূর্ণ পাথরের বাঁধান রাস্তা নাই; দুই পা চলিতে হইলে চারি পয়সার বৈদ্যুতিক গাড়ীর বন্দোবস্ত নাই; রজনীর অন্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য গ্যাস বা তড়িতালোকের ব্যবস্থা নাই; গ্রীষ্মের জ্বালা জুড়াইবার জন্য কল টিপিয়া হাওয়া খাইবার বন্দোবস্ত নাই এবং ভ্রমণ করিবার জন্য শ্যামল দূর্ব্বাদলোপরি বিবিধ কৃত্রিম দৃশ্য-বিশোভিত অপরূপ বিলাস-লীলা-চঞ্চল নর-নারী-বিরাজিত মাঠ নাই। আর নাই এরূপ লালসা-পীড়িত মানব-মানবী এবং অপরিণামদর্শী বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীর অস্থি-মজ্জাচর্ব্বণকারী জঘন্য উপকরণ-সমষ্টি!

সত্য বটে, এখানে সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বীর আহার্য্য বা ব্যবহার্য্য বস্তু একত্রে পাওয়া যায় না; ইচ্ছামাত্রই টাকা ফেলিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণার্থে ধর্ম্মের মস্তকে কুঠারাঘাত করণোপযোগী আপাত-মধুর রসনা-তৃপ্তিকর আহার্য্য এবং স্নিগ্ধ সুমধুর পানীয় পাওয়া যায় না। আর পাওয়া যায় না—এমন জাতি-ধর্ম্মবিনাশকারী কদাচারপূর্ণ জঘন্য একাকার! ধর্ম্ম-জ্ঞানহীন হিন্দু-মোসলমানের গরল-পূর্ণ তরল অন্তরের এমন সরল সম্মিলন!!

পল্লীগ্রামের অভাবের তালিকা দেখিয়া—বর্ত্তমান নব্য সম্প্রদায়ের নিত্য-ব্যবহার্য্য উপকরণের নিদারুণ অনাটন ভাবিয়া কেহ যেন আতঙ্কে শিহরিয়া না উঠেন! কারণ পল্লীর গৃহে গৃহে অট্টালিকা না থাকিলেও

অট্টালিকা হইতে কোন অংশে কম স্নিগ্ধ বা কম আরাম-দায়ক নহে। বিশেষতঃ সে গৃহের এক কক্ষে পিতামাতা এবং অন্য কক্ষে পুত্র-পুত্রবধূ কিংবা এক কক্ষে ভ্রাতা-ভ্রাতৃজায়া এবং অন্য কক্ষে ভগিনী-ভগিনীপতির থাকিবার আবশ্যক হয় না ; অথবা নীচে হিন্দু উপরে মোসলমান কিংবা উপরে মোসলমান নীচে হিন্দু—এরূপ বসবাস করিবারও আবশ্যকতা নাই। পল্লীগ্রামে স্থানাভাববশতঃ একজনের পায়খানার সম্মুখে অন্য জনের পাকশালা কিংবা এক বাড়ীর আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থান সম্মুখে করিয়া অন্য বাড়ীর বৈঠকখানাও নির্ম্মিত হয় না ! তথায় পাড়ায় পাড়ায় স্কুল না থাকিলেও গ্রামের একটী স্কুলেই সমস্ত পাড়ার ছেলেরা একত্রিত হইয়া থাকে এবং আমোদ-প্রমোদের আড্ডা নাই বলিয়া তজ্জন্য লোকের মাথা-ব্যথাও নাই। পল্লীগ্রামে প্রস্তর-নির্ম্মিত রাজপথ না থাকিলেও উন্মুক্ত সমতল ভূমি ও কুঞ্জোদ্যানের মধ্য দিয়া অসংখ্য শ্যামল তৃণাস্তৃত গ্রাম্য পথ আছে ; দূর-দূরান্তরে গমনের জন্য নানা শ্রেণীর অনাবশ্যক যান-বাহনের পরিবর্ত্তে পল্লীবাসিগণের পদে খোদাদত্ত স্বাভাবিক শক্তি আছে। গ্রীষ্মজ্বালা জুড়াইবার জন্য উন্মুক্ত প্রান্তর প্রবাহিত শ্যামল তরু-পল্লবচুম্বিত স্নিগ্ধ সমীরণ আছে। পল্লীর চারি'দিকে বিস্তৃত মাঠ আছে, কিন্তু তাহা কেবল নিষ্কর্ম্মা জীবের ভ্রমণের জন্য নহে ! সে মাঠে গরু চরে, শিশুরা খেলা করে, কৃষকেরা পরিশ্রম করে ; সে মাঠে শ্যামল শস্য হাস্য করে, বাতাসে ঢেউ খেলে ; তাহাতে মানবের জীবন রক্ষার বিবিধোপকরণ উৎপন্ন হয়। পল্লীগ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে ফলোদ্যান আছে ; তাহাতে যথাসময়ে ফল ধরে, যথা সময়ে পাকে ; আবশ্যক অনু-যায়ী প্রত্যেক বাড়ীতেই শাক-শব্জীর বাগান আছে। আর আছে প্রতি গ্রামে বিলাস-লীলা-অপরিজ্ঞাত সরল ধর্ম্মভীরু নর-নারী ! মানব-জীবনের আড়ম্বরহীন বিশুদ্ধ আদর্শ !!

যদিও পল্লীগ্রামে অর্থ-বিনিময়ে যদৃচ্ছা আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ; কিন্তু হিন্দু হউক, মোসলমান হউক, স্বজাতির বাড়ী উপস্থিত হইলে বিনা প্রার্থনায় বরং যত্ন-সমাদরের সহিত কুললক্ষ্মীগণের স্বহস্ত-প্রস্তুত পবিত্র অন্ন-ব্যঞ্জনের কোনই অভাব হইবে না। সরোবরের স্নিগ্ধ জল কিংবা পল্লী-গৃহস্থের গাছের ডাবের জন্য পয়সাও খরচ করিতে হইবে না। শহরের জঘন্য একাকার পল্লীগ্রামে নাই বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে উদার পবিত্র আচার ব্যবহার আছে; হিন্দু-মোসলমানের ছলনাময়ী পীরিতের ঢলাঢলি না থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে উদার পবিত্র সরল সদ্ভাব আছে। আর শহরের এই মার্জ্জিতরুচি ও শ্লীলতার ডঙ্কা পল্লীগ্রামে না বাজিলেও তথায় অশ্লীল ভাবের নাম গন্ধও নাই। অভিজ্ঞগণ বোধ হয়, লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, হিন্দু পল্লীর কুলকামিনীগণ নিকটস্থ নদীর ঘাটে বা সরোবরে আসিয়া জল লইতেছে, স্নান করিতেছে; স্নান-সিক্তবস্ত্রে ঘোমটা দিয়া বৃদ্ধা, যুবতী ও বালিকাগণ সধবা-বিধবা নির্ব্বিশেষে যাইতেছে, আসিতেছে; তাঁহাদের অতি নিকটে পল্লীবাসী হিন্দু-মোসলমানগণ কাজকর্ম্ম করিতেছে; কিংবা নদী-সরোবরের এক ঘাটে পুরুষগণ, অপর ঘাটে রমণীগণ স্নান করিতেছে; অঙ্গ মর্দ্দন করিতেছে; কিন্তু কেহ কাহারও প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেছে না। সকলের দৃষ্টিই সংযত ও সম্ভ্রমবিনত।

আলিনগর শস্য-শ্যামলা বঙ্গসুন্দরীর সৌন্দর্য্যময়ী ষড়ঋতু-বিলাসিনী পল্লী-দুহিতা; স্বভাব-সুন্দর অবস্থানগুণে যথাকালে ছয়টী ঋতুই গমনাগমন-পূর্ব্বক তাহার কোমল অঙ্গে আপন আপন লীলা খেলা প্রকাশ করিয়া থাকে; তথায় গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্য্যোত্তাপ অনুভূত হয়; তরুলতা পরিশূন্য হল-কর্ষিত প্রান্তরসমূহ অগ্নিতুল্য রবিকরে দগ্ধ হইয়া ভীষণ মরু-ভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হয়! তখন পল্লীবাসী শ্রমশীল কর্ম্মক্লান্ত লোক সকল অনাবৃত দেহে নব পল্লবিত তরুতলে বা বিস্তৃত উদ্যান-কোলে শুইয়া

বসিয়া শ্রান্তি দূর করে; বৃদ্ধা রমণী ও শিশুগণ বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করে; যুবতী ও কুলবধূগণ তখন শূন্য বাড়ী প্রাপ্ত হইয়া খিড়কি খুলিয়া ঘোমটা ফেলিয়া অঙ্গবসন শ্লথ করিয়া রন্ধন-নিপুণ পরিজন-সেবাপরায়ণ বলয়-ভূষিত ললিত করে পাঙ্খা পরিচালনা করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে প্রয়াস পায়। গাছে গাছে আম্রমুকুলসমূহ বর্দ্ধিত ও পরিপক্ক হইয়া ঝুলিতে থাকে। ক্রমে বর্ষারম্ভের পূর্ব্বাভাস বিজ্ঞাপিত হইতে থাকে; আকাশে মেঘ-গর্জ্জন শ্রুত হয়; মাঝে মাঝে বর্ষণ হয়; হল-কর্ষিত প্রান্তরসমূহ নব অঙ্কুরিত হরিদ্বর্ণ শস্য-শোভায় হাসিয়া উঠে এবং সমীরণ তাহার সহিত অবাধে ক্রীড়া-কৌতুক করিতে নিরত হয়; দেখিতে দেখিতে সোণার জলে বঙ্গভূমি ভাসিয়া যায়; পণ্য-তরীগুলি নানাবর্ণ পক্ষ তুলিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়; সুনির্ম্মল শারদাকাশে প্রস্ফুটিত নক্ষত্র-পুঞ্জপরিবৃত সমুজ্জ্বল চন্দ্র সমুদিত হইয়া প্রকৃতির বক্ষে সুধাধারা বিকীর্ণ করিতে থাকে। শতদল-ভূষণা অবনী সুন্দরীও কৌমুদী-বসনে অঙ্গ সাজাইয়া,—বেলা, যূঁই ও কামিনী ফুলের কমনীয় মালা কণ্ঠে পরিয়া—সদ্য প্রস্ফুটিত শিশির-স্নাত সেফালি পুষ্পে কবরী ভূষিত করিয়া শরচ্চন্দ্রের অভ্যর্থনা হেতু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জগদ্বাসীর মন প্রাণ হরণ করিতে নিরত হয়। ক্রমে শীত-সহচর হেমন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক দারুণ শিশিরে অবনী আচ্ছন্ন করে; হৈমন্তিক ধান্য পরিপক্ক হয়; কৃষকেরা আনন্দিত মনে ধান কাটিয়া আঁটি বাঁধিয়া মাথায় করিয়া গৃহে লইয়া যায়। শীত আত্মপ্রকাশ করে; প্রকৃতি সশঙ্কিত ও বৃক্ষপত্র সঙ্কুচিত হয়; বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ দয়াময় জগৎপাতার নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন; শিশু ও যুবকগণ সুরঞ্জিত বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া আনন্দোল্লাস প্রকাশ করে; কৃষকগণ নীরবে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে থাকে—যেমন তাহারা

এক উন্মাদনাপূর্ণ আনন্দের কোলাহল পড়িয়া যায় ; ভ্রমর-গুঞ্জন ও ঝিল্লি-রব-মুখরিত মুকুলপরিশোভিত আম্রবনে ঝাকে ঝাকে কোকিল ডাকিতে থাকে ; মলয় পবন গৃহে গৃহে কুঞ্জে কুঞ্জে আনন্দবার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যায় ; সদ্য বিকশিত কুসুমসমূহ সুগন্ধ বিতরণ করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিতে রত হয়। রবিশস্যের লাল, নীল, সবুজ ও স্বর্ণ বর্ণের বিবিধ পুষ্প সমাচ্ছন্ন পল্লী-প্রান্তর মানব-নয়নে স্বর্গ-ছবির ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে।

আলিনগরের দক্ষিণে অনতিবৃহৎ প্রান্তর ; প্রান্তরের দক্ষিণে সুনির্ম্মল সলিলপরিপূর্ণ সুবৃহৎ আলমডাঙ্গার ঝিল ; এই ঝিলের বিস্তার উত্তর-দক্ষিণে দুই মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে তিন মাইলের কম নহে। আলম-ডাঙ্গার দক্ষিণ হইতেই ফরিদপুরের নিম্ন-সমতল জলাভূমি আরম্ভ হইয়াছে ; বিশাল প্রান্তরসমূহ দিগন্তে বিস্তৃত রহিয়াছে ; মাঝে মাঝে গ্রামসমূহ পুঞ্জীভূত বা রেখাকৃতি পল্লীপুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ফরিদপুরের এই অংশে ফলবান বৃক্ষের সংখ্যা অতি অল্প ; এমন কি, এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। কিন্তু জেলার এই বিভাগ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারস্বরূপ ; ইহার প্রান্তরসমূহে যেরূপ প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে সমস্ত জেলাবাসীর অন্নাভাব পরিপূর্ণ হইয়াও যথেষ্ট ধান্য সঞ্চিত থাকিতে পারে ; বিশেষতঃ এই স্থানের বিল-খাল ও দীঘী-পুষ্করিণীতে এত অধিক পরিমাণে জিয়াল মৎস্য সঞ্চিত থাকে যে, ইহার অধিবাসিগণকে মৎস্যাদির জন্য সারা বৎসরে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হয় না। এই অংশের পূর্ব্বতন নাম পরগণা আমিরাবাদ, জলিলপুর, তেলীহাটী প্রভৃতি। বর্ত্তমানে এই স্থান সবডিভিশন গোপালগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলে বৎসরে প্রায় ছয় মাস বর্ষা ঋতুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

সুপ্রসিদ্ধ আলমডাঙ্গার ঝিলের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই তিন দিকেই

ঝিলের মত নহে। ইহার বারিরাশি বার মাস নির্ম্মল থাকে। জলের গভীরতা কোন সময়েই পার্শ্বে দুই হাত এবং মধ্যস্থলে দশ বার হাতের কম হয় না। এই ঝিলের কোন অংশে ধান, পাট,—এমন কি, কোন প্রকার জলীয় উদ্ভিদও জন্মে না। ঝিলে রোহিত, কাতল, আইড়, চিতল ও বোয়াল প্রভৃতি প্রচুর মৎস্য সঞ্চিত থাকে। চতুষ্পার্শ্বে বহুগ্রামে এই সমস্ত মৎস্য সরবরাহ করা হয়; এই ঝিলের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য প্রবাদ প্রচলিত আছে।

আলিনগরের উত্তরে কয়েক খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাঠ; তদুত্তরে অন্যূন এক মাইল দূরে মতিপুর নামক প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম অবস্থিত। মতিপুরের মধ্যেই পুটীখোলার পুলিস-ষ্টেশন ও হাট-বাজার অবস্থিত। ইহার উত্তর দিয়া মতিপুরের সহিত প্রায় সমান্তরাল রেখায় কৌমার্য্যবিহীন কলনাদী কুমার নদ বঙ্কিম গতিতে বহু দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কুমার নদের উত্তর হইতে ফরিদপুর জেলার সদর—এমন কি, তাহারও উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত ভূভাগের অধিকাংশই উচ্চ সমতল এবং বিবিধ বন-জঙ্গল ও নূতন পুরাতন উদ্যানপরম্পরা সমাচ্ছাদিত। সুপ্রসিদ্ধ ফতেহাবাদ প্রভৃতি পরগণা এই অংশেরই অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমানে এই অংশ সদর কোতয়ালি, ভাঙ্গা ও নগরকান্দা প্রভৃতি থানার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

বয়োবৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ—অথচ চিরকুমার কুমার নদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী মধুর প্রবাদ প্রচলিত আছে। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থে উহা অবিকল এই স্থানে বিবৃত করিতেছি। এই কুমারের জন্মস্থান কোথায় এবং তিনি রাজকুমার কি দ্বিজকুমার, তদ্বিষয়ে প্রবাদ-প্রণেতৃগণ আমাদিগকে বড়ই ফাঁকি দিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমরাও এ পর্য্যন্ত উহার কোন কূল-কিনারা ঠিক করিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি বঙ্গদেশে আসিয়া—শস্য-শ্যামলা সরস ভূমির গুণেই হউক,

কিংবা তপ্ত-মধুর আব-হাওয়ার গুণেই হউক,—একেবারে যৌবন-গর্ব্ব-স্ফীতা মহাপরাক্রান্তা তটিনীকুলরাণী বেগবতী মধুমতীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। মধুমতী চপল বঙ্গকুমারের দুঃসাহস দর্শনে পরিহাস করিয়া বলিলেন যে, কুমার যদি আমাকে ধরিতে বা স্পর্শ করিতে পারে, আমি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছি। কিন্তু এই কথা বলিয়াই মধুমতী রোষে গর্জ্জন করিয়া সহচরী পদ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার সহিত এক যোগে চলিতে চলিতে কুমারের অপমানজনক প্রস্তাবের অভিযোগ করিবার জন্য নদ-নদীকুল-সম্রাজ্ঞী গঙ্গার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এদিকে কুমার মধুমতীর অনুকূল উত্তরে উৎসাহিত হইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার গর্জ্জন অনুসরণপূর্ব্বক ছুটিয়া চলিলেন এবং সাধ্যমত ছুটিতে ছুটিতে আড়াই বার পৃথিবী পরিক্রমণ করিয়া আসিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ মধুমতীর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলেন না। আর্য্য বীরগণ ভারতবর্ষের বাহিরে পদার্পণ না করিয়াও যেরূপে বিশ্বজয় বা দিগ্‌বিজয় করিতেন, কুমারের এই পৃথিবী পরিক্রমণও তদ্রূপ; অর্থাৎ এ পৃথিবী ফরিদপুর জেলার বাহিরে নহে। বিশেষতঃ মধুমতীর প্রেমোন্মত্ত কুমার এই পরি-ক্রমণের সময়ে বড়ই এলো-মেলো বকিয়াছিলেন বোধ হয়; কারণ অনেক স্থলেই তাহার পরিচয় সম্বন্ধে গোলযোগ দৃষ্ট হয়।

কুমার নদের বিস্তৃতি স্থানে স্থানে এক রশিরও কম; কিন্তু কোথাও দুই রশির বেশী নহে। জল দুই এক স্থানে গভীর হইলেও অধিকাংশ স্থানেই অগভীর। বসন্তকালে কোন কোন স্থানে দুই এক হাতের বেশী জল থাকে না। কুমারের দুই পার্শ্বে অসংখ্য ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত পল্লী-গ্রাম অবস্থিত। বলা বাহুল্য, জরাজীর্ণ কুমারের স্নেহ-সলিল ভিন্ন সেই সমস্ত গ্রামের হতভাগ্য অধিবাসিবৃন্দের পক্ষে আর কোন প্রবীণ বা তরুণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পল্লী-সমাজ।

সুপ্রসিদ্ধ আলিনগর পাঁচটী পাড়ায় বিভক্ত। সর্ব্ব পশ্চিমে রায়পাড়া। কেহ কেহ ইহাকে শুঁড়ীপাড়াও বলিত। এই পাড়ায় তারিণীচরণ রায় নামক একজন সম্ভ্রান্ত তালুকদার বাস করিতেন। তাঁহার সম্পত্তির বাৎসরিক আয় প্রায় দুই সহস্র টাকা। রায় মহাশয়ের একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্রের নাম সতীশচন্দ্র রায় এবং কন্যার নাম কমলা। ইহা ভিন্ন রায়পাড়ায় আরও কয়েক ঘর মধ্যম অবস্থার কায়স্থ এবং অনেকগুলি শুঁড়ী ও তেলি বাস করিত। শুঁড়ীদিগের উপাধি সাহা এবং তেলিদিগের উপাধি কুণ্ডু। সাধারণতঃ ইহারা ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

রায়পাড়ার পশ্চিমেই মিঞাপাড়া অবস্থিত। এই মিঞাপাড়াই এক সময়ে আলিনগরের মুকুটমণি-স্বরূপ বিদ্যমান ছিল। মিঞা সাহেবদিগের পূর্ব্বপুরুষ আলি মিঞার নামেই সমস্ত গ্রাম আলিনগর নাম প্রাপ্ত হয়। আলিনগর ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী তালুকসমূহ এবং আলমডাঙ্গার ঝিল পূর্ব্বে মিঞা সাহেবদিগের খাস সম্পত্তি ছিল। তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, অশ্বারোহী ও শিবিকারোহী ব্যক্তিগণ আলি নগরের দক্ষিণ প্রান্তর দিয়া যাইবার সময়ে মিঞা সাহেবদিগের সম্মান জন্য অবতরণ করিয়া যাইতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই! সে সম্পদ, সে সম্ভ্রম নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রবল হিন্দু জমিদারের সহিত মামলা মোকদ্দমায় এবং নওয়াবী ধরণের আহার,

তাহাও অতি বিশৃঙ্খল—সর্ব্বসাকল্যে আয় এক হাজার টাকার অধিক নহে। এই সামান্য আয়ই আবার তিন চারি অংশে বিভক্ত। বর্ত্তমান সময়ে মিঞাবংশে লোকও অধিক নাই। বড় জোর ছেলে বুড়া যোগ করিয়া দশজন। ইহার মধ্যে মরা নদীর ক্ষীণ রেখার মত আফতাব-উদ্দিন মিঞা বর্ত্তমান। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি। সম্পত্তির মধ্যে তাঁহারই অংশের আয় কিঞ্চিন্ন্যূন পাঁচ শত টাকা। কিন্তু এই আয়ের উপর বড়মানুষী চাল-চলন বজায় রাখিতে হয় বলিয়া তিনি অনেক দাম্বিক দেনায় জড়িভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। পুত্রটীর নাম আবুল্ ফজল, কন্যা দুইটীর নাম যথাক্রমে করিমন্-নেসা ও সমীরন্-নেসা।

মিঞাপাড়ার লোকসংখ্যাও খুব কম; মিঞাসাহেবেরা ছাড়া আট দশ ঘর লোক মাত্র। তাহাদের অবস্থাও অতি হীন। তাহারা মিঞা সাহেব-দিগের বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম এবং হাট-বাজার করিয়াই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

মিঞাপাড়ার পূর্ব্বাংশেই সুবৃহৎ গৃহস্থ পাড়া *। এই পাড়ায় প্রায় পঞ্চাশ ষাইট ঘর মোসলমান কৃষকের বাস। তাহাদের উপাধি শেখ ও মোল্লা। তাহাদের প্রধান ব্যক্তির নাম মুন্‌শী গিয়াস-উদ্দিন; লোকে সাধারণতঃ 'বড়মিয়া গয়জদ্দিন' বলিয়া থাকে। তিনি সুবিখ্যাত আলিমুদ্দিন সরদারের একমাত্র পুত্র। শুনা যায়, মিঞা সাহেবদিগের প্রভাবের সময়ে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মিঞাবাড়ীর 'সরদারী' কার্য্য করিতেন। সেই সূত্রে ক্রমশঃ অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। তাহাতেই ইহাদের উন্নতি হইতে থাকে। অতঃপর যখন মিঞা সাহেবদিগের অবস্থা-

* পূর্ব্ববঙ্গে কৃষিজীবীদিগকে সাধারণতঃ গৃহস্থ বলে।

বিপর্য্যয় ঘটিয়া তাঁহাদের সম্পত্তিসমূহ হস্তান্তরিত হইতে থাকে, তখন রায় মহাশয়দিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আলিমুদ্দিন সরদারের পিতাও দুই এক খণ্ড লাভজনক সম্পত্তি হস্তগত করেন। পরিশ্রমগুণে ও আড়ম্বর-হীন চাল-চলনে এই সম্পত্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আলিমুদ্দিন সরদারের সময়ে জোত ও প্রজা-সম্পত্তি ভিন্ন তাঁহার স্বীয় খামার চাষে প্রায় একশত বিঘা জমি ছিল। এই ভূমিগুলি রীতিমত চাষ-আবাদ হওয়ায় প্রতি বৎসর বহুশত টাকা উপার্জ্জিত হইত। ফলতঃ আলিমুদ্দিন সরদারের সময়ে তিনিই এ অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার আদেশে শতাধিক লোক প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইত। তাঁহাকে ভয় না করিত, চতুষ্পার্শ্বের হিন্দু-মোসলমানের মধ্যে এমন কোন লোকই ছিল না।

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও তাঁহাদের বংশাবলীর সুদীর্ঘ সুদৃঢ় দেহ, বীরত্ব-ব্যঞ্জক বাহু, সমুন্নত নাসিকা, সুবৃহৎ চক্ষু, প্রসারিত বক্ষ, বিশাল উরুদেশ, বৃহৎ পদ ও বজ্রমুষ্টি দেখিয়া অনেকেই সেই মিঞাবাড়ীর 'সরদারি' কার্য্যের কথা লইয়া কানা-ঘুষা করিত। বুদ্ধিমান্ আলিমুদ্দিন সরদারের ইহা সহ্য হইল না। তিনি এই অপবাদ খণ্ডনের জন্য আফতাবউদ্দিনের ভগিনীর সহিত স্বীয় পুত্র গিয়াসউদ্দিনের বিবাহ দিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া প্রচুর টাকা পয়সা ও ভূমি-সম্পত্তি প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু আফতাব-উদ্দিনের পিতা কিছুতেই এ কার্য্যে সম্মত না হওয়ায়, অগত্যা প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ করিয়া—ফতেহাবাদের অন্তর্গত ফুলকুচা গ্রামের প্রসিদ্ধ কাজী-বংশোদ্ভব মৌলবী এরফান আলি সাহেবের কন্যা রাবিয়ার সহিত গিয়াসউদ্দীনের বিবাহ সম্পাদন করিলেন। মৌলবী এরফান আলি সাহেব স্বীয় জামাতাকে লেখা পড়া শিখাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু একাধারে লক্ষ্মী ও শৌর্য্যের বর-পুত্রকে সমধিক কৃপা করিতে ইচ্ছা

সরস্বতী কিছুতেই সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। অগত্যা গিয়াসুদ্দিনের নামের শেষের সরদার উপাধির পরিবর্ত্তে নামের পূর্ব্বে একটী 'মুন্‌শী' সংযুক্ত হইয়াই এ নাটকের যবনিকা পতিত হইল।

এই বিবাহ ও উপাধি পরিবর্ত্তনের দ্বারা বিশেষ কোন ফল হইয়াছিল কিনা, বলা যায় না। তবে পরাক্রান্ত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী বুদ্ধিমান্ ও তেজস্বী গিয়াসুদ্দিনের সম্মান-প্রতিপত্তি যে বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় নাই, একথা নিশ্চিত।

কিন্তু বিধাতার বিধানে বোধ হয়, নির্দ্দোষ সুখ-শান্তি কাহারও অদৃষ্টে নাই। বিবাহের পর গিয়াসুদ্দিন গুণবতী পত্নী রাবিয়ার সহবাসে পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার সন্তানাদি হইবার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। ইহাতে সকলেই হতাশ হইলেন। অনেক চেষ্টা চরিত্র ও চিকিৎসাদির পর বিবাহের দশম বৎসরে বড়মিঞার একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। মহাধুমধামে উক্ত শিশু কন্যার আকিকা * সম্পাদনপূর্ব্বক তাহার নাম আজিজন্-নেসা ওরফে আজিজা রাখা হইল। কিন্তু আজিজার জন্মের পাঁচ ছয় বৎসর পরে সকলেই বুঝিল যে, আজিজার মাতার আর সন্তানাদি হইবে না। অগত্যা গিয়াসুদ্দিন সকলের—বিশেষতঃ আজিজার মাতার একান্ত অনুরোধে একটী সাধারণ শ্রেণীর গৃহস্থ-কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে তাহারও কোন সন্তানাদি হইল না। গিয়াসুদ্দিন আবার বিবাহের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার তিনি বাঁধাশূন্য। প্রথমবার বিবাহ করিতে তিনি কত ভাবিয়াছিলেন, আজিজার মাতার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কি মনে করিবেন, ভাবিয়া কতরূপে তাঁহার সহিত কথা পাড়িয়া তাঁহার মন বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এবার এ সমস্ত চিন্তা বা জিজ্ঞাসা করা তিনি

আদৌ আবশ্যক বোধ করিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই দওলতগঞ্জের স্বনামখ্যাত জমীর বিশ্বাসের পরমাসুন্দরী যুবতী বিধবা কন্যাকে বরণ করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন।

পাঠক! তিন বিবাহ করিলেন বলিয়া সর্ব্বসাধারণের ত্রাস-স্বরূপ বড়মিঞা গিয়াসুদ্দীন সাহেব যে হিন্দু-গ্রন্থকার-বর্ণিত বুড়া ডেপুটী কুমুদবাবু বা নাজীর তারিণী বাবু কিংবা একাধিক বিবাহ-বিদ্বেষী গ্রন্থকার বিশেষের কল্পিত দ্বিপত্নীক স্বামীর ন্যায় স্ত্রী-দুর্গের চরণ-প্রাকারে গড়াগড়ি দিলেন, এরূপ কেহ মনে করিবেন না। বরং প্রত্যেক স্ত্রী-ই তাঁহাকে যমের মত ভয় করিতেন, তবে আজিজার মাতা সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভবা ও সুশিক্ষিতা এবং শ্বশুরের আদরের পুত্রবধূ বলিয়া তিনি চিরকালই স্বামীর নিকট হইতে ভালবাসার সহিত ভক্তি সম্মানও পাইয়া আসিয়াছেন। একা তিনি ভিন্ন অন্য স্ত্রীদ্বয়কে সময়ে সময়ে বড় মিঞার বজ্রমুষ্টির বিরাগ চুম্বনও সহ্য করিতে হইত। তবে বড় মিঞার তৃতীয় পত্নী বিশ্বাস-তনয়ার যে একটু বাড়াবাড়ি ছিল, তাহা আমরাও অস্বীকার করিতে পারি না।

গৃহস্থপাড়ার পূর্ব্বে খোন্দকারপাড়া। খোন্দকার সাহেবেরা বনিয়াদি পীর। তাঁহারা উত্থান পতনের বড় ধার ধারেন নাই। বহুকাল যাবৎ সমাজের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া, 'মুরিদ' বাড়ী গিয়া মোরগ বধ করিয়া, ঘৃতসংযুক্ত পোলাওয়ে উদর পূর্ণ করিয়া, মৌলুদ পাঠপূর্ব্বক নজর গ্রহণ করিয়া আরামের জীবন কাটাইয়া আসিয়াছেন। লেখা পড়া শিক্ষারও বড় একটা গরজ তাঁহাদের হয় নাই। কিন্তু ইদানীং তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছিল। কারণ সমাজে ইংরাজী ও আরবি শিক্ষিত নব্যদলের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। এতদিন খোন্দকার-কুল-চূড়ামণি পীর মহম্মদ সাহেব—"আখের জামানেকি আলেমুঁ শায়তান কা দোস্ত হায়"—এবং "আঙ্গরেজি পড়নেওয়ালা কাফের"—এই

উর্দ্দুটুকু আওড়াইয়াই তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন; কিন্তু এখন আর চলে না। অগত্যা এই "কাফের" ও "শয়তান কা দোস্ত" দলের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য খোন্দকার সাহেব স্বীয় পুত্রযুগলকে যথাক্রমে স্কুল ও মাদ্রাসায় প্রেরণ করিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম যথাক্রমে আকসার-উদ্দিন ও আতাওর রহমান।

সকলের পূর্ব্বে ঈষৎ বক্রভাবে আলমডাঙ্গা ঝিলের প্রায় সংলগ্ন ভাবে অবস্থিত জেলেপাড়া। এই পাড়ায় পনর যোল ঘর জেলের বাস। তাহাদের কার্য্য রাত্রে মৎস্য ধরিয়া প্রাতঃকালে বাজারে বিক্রয় করা এবং দ্বিপ্রহরে নিদ্রা যাওয়া ও বৈকালে তাস পেটা।

সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ! আমরা আলিনগরের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পল্লীসমাজ সম্বন্ধে আবশ্যক সকল কথাই প্রায় বলিয়াছি। অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আর একটু ধৈর্য্য ধারণ করিলে গ্রামের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিয়াই আমরা উপাখ্যানের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইব। মনে রাখিবেন, অধমের উপাখ্যান পল্লীচিত্র। কোন পল্লীদৃশ্য দেখিতে হইলেই, একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, পল্লীর বাড়ী ঘরের পার্শ্ব দিয়া, পল্লীর কর্ম্মক্লান্ত নর-নারীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, অনাবশ্যক হইলেও পল্লীর ভালমন্দ বিবিধ দৃশ্য দেখিয়া,—একটু আবশ্যকাতিরিক্ত সময় নষ্ট করিয়া গমন করা আবশ্যক। কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ পল্লীগ্রামে ঘড়ির কাটার মর্য্যাদা-বোধ-সম্পন্ন বগি, ট্রাম, সাইকেল বা মোটর গাড়ীর প্রচলন হয় নাই। বিশেষতঃ পল্লীপথে গমন করিতে হইলে আপনাদের কোমল চরণ সময়ে সময়ে যে কণ্টকে আহত বা কর্দ্দমে সিক্ত হইবে না, এমন কথাও আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে শ্রান্ত হইলে যে নব পল্লবিত তরুতলে বিশ্রাম করিতে—সরিৎ-সলিলে বদন-চরণ প্রক্ষালন করিতে পারিবেন কিংবা শহরে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া যেরূপ দুই একটী

কৃত্রিম বিলাসকুঞ্জ নির্ম্মিত হয়, তদ্রূপ অসংখ্য দৃশ্য দেখিতে পাইবেন, এরূপ আশা আমরা প্রদান করিতে পারি।

আলিনগরের রায়পাড়ায় দুইটী দল বর্ত্তমান। যদিও রায় মহাশয়ের তুল্য লোক সে পাড়ায় কেহই ছিল না এবং প্রকারান্তরে সকলেই রায় মহাশয়ের অনুগত, তথাপি ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে এই দলাদলির ভাবটা স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। এই বিরুদ্ধবাদী দলটা কয়েকজন কায়স্থ যুবকের; দলের দলপতি শচীন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে শচিবাবু। তিনি সব-রেজেষ্ট্রী আপিসে মহুরেরগীরি চাকুরি করেন এবং প্রত্যেক মাসের শেষ শনিবার বাড়ী আসিয়া দলপতির আসন গ্রহণ করেন। পাড়ার অন্যান্য সকলেই তারিণী বাবুর দলে এবং তারিণীবাবুর দলের নিকট শচিবাবুর দলের শক্তিও নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু আমরা জানি, তারিণীবাবুর একাধিপত্যের ব্যতিক্রম হওয়ায় তিনি শচিবাবু ও তাঁহার দলস্থ যুবকগণের উপর ভারি চটিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষেও তারিণীবাবুর কার্য্যে গোলযোগ বাধাইবার জন্যই যেন শচিবাবুর দলের সৃষ্টি। তবে তারিণীবাবু প্রকাশ্যেই বলিতেন, "থাকিতে দাও ওদেরে; যে গাঙ্গে রুই মাছ থাকে, সেই গাঙ্গেই সফরী ফর্ ফর্ করিয়া বেড়ায়। শোল-গজারের কাছে চাঁদা-চেলা না থাকিলে চলিবে কেন? যে জঙ্গলে বাঘ থাকে, সে জঙ্গলের শিবরাম পণ্ডিত* হুয়া হুয়া করিবেই।" শচিবাবু বলিতেন, "বুড়া এইবার আমাদের শক্তি-সামর্থ্য বুঝিয়াছে; আর বেশীদিন বাহাদুরি টিক্‌ছে না।"

রায় মহাশয় একজন প্রবীণ সুদখোর। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের প্রায় সকলেই তাঁহার খাতক। রায় মহাশয়ের টাকা ধারে না, এমন লোক খুব বিরল। পূর্ব্বে অধিকাংশ লোক আলিমুদ্দিন সরদারের খাতক ছিল;

---

* স্থান-বিশেষে শৃগালের পাণ্ডিত্যের জন্য উহাকে বিদ্রূপ করিয়া 'শিবরাম

কিন্তু মৌলবী এরফান আলি সাহেবের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেওয়া উপলক্ষে তিনি 'তওবা' * করিয়া সুদ পরিত্যাগ করেন এবং সেই হইতেই সুদের কারবারে রায় মহাশয়ের পশার-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। বিশেষতঃ মোসলমান সমাজের ন্যায় সুদ-গ্রহণ হিন্দু সমাজের নিকট নিন্দনীয় ঘৃণাকর পাপকার্য্য বলিয়া পরিগণিত নহে †।

মোসলমান পাড়ায় মিঞা সাহেবদিগের প্রভাবকালে কোন প্রকার দলাদলি ছিল না। সমস্ত মোসলমানই ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপে মিঞা সাহেবদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদেরই মতানুসরণ করিতেন। কিন্তু মিঞা সাহেবদিগের পতনের সূচনায় ইস্‌লাম ধর্ম্মের পবিত্র উদ্দেশ্যের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া গৃহস্থ পাড়া ও খোন্দকার পাড়ায় দুইটী পৃথক্‌দলের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে ধন-জন-বল-সম্পন্ন গৃহস্থ পাড়ার দল সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া মাথা তুলিতে থাকে এবং শিথিল-ভিত্তি জীর্ণ অট্টালিকার ন্যায় মিঞা সাহেবদিগের দলবল ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমে সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়া যায়। ইহা আলিমুদ্দিন সরদারের পিতার সময়ের ঘটনা। অতঃপর আলিমুদ্দিন সরদারের প্রভাবের সময়ে, তিনি বিশেষ কৌশল-জাল বিস্তারপূর্ব্বক মিঞা সাহেবদিগকে স্বীয় দলে আকর্ষণ করিয়া অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করেন। ইহাদ্বারা তাঁহাদের ক্ষুণ্ণ সামাজিক সম্মানের পূর্ণতা সাধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে খোন্দকার সাহেবদিগের দল ক্রমশঃ একেবারেই নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ মিঞা সাহেবদিগের সহিত এই সদ্ভাব স্থাপনে বিচক্ষণ আলিমুদ্দিন সরদারের এক গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত

* পবিত্র ইসলাম-শাস্ত্রানুসারে পাপ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া এবং পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করাকে, 'তওবা' করা বলে।

† হিন্দু-শাস্ত্রেও সুদ-গ্রহণ অবৈধ বলিয়া বর্ণিত আছে; কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, হিন্দু সমাজে ঐ বিধানের কোনই প্রভাব নাই।

হইয়াছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধিত না হইলেও তিনি প্রাচীন মিঞা বংশের সহিত কোন প্রকার অসদ্ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হন নাই। এই সদ্ভাব আলিমুদ্দিনের পুত্র বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিন ও আফতাব-উদ্দিন মিঞার মধ্যে এ পর্য্যন্ত সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে।

খোন্দকার সাহেবদিগের কর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের অনভিজ্ঞতার জন্য তাঁহাদের দল-বল কখনও সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই; তাঁহাদের তদ্রূপ উদ্দেশ্যও ছিল না। কেবল কৃষকদলের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার জন্যই তাঁহাদের এ দলের সৃষ্টি। বর্ত্তমান খোন্দকার পীর মহম্মদ সাহেব কৃষককুলের এই বাড়াবাড়ি ও ভদ্রলোকের দুরবস্থার জন্য বড়ই ক্ষুণ্ণ; তজ্জন্য তিনি ভদ্রলোকের সম্মান বাড়াইয়া ছোট লোকের ক্ষমতা ধ্বংস করিতে একান্ত ইচ্ছুক। কিন্তু আফতাব-উদ্দিন মিঞাকে স্বদলভুক্ত করিতে না পারায় তাঁহার এ বাসনা পূর্ণ হইতেছিল না। খোন্দকার সাহেবের প্রতি বা ভদ্র লোকের সম্মান বাড়াইবার জন্য আফতাব-উদ্দিন মিঞার যে সহানুভূতির অভাব ছিল, তাহা নহে; কিন্তু গিয়াসুদ্দিন ও তাঁহার দলের উপর ভর দিয়া তিনি যে সম্মান-প্রতিপত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, নির্ব্বোধের মত অকারণে তাহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন।

ইহাই আলিনগরের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা। পাঠক! এক্ষণে স্বচ্ছন্দে উপাখ্যানের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হউন।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গ্রাম্য সম্বন্ধ।

অনুজ্জ্বল রবির কনক-কিরণ-প্রদীপ্ত কুয়াসাচ্ছন্ন পৌষ মাসের প্রভাত; শীত-জর্জ্জর রজনীর শিশির-স্নাত শ্যামল পল্লবদলশালী সমুন্নতশীর্ষ পল্লীবৃক্ষ-রাজির উপর নবোদিত সূর্য্যের হেম-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছে!—যেন তরলীকৃত কাঞ্চন-মাখা তরুপল্লবসমূহ মৃদু সমীরণ-তাড়নে ঈষৎ কম্পিত হইয়া রবি-রশ্মির সহিত নীরবে হাস্য করিতেছে! অবনী সুন্দরীর অঙ্গাবরণ স্বরূপ সূক্ষ্ম শিশিরজাল-সমাচ্ছন্ন সমশীর্ষ নবীন দুর্ব্বাদলের উপর লোহিত সূর্য্যের সোণালী আভা প্রতিবিম্বিত হওয়ায় শিশির-কণাসমূহ অজস্র মুক্তামালার ন্যায় ঝল্‌মল্‌ করিয়া পল্লী-প্রান্তরের স্নিগ্ধ বক্ষে কি অপূর্ব্ব মাধুরীই ছড়াইয়া দিতেছে! উন্মুক্ত প্রান্তর-প্রবাহিত ধীর সমীরণ রবিশস্যের নানা বর্ণ পুষ্প-স্তবকের উপর দিয়া খেলিতে খেলিতে গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ-পূর্ব্বক শীতের প্রখরতা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে।

এমন সময়ে—সেই প্রথম প্রভাতের শীত-সমীরণ-প্রবাহিত প্রান্তরের মধ্য দিয়া—একটী বালক আলিনগরের মধ্য-পাড়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং দেখিতে দেখিতে—কৃষকগণ কৃষি-কার্য্যের জন্য গো-বৎসাদি লইয়া বাহির হইতে না হইতেই—বালক অনূ্যন অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মধ্য-পাড়ার বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিন সাহেবের বৈঠকখানার

বৈঠকখানা "করোগেট আয়রনের" নির্ম্মিত একখানি প্রকাণ্ড আটচালা গৃহ ;—বাটীর দক্ষিণে প্রায় পঞ্চাশ হস্ত দূরে অবস্থিত। বৈঠকখানার সম্মুখ হইতে মাঠ পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত রাস্তা রহিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে কয়েকটী লিচু ও ডালিম এবং কতকগুলি নারিকেলের গাছ ; তাহার মাঝে মাঝে মেটে আলু, মানকচু, ওল প্রভৃতি তরকারী এবং পুঁই, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি শাক ও তরকারীর লতাগাছ।

বৈঠকখানার উত্তরে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পশ্চিম পার্শ্বে প্রায় পনর ষোলটী গরু থাকিবার উপযুক্ত বৃহৎ গোয়াল ঘর। পূর্ব্বদিকে চাকরদের থাকিবার দোচালা গৃহ।

আঙ্গিনার উত্তরে অন্তঃপুর বা ভিতরবাটী ; ভিতর বাটীর উত্তর ও দক্ষিণ পোতায় দুই খানি আটচালা এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম পোতায় দুইখানি চৌচালা গৃহ ; তন্মধ্যে উত্তর পোতার গৃহখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং মূল্যবান্ কাষ্ঠাদি দ্বারা দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত। বড় মিঞা সাহেবের যাবতীয় মূল্যবান্ জিনিসপত্র ও লৌহ-সিন্ধুক এই গৃহেই অবস্থিত। এই গৃহের কর্ত্রী আজিজার মাতা—বড় মিঞা সাহেবের প্রথমা স্ত্রী। পশ্চিমের গৃহে ধানের গোলা ; পূর্ব্বের গৃহে বড় মিঞা সাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী এবং দক্ষিণের সুসজ্জিত গৃহে তাঁহার নব-পরিণীতা পত্নী বিশ্বাস-তনয়া দেলজান অবস্থান করেন। এতদ্ভিন্ন পাশে পাশে আরও কয়েকখানি রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর ও কাষ্ঠাদি রাখিবার ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৃহগুলি সমস্তই "করোগেট আয়রন" অর্থাৎ বঙ্গের নূতন আমদানী টীন দ্বারা নির্ম্মিত।

বৈঠকখানার মধ্যে দুই তিন খানি তক্তপোষ, একখান টেবিল, দুইখান চেয়ার ও কয়েকখানি ছোট বড় টুল বিশৃঙ্খলভাবে পাতা রহিয়াছে। পশ্চিম পার্শ্বের তক্তপোষের উপর ফরাশ-আবৃত একটা সতরঞ্চ পাতা ছিল ; তদুপরি একজন সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ উপবেশন করিয়া একটী নরমসৃণ

বালিকাকে কোরান-শরীফ পড়াইতেছিলেন। বালিকার কমনীয় কণ্ঠে উচ্চারিত কোরান-শরীফের পবিত্র 'আয়ত'সমূহ * চারিদিকে সুমধুর অমৃতধারা ঢালিয়া দিতেছিল।

পূর্ব্বোক্ত বালক বৈঠকখানার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন এবং অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে বৈঠকখানার অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক বৃদ্ধকে সসম্ভ্রমে 'সালাম' করিয়া তক্তপোষের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

বৃদ্ধ তাঁহার প্রশান্ত দৃষ্টি বালকের শীত-নিপীড়িত পরিম্লান মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"আবুল ফজল! এত সকালে কি জন্য?"

বালক সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"হুজুর, একটী সংবাদ আছে, আপনি আগে পড়ান শেষ করুন।"

বৃদ্ধ।—"আচ্ছা তবে ব'স"—বলিয়া তিনি বালিকাকে পড়াইতে লাগিলেন। বালিকা বৃদ্ধের কথা বলার অবসরে মুহূর্ত্তের জন্য বালকের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ পুনঃ পড়াইতে প্রবৃত্ত হওয়ায় বালিকাও পুস্তকে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া অবিলম্বে কোরান-শরীফের নূতন এক 'সুরার' † পাঠ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ঘোড়া, গরু, শৃগাল, কুকুর, বিড়াল, উল্লুক, ভল্লুক ও কাক-চিলের গল্পপূর্ণ সুসভ্য বিংশ শতাব্দীর একখানি বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তক হাতে উঠাইয়া পড়িতে লাগিলেন; কিন্তু সেই নীরস ও কর্কশ গল্পগুলি বোধ হয় বালিকার একটুও ভাল লাগিল না; কারণ বালিকা অবিলম্বে সেই পুস্তকখানি রাখিয়া দিয়া "কোরান-শরীফের নীতি ও উপাখ্যান" নামক আর একখানি উপাদেয় বাঙ্গলা পুস্তক অত্যন্ত মনঃসংযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন। এই পুস্তকখানিতে পবিত্র

* আয়ত = কোরান-শরীফের বাক্য, শ্লোক।

† সুরা = কোরান-শরীফের অধ্যায়।

ইসলাম ধর্ম্মের রীতি-নীতি এবং একেশ্বরবাদ—ইসলাম-প্রচারক পয়গম্বর-গণের জীবন-চরিত ও উপদেশ অতি সুললিত গদ্য ও পদ্যে লিখিত ছিল।

বালিকা পাঠ সমাপনানন্তর পুস্তকগুলি যথাস্থানে রাখিতেছেন দেখিয়া বালক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজিজা! চাচাজান * বাড়ী আছেন?"

অতি সংক্ষেপে—মৃদুস্বরে—"আছেন" কথাটী বলিয়াই বালিকা বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। কিন্তু যাইবার সময়ে বালকের মুখের দিকে আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; সে দৃষ্টি যেন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিল,— "আপনি বাড়ীর মধ্যে আসিবেন না?"

বালিকা চলিয়া যাইবার পর বৃদ্ধ বালকের দিকে ফিরিয়া বসিলেন। বালকের বয়স ষোল বৎসরের অনধিক; বর্ণ উজ্জ্বল গৌর; মুখখানি শরতের চাঁদের মত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল; তদুপরি তরল লাবণ্য যেন টল্‌মল্ করিতেছে। উজ্জ্বল ললাট, যুগ্ম ভ্রূ, উন্নত নাসিকা, বৃহৎ চক্ষু এবং ঈষৎ গোঁপের রেখা তাঁহার কমনীয় মুখকান্তি আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার শরীর ঈষৎ দীর্ঘ—কিন্তু পূর্ণায়ত ও স্বাস্থ্য-সম্পন্ন।

বালকের পরিধানে একখানি দেশী মিলের মোটা ধুতি; গায়ে পুরু কাশ্মিরী কোট,—কিন্তু বুক খোলা নহে। পায়ে কানপুরী জুতা ও মতি-পুরের নীটিং কোম্পানীর ষ্টকিং; মস্তক ও গলার উপর দুই পেচ দেওয়া আসামজাত মলীদার কম্‌ফর্টার।

---

* চাচাজান-চাচিজান, দাদাজান-দাদীজান, আব্বাজান-আম্মাজান, ফুফাজান-ফুফুজান, খালুজান-খালাজান, মামুজান, ভাইজান, বুজান প্রভৃতি শব্দগুলি পূর্ব্ববঙ্গীয় মোসলমান সমাজের বহুল-প্রচলিত পারিবারিক শব্দ। সুতরাং কাকা-কাকী, আজা-আজী, পিসা-পিসী, মেসো-মাসী ও দাদা-দিদির পরিবর্ত্তে আমরা উক্ত সুপ্রচলিত ও সুশ্রাব্য জাতীয় শব্দগুলি ব্যবহার করাই সমীচীন মনে করি।

বালকের নাম যে আবুল ফজল,তাহা বৃদ্ধ কর্ত্তৃক প্রথমেই উচ্চারিত হইয়াছিল। পাঠক বোধ হয়, ভুলিয়া যান নাই যে, আবুল ফজল আলিনগরের আফতাব-উদ্দিন মিঞার পুত্র;—স্থানীয় মাইনর স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।

বৃদ্ধের নাম মৌলবী রফিউদ্দিন; তিনি আলিনগর মাইনর স্কুলের পার্সিয়ান শিক্ষক। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুসলমান শিক্ষার উন্নতি-কল্পে নিয়োজিত পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণের নির্দ্দেশ অনুসারে অনেক মাইনর স্কুলেই এইরূপ মৌলবী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মৌলবী সাহেবের বেতন মাসিক কুড়ি টাকা মাত্র। পাঠক! ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; ইহা সুসভ্য বিংশ শতাব্দীর মহিমা-বিশেষ! যে প্রোফেসরের ছাত্র পাস করিয়া বাহির হওয়া মাত্রই চারি পাঁচ শত টাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির পদে নিযুক্ত হন, সেই প্রোফেসরের বেতন এক শত বা দেড়শত টাকা যে নীতিতে অনুমোদিত হইয়াছে, মৌলবী সাহেব বা পণ্ডিত মহাশয়ের ছাত্র শতাধিক মুদ্রা মাসিক বেতনের বিশেষ বিশেষ পদে অতি সহজে নিযুক্ত হইলেও সেই "শামসুল ওলামা" মৌলবী বা কাব্যতীর্থ কবিকুসুম পণ্ডিতের বেতন মাসিক কুড়ি টাকা হইতে তিরিশ টাকা পর্য্যন্ত সেই নীতিতেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে; অতএব ইহা আলোচনার বিষয় নহে; বিষয়টী কেবল মাত্র সাধনার ও বিবেচনার!

যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিন সাহেবের বাটীতে মৌলবী সাহেবের 'জায়গীর' নির্দ্ধারিত ছিল; তজ্জন্য তিনি বেতনের কুড়িটী টাকা সমস্তই বাড়ী পাঠাইতে সমর্থ হইতেন। বাজে খরচ বড় মিঞা সাহেবের কন্যা আজিজাকে পড়ানের জন্য প্রাপ্ত মাসিক পাঁচ টাকাতেই চালাইয়া লইতেন। তদুপরি মৌলবী সাহেব চারি পার্শ্বের মোসলমান সমাজের ধর্ম্ম-ক্রিয়া এবং নিমন্ত্রণ-পত্রাদি হইতেও কিছু টাকা প্রাপ্ত হইতেন। তিনি অত্যন্ত সদাশয় ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি।

মৌলবী সাহেব আবুল ফজলের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—এমন সময়ে আর একজন প্রবীণ ব্যক্তি সেখানে আগমন করিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর; নিয়মিত পরিশ্রম হেতু শরীরে পূর্ণ স্বাস্থ্য ও তজ্জনিত লাবণ্য সম্পূর্ণ বিদ্যমান। তাঁহার শরীর যেরূপ হৃষ্টপুষ্ট, দেখামাত্র সেইরূপ বলিষ্ঠ বলিয়া অতি সহজেই প্রতীয়মান হয়। তাঁহার ললাট প্রশস্ত—নয়নদ্বয় বৃহৎ ও তেজঃ-সম্পন্ন;—দেখিলেই মূর্ত্তিমান্ গাম্ভীর্য্য ও রাশভারি লোক বলিয়া অনুমিত হয়।

তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই আবুল ফজল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মৌলবী সাহেবও সম্মান প্রকাশ জন্য—"আসুন বড় মিঞা সাহেব" বলিয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু—"মৌলবী সাহেব বসেন"—বলিয়া তিনি তক্তপোষের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং আবুল ফজলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মিঞা! বাড়ীর সকলে ভাল ত?"

আঃ ফজল। জি-হাঁ,—সকলে ভালই আছেন।

বড় মিঞা। তোমার পিতা বাড়ী আছেন?

আঃ ফজল। হাঁ, আছেন।

বড় মিঞা। তোমাদের পড়া-শুনা কেমন হইতেছে?

আঃ ফজল। একরূপ ভালই হইতেছে। আজ ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আস্‌বেন বলিয়া সংবাদ দিয়াছেন। মৌলবী সাহেব কাল স্কুলে যাইতে পারেন নাই, তাই সংবাদ দিতে আসিলাম।

মৌলবী সাহেব। (আবুল ফজলের প্রতি) কাল খবর দিয়াছেন বোধ হয়? আজই কি আস্‌বেন?

আঃ ফজল। জি-হাঁ।

বড় মিঞা। (মৌলবী সাহেবের প্রতি) সেই বুড়া ডেপুটী-সাহেব বোধ হয়? আপনার বালিকা-স্কুলও দেখিতে আস্‌বেন না কি?

মোঃ সাহেব। খুব সম্ভব আসিবেন। কাছারীটা একটু পরিষ্কার করিয়া বিছানা-পত্র পাতিয়া রাখা দরকার।

বড় মিঞা। তা করা যাইবে।

এমন সময়ে চাকর তামাক লইয়া আসায় বড় মিঞা সাহেব তামাক সেবন করিতে লাগিলেন এবং আবুল ফজল উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন।

আবুল ফজল বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখিলেন,—আজিজা ফুটন্ত খর্জ্জুর রসে আল-চাল ও কাঁচা দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে নাড়িয়া দিতেছেন এবং রন্ধনগৃহের অন্য পার্শ্বে আজিজার বিমাতা (বড় মিঞার দ্বিতীয়া স্ত্রী) ভাতের হাঁড়ী নামাইয়া কতকগুলি কৈ মাছ ও বেগুণ তরকারী ভাজিতেছেন। আজিজার অন্যতমা বিমাতা দেলজান একটী শিশু পুত্র (যাহা তিনি বিবাহের এক বৎসর পরেই প্রাপ্ত হইয়াছেন) কোলে লইয়া চাকরের দ্বারা এক রাশি ধান ভানাইতেছেন এবং ইচ্ছাপূর্ব্বকই বোধ হয়, কোলের শিশুকে কাঁদাইয়া মাঝে মাঝে ধমক দিতেছেন।

আবুল ফজল আজিজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বড় চাচিজান কোথায়?" বড় চাচিজান অর্থ—আজিজার জননী-মাতা।

আজিজা। তিনি ঘরে 'ওজিফা' * পড়িতেছেন;—ভাল কথা, ভাইজান! আপনি মৌলবী সাহেবকে কি সংবাদ বলিতে চাহিলেন?

আঃ ফজল। ও—তা তোমারও শোনা দরকার বটে। আজ ডেপুটী সাহেব আসিবেন; সম্ভব তোমাদিগকেও পরীক্ষা দিতে হইবে।

আজিজা। আমাদের আবার পরীক্ষা! এই ভাত রাঁধা, মাছ কোটা, বেগুণ ভাজা আর পায়স রাঁধার পরীক্ষা নিলে দিতে পারি!

---

* ওজিফা—উপাসনা ও স্তোত্র পাঠ বিশেষ।

আঃ ফজল। সত্যি আজিজা; মাষ্টার সাহেবের কাছে শুনেছি, আজ কাল অনেক স্কুলেই মেয়েদিগকে রাঁধা-বাড়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

তচ্ছ্রবণে আজিজা সুমধুর হাসির লহরী তুলিয়া—তাঁহার পার্শ্বস্থিতা বিমাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"হাগো রাঁধুনির মেয়ে! তুমি কোন্ স্কুলে রাঁধা-বাড়া শিখেছ?" অনন্তর আবুল ফজলের প্রতি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"ভাইজান! তা হইলে আমি বোধ হয়, আপনাদের সে স্কুলে মাষ্টার হইতে পারি?"

পার্শ্বস্থ ধান ভানিবার গৃহ হইতে দেলজান সম্বন্ধহীন ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"মেয়েদের আবার ইস্কুলি যাইয়া রাঁধাবাড়া শিখ্‌তে অবে! কালে কালে ভাত খাওয়া, পান সাজা, বসা, শোওয়া শিখ্‌বার জন্যি ইস্কুলে যাইতি না অয়!"

আবুল ফজল একটু অপ্রতিভ হইলেন; এমন সময়ে আজিজার মাতা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্নেহপূর্ণস্বরে আবুল ফজলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! তোমার মা ভাল আছেন? মেয়েরা সব ভাল আছে?"

আঃ ফজল। জি-হাঁ, সকলেই ভাল আছেন। অনন্তর আরও দুই একটী কথা বলিয়া আবুল ফজল বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তদ্দর্শনে আজিজা ব্যস্তভাবে বলিলেন—"ভাইজান একটু দেরি করিয়া 'নাস্তা' * খাইয়া যান।"

আঃ ফজল। তুমি পাগল; আমি 'গোসল' † না করিয়া কিছু খাই না।

আজিজা। একদিন খাইলে দোষ হইবে না; কেবল নাস্তা খাইবেন বৈত নয়, 'গোসল' করিয়া ভাত খাইলেই চলিবে।

* নাস্তা = জলযোগ ইত্যাদি। † গোসল = স্নান।

আজিজার মাতাও তদ্রূপ বলায় আবুল ফজল বাধ্য হইয়া দেরি করিতে সম্মত হইলেন। এমন সময়ে সহসা দেলজানের শিশুপুত্র কাঁদিয়া উঠায় তিনি আজিজার দিকে বক্র দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"ওকে কেউ একটু ধর্‌লি চাইলগুলি ঝাইড়া দিতাম।"

আজিজার মাতা শিশুকে কোলে লইবার জন্য আজিজাকে আদেশ করায় তিনি উঠিয়া গেলেন। আজিজার দ্বিতীয় বিমাতা পায়স ও ভাত-তরকারী গৃহে লইয়া গেলেন। আজিজার মাতা সকলকে খাবার দিতে লাগিলেন।

আবুল ফজল ও বড় মিঞা সাহেব একত্রে আহার করিতে বসিলেন। বলা বাহুল্য, আবুল ফজল কেবল খর্জ্জুর রসের পায়স খাইয়াই নিষ্কৃতি পাইলেন না; অন্ন-ব্যঞ্জন সমস্তই তাঁহাকে যথাযোগ্য ভোজন করিতে হইল।

আহার সমাপনান্তে আবুল ফজল স্কুলে যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

গ্রাম্য শিক্ষা।

অন্যূন দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আলিনগরে মাইনর স্কুল স্থাপিত হয়, তখন মাত্র তিনজন শিক্ষকের দ্বারা স্কুলের শিক্ষাদানকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে শিক্ষা-বিভাগের উন্নতি-বিধায়ক বিধান অনুসারে শিক্ষকের সংখ্যা তিন জনের স্থলে ছয় জন করিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে শিক্ষা-বিভাগ হইতে স্কুলের সাহায্য মাসিক কুড়ি টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল। তৎপরে বিশেষ মোসলমান পরিদর্শক কর্ম্মচারীর অনুমত্যনুসারে স্কুলে একজন পার্সিয়ান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া মাসিক সাহায্য তিরিশ টাকায় পরিণত হয়। পাঠক বোধ হয়, বেশ বুঝিতেছেন যে, সরকারী মাসিক দশ টাকা সাহায্য পাইতে হইলে স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষকে মাসিক অন্ততঃ কুড়ি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে; অথচ ছাত্র-বেতন যাহা আদায় হইত, তাহা স্কুলের নিয়মিত খরচের অর্দ্ধাংশেরও কম। তথাপি নিকটবর্ত্তী কোথাও আর স্কুলাদি না থাকায় স্থানীয় হিন্দু-মোসলমানগণ সাধ্যানুযায়ী মাসিক চাঁদা দিয়া স্কুলের এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ বোধ হয়, ইহাতেও তৃপ্ত হইতে না পারিয়া স্কুলের চরম উন্নতি (কেহ দুর্গতি না বলিলেই মঙ্গল) করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে পরিদর্শনের আভাস দিয়াছি, সেই পরিদর্শনে জিলার ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের সহিত ইন্‌স্পেক্টর রায় বাহাদুর মহাশয় স্বয়ং স্কুল পরিদর্শন করিলেন। তিনি স্কুলের আদর্শ

উন্নতির জন্য উহার এফ-এ অনুত্তীর্ণ হেড মাষ্টার মহাশয়কে সেকণ্ড মাষ্টারের পদে অবনমিত করিয়া মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে বি-এ অনুত্তীর্ণ অগত্যা আই-এ পাস হেড মাষ্টার নিযুক্ত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। এতদ্ভিন্ন শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন জন্য বর্ত্তমান দ্বিবার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রধান পণ্ডিত মহাশয়ের পরিবর্ত্তে এক জন ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ইংরাজি জানা প্রধান পণ্ডিত এবং প্রাচীন 'উলা' পাস মৌলবী সাহেবের পরিবর্ত্তে নব-বিধানে মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ ইংরাজী বাঙ্গলা অভিজ্ঞ মৌলবী সত্বর নিযুক্ত করা আবশ্যক, এ কথা পরিদর্শন-বহিতে বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। স্কুলের ভাগ্য-বলেই সম্ভব, বিদ্যাসাগর বা শামস্থল-ওলামা নির্দ্দেশিত হয় নাই! এই সমস্ত আদর্শ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলেই রায় বাহাদুর মহাশয় ইহার প্রতিদানস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট হইতে স্কুলের সাহায্য মাসিক চল্লিশ টাকা করিয়া দিবেন।

শুধু ইহাই নহে, আদর্শ স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ, হিন্দু-মোসলমান বালকদিগের পৃথক্ পৃথক্ ছাত্রাবাস স্থাপন—যদিও উহার আবশ্যক অতি সামান্য এবং স্কুলের সাজ-সরঞ্জাম ও লাইব্রেরীর পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য আবশ্যক চারি হাজার টাকা আনুমানিক হিসাব করিয়া তন্মধ্যে অন্ততঃ আড়াই হাজার টাকা স্কুলকর্ত্তৃপক্ষকে অতি সত্বর সংগ্রহ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন এবং তিনি ইহাও আশা দিলেন যে, বক্রি দেড় হাজার টাকা গভর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়াইয়া দিবেন। পরিদর্শন সমাপ্ত হইল।

এই প্রচণ্ড উন্নতির স্রোতে স্কুলের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তারিণীচরণ রায়, আফতাব-উদ্দিন মিঞা ও বড় মিঞা প্রভৃতি স্কুলের হিতৈষী কর্ত্তৃপক্ষগণ আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের কোনই উপায় না দেখিয়া রায় বাহাদুর মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী লোক নিযুক্ত করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। শিক্ষা-বিভাগ হইতে—তিন মাস পরে

পরিদর্শন-বহির লিখন অনুযায়ী লোক নিযুক্ত না করিলে স্কুলের সাহায্য বন্ধ হইবে—লিখিয়া জানান হইল। তখন অগত্যা স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ সাহসে বুক বাঁধিয়া অন্ততঃ শিক্ষক নিযুক্ত করিতে মনোযোগী হইলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ লোক পাওয়া গেল না। শিক্ষা-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এ সমস্ত কথা লিখিয়া পাঠান সত্ত্বেও ছয় মাস পরে সাহায্য বন্ধ হইল; স্কুলের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। স্কুল-গৃহ ও ছাত্রাবাস স্থাপনের জন্য সংগৃহীত টাকায় আরও কিছুদিন স্কুল চলিলেও শীঘ্রই শিক্ষকগণের বেতন বাকী পড়িতে লাগিল। শিক্ষকগণের মনোযোগের অভাবে ছাত্রবেতন নিয়মিত আদায় হইল না। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত শুভ পরিদর্শনের শুভ ফলে যাহা হওয়া সম্ভব, তাহাই হইল; উন্নতির দারুণ দাবানলে শিক্ষালয়ের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইল! শিক্ষা-বিভাগের অন্যায় চাপনে দুই বৎসরের মধ্যেই স্কুল উঠিয়া গেল।

কেহ যদি বলেন যে, মাইনর স্কুলের ইংরাজী পাঠ্য—বড় জোর "কিং রীডার নম্বর থ্রী" কিংবা তদনুরূপ কিছু, উহা পড়াইবার জন্য বি,-এ, মাষ্টারের কি প্রয়োজন? একজন এফ,-এ, পড়া লোকের কি ঐ বহিটুকু পড়াইবার উপযুক্ত বিদ্যা নাই? এবং মাইনর স্কুলের জন্য চারি পাঁচ হাজার টাকায় ঘর দুয়ারেরই বা আবশ্যক কি? আমরা বলি, এরূপ প্রশ্ন যিনি করিবেন, তিনি উন্নতি জিনিসটা কি তাহা বুঝেন না! সুতরাং ইহার উত্তরও বুঝিবেন না। কারণ ইহার উত্তরের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে একটু সাধনা ও সময়ের প্রয়োজন—অর্থাৎ "মানে ইহার, বুঝ্‌বে না এখন, বুঝ্‌বে কিছু বড় হলে।"

শিক্ষাবিভাগের উৎকট করুণা-প্রবাহে আলি নগরের মাইনর স্কুল ভাসিয়া গেল বটে, কিন্তু গ্রামবাসিগণের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল না; কারণ অল্পদিনের মধ্যেই কর্ত্তৃপক্ষের সাধ কল্পনা অনুসারে তথায় একটী নিম্ন

প্রাথমিক 'বোর্ড স্কুলের' পত্তন হইল। গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ ব্যয়ে প্রায় পঞ্চশত মুদ্রা খরচ করিয়া একখানি নূতন ফ্যাশনের গৃহ নির্ম্মিত হইল এবং অল্পদিনের মধ্যে আট টাকা বেতনে একজন গো-মূর্খ-গুরু-ট্রেনিং (কেহ গোরু-ট্রেনিং মনে করিবেন না।) পণ্ডিত সশরীরে আবির্ভূত হইয়া অজ্ঞানান্ধকারাবৃত পল্লীগ্রামে বিদ্যার বিমল কিরণ বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামবাসিগণ অগত্যা "মধু অভাবে গুড়ং" বাক্যের সার্থকতার উপর নির্ভর করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন।

স্কুলের "নিম্ন প্রাথমিক" বিশেষণটী দেখিয়াই কেহ যেন ইহাকে নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর জিনিস মনে না করেন। কারণ এই বিশেষত্বে ভরা নিম্ন প্রাথমিককে একপ্রকার উচ্চপ্রাথমিকের ঠাকুরদাদা বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। যেহেতু ইহার শিক্ষাপ্রণালী হইতেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমুন্নত জার্ম্মাণ-আবিষ্কৃত "কিণ্ডার গার্ডেন" বা শিশু-বাগান প্রণালীর অনুরূপ—অর্থাৎ শিশুরূপ তরুকুল সমবায়ে একটী বিদ্যার বাগান প্রস্তুত করা। বেশ কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-উন্নত জার্ম্মণীতে ইহার বিকাশ কিরূপ হইয়াছে জানি না, কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশের সতেজ জল বায়ুর গুণে উক্ত উদ্যানে যেরূপ ফুল ফুটিতে ও ফল ধরিতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার এক নম্বর হইতেছে পুস্তকের বিশেষত্ব, অর্থাৎ সাহিত্য হইতেছে "নিম্ন প্রাথমিক বিজ্ঞান রীডার বা বিজ্ঞান পাঠ।" দেখিলেন পাঠক! কলেজগুলাকে ফাঁকি দিবার কেমন সুন্দর বন্দোবস্ত! যে গবেষণাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিষয় ছাত্রগণের ধারণক্ষম জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত এণ্ট্রান্স স্কুল হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কলেজে যে শিক্ষার হাতে খড়ি, সেই মহীয়ান্ বৈজ্ঞানিক পাঠ্য সশরীরে নিম্ন-প্রাথমিক স্কুলে আবির্ভূত! ইহা কেবল নামে নহে, হাতে কলমে ও কাজে। এ পুস্তকের মধ্যে স্থান না পাইয়াছে এমন বিষয়ই নাই!—অর্ব্বাচীন বাঙ্গালি

পাঠক গোরু হারাইলে গোরু পাওয়া যাইবে কিনা, জিজ্ঞাসা না করিলেই মঙ্গল ! এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায় উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ;—গভর্ণমেণ্টের বোটানিকাল কলেজগুলাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ! উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ফল—উদ্ভিদের আহার-বিহার—উদ্ভিদের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রভৃতি সমস্ত তথ্যই এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাণিতত্ত্ব ; কুকুর, বিড়াল, হাতী, ঘোড়া, মহিষ, জিবরা, সিন্ধুঘোটক হইতে ইন্দুর, বাঁদর, ছুচা ও পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্ত জীবের তত্ত্বই এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে ; সুতরাং নিম্ন-প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রগণ সকলেই যে প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ! পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় রসায়ন ;—জল, বায়ু ও বাষ্প প্রভৃতির গতি প্রকৃতির বিবরণ। চতুর্থ অধ্যায় ধর্ম্মতত্ত্ব ও জীবনী—যাবতীয় ধর্ম্মপ্রচারক ও মনীষিগণের জীবনী ও ধর্ম্মের আলোচনা ! পঞ্চম অধ্যায় কৃষিকার্য্য—হলকর্ষণ হইতে বপন, রোপণ ও কর্ত্তন পর্য্যন্ত ! ষষ্ঠ অধ্যায় গৃহস্থালী—ঘরঝাট হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধন, পরিবেশন, শয্যারচনা ও শয়ন প্রভৃতি। সপ্তম অধ্যায় অঙ্কন—আর্টস্কুল পাত্তাড়ী না গুটায় ! অষ্টম অধ্যায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শিশুপালন—যুবক-যুবতীর কপালদোষেই বোধ হয় প্রেমটা বাদ পড়িয়াছে ! নবম অধ্যায় সংক্রামক রোগ ও তাহার প্রতিকার ! চিকিৎসকগণের ভাগ্যে বুঝি এবার অষ্টরম্ভাই সার হইল ! দশম অধ্যায় শিল্পশিক্ষা—জার্ম্মাণী ও জাপান এবার তাল সামলাইতে পারিলে তবে বুঝিব। একাদশ অধ্যায় কথোপকথন—স্বামী-স্ত্রীর নহে। দ্বাদশ অধ্যায় অর্থনীতি ও ব্যবসা। আর স্বদেশীর ভাবনা কি ? ত্রয়োদশ অধ্যায় শাসননীতি ও আইন কানুন ;—উকিল মোক্তারগুলার ভাত মারিবার কেমন আজব ফন্দি ! পুস্তকের চতুর্দ্দশ অধ্যায় বা শেষ অধ্যায় কবিতা-মালা। এ কবিতা অতি অসাধারণ—যেমন ভাব তেমনি ভাষা ! যেমন

রচনা আবার তেমনি নির্ব্বাচন! এ কবিতার তরঙ্গে—মাইকেল, হেম, নবীন ত কোন্ ছার,—কবি-রাজ রবি বাবুর "কাঁটা গাছে পুচ্ছ তুলে নাচা," ভুলগুলো সব লওরে বাছা বাছা"—পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালি হিন্দু-মোসলমানগণ চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্রের নাম শুনিয়াছেন সত্য, কিন্তু চতুর্দ্দশ বেদের এমন মধুর সম্মিলনের বিরাট্ দৃশ্য কখন চক্ষে দেখিয়াছেন কি? আমাদের পরম সৌভাগ্য, তাই আমরা চর্ম্মচক্ষে এমন মধুর দৃশ্য দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করিতে পারিলাম! কিন্তু বড়ই আপসোস যে, ইহার গুণ প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না।

উপরে কেবলমাত্র প্রাইমারি রীডারখানার বিবরণ দেওয়া গেল। কেহ যেন মনে না করেন যে, ইহাতেই নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি; কারণ উহা ছাড়া গণিত শিক্ষা আছে, বক্তৃতা শিক্ষা আছে, সঙ্গীত শিক্ষা আছে, যাত্রাদলের ছড়া শিক্ষা আছে, বীর হইবার জন্য ব্যায়াম ও কুস্তি শিক্ষা আছে এবং ভারত উদ্ধারের জন্য দেশী 'কসরত' শিক্ষা আছে! আর আছে সেই সঙ্গে একটু একটু বাবুয়ানা! সরল গ্রাম্য-জীবনের উপর অল্প একটু আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসিতা!!

কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ এই অভিনবোন্নত শিক্ষালোক স্বীয় গৌরবদীপ্তি বিকাশের পূর্ব্বেই আবুল ফজল ও তাঁহার সহপাঠিগণ মাইনর ছাত্রবৃত্তি শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। আবুল ফজল মাসিক চারি টাকা সরকারি বৃত্তি পাইয়া জনৈক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে অবস্থানপূর্ব্বক একটী গ্রাম্য এণ্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে থাকেন। তদীয় সহপাঠী বাবু সতীশচন্দ্র রায় ফরিদপুর-জেলা-স্কুলে ভর্ত্তি হন। আবুল ফজলের গ্রাম্য স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার একমাত্র কারণ অর্থাভাব। ফরিদপুর জেলায় ছাত্রাবাসের ব্যয় সংকুলান বর্ত্তমানে তাঁহার পক্ষে কষ্টকর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরিণয়-প্রস্তাব।

উন্নতির উৎকট উত্তেজনায় উল্লাসিত—উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষা-বিভাগের ধুরন্ধরগণের বিকট ব্যবস্থায় মাইনর স্কুল উঠিয়া গেলেও, মৌলবী রফিউদ্দিন সাহেব আলিনগর ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কারণ সকলের অনুরোধে তিনি আলিনগরেই একটী ‘মকতুব’ খুলিতে বাধ্য হইলেন। বিশেষতঃ জেলার ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের চেষ্টায় কর্ত্তৃপক্ষের সুনজরের গুণে মৌলবী সাহেবের বালিকা-স্কুলের সাহায্যও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

বড় মিঞা সাহেবের কন্যা আজিজা মৌলবী সাহেবের নিকট অধ্যয়ন-পূর্ব্বক ক্রমশঃ উচ্চ-প্রাথমিক ও মধ্যবাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণা হইয়া তিন চারিটী বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও কয়েকটী বালিকা নিম্ন-প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন। বলা বাহুল্য, সদরের প্রবীণ ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর সাহেব স্বয়ং ছাত্রীগণের বাটীতে আসিয়া তাঁহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আজিজার পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদ কয়েকখানি সাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় কতকগুলি উদীয়মান যুবকের চিত্ত-কাননে আকাঙ্ক্ষার কুসুম-কলি ফুটিয়া উঠিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ অভিভাবকগণের বিনা

হইয়া পত্র লিখিলেন ; কেহ মাসিকপত্রে প্রকাশিত স্বরচিত গদ্য বা পদ্য প্রবন্ধবিশেষের উল্লেখ করিয়া—কেহ বহুদিন পূর্ব্বে কোন সভায় একটী গান গাহিয়া বা প্রবন্ধ পড়িয়া কিংবা বক্তৃতা করিয়া করতালি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বিবাহার্থে পত্র লিখিলেন ; কেহ লজ্জাবশে সরাসরী পত্র না লিখিয়া সম্বন্ধ উত্থাপনের জন্য কোন বন্ধু-বিশেষকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ফল কথা বিদুষী বালিকার পাণিগ্রহণার্থে কেহই স্বীয় বিদ্যার পরিচয় দিতে ত্রুটী করিলেন না। আবার কেহ কেহ আজিজাকে বিবাহ করিয়া কিরূপে এণ্ট্রান্স পড়াইবেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ; কেহ ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণের অধ্যয়নাগার বেথুন কলেজের অনুকরণে মোসলমান বালিকাগণের সুশিক্ষার জন্য একটী পর্দ্দা কলেজের কল্পনা আটিতে লাগিলেন ; কেহবা আজিজার জন্য সমস্ত ভাল ভাল গ্রন্থকারের বাঙ্গলা পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য নাস্তা খাওয়ার পয়সা কাটিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে কেহ কেহ এমনও ছিলেন যে, "স্বামি-স্ত্রীর কথোপকথন", "বাসর শিক্ষা" ও "যুবতী-জীবন" প্রভৃতি পুস্তকগুলি একেবারে কিনিয়াই ফেলিলেন ! কিন্তু বিধাতৃ-বিধানে সকলের আশানলেই অপূর্ণতার অতৃপ্তি-বারি বর্ষিত হইয়া বালিকার জীবনস্রোত অন্য পথে প্রবাহিত হইল।

একদা মধ্যাহ্নকালীন আহার সমাপনান্তে বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিন সাহেব একখানি তক্তপোষের উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। আজিজার মাতা নীচে বসিয়া স্বামীর জন্য পান প্রস্তুত করিতেছেন এবং আজিজা পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া তালপত্রের পাখা দ্বারা পিতাকে বাতাস দিতে-ছেন। বড় মিঞা সাহেব স্নেহপূর্ণস্বরে হাস্যমুখে কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দাও মা, একটু ভাল করিয়া বাতাস দাও ; এর পরে শ্বশুর-শাশুড়ী পাইলে ত আর আমার কথা মনে থাকিবে না।"

আজিজার মাতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বেশ, তখন যদি বাতাস দেওয়ার কথা আজিজার মনে না থাকে, তবে আজিজার শাশুড়ীকে আনিয়া বাতাস খাইলেই হইবে।"

বড় মিঞা সাহেব প্রেমময়ী স্ত্রীর উপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; লজ্জায় আজিজার মুখখানি লাল হইয়া গেল। এমন সময়ে জননী কন্যার হস্ত হইতে পাখা লইয়া নিজে বাতাস লইতে থাকায়, আজিজা ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া বিমাতা দেলজানের গৃহে চলিয়া গেলেন।

আজিজার মাতা স্বামীর মুখে পান দিয়া বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ সকালে কাছারী-বাড়ীতে কিসের গোলমাল শুন্‌লাম ?"

বড় মিঞা। ভাল কথা, মেয়ের বিবাহের জন্য ঘটক আসিয়াছিল। আমি বলি,'এখন আজিজার বিবাহ দেওয়া যাক। কতকগুলি ভাল ভাল সম্বন্ধ আসিয়াছে। তুমি কি বল ?

আঃ মাতা। আপনার ইচ্ছা হয় দিন্; আমার তাহাতে আপত্তি কি ?

বড় মিঞা। তোমার মত অনুসারেইত এতদিন বিবাহ দেওয়া হয় নাই। কারণ তুমি ত সর্ব্বদাই বল যে, মেয়েদিগকে একটু বড় করিয়া বিবাহ দেওয়াই ভাল।

আঃ মাতা। সে কেবল আমার কথা নহে। আমি বাবাজানের কাছেই ঐরূপ শুনেছি। তিনি জীবিতকালে প্রায় সকলকেই উপদেশ স্বরূপ বলিতেন, "কেতাবে বিবাহ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধান আছে, তদ্দ্বারা মেয়েদিগকে একটু বড় করিয়া ধর্ম্ম ও রীতি-নীতি শিক্ষা প্রদানান্তর বিবাহ দেওয়াই উত্তম বলিয়া অনুমিত হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে মৃত পিতার স্নেহময় সৌম্যমূর্ত্তি মনে হইয়া আজিজার মাতার চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

বড় মিঞা। (কিঞ্চিৎ ব্যথিত স্বরে) সত্যিই তাঁ'র মত লোক আর হয় না। আমি কত মুন্‌শী মৌলবী দেখিয়াছি,—কিন্তু তেমন উদার, তেমন দেলদরিয়া, তেমন নিঃস্বার্থ আমি আর কেউকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের এই যে বালিকা স্কুল, ইহা ত আজিজার পড়ার জন্য তিনিই স্থাপন করিয়াছিলেন। তারপর আমার ত আগে মেয়েমানুষের লেখাপড়ার কথা শুন্‌লেই কেমন কেমন লাগ্‌ত। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সে ভ্রম দূর হয়। যা হউক, আমার বিশ্বাস, এখন আজিজার বিবাহের বয়স হইয়াছে। আর খোদার ফজলে আজিজা আমার অনেকের পুত্রের চেয়েও ভাল লেখাপড়া শিখেছে। বিশেষতঃ এখন মেয়ের বিবাহ না দিলে লোকে পাঁচ কথা বলিতে পারে। সকালে এক বেটা ঘটক ঐরূপ একটা কথা বলিয়াছিল; তা বেটাকে চৌদ্দপুরুষ ঝাড়িয়া আচ্ছা করিয়া শুনাইয়া দিয়াছিলাম!

আঃ মাতা। ও! সেইজন্য বুঝি গোলযোগ শুনেছিলাম? আচ্ছা মানুষের কথা মানুষের মুখেই থাকে; ওতে ত কারও বড় কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। আমি ভাব্‌ছিলাম, কোথাকার রাগ কোথায় গড়াইয়া পড়্‌ছে।

বড় মিঞা। আচ্ছা, তুমি বরাবরই আমার রাগের কথা বল; কিন্তু আমি কখনও ত তোমার সাতে রাগ করি নাই।

আঃ মাতা। আমার সাতে রাগ করা বরং ভাল; কিন্তু রাগ হইলেই যে বাড়ীময় সকলের সহিত রাগ করা—রাগের চোটে থালা-ঘটী-বাটী ভাঙ্গা—ঘরের বেড়া কাটা—এসব অমার মোটেই ভাল বোধ হয় না।

বড় মিঞা। (সহাস্যে) ওটা আমাদের স্বভাব।

আঃ মাতা। ও স্বভাবটা না থাক্‌লেই ভাল হয়।

বড় মিঞা। সে যা হয় পরে দেখা যাবে; কিন্তু আমার কথার কি? এখন আজিজার বিবাহ দিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়।

আঃ মাতা। বেশ দিন্, আমি রাজি আছি; তবে একটা কথা।

বড় মিঞা। কি কথা, বলই না।

আঃ মাতা। মিঞাবাড়ীর আবুল ফজল ছেলেটী খুব ভাল। তার সহিত আজিজার বিবাহ দিলে কেমন হয়?

বড় মিঞা। (একটু চিন্তা করিয়া) সে মন্দ হয় না; ছেলেটী খুব ভাল; তবে অবস্থা তত ভাল নয়।

আঃ মাতা। তা'ত জানিই; আপনি কি কেবল টাকা দেখিয়া মেয়ের বিবাহ দিবেন?

বড় মিঞা। না কেবল তাই নহে, আরও কথা আছে। মিঞাদের কিছু না থাক্‌লেও অহঙ্কার কমে নাই। (কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া) আবুল ফজলের ফুফুর সহিত একবার আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই উহারা সম্মত হয় নাই।

আঃ মাতা। আমি তা' শুনেছি; সম্ভব এখন আর সে আপত্তি উঠ্‌বে না এবং আমি আবুল ফজলের পিতাকে খবর দিয়া বল্‌লে তিনি কখনই অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না। কিন্তু এ কাজ আপনার ভাল বোধ হয় কি না?

বড় মিঞা। এ কাজ হইলে আমি খুব সুখী হইব; এমন কি, মিঞাপাড়ায় আমার যে কুড়ি বিঘা খামার জমির জোত আছে, তাহা আমি মেয়ে-জামাইকে যৌতুক দিতেও সম্মত আছি; আর তা ছাড়া আবুল ফজলের সমস্ত পড়ার খরচ আমি দিব।

আজিজার মাতা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। এমন সময়ে দেলজান অলঙ্কার-ধ্বনির সহিত গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেয়ের বিয়ার কথা হ'চ্ছে নাকি?"

বড় মিঞা। হ্যাগো, আর কি করি; নিজে এখন বুড়া-সুড়া হয়েছি ; কাজেই জওয়ান দেখে জামাই এনে দিচ্ছি ; আর চিন্তা নাই * ।

আঃ মাতা। ছিঃ, আর কি কথা নাই ? যেখানে মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ, সেখানে এরূপ উপহাস করা ঘোর পাপজনক।

দেলজান। আমার সাতে অত ঠাট্টা কেন ? আমি না হয় পুছ নাই কর্‌লাম।

আঃ মাতা। সে কি ভগ্নি! তোমাদের মেয়ে ; তোমরা জিজ্ঞেস্ কর্‌বে না ত কে কর্‌বে ?

দেলজান। না আমার আবার মেয়ে কিসের ; যাদের মেয়ে তাদের আছে, আমার কি ?

বড় মিঞা। ছোট লোকের মুখের কথাই আলাদা ; বলি এক, বুঝে আর!

"বেশ, আম্‌রাত ছোট লোক আছিই ; আম্‌রা কেউর বড় লোকের সাতে জোড়া দিতে চাই না" বলিয়াই দেলজান দ্রুতপদে বাহিরে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"আজিজা! মতিকে আমার কাছে দেও ; তোমরা বাপু ছোট লোকের কাছে এস কেন ?"

মতিওর রহমান দেলজানের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রের নাম। তাহাকে সাধারণতঃ মতি বলিয়া ডাকা হইত।

বড় মিঞার চক্ষুদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল ; তাঁহার মুখে রোষ-ভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইল ; কিন্তু আজিজার মাতা নানা কথায় তাঁহাকে শান্ত

* এই শ্রেণীর বরং ইহা হইতেও ঘোর আপত্তিকর অশ্লীল ঠাট্টা, বিদ্রূপ, উপহাস ও রহস্যালাপ সমাজে বহুল প্রচলিত আছে। সমাজের সকল স্তরেই এ গুলি চলিত দেখা যায় ; কিন্তু এ গুলি ঘোর দোষাবহ ও পাপজনক। সমাজের পক্ষে এ গুলি সর্ব্ব-প্রযত্নে বর্জ্জন করা উচিত। সুখের বিষয়, সুশিক্ষিত সমাজ ক্রমশঃ এ সম্বন্ধে সুরুচির

করিয়া রাখিলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, এইরূপ সামান্য ছুতা নাতা লইয়াই অনেক সময়ে দেলজানের উপর—স্বামি-কর্ত্তৃক স্ত্রী-শাসনের প্রাচীন আইন জারী হইয়া থাকে।

ইহার কয়েকদিন পরে আফতাব-উদ্দিন মিঞাকে সংবাদ দিয়া আবুল ফজলের সহিত আজিজার বিবাহের প্রস্তাব করায় তিনি সানন্দে সম্মতি প্রদান করিলেন। অর্থের নিকট কৌলীন্য নত-মস্তকে পরাজয় স্বীকার করিল।

আবুল ফজল এই সময়ে এণ্ট্রান্স প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। কথা হইল, পরীক্ষা-অন্তে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে পড়িবার জন্য কলিকাতায় পাঠান হইবে।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আদর্শ মৌলবী।

ফুলকুচা-নিবাসী মৌলবী এরফান আলি সাহেব একজন প্রবীণ সমাজ-হিতৈষী, সুশিক্ষিত ও মহৎহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণ মৌলবী সাহেব-দিগের কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহার কার্য্যকলাপের গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত। তিনি কেবলমাত্র শিষ্যবাড়ী গমনপূর্ব্বক 'মৌলুদ' * পড়িয়া বা নজর লইয়াই আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেন না। তদীয় শিষ্য-শিষ্যাগণের প্রায় সকলকেই তিনি সযত্নে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলিও সাধারণ মৌলবী সাহেবদিগের বক্তৃতা হইতে স্বতন্ত্র রকমের ছিল। সে বক্তৃতায় কেবল মাত্র 'নামাজ' পড়িলে বা 'রোজা' ব্রত পালন করিলেই তাহার জন্য অনন্ত সুখ-সম্ভারপরিপূর্ণ অফুরন্ত বিলাস-লীলা-নিকেতন স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করা হইত না; কিংবা কেহ ইস্‌লামের আদিষ্ট বা অনুমোদিত দুই একটী বাহ্যিক অনুষ্ঠানে শিথিলতা প্রকাশ করিলেই তাহাকে কল্পনাতীত শাস্তির ভীষণ আধার ও অনন্ত দুর্গতির উৎস নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইত না। কিংবা নামাজ পড়িলেই 'মোমেন' হইবে এবং ইংরাজি শিখিলেই কাফের হইবে এরূপ অস্বাভাবিক উক্তি ভ্রমেও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইত না। তিনি সকলকেই স্নেহপূর্ণস্বরে ইস্‌লামের প্রকৃত আদর্শের দিকে আকর্ষণ করিতেন; সকলকেই ইস্‌লামের মূল উদ্দেশ্যগুলি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন;

---

* হজরত মোহাম্মদের জন্ম-বিবরণী পাঠ ও জীবনী আলোচনা।

সকলের হৃদয়েই ইস্‌লামের সমুজ্জ্বল সারস্বরূপ একতা, সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি মহদ্‌ভাবগুলি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পাইতেন এবং সকলকেই ইস্‌লামের পবিত্র আচারানুষ্ঠান পালনে তৎপর হইতে উপদেশ দিতেন। তিনি জলদগম্ভীরস্বরে বলিতেন, "ইস্‌লামের সাধারণ ও সামাজিক অর্থ 'শান্তি', কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ "মহান্ আল্লার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ"।

বিচক্ষণ মৌলবী সাহেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কেবল ধর্ম্মশিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া অধঃপতিত মোসলমান সমাজ আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না ; তবে ধর্ম্মশিক্ষাকে প্রধান অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তৎসহ যাবতীয় ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিলেই তাঁহাদের উন্নতি সহজ ও সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইবে। মৌলবী সাহেব আরও বুঝিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের প্রভাবে মোসলমানের দিগ্বিজয়ী অশ্বগতি শিথিল হইয়াছে, তাঁহাদের বিশ্বত্রাস প্রদীপ্ত তরবারি নিষ্প্রভ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের বীরবাহু চিরতরে ভগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বা শিক্ষা-দীক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তাঁহাদের কল্যাণ হইবে না,—তাঁহাদের লুপ্তগৌরব ফিরিবে না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইলে বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানোন্নত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করাই সমীচীন। এই সমস্ত কারণে মৌলবী সাহেব বলিতেন, বর্ত্তমান সময়ে রাজভাষা ইংরাজী শিক্ষা করা মোসলমানগণের জন্য 'ওয়াজেব' * কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত। এই বিষয় লইয়া মৌলবী এরফান আলি সাহেবের সহিত জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ বিখ্যাত মৌলবীর যে প্রকাশ্য বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া দিলাম। প্রতিপক্ষ মৌলবী সাহেব এক বহুজনপূর্ণ সভার মধ্যে মৌলবী

এরফান আলি সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "মৌলবী সাহেব! ইংরাজী শিক্ষা করা 'ওয়াজেব', এ অভিনব বিধান আপনি কোথায় পাইলেন? পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞগণ ত ইংরাজি শিখিলে 'কাফের' হইবে, এইরূপ বিধানই প্রদান করিয়াছিলেন।"

মৌঃ এরফান আলি। জোনাব! আপনি ত একজন প্রসিদ্ধ আলেম; আপনিই বলুন—'ইংরাজি শিখিলে কাফের হইবে' এ বিধান পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধেয় আলেমগণ কোথা হইতে দিয়াছিলেন?

প্রতিপক্ষ মৌঃ। সম্ভবতঃ ইহা "কেয়াস" (আনুমানিক সিদ্ধান্ত)।

মৌঃ এঃ আলি। বেশ কথা; আপনি তা হইলে 'এজ্মা' ও 'কেয়াস'* সিদ্ধ হওয়া স্বীকার করেন?

প্রঃ মৌঃ। হাঁ, তা করি বৈ কি; আমি 'মজহাব'-অবলম্বী † ও মোকাল্লেদ ‡।

মৌঃ এঃ। তবে আপনার সহিত আমার মতভেদ হইবার আশঙ্কা নাই। আপনি কি পূর্ব্বোক্ত কাফের হওয়ার বিধান ঠিক হইয়াছিল বলেন?

প্রঃ মৌঃ। বোধ হয়, ইস্‌লাম ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য তখন ঐরূপ বিধান দেওয়ার আবশ্যক হইয়াছিল। কারণ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে মোসলমান সমাজের পক্ষেও তৎকালীন হিন্দু সমাজের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ও ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল।

মৌঃ এঃ। মৌলবী সাহেব! আমি তা স্বীকার করি না। হিন্দুসমাজ তখন অভ্যুদয়-প্রয়াসী; তাঁহাদের জীবনীশক্তি তখন প্রবল; তাই ধর্ম্ম বা

---

* এজ্মা—সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। কেয়াস—আনুমানিক সিদ্ধান্ত।

† জগতের সুন্নী মোসলমানগণ যে চারিটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তাহাকে "মজহাব" বলে।

‡ মোকাল্লেদ্—পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মহাত্মাগণের মতানুসরণকারী।

সামাজিক অনুশাসন তাঁহাদের গতি রুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহারা ধর্ম্ম-বিধানকে হেলায় উপেক্ষা করিয়া—সামাজিক শাসন-শৃঙ্খল সবলে চূর্ণ করিয়া আপনাদের অভীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অধঃপতন-পথে প্রধাবিত মোসলমান সমাজ তখন সবেমাত্র রাজ্যহারা হইয়াছে ; তাহার উপর আবার জাতীয় ভাষা হারাইবার আশঙ্কায় তাঁহারা ভীত হইয়া পড়িলেন ; বিশেষতঃ তাঁহাদের জীবনীশক্তিও তখন অতি দুর্ব্বল ; তাই অতি সহজেই তাঁহারা আমাদের বিধান-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সমাজের জীবনীশক্তি সতেজ পরিলক্ষিত হইতেছে। অতএব এখনও যদি আমরা সামাজিক শাসনরজ্জু শ্লথ না করি, তবে তাঁহারা সহজেই উহা ছিন্ন করিয়া, আমাদের প্রভাব চূর্ণ করিয়া আপনাদের পথ মুক্ত করিয়া লইবেন। কারণ শক্তিমান্ সমাজকে বাধা দিলে সে সমাজ বিদ্রোহী হইবেই। এ বিদ্রোহ ইতিপূর্ব্বেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ! কথাবার্ত্তায় শ্রদ্ধেয় মৌলবী সাহেবগণকে "কাঠ মোল্লা" বলিয়া উপহাস এবং ইংরাজিশিক্ষিত যুবক-গণের "মোল্লা-সংহার কাব্য" প্রণয়ন করাই উহার স্পষ্ট উন্মেষ ; এখন কেবল রীতিমত বিকাশ হইতে বাকী।

প্রঃ মৌঃ। ধর্ম্মের অনুশাসন ছিন্ন করিয়া সমাজের কি কল্যাণ হইতে পারে ? বিদ্রোহের ফল হিন্দু সমাজে কি ভাল হইয়াছে ? লাভের মধ্যে হিন্দু সমাজের বিশাল তরুমূলে কতকগুলি অহিন্দু শাখা বিকশিত হইয়াছে। মোসলমান সমাজে ঐরূপ হইলে কি ভাল হইত ?

মৌঃ এঃ। নিতান্ত মন্দ হইত এরূপ বলা যায় না ; কারণ বহু বিশৃঙ্খল ও বিভিন্ন ধর্ম্ম-মতের উপর স্থাপিত—বহু বিরুদ্ধমতযুক্ত অধিক সংখ্যক ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল—বহু শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট ও বহু ঈশ্বর-বিশ্বাসী পৌত্তলিক হিন্দুগণের পক্ষে, চতুর্বাইবেল-অবলম্বী, ত্রিত্ববাদী,

একাকার-(অনাচার) প্রিয় খ্রীষ্টানগণের সংস্পর্শে ও সহবাসে স্বীয় ধর্ম্মমত অবিকৃত রাখা এক প্রকার অসম্ভব ! কিন্তু একেশ্বরবাদী,—এক কোরান অবলম্বী—সাম্য-মৈত্রীর প্রস্রবণস্বরূপ ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে ওরূপ ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। আর তাহা না হইলেও ক্ষতি ছিল না ; কারণ প্রত্যেক বিষয়েরই প্রতিক্রিয়া আছে। হিন্দু সমাজের প্রাথমিক যুগের কতকগুলি যুবক স্বেচ্ছাচারের পথে ধাবিত হইয়াছিল সত্য ; কিন্তু তৎপর সহস্র সহস্র যুবক ধর্ম্মপথে স্থির থাকিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন ; এমন কি, যে কঠোরতার জন্য আপনারা এত চেষ্টা করিতেছেন, সেই কঠোরতা (বনাম গোঁড়ামী) আজ কাল হিন্দুদের বেলাত-ফেরত দলের মধ্যে পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সুতরাং আমার বিশ্বাস, তখন মোসলমান সমাজ ঐ বাধাটী না পাইলে ভারতে লক্ষ লক্ষ মোসলমান নামধারী অমুসলমানের মধ্যে অন্ততঃ সহস্র সহস্র প্রকৃত মোসলমান দেখা যাইত এবং একত্র পাশাপাশি বাস করিয়া মোসলমান হিন্দুর শত বৎসর পশ্চাতে পড়িত না।

প্রঃ মোঃ। কেবল এই জন্যই কি আপনি ইংরাজি শিক্ষার অভিনব বিধান দিতেছেন, না উহার অন্য কোন ভিত্তি আছে ?

মোঃ এঃ। যদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন ভিত্তি থাকে, তবে আপনি নিঃসন্দেহ হইবেন ত ?

প্র মোঃ। অবশ্য নিঃসন্দেহ বরং সন্তুষ্ট হইব।

মোঃ এঃ। আচ্ছা, আল্লাতালা কোরান-শরীফে * বিদ্যার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন কি না ?

প্রঃ মোঃ। অবশ্য করিয়াছেন।

---

* কোরান—আল্লাহ-তালা কর্ত্তৃক অবতারিত ইস্‌লামী ধর্ম্মশাস্ত্র।

মৌঃ এঃ। হাদিস-শরিফে* —"মোসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের পক্ষে বিদ্যা শিক্ষা করা 'ফরজ'—অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য—বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে কি না?

প্রঃ মৌঃ। হইয়াছে বটে, কিন্তু সে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য।

মৌঃ এঃ। উহা ভাষ্যকার বিশেষের কথা।

প্রঃ মৌঃ। ভাষ্যকারের কথা কি গ্রাহ্য নহে?

মৌঃ এঃ। হাঁ, গ্রাহ্য বটে, কিন্তু হাদিস বলবৎ।

প্রঃ মৌঃ। বৈদেশিক ও বিধর্ম্মীর ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে কি হাদিস আছে?

মৌঃ এঃ। হাঁ, আছে। হজরত মোহাম্মদ (সঃ) বলিয়াছেন; "তোমরা বিদ্যা শিক্ষার জন্য চীনদেশে গমন কর।"

প্রঃ মৌঃ। হাঁ, বলিয়াছেন বটে।

মৌঃ এঃ। আচ্ছা বলুন,—হজরত কি ধর্ম্ম ও আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য মোসলমানদিগকে চীনদেশে গমন করিতে আদেশ করিয়াছেন?

প্রঃ মৌঃ। সম্ভব নহে; আপনি এক্ষেত্রে কি বলিতে চান?

মৌঃ এঃ। মৌলবী সাহেব! সম্ভব নহে কি, অসম্ভব! মোসলমান-দিগকে ধর্ম্ম কিংবা আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য চীনদেশে গমন করিতে বলা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। তৎকালে এসিয়ার মধ্যে চীনের শিল্প-বিজ্ঞান অতি প্রসিদ্ধ ছিল। হজরত বরং এই প্রবচন দ্বারা চীনের শিল্প-বিজ্ঞান ও চীনের ভাষা শিক্ষারই আদেশ দিয়াছেন। এক্ষণে বলুন, ইহা দ্বারা কি বৈদেশিক ভাষা ও বৈদেশিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা মোসলমানের পক্ষে অনুকূল বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে না? তার পর, হজরত স্বয়ং মহাত্মা জয়েদকে বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন, সে কথা কে না জানে?

* হাদিস—হজরত মোহাম্মদের (সঃ) এর ক্রিয়া-কলাপ, আদেশ-উপদেশ ও বিধি-নিষেধ প্রভৃতি।

প্রতিপক্ষ মৌলবী সাহেব নীরব হইলেন। সভা হইতে মোসলমান-গণের উল্লাসপূর্ণ বিরাট 'মারহাবা' ধ্বনি গগন-পবন প্রকম্পিত করিয়া মৌলবী সাহেবের জয় ঘোষণা করিল। অনন্তর মৌলবী এরফান আলি সাহেব প্রতিপক্ষ মৌলবী সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; প্রতিপক্ষ মৌলবী সাহেব মৌলবী এরফান আলি সাহেবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"আমি আপনার নিকট ঋণী;—আমরা কদাপি এরূপ চিন্তা করি নাই।"

মৌলবী এরফানআলি সাহেবের জীবনের অন্যতম মহৎ উদ্দেশ্য ছিল—সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার। তিনি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, সাংসারিক জীবনে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রভাব বিশেষরূপে প্রতিফলিত হয়। এ ক্ষেত্রে পুরুষগণ শিক্ষায় যতই উন্নতিলাভ করুক, স্ত্রীলোকেরা অশিক্ষিত ও অনুন্নত থাকিলে তাহার প্রভাব পুরুষগণের উপর প্রতিফলিত হইবেই; সুতরাং তাঁহারা কিছুতেই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর উন্নতি ও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবেন না। অনুদার সঙ্কীর্ণ-হৃদয়া স্ত্রীর স্বামী মহৎ ও উদার অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট হইলেও তাঁহার দ্বারা তদুপযোগী কার্য্যের আশা করা যায় না। এ অবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সে শিক্ষা কিরূপ ধরণের হওয়া উচিত, তাহাও মৌলবী সাহেব চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, আড়ম্বরপূর্ণ, ধর্ম্ম-সংশ্রবশূন্য, ইউরোপীয় নাস্তিক শিক্ষার কুহকে যুবকগণের মতি-গতি প্রথমতঃ কতকটা সেই দিকে গড়াইবেই। পক্ষান্তরে স্ত্রী-সমাজেও যদি আবার ওই আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে নাস্তিকতার সহিত বিলাস-লীলা-মিশ্রিত যে আগুন প্রজ্বলিত হইবে, তাহাতে ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়ই ভস্মীভূত হইবে। কিন্তু রমণীগণকে যদি পবিত্র ধর্ম্মভাবপূর্ণ ইস্‌লামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়,

তবে সাংসারিক জীবনে উহার প্রভাব পুরুষসমাজে অবশ্যই বিস্তার লাভ করিবে এবং ইহার দ্বারাই সমাজের কল্যাণ হওয়া সম্ভব। তিনি এই ধারণার বশীভূত হইয়া স্বীয় কন্যাগণকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, অন্যান্য মোসলমান বালিকাগণের শিক্ষার জন্যও সেইরূপ কতিপয় বালিকা স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন।

মৌলবী সাহেব ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, হিন্দুসমাজের ন্যায় জাতিভেদপ্রথা ক্রমশঃ মোস্‌লেম-সমাজে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। পরিশ্রমশীল সাধারণ সমাজ উন্নতির জন্য একাধিকবার মস্তকোত্তোলন করিতেছে ; কিন্তু ব্যবহারিক-জীবনের অনভিজ্ঞতার জন্য তাহাতে সাফল্য লাভে সমর্থ হইতেছে না। পক্ষান্তরে কৌলীন্য-অভিমানী ভদ্রসমাজ নিষ্ফল অভিমান বশে শ্রমসাধ্য কার্য্যে নির্লিপ্ত থাকিয়া ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ক্রমশঃ অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইতেছেন। তিনি উভয় পক্ষের এই ত্রুটী অবধারণে সক্ষম হইয়া উভয় সমাজের গুণটুকু উভয় সমাজের কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে পরস্পরের মধ্যে অবাধ বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপনের চেষ্টা করেন। স্বীয় কন্যাগণের বিবাহে তিনি নিজেই ইহার পথ প্রদর্শন করেন। এই শুভ ইচ্ছার প্রণোদনেই গিয়াসুদ্দিনের সহিত আজিজার মাতার বিবাহ অতি সহজে সম্পাদিত হইয়াছিল।

মৌলবী-সাহেবের শেষ কার্য্য আলিনগরের বালিকা স্কুল স্থাপন করা। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার পরে—আজিজার জন্মের অষ্টম বৎসরে মৌলবী এরফান আলি সাহেব জগতে স্বীয় মহৎ আদর্শ রাখিয়া—অভাগা মোসলমান সমাজকে কাঁদাইয়া পৃথিবী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। সমাজ-গগনের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র চিরতরে খসিয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

আজিজা

আজিজার মাতা মৌলবী এরফান আলি সাহেবের কন্যা; সুতরাং আদর্শ পিতার আদর্শ কন্যার ন্যায় পিতার সমস্ত গুণই তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ধীর শান্ত স্বভাবের সহিত—স্বধর্ম্মে অনুরাগ, পতির প্রতি ভক্তি, পরিজনে স্নেহ ও আত্মীয়-স্বজনে প্রীতি তাঁহার চরিত্রে অতি গাঢ়ভাবে জড়িত ছিল। ফলতঃ বাহ্যিক মনোহারী সৌন্দর্য্যের সহিত স্ত্রীজন-সুলভ মাধুর্য্য ও গুণ-গরিমার তাহাতে অণুমাত্রও অভাব ছিল না; বরং তাহার অনেক বিষয়েরই প্রাচুর্য্য ও উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইত।

স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিতে—স্বামীর সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতে ও স্বামীর যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে তিনি অতিমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। স্বামীকে দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎকার্য্যে অনুপ্রাণিত করিতে তিনি অনেক সময়ে স্বামীর কঠোর স্বভাবের সহিত নীরবে সংগ্রাম করিয়াছেন। স্বামীর অনেক অভিমান, অনেক উপদ্রব তিনি হাসিমুখে সহ্য করিয়া পতি-প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার ফলে বড় মিঞা গিয়াস-উদ্দিনের ন্যায় কঠোরস্বভাব অদম্য ক্রোধ-পরায়ণ ব্যক্তিকেও এই মহীয়সী স্ত্রী-রত্নের নিকট বিনত হইয়া শান্ত স্বভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এই পবিত্রহৃদয়া স্ত্রীর সহবাস-গুণেই তিনি ক্রমশঃ ধর্ম্মে অনুরক্ত ও সৎকার্য্যে উৎসাহী হইতে পারিয়া-

হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছেন। বড় মিঞাসাহেব স্ত্রী-রত্নের এমন অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কখনও যদি ক্রোধবশে তাঁহার মতঃবিরুদ্ধ বা মনঃকষ্টকর কোন কার্য্য করিয়া ফেলিতেন, তবে ক্রোধ উপশম হওয়ার পর মুহূর্ত্তে যে কোন প্রকারেই হউক, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে তিনি অন্তরে তৃপ্তি বা প্রাণে শান্তি অনুভব করিতে পারিতেন না।

সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করার বিষয় এই ছিল যে, তিনি বিবাহিত জীবনে ভ্রমেও কখন স্বামীর সহিত প্রকৃত অভিমান বা স্বামীর প্রতি একটীও রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। যাহাতে স্বামী দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, তিনি প্রাণান্তেও এরূপ কার্য্য করিতেন না। আলিনগরের স্ত্রী-সমাজে প্রকাশ, "আজিজার মায়ের মত "নেক-বখ্‌ত" * স্ত্রীলোক আর হয় না।" পুরুষ মহলে বলাবলি হইত—"এত কালের মধ্যে বড় মিঞার স্ত্রীর ছায়াও কেহ দেখিতে পারে নাই †।"

আজিজা এইরূপ মায়ের একমাত্র মেয়ে,—স্নেহ ও আদরের একমাত্র আধার; পিতার প্রেমময়ী প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত একমাত্র সন্তান। যদিও আজিজা স্নেহ ও আদরের গভীর সরোবরে ভাসমানা হইয়া প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন,—পিতার অতিমাত্র প্রশ্রয়ে যদিও অনেক

* 'নেক-বখ্‌ত'—সতীসাধ্বী, পুণ্যবতী, ভাগ্যবতী প্রভৃতি।

† মোসলমান রমণীগণের পক্ষে পিতা-ভ্রাতা ও পতি-পুত্র প্রভৃতি ঘনিষ্ঠতর পরিজন ভিন্ন অন্যান্য পর পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে—পর্দ্দার মধ্যে অবস্থান করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা কোরান-হাদিস-সম্মত অপরিহার্য্য ধর্ম্মবিধান। এই বিধানানুসারেই মোসলমান সমাজে পর্দ্দা বা আবরণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পর্দ্দা-প্রথা একদিকে যেমন রমণীগণের সম্ভ্রম ও পবিত্রতার সংরক্ষক, অন্যদিকে তেমনি মর্য্যাদার নিদর্শক। যে সমস্ত ধর্ম্মদ্রোহী এই পবিত্র প্রথার অবমাননা করিয়া কুলকামিনীদিগকে নানাশ্রেণীর নরনারীর পাপদৃষ্টির সম্মুখে—সর্ব্বত্র বাহির করিতে—হাটে-মাঠে-ঘাটে ছাড়িয়া দিতে সমুৎসুক, সেই সমস্ত কুলকলঙ্ক সমাজের ঘোর আবর্জ্জনাস্বরূপ! উহাদিগকে কঠোর

সময়ে তাঁহার একটুখানি ম্লানমুখ বাড়ীর সকলের বিপদের কারণ হইয়া উঠিত, তথাপি মাতার সংযত শিক্ষাগুণে,—মাতার মহীয়সী আদর্শে মায়ের যাবতীয় সদ্‌গুণই তাঁহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। মাতার দেখাদেখি আজিজা বাল্যকাল হইতেই 'রোজা'-'নামাজে' অভ্যস্থ হইয়াছিলেন। রন্ধন ও পরিবেশনে মায়ের সাহায্য করিতে করিতে আজিজা বাল্যকাল হইতেই রন্ধননিপুণা হইয়াছিলেন। গৃহের জিনিসপত্র শৃঙ্খলা সহকারে সাজাইয়া রাখা—কাপড়-চোপড়া ও বিছানা-পত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নিজে শারীরিক পরিষ্কার ও পবিত্রাবস্থায় থাকা আজিজার মাতার অপরিহার্য্য স্বভাব,—সুতরাং মেয়ের স্বভাবও মায়ের দেখাদেখি ও সহবাস-গুণে সম্পূর্ণ মাতারই অনুরূপ হইয়াছিল।

বঙ্গ-সংসারের আদর্শ-গৃহিণী বা আদর্শ-জননী হইবার যাবতীয় সদ্‌গুণ আজিজার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহার তদনুযায়ী রূপের প্রাচুর্য্য ছিল কি না, আমরা তদ্বিষয়ে সন্দিহান। কারণ তাঁহার বর্ণ স্বর্ণচম্পক-বিনিন্দিত তপ্ত-কাঞ্চনোজ্জ্বল গৌর নহে, বরং বঙ্গ-সংসারে সচরাচর যেরূপ রূপ দেখা যায়,—যেরূপ বর্ণ থাকিলে রমণীগণ রূপবতী বা সুন্দরী বলিয়া গণ্য হয়, আজিজার বর্ণও সেইরূপ ছিল; তবে তাহাতে লাবণ্য স্বভাবতঃই বেশী। তাঁহার সুগঠিত নিখুঁত অঙ্গ-সৌষ্ঠব, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য-বিমণ্ডিত নবযৌবন—পদ্মপত্রোপম সুবৃহৎ স্নিগ্ধ নয়ন-যুগল, আজানুলম্বিত ঘনকৃষ্ণ তরঙ্গায়িত কেশদাম—লাবণ্যপ্লাবিত দেহ ও সমুজ্জ্বল হাসিমাখা সকরুণ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্যের নিকট অনেক কাঞ্চনবর্ণা পরমা-সুন্দরীকেও নিষ্প্রভ বলিয়া অনুমিত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিজা স্বর্গহারা অপ্সরা কিংবা ছিন্নপক্ষ পরীর উপমাস্থল নহে; এই জন্য তাঁহার কটিদেশ ক্ষীণতর হইলেও ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল না;

অস্বাভাবিক ভাবেরও উদয় হইত না এবং শশধর তাঁহার মনোহর মুখকান্তি দর্শন করিলে লজ্জায় ম্রিয়মাণ না হইয়া বরং আনন্দে হাস্য করিত।

আজিজার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তিনি এই বৎসরই মধ্যবাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে আবুল ফজলের সহিত আজিজার বিবাহের কথা স্থিরীকৃত হইয়াছে। সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইবার পরে আবুল ফজল ফরিদপুরের জেলা-স্কুলে প্রেরিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে বড় মিঞা সাহেবই তাঁহার সমস্ত ব্যয় বহন করেন।

বিবাহ স্থিরীকৃত হইবার পূর্ব্বে আবুল ফজলের সহিত আজিজার অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। উভয়ে কত কথা বলিয়াছেন, কত গল্প করিয়াছেন; কিন্তু তখন বর্ত্তমান ভাবের ক্ষীণ রেখাও বালকবালিকার হৃদয়ে কল্পিত হয় নাই। আজিজা চিরকালই আবুল ফজলকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভক্তি করিতেন, এবং সেইজন্য অবাধে সম্মুখে আসিয়া ভ্রাতৃসম্বোধনে কথা বলিতেন। আবুল ফজলও আজিজাকে আপন ভগ্নী-গণের ন্যায় স্নেহ ও আদর করিতেন।

সহসা উভয়ের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভবিষ্যৎ ভাবের ছায়া উভয়েরই অন্তর-ফলকে প্রতিফলিত হইল। বালকবালিকা উভয়েই উভয়ের নিকট পরিচিত; উভয়ের স্বভাব-চরিত্রে উভয়ে অনুরক্ত; উভয়ের গুণ-গ্রামে উভয়েই মুগ্ধ ও পক্ষপাতী; সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের শুভ কল্পনায় উভয়েরই হৃদয় উচ্ছ্বাসিত হইতেছিল; স্নেহ ও ভক্তি ক্রমশঃ প্রেম ও ভালবাসায় পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

বিবাহ-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হওয়ার পরে উভয়ের আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। আবুল ফজল লজ্জা-বশে ভাবী শ্বশুরবাটী যাওয়া বন্ধ করিয়াছে

নিমন্ত্রিত হইয়া দুই তিন বার যাইতে বাধ্য হইয়াছেন ; কিন্তু আজিজা লজ্জা-বশে তাঁহার সম্মুখে বাহির হন নাই। এই সময় হইতে আজিজার মাতাই আবুল ফজলের আদর যত্ন করিতেন।

কিন্তু প্রকাশ্য দেখা সাক্ষাৎ না হইলেও উভয়ের অন্তরাত্মা ক্রমশঃ উভয়ের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। আবুল ফজল এই বৎসরই প্রবেশিকার প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছেন ; আর এক বৎসর অন্তর পরীক্ষা দেওয়ার পরেই উভয়ের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আমাদের লেখা বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না যে, সে শুভ দিনের জন্য উভয়েই অন্তরে অন্তরে একান্ত উদ্‌গ্রীব! বিশেষতঃ যদিও এক্ষণে কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি আজিজার সংবাদের জন্য আবুল ফজল উৎকণ্ঠিত এবং আবুল ফজল কবে বাড়ী আসিবে, তজ্জন্য আজিজার হৃদয় ব্যাকুল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——:*:——

অনুরাগ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ; দিবা দুই প্রহর; পৃথিবী অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়া প্রখর রবির অনলোত্তাপ আগুনের হল্কার মত ঢেউ খেলিতে খেলিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। জলাশয়-গুলি প্রচণ্ড নিদাঘোত্তাপে অত্যন্ত তপ্ত হওয়ায় থর্ থর্ কম্পিতবৎ বোধ হইতেছে। গ্রীষ্ম-শ্রান্ত তরুগুলি নীরবে দাঁড়াইয়া শীতল শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুল ছায়া-শীতল নির্জ্জন ঝোপে বা নব পল্লবিত তরুশাখার পত্রান্তরালে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। গরু বাছুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুসকল জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শয়ন করিয়া বা দণ্ডায়মান হইয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে জাবর কাটিতেছে। কৃষকেরা কেহ স্নান করিয়া—কেহ বা স্নান করিবার উদ্দেশ্যে—জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী তরুতলে বিশ্রাম করিতেছে; কেহ বা স্নান-সিক্ত গামছা মাথার তলে রাখিয়া সেই তপ্ত বায়ুস্পর্শেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পল্লীপথে জন-মানবের সমাগম মাত্রই নাই।

এ হেন নিদাঘ-তপ্ত দ্বিপ্রহরের সময়ে আবুল ফজল কয়েকখানি পুস্তক ও তিন চারি খানি ধোপাবাড়ীর ধোয়া কাপড়ের একটী ক্ষুদ্র গাঠরি হাতে লইয়া স্কুল-বোর্ডিং হইতে বাহির হইলেন এবং তাড়াতাড়ি হিন্দু বোর্ডিংয়ে উপস্থিত হইয়া সতীশচন্দ্র রায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি সতীশ! তুমি যে এখনও শুইয়া শুইয়া গড়াইতেছ; আজ বাড়ী যাবে না নাকি?"

সতীশ আবুল ফজলের দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"তুমি ক্ষেপেছ নাকি? এই ভয়ঙ্কর রোদের মধ্যে কোথায় যেতে চাও?"

"ভীরু বাঙ্গালি! একটু রোদ দেখেই মূর্চ্ছা! এ রোদ ত নিত্যই হবে; তাই ব'লে কি গ্রীষ্মকালে বাড়ী যাওয়া হবে না?"

"বলি সাহেব! এ বীরত্বটুকু প্রকাশপূর্ব্বক স্বাস্থ্য-জীবটাকে বিনাশ না ক'রে কাল সকালে গেলে চল্‌ত না কি?"

"আজ্ঞা না বাবু! স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানটা এখনও অত পড়ি নাই। এক্ষণে মহাশয় যাবেন কি না, একটু তাড়াতাড়ি তাই বলুন?"

সতীশ আবুল ফজলের একগুঁয়েমী অনেকটা জানিতেন; সুতরাং তিনি কথা কাটাকাটি করা নিষ্ফল মনে করিয়া বলিলেন,—"তবে একান্তই যদি যাও, তালবাগ পর্য্যন্ত গাড়ীতে যাইতে চেষ্টা কর। আমার আজ বাড়ী যাওয়া হইবে না; কারণ আমি রাত্রেই কলিকাতা যাইতেছি; সেখান হইতে সাত আট দিন পরে খুলনা দিয়া বাড়ী ফিরিব। তুমি আমার একখান পত্র লইয়া যাও।" বলিয়া সতীশ পত্র লিখিতে বসিল।

আবুল ফজল বলিলেন,—"তুমি তাড়াতাড়ি পত্র লিখ; ছয় টাকা খরচ করিয়া বার মাইল ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়া আমার পোষাইবে না।

সতীশ। কেন 'সেয়ার' পাইলে না?

আঃ ফজল। মনে করিয়াছিলাম, না হয় আমরা দুই জনেই এক গাড়ীতে যাইব; কিন্তু তোমার যে এমন গতি হ'বে, তা আর কে জানে!

সতীশ আবুল ফজলের মুখের দিকে বিদ্রূপপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"আমার গতি একটু শিথিল হওয়াই সম্ভব; কারণ আলিনগরে ত আর আমার এক 'নজর' দেখিবার যোগ্য ঢলঢলে চাঁদ-মুখ নাই যে, গতি তোমার মত দ্রুত হবে।"

"হাঁ গো তোমাদের মত কিনা? তাই চাঁদমুখ খুলিয়ে—কেশ এলিয়ে বসে রয়েছে; অতএব এখন এস আর দেখ।"

"সেইরূপ হ'লেই বোধ হয় তোমার পক্ষে ভাল হ'ত।"

আবুল ফজল আর বেশী কথা না বলিয়া সতীশের অর্দ্ধসমাপ্ত পত্র কাড়িয়া লইয়া সেই রৌদ্রতপ্ত পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে গণিতের সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া বুঝিলেন, ঘণ্টায় অন্ততঃ চারি মাইল গেলেও ছয়টার মধ্যে বাড়ী যাইতে পারিব।

সতীশের হৃদয় এখনও স্বচ্ছ; তিনি এ পর্য্যন্ত সহপাঠী বালকগণের সহিত বন্ধুত্ব ভিন্ন অন্য প্রণয়ের কোনই ধার ধারেন নাই। কাজেই প্রণয়ী যুবকের এই ঔপাখ্যানিক আকুলতা দেখিয়া মনে মনে খুব হাসিয়া লইলেন।

আবুল ফজল পূর্ণ উৎসাহে রবি-কর-দগ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু তিন চারি মাইল যাইতে না যাইতেই তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল; উত্তপ্ত নিদাঘ-বায়ু-বিতাড়িত উত্তাপ-লহরী-প্লাবিত প্রান্তর তাঁহার নিকট অগ্নিময় বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল; প্রখর সূর্য্য-কর ছত্রাবরণ ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক গরম করিয়া তুলিল; অবিশ্রান্ত ঘর্ম্মে যাবতীয় গাত্রবস্ত্র সিক্ত হইয়া গেল; জুতাসহ পদদ্বয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; নিদারুণ শ্রান্তিতে উৎসাহ-উল্লাস দূরীভূত হইয়া দেহ-মন নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। এতক্ষণে তিনি সতীশের কথার স্বার্থকতা বুঝিলেন এবং সেই দিন বাড়ী যাইতে সমর্থ হইবেনা কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু তিনি আপন সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না; যথাসাধ্য চলিয়া একাদিক্রমে ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিলেন। অনন্তর বিশ্রমার্থ রাস্তার পার্শ্বস্থ এক মোসলমান-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জল পান করিবার ইচ্ছা-

জ্ঞাপন করিলেন। গৃহস্বামী একটী ভদ্রবেশী যুবক দেখিয়া বসিবার জন্য তাড়াতাড়ি একটী বাঁশ ও বেতের নির্ম্মিত মোড়া এবং একখানি তালপত্রের পাখা আনিয়া দিল। আবুল ফজল উপবিষ্ট হইয়া পাখা চালনা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গৃহস্বামী এক বৃহৎ কাঁসার বাটী ভরা জল আনিয়া উপস্থিত করিল। বাটীটা তখনই মাজিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে, কিন্তু জল তত পরিষ্কার নহে। তদ্দর্শনে আবুল ফজল সেই জল পান করিলেন না; কেবলমাত্র হাত মুখ ধুইয়া শ্রান্তি দূর করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই মাইল যাইতে না যাইতেই তিনি আবার শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন; কঠোর পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুকাইয়া আসিতে লাগিল। তিনি শীতল জল পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়া চারি দিকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক দেখিলেন যে, একটী আমগাছের অগ্রভাগে কয়েকটী সিন্দুরমাখা সুদর্শন পাকা আম ঝুলিতেছে। আবুল ফজল গাছের অবস্থান-স্থলে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন যে, গাছটী সরকারী রাস্তার সীমার মধ্যে অবস্থিত; সুতরাং এ গাছ সরকারী এবং ইহার ফল সাধারণের ভোগ্য। অনন্তর তিনি গাছের পার্শ্বস্থ চাষ করা ভূমি হইতে একটী ঢিল তুলিয়া স্বীয় ক্রিকেট-বল-নিক্ষেপ-নিপুণ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটী পক্ক আম্র লক্ষ্য করত সজোরে ছুড়িয়া মারিলেন। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাহাতে একটী কাঁচা আম পড়িয়া গেল। আবুল ফজল পুনরায় সেই আমটীই ছুড়িয়া মারিলেন। এবার একটী পাকা ও দুই তিনটী কাঁচা আম পড়িল। তিনি পাকাটী রাখিয়া কাঁচাগুলি ছুড়িয়া মারিতে লাগিলেন। এইরূপ উপর্য্যুপরি কয়েকবার চেষ্টা করিয়া দশ বারটী কাঁচা আমের সহিত তিন চারিটী পাকা আম পাড়িতে সমর্থ হইলেন। তিনি আর একটী কাঁচা আম হাতে হইয়া একটী পাকা আম লক্ষ্য

করিয়া বলিলেন,—“বাবা! বৃথা কাঁচা আমগুলি নষ্ট করিতেছ কেন? একটু কষ্ট করিয়া গাছে উঠিয়া পাকা আম কয়টী পাড়িয়া লইলেই ত হয়।” বৃদ্ধের কথায় আবুল ফজলের খেয়াল ছুটিয়া গেল; তিনি আপনার ভুল বুঝিয়া লজ্জিত হইলেন এবং হাতের আমটী দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাড়াতাড়ি রাস্তায় উঠিয়া পড়িলেন। কিয়দ্দূর গমনান্তর রাস্তার পার্শ্বস্থ একটী প্রাচীন ক্ষুদ্র পুকুরের পাড়ে বসিয়া পকেটস্থিত একখানি ক্ষুদ্র ছুরীর সাহায্যে আম কয়টীর সদ্‌ব্যবহার করিলেন; তৎপরে পুকুরের তপ্ত জলে হাত মুখ ধুইয়া আবার দ্রুত বেগে চলিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত তিনটা বাজিবার অল্পক্ষণ পরে তালবাগের ঘাটে উপস্থিত হইলেন।

এই ঘাট হইতে কুমার নদের এক শাখা কাঞ্চনপুর বিলের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। এই স্থানে বারমাস নৌকা চলে। এই নৌকার পথটুকু নৌকায় গেলে স্থলপথের অন্যূন আট মাইল পথ অতিক্রম করা হয়। কিন্তু অসুবিধা এই যে, সকল সময়ে ঘাটে নৌকা থাকে না এবং কোন কোন সময়ে কায়দা পাইলে মাঝিগণ এক টাকার স্থলে পাঁচ টাকা আদায় করিয়া থাকে। কুমারের এই স্থানের পরিচয় শীতলক্ষা।

আবুল ফজল তাড়াতাড়ি ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, কাঞ্চনপুর যাইবার জন্ত দুই জন আরোহী লইয়া তখনই একখানি নৌকা খুলিয়া যাইতেছে এবং আর এক খানি মাত্র নৌকা ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে। আবুল ফজল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাঝি কাঞ্চনপুর যাইতে পার?”

মাঝি। বাবু পার্‌বো না কেন; এই ত আমাদের কাম; এই যে একখান দুই টাকা পাইয়া যাইতেছে।

আঃ ফজল। আমি একা মাত্র যাইব; ঠিক কত চাও, তাই বল।

মাঝি। আপ্নি একলাই যান, আর দশ জনই যান, আমাদের নাও ঠেইলা যাইতিই অবে। তা আপ্নি ভদ্রলোক, চার আনা কম দিন।—বলা বাহুল্য, তিনজন হইলে দুই টাকার উপর আট আনা বাড়িত।

আঃ ফজল। বাপু! পাঁচশিকা পাবে, হয়ত চল।

মাঝি। বাবু আপ্নারা ভদ্রলোক। ফাঁকাফাঁকি কথা কি আপনাগো কাছে কওয়া চলে। দেড় টাকা আর ঘাটের দুই আনা এই দিতে হবে। মেঘ ঝড়ের দিন; যদি যান ত কিছু জল টল খাবার (অবশ্য মাঝির জন্য) নিয়া শীঘ্র শীঘ্র উঠুন।

আবুল ফজল একটু চিন্তা করিলেন এবং যে নৌকাখান ছাড়িয়া যাইতেছিল, তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, নৌকা তখনও ছাড়িয়া যায় নাই; বোধ হয়, দুই জনে একত্র যাইবার জন্য সেও একটু অপেক্ষা করিতেছিল।

নৌকায় দুইজন আরোহী। একজন অন্যূন চল্লিশ বর্ষীয় পৈতা-ধারী ব্রাহ্মণ; দ্বিতীয় অনুমান পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক সুদর্শন যুবক; উত্তম বসন-ভূষণে বিভূষিত।

আবুল ফজল তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপ্নারা কি কাঞ্চনপুরেই যাইবেন?"

বৃদ্ধ। হাঁ; মশা'র বাড়ী?

আঃ ফজল। আলিনগর।

যুবক। তবে ত আমাদের নিকটেরই; আপনি আমাদের নৌকায় আসুন না?

আঃ ফজল। সেত খুব সুবিধাই হয়; কিন্তু আপনাদের কোন অসুবিধা হইবে না ত?

বৃদ্ধ। আপনারা ?—“অর্থাৎ আপনারা কোন্ জাতি ?”

আঃ ফজল। আমরা মোসলমান।

বৃদ্ধের মুখে একটু কেমনতর ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি যুবকের উপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

যুবক। (অস্পষ্ট স্বরে) তা হোক ; (স্বাভাবিক ভাবে) না আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না। আপনি আমাদের নৌকায়ই আসুন।

বৃদ্ধ কোন কথা বলিল না। বোধ হইল, যুবকের কার্য্যের উপর তাহার কোন হাত নাই।

মাঝি। বাবু, আমার সাতে ত দুই জনের কথা আছে।

যুবক। আচ্ছা তোমাকে কিছু বেশী করিয়া দিব ; তুমি শীঘ্র শীঘ্র বেয়ে যাও।

আবুল ফজল নৌকায় উঠিলেন। যুবক তাঁহাকে আহ্বান করিয়া স্বীয় বিছানার উপর বসাইলেন। বৃদ্ধ তাহার ছোঁয়াচে রোগ লইয়া একটু ফাঁকে ফাঁকে থাকিতে লাগিলেন।

আবুল ফজল ও যুবক অল্পক্ষণ আলাপ করিয়াই উভয় উভয়ের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। যুবকের নাম যতীন্দ্রনাথ শরখেল ; জাতি ব্রাহ্মণ ; নিবাস কাঞ্চনপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলহরা গ্রামে। তিনি ইতিহাসে এম, এ, পাস করিয়া বি, এল, পড়িতেছেন। তিনি মোসলমান জাতির উত্থান-পতন, রাজা-সম্পদ, রীতি-নীতি, জ্ঞান-বিদ্যা, শিক্ষা-দীক্ষা ও মহত্ত্ব-মহিমা সম্বন্ধে যত কথা বলিলেন, আবুল ফজল অতৃপ্ত কর্ণে বিভোর হইয়া সে সমস্ত শুনিতে লাগিলেন। শুনিয়া শুনিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি আল্লাহ্‌তালার কৃপা হয়,—ইতিহাসে এম,-এ, পড়িব। ঐতিহাসিক ভিন্ন অন্যান্য যে সমস্ত আলাপ হইল, তাহার প্রায় সমস্তই স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে। তখন বঙ্গে স্বদেশীর প্রবল বন্যা প্রবাহিত।

পাঁচটা বাজিয়া কয়েক মিনিট গত হইতেই নৌকা ঘাটে লাগিল। মাঝিকে দুই টাকা চারি আনা দেওয়া হইল। আবুল ফজল একরূপ জোর করিয়া বার আনা দিলেন; যুবক একান্ত অনিচ্ছার সহিত গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর সকলে যথাবিধি সাদর সম্ভাষণ অন্তে নিজ নিজ পথে গমন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

নীরব ভাষা।

বসন্ত-স্মৃতিবিজড়িত আলস্য-মদিরামাখা নৈদাঘী অপরাহ্ণ; আকাশে বেলা দুই দণ্ডের অধিক নাই; অস্তোন্মুখ রবির কনক-কিরণ বন-কুঞ্জ ভেদ করিয়া বিগলিত স্বর্ণরেখার ন্যায় প্রান্তরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে! হরিৎ সাম্রাজ্যের ন্যায় অভিনব ধান্য-চারা-সমাচ্ছন্ন পল্লী-প্রান্তরের শ্যাম-সবুজ বুকের উপর দিয়া ঢেউ খেলিতে খেলিতে স্নিগ্ধ সতেজ দক্ষিণা বায়ু ছুটিয়া চলিয়াছে; পুঞ্জ পুঞ্জ শ্বেত-বিমলিন মেঘ-মালা রণগামী সৈন্য-রেখার ন্যায় উত্তরমুখে ধাবিত হইয়াছে। কোথাও বা ঘুঘুর মধুর স্বরে আম্রবণ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। নিদাঘ-নিপীড়িত সদ্যঃ পক্ক আম্রসমূহ বায়ুস্পর্শে ঝরিয়া পড়িতেছে; বালক বালিকাগণ ছুটিয়া ছুটিয়া কুড়াইয়া লইতেছে। পল্লীঝোপের প্রস্ফুটিত বন-কুসুমের মধুর গন্ধ কোন কোন স্থানে বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া দিক্ আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে।

আবুল ফজল এ হেন মধুর কালে নৌকা হইতে নামিয়া প্রান্তর অতিক্রমপূর্ব্বক ধীরে ধীরে গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন; এমন সময়ে সহসা বাতাস রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, পুঞ্জীভূত প্রগাঢ় মেঘ-মালা উত্তরাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে; কৃষকবালকগণ গরু বাছুর লইয়া তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে; দূর শূন্যে উড্ডীয়মান চিল শকুনী প্রভৃতি পক্ষী সকল 'তা' ধরিয়া অতি দ্রুত নীচে নামিয়া আসিতেছে। অবনী যেন কি এক

আবুল ফজল ঝটিকার আশু সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন এবং যথাসম্ভব সত্বর কুমার নদ পার হইয়া পুঁটিখোলার বাজারে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; প্রগাঢ় মেঘে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; তিনি একবার ভাবিলেন, কোন দোকানে অপেক্ষা করিবেন। আবার ভাবিলেন, বাজারে বিলম্ব করিলে রাত্রে বাড়ী যাওয়া কঠিন হইবে। সুতরাং বিলম্ব না করিয়া একটু কষ্ট করিয়া এক মাইল পথ কোন প্রকারে যাইতে পারিবই। এইরূপ মনে করিয়া তিনি যথাসাধ্য দ্রুত বেগে বাটী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু পথচলার শ্রমে তাঁহার পদদ্বয় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল;—পায়ের তলা যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল; সুতরাং তিনি বেশী দ্রুত যাইতে সক্ষম হইলেন না।

আবুল ফজল অনুমান অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে সহসা তীব্র শন্ শন্ শব্দ শ্রুত হইল; চারি দিক্ হইতে বৃক্ষের শুষ্ক পত্র-সমূহ উড়িয়া আসিতে লাগিল; প্রান্তরে ধূলি উৎক্ষিপ্ত হইল; দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝটিকায় বন-জঙ্গলে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। বৃক্ষাদি জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে সাধ্যপক্ষে সংগ্রাম করিতে লাগিল। পতিত আম্রে পথ-ঘাট আচ্ছাদিত হইয়া গেল।

আবুল ফজল সাধ্যপক্ষে দৌড়িয়া আলিনগরের মধ্যপাড়ার নিকটে উপস্থিত হইলেন। আর দশ-পনর মিনিট সময় পাইলেই তিনি বাড়ী যাইতে পারেন; কিন্তু এমন সময়ে আকাশে মেঘ বিরাট্ গর্জ্জন করিয়া উঠিল; ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিত হইতে লাগিল; মুষল ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

আবুল ফজল সাবধানে ছত্র খুলিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। বৃষ্টির ঝাপ্টায় তাঁহার সর্ব্বশরীর ভিজিয়া গেল। এক্ষণে তিনি বড় মিঞা

মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া কি চিন্তা করিলেন। অতঃপর সে বাটীর পথ ছাড়িয়া স্বীয় বাড়ীর পথে পাঁচ-সাত পদ অগ্রসর হইলেন। সহসা একটী ঘূর্ণ বাত্যা আসিয়া তাঁহার ছাতাটী উল্‌টাইয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গে শিলা পতিত হইতে লাগিল। তিনি তখন স্বীয় সঙ্কল্প অসম্ভব জানিয়া পশ্চাদাবর্ত্তনপূর্ব্বক দৌড়িয়া বড় মিঞার বৈঠকখানার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বৈঠকখানায় উঠিবার জন্য দ্বারের সিঁড়িতে পদ রাখিতেই দেখিলেন, সম্মুখে বড় মিঞা! আবুল ফজল 'সালাম' করিতেও সময় পাইলেন না। বড় মিঞা সাহেব বলিয়া উঠিলেন,—"আবুল ফজল! এখানে ত কাপড়-চোপড় নাই; বাড়ীর মধ্যে যাও।"

আবুল ফজল বিনা বাক্যে বাড়ীর মধ্যে গমন করিয়া আজিজার মাতার গৃহে উঠিলেন। আজিজা তখন গৃহের বারান্দায় বসিয়া বৃষ্টির সহিত ঝটিকার খেলা দেখিতেছিলেন; তিনি সহসা আবুল ফজলকে দেখিয়া সলজ্জভাবে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আজিজার মাতা গৃহের মধ্যে অন্য পার্শ্বে বসিয়াছিলেন; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে?" আজিজা কোন কথা বলিলেন না; বরং সলজ্জভাবে মস্তক নত করিলেন। তদ্দর্শনে তিনি নিজে বারান্দার দুয়ারে আসিয়া দেখিলেন, আবুল ফজল সিক্তবস্ত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আবুল ফজল আজিজার মাতাকে দেখিয়া লজ্জিত ভাবে সসম্ভ্রমে 'সালাম' করিলেন। তিনিও সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। অনন্তর গৃহের মধ্যে গিয়া আজিজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বেশ মেয়ে! আমি যদি ঘরে না থাকিতাম কিংবা ঘুমাইয়া থাকিতাম, তবে পরের ছেলেকে বোধ হয়, ভিজা কাপড়েই থাকিতে হইত।"

আজিজার হৃদয় স্পন্দিত হইতেছিল; তিনি লজ্জারঞ্জিত মুখখানি তুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য মায়ের মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং

তৎক্ষণাৎ মুখ নত করিয়া মাটীর দিকে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিলেন। সে দৃষ্টি যেন সসঙ্কোচে বলিল,—"মা! আপনি না থাকিলে আমার কার্য্য আমি সম্পন্ন করিতে পারিতাম।"

আজিজার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইবার পরে আবুল ফজল এই প্রথম অনাহূত ভাবে-এ বাড়ী আসিয়াছেন; তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত ভাবে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া বারান্দার তক্তপোষের উপর উপবেশন করিলেন। তখন ঝটিকা থামিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু প্রবল-ভাবে বৃষ্টি হইতেছে। আজিজার মাতা কিন্তু কোন প্রকার সঙ্কোচ প্রদর্শন করিলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সরল ভাবে আবুল ফজলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং গৃহে সুরক্ষিত পিষ্টক, মোরব্বা ও পাকা আম কাটিয়া আবুল ফজলকে 'নাস্তা' খাইতে দিলেন। আবুল ফজল 'নাস্তা' খাইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে বড় মিঞা সাহেব বহির্বাটী হইতে বাটীর মধ্যে আসিয়া আবুল ফজলের নিকট বসিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাদের বাটীর কুশলাদি বলিলেন।

যথাসময়ে খাবার প্রস্তুত হইয়াছে শুনিয়া উভয়েই 'ওজু' করিয়া নামাজ পড়িলেন। আজিজা তাঁহার দ্বিতীয়া বিমাতার সাহায্যে দুই একটী অতিরিক্ত তরকারী রন্ধন করিয়া লইয়া আসিলেন। আজিজার মাতা খাবার দিতে লাগিলেন। উভয়েই আহার করিয়া বারান্দায় পৃথক্ পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

বলা বাহুল্য, আবুল ফজল এই দুর্য্যোগের রাত্রে বাড়ী যাইবার অসঙ্গত প্রস্তাব তুলিতে সাহসী হন নাই।

আবুল ফজল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিলেন না। আজিজার

দুই একবার আজিজার নাম শ্রবণ ভিন্ন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হন নাই। ইহা আজ নূতন নহে; বিবাহ স্থির হওয়ার পর হইতেই এইরূপ।

যাহা হউক, অনেক রাত্রে-পরিশ্রান্ত আবুল ফজল ঘুমাইয়া পড়িলেন। সকালে যখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা প্রায় চার দণ্ড হইয়াছে; বৃষ্টি-বিধৌত প্রকৃতি নবীন সূর্য্যের হেম-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উজ্জ্বল হাস্য করিতেছে! তিনি লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন এবং হাত-মুখ ধুইয়া 'ওজু' করিয়া তখনই প্রভাতের নামাজ পড়িলেন। প্রাতঃ-নামাজ সূর্য্যোদয়ের পরে পড়া তাঁহার জীবনে এই প্রথম।

তিনি নামাজ সমাপনানন্তর বাড়ী যাইবার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে আজিজার মাতা আসিয়া বলিলেন,—"বাবা, ঘরে আসিয়া কিছু নাস্তা খাও।"

আবুল ফজল বিনম্র-ভাবে বলিলেন,—"আমি এখন বাড়ী যাই; না হয়, আবার আসিব।"

আজিজার মাতা হাস্যমুখে বলিলেন,—"বাবা! বাড়ী যাওয়ার জন্য চিন্তা কি? মায়ের ছেলে, যখন ইচ্ছা, মার কাছে যাইতে পারিবে। কা'ল রাত্রে আসিয়া কি খেয়েছ না খেয়েছ, তা' ত দেখ্‌তেই পারি নাই। আজ এ "ফকিরের" * মেয়ের হাতে চারিটা দাল ভাত খেয়ে যাও। আমি তোমার পিতাকেও সংবাদ দিয়াছি; তিনিও আসিবেন।"

মৌলবী এরফান আলি সাহেব মোসলমানী লম্বা-চওড়া কাপড় পরিধান করিতেন বলিয়া আবুল ফজল সময়ে সময়ে আজিজার মাতাকে "ফকিরের মেয়ে" বলিয়া উপহাস করিতেন। কিন্তু আজিজার সহিত আবুল ফজলের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পর তিনি আর এ সম্বোধন

* ফকির—সংসারত্যাগী তাপস, দরিদ্র।

ভ্রমেও মুখে উচ্চারণ করেন নাই। তাই আজ পরিহাসচ্ছলে আজিজার মাতা কথাটার উল্লেখ করিলেন।

আবুল-ফজল অগত্যা নাস্তা খাইলেন; কিন্তু পিতা আসিতেছেন শুনিয়া তিনি বড়ই লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর একখানা পুস্তক বাহির করিয়া কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া আজিজার বৈমাত্র ভ্রাতা মতিয়র রহমানকে ডাকিতে লাগিলেন। মতিয়র রহমান তখন মাতার কাছে ছিল; তাহার মাতা দেলজান তখন দক্ষিণের পোতার ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী রান্না-গৃহে রন্ধন করিতেছিলেন। তিনি এক বৎসর হইল, পৃথক্ রন্ধন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সেই পৃথক্ পাকে তিনি প্রায় একাকীই আহার করিতেন। বড় মিঞা সাহেব ক্বচিৎ দুই একদিন ভিন্ন কদাচ দেলজানের গৃহে আহার করিতেন না। তাঁহার পুত্র মতিয়র রহমান অধিকাংশ সময় আজিজার কাছে আসিয়া তাঁহার সহিতই আহার করিত। এতদ্ভিন্ন বাটীর অন্যান্য সকলেই আজিজার মাতার গৃহে আহারাদি করিতেন।

আবুল ফজলের আহ্বানে মতিয়র রহমান ছুটিয়া আসিয়া একেবারে বারান্দায় উঠিয়া পড়িল। কিন্তু আবুল ফজলকে চিনিতে না পারিয়া ভয়ে ভয়ে ঘরের মধ্যে গিয়া আজিজাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বুজান! ও কেডা* ?"

আজিজা তখন মাতার আদেশে ঘৃতের বোতল লইবার জন্য গৃহে আসিয়াছিলেন। তিনি বালকের কথায় অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে কোলে লইবার জন্য নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলেন। কিন্তু বালক নিকটে না আসিয়া পুনঃ ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,"বুজী, কও ও কেডা ?"

---

* পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে কথ্য ভাষায় 'টা'ও 'টী' সাধারণতঃ 'ডা'ও 'ডি' রূপে উচ্চারিত হয়, যথা—ভাইডি, বুন্‌ডি, দুইডা, তিনডা প্রভৃতি।

আজিজা দেখিলেন, কথা না বলিলে বালক আরও বিপদে ফেলিবে। সুতরাং তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তোমার ভাইজান"†—তৎশ্রবণে বালক আবার দুয়ারে ছুটিয়া গেল।

সেই মৃদুস্বর আবুল ফজলের কর্ণে প্রবেশ করায় তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তাঁহার শিরায় শিরায় শোণিত-ধারা চঞ্চল ও সঞ্চালিত হইতে লাগিল। তিনি শান্তভাবে মতিয়র রহমানকে নিকটে ডাকিয়া কোলে বসাইয়া তাহার হাতে একখানি পুস্তক প্রদান করিলেন। বালক পুস্তকের ছবি দেখিতে মত্ত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে আজিজা আবৃতবদনে উন্মুক্ত দুয়ারের সম্মুখ দিয়া গৃহের অপর পার্শ্বে আসিলেন এবং অনতিবিলম্বেই আবার একটী ঘৃতপূর্ণ বোতল হস্তে লইয়া ফিরিয়া চলিলেন। আবুল ফজল বারান্দায় যে তক্তপোষে বসিয়াছিলেন, তথা হইতে ঘরের মধ্যভাগ উত্তমরূপে দেখা যায়। আজিজা গৃহের পশ্চিম পার্শ্বে যাইবার সময়েই তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন; তখন তাঁহার চিত্ত এরূপ আন্দোলিত হইতেছিল যে, তিনি আজিজার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও সমর্থ হন নাই। কিন্তু আজিজা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধ্যগৃহে আসিবামাত্র আবুল ফজল বহু কষ্টে চিত্ত স্থির করিয়া শান্ত-কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন—"আজিজা!"

আজিজার পদদ্বয় জড়িত হইয়া গেল; তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল; তিনি কম্পিত-হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন।

---

† জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসম্পর্কীয় ব্যক্তির ন্যায় স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্বামীকেও 'ভাইজান' বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রথা মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে।

আবুল ফজল আবার বলিলেন,—“আজিজা! আমি কি তোমার এতই পর হইয়া গিয়াছি যে, তুমি ভ্রমেও আমার সম্মুখে আসা পরিত্যাগ করিয়াছ?”

আজিজা—নীরব।

আবুল ফজল পুনরায় বলিলেন,—“আজিজা! বুঝিলাম, তুমি আর আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভালবাস না। আচ্ছা তবে আমি আর এ বাড়ী আসিব না।”

আজিজার আর সহ্য হইল না; তিনি বদনমণ্ডল ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া স্বীয় করুণামাখা শান্ত সমুজ্জ্বল পদ্মপত্রোপম বৃহৎ নয়নদুটি আবুল ফজলের মুখের উপর স্থাপন করিলেন। সে করুণ-দৃষ্টি যেন স্পষ্টই বলিতে লাগিল, নিষ্ঠুর! এ হৃদয়-মন ত তোমাকেই সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইতেছি; তবে কেন অনর্থক এ দারুণ ভৎর্সনা! আমার মনে কষ্ট দেওয়াই কি তোমার সুখ?’

আবুল ফজল সে আবেগময়ী দৃষ্টির প্রতিঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া আর কথা বলিতে পারিলেন না। আজিজাও কম্পিত পদে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে আবুল ফজলের পিতা উপস্থিত হইলেন। অনন্তর আহারাদি সমাপন করিয়া পিতা-পুত্র একত্র বাটী গমন করিলেন।

দশম অধ্যায়।

দেলজান।

দেলজান দওলতগঞ্জের জমীর হোসেন বিশ্বাসের কন্যা। জমীর হোসেন বিশ্বাসের অবস্থা তত ভাল না হইলেও নিতান্ত মন্দ নহে। সামাজিক হিসাবে তাহার একটু বংশ-মর্য্যাদাও ছিল। এই বংশ-গৌরব-টুকুর পরিমাণ বুঝাইতে হইলে, ফরিদপুর জেলার মোসলমানগণের সামাজিক অবস্থার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি।

কয়েকজন বড়লোককে বাদ দিলে ফরিদপুর জেলার মোসলমান অধিবাসিবৃন্দকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। উহার প্রথম শ্রেণী ফরিদপুরের "আশরাফ"—অর্থাৎ সম্রান্ত বংশসমূহ। ইঁহাদের অধিকাংশই আওলিয়া, দরবেশ, শাহ, পীর ও রাজপুরুষগণের প্রদত্ত উপাধিপ্রাপ্ত বড় লোকদিগের বংশধর। ইঁহাদের উপাধি প্রধানতঃ সৈয়দ, শাহ, কাজী, মিঞা, খোন্দকার ও চৌধুরী প্রভৃতি। সৈয়দ উপাধিধারিগণের মধ্যে গেরদা, গড্ডি, মীর-গ্রাম, কাঠিয়া, আটাইল ও গোড়াইল প্রভৃতি গ্রামের বংশগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ। এইরূপ কাজী উপাধিধারিগণের মধ্যে বেথুলিয়া, পিপ্‌ড়ুল, বল্লভদী ও হিরণ্যকান্দি,—মিঞা উপাধিধারিগণের মধ্যে মালিগ্রাম, বাহাদুরপুর, সাতইর, চুকইড়, সুন্দরদী ও রাজপাট,—খোন্দকার উপাধিধারিগণের মধ্যে গেরদা, খাবাশপুর, লস্কর-দিয়া ও মহিষপুর,—শেখ উপাধিধারিগণের মধ্যে টুঙ্গিপাড়া ও হিরণ্য-কান্দি এবং চৌধুরী উপাধিধারিগণের মধ্যে ফুলসুতি ও তালমা প্রভৃতি

গ্রামসমূহের বংশগুলিই বিশেষ প্রসিদ্ধ* । ইঁহারা প্রায়ই কৃষিকার্য্য করেন না। পূর্ব্বে ইঁহারা নিষ্কর জায়গীর বা চেরাকী তালুকাদি উপভোগ ও সামাজিক বৃত্তি ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু অধুনা ঐ সমস্ত সুবিধা প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়াছে। শিক্ষা-দীক্ষায়ও এ শ্রেণী তত উন্নত নহে। ইঁহাদের বর্ত্তমান পেশা নিম্নশ্রেণীতে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের সম্পত্তির কিয়দংশ লাভ করা ; নীচ বংশে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া পণ গ্রহণ করা ; অগত্যা পেয়াদাগিরী কনষ্টবলী হইতে আরম্ভ করিয়া কেরাণীগিরী এবং ভাগ্য একান্ত প্রসন্ন হইলে দারোগাগিরী পর্য্যন্ত চাকরী করা। কিন্তু কালধর্ম্মে আর তাহাও বুঝি জুটে না। শিক্ষাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কৌলিন্য প্রত্যাখ্যাত হইতেছে ; চাকরীও দুষ্প্রাপ্য ! ফলতঃ এই শ্রেণী অধঃপতন ও অবনতির চরমসীমায় উপনীত হইতেছে ; ইঁহাদের ভবিষ্যৎও ঘোর অন্ধকারময়।

দ্বিতীয় শ্রেণী—বঙ্গের উন্নতিশীল মধ্যম সমাজ। ইঁহাদের অধিকাংশই কোন বিশেষ মহাত্মার বংশধর নহেন। ইঁহারা স্বহস্তে চাষ-আবাদ না করিলেও কৃষিকার্য্যের সহিত গাঢ়ভাবে সংলিপ্ত। ইঁহাদের অনেকের প্রচুর ভূ-সম্পত্তি আছে। বঙ্গদেশের মধ্যে এই শ্রেণীর অবস্থাই একটু সচ্ছল। পূর্ব্বোক্ত 'আশরাফ'গণের সামাজিক সম্বন্ধ প্রধানতঃ, ইঁহাদেরই সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণও বেশ প্রতিভাশালী পরিদৃষ্ট হইতেছে। ফল কথা, ইঁহাদেরই ভবিষ্যৎ একটু আশাজনক ও উজ্জ্বল। ইঁহাদের মধ্যেও তালুকদার, আয়মাদার, হাওলাদার, বিশ্বাস, খাঁ, সরদার, মুন্‌শী, ঠাকুর, মিনা ও মণ্ডল প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত আছে।

---

* বলা বাহুল্য, আমরা ফরিদপুর জেলার সমস্ত প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম উল্লেখ করিতে পারি নাই। উল্লিখিত গ্রামসমূহ ভিন্ন ফরিদপুরে আরও বহু প্রসিদ্ধ গ্রাম বিদ্যমান আছে।

তৃতীয় শ্রেণী—'আতরাফ'—অর্থাৎ অকুলীন ও নীচ বংশ-সমূহ। ইহাদের অধিকাংশই বঙ্গীয় হিন্দুদিগের বংশধর ; সুতরাং হিন্দুদিগের ন্যায় ইহাদের সামাজিক জীবন বড়ই অনুন্নত। ইহাদের আচার-ব্যবহারও পূর্ব্বপুরুষদিগেরই ন্যায় ইস্‌লামের বৈশিষ্ট-বর্জ্জিত ; সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কারাদিও তাহাদেরই অনুরূপ। ইহারা পরিশ্রম করে,—উপার্জ্জন করে, খায় ও ঘুমায় ; ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা ভ্রমেও ইহাদের মনে উদিত হয় না এবং সে সম্বন্ধে ইহাদের কোন আশাও নাই।

আমরা এই সামাজিক অবস্থা ও উপাধি প্রচলন সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যেরূপেই হউক, ঐগুলি সৃষ্ট ও প্রচলিত হইয়াছে, এবং যাহা প্রচলিত হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রদান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। উক্ত বিবরণ অনুসারে দেলজানের পিতা জমীর হোসেন বিশ্বাস দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দেলজানের বিশ্বাস, তাঁহার পিতাই কুলে মানে দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং তিনিই নারীকুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। অন্ততঃ প্রথম স্বামীর শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার এই ধারণাই বলবৎ ছিল। কারণ প্রথম স্বামী তাঁহার পিতা হইতে বংশে হীন এবং দেলজানের রূপে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, তিনি একপ্রকার তদীয় ক্রীড়া-পুত্তলিতে পরিণত হইয়াছিলেন। স্বামীকর্তৃক অন্যায় প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইলে বঙ্গ-সংসারের অনেক রমণীই যে অবাধ্য ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত কথা। ফলতঃ দেলজানেরও সেই অবস্থাই ঘটিয়াছিল। কারণ অপরে ত দূরের কথা, স্বয়ং শাশুড়ী যদি তাঁহাকে কোন কথা বলিতেন, তাহার প্রতিফলস্বরূপ বেচারী প্রথম পুত্রবধূর মধুর সম্ভাষণেই আপ্যায়িত হইতেন ; পরে গুণবতী বধূমাতার অন্নাহার বন্ধ হইত এবং প্রকৃত কথাটী বহুগুণে রঞ্জিত ও শাখা-প্রশাখা বর্দ্ধিত হইয়া পুত্রের কাণে

উঠিত। জননী পুত্রকর্তৃক ভৎর্সিতা হইতেন। তার পরে এ নাটকের যবনিকা পতিত হইত।

কিন্তু দারুণ বিধাতার নিদারুণ বিধানে দেলজানের এ সুখের রাজ্য, আব্দারের সাম্রাজ্য স্থায়ী হইল না। তাঁহার ষোল বৎসরের ভরা যৌবনে করাল কলেরা-রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামী তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন। দেলজান প্রকৃতই স্বামি-শোকে আছাড় খাইয়া—ধূলায় লুঠিয়া—বুকে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে খুব কাঁদিলেন। ভরা গাঙ্গে ভাটা পড়ানের জন্য নিষ্ঠুর বিধাতাকে গালাগালি দিলেন। যাহারা তাঁহার সুখ দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিত, তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। অনন্তর কিছুদিন পরেই পিত্রালয়ে আসিয়া ভ্রাতৃবধূর সহিত মধুর কলহে গৃহ মুখরিত করিলেন।

কিন্তু এখানে বিষম প্রতিক্রিয়া! স্বামি-বর্ত্তমানে স্বামীর সংসারে তিনি যে রাজ্যের রাণী ছিলেন, এখানে ভ্রাতৃবধূ সে রাজ্যের মহা-সাম্রাজ্ঞী! কারণ তাঁহার গুণধর ভ্রাতা সাধের স্ত্রীর জন্য পিতা-মাতাকেই গ্রাহ্য করেন না, আর ভগিনী ত কোন্ ছার! সুতরাং এ সংগ্রামের ফলে তিনি ভ্রাতাকর্ত্তৃক প্রথমে তিরস্কৃতা হইলেন; তৎপরে অপমানিত ও বিতাড়িত হইবার "নোটীস্" প্রাপ্ত হইলেন; সুতরাং অগত্যা তিনি তখন মনে মনে গুমরিয়া মহারাজ্ঞী ভ্রাতৃজায়ার আইন-কানুন মানিয়া চলিতেই বাধ্য হইলেন।

কিন্তু রমণীর যদি রূপ থাকে, তবে তাহার কিসের অভাব? রূপের অভাবে কত রাজকুমারী দরিদ্রের কুটীরে নিষ্পেষিতা; আবার রূপের মহিমায় কত কৃষক-কুমারী রাজসিংহাসনে সমাদৃতা ও সম্পূজিতা! রূপের অভাবে কত মহীয়সী মহিলা স্বামী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা;—রূপের গরবে কত বারবিলাসিনী ধন-সম্পদ্-প্রতিভাশালী যুবকের হৃদয়-মন্দিরে

অধিষ্ঠিতা! অতএব দেলজানেরও যখন রূপ আছে, তখন আর সমস্ত একদিন না একদিন হইবেই।

যাহা হউক, দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই দেলজানের তমসাপূর্ণ অদৃষ্টাকাশে রক্তবরণ সুখ-রবির উদয় হইল! বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। দেলজানের ভ্রাতৃবধূ আনন্দমনে কাল-সাপিনী ননদিনীকে শাড়ি-চুড়ি দিয়া সাজাইয়া বিদায় করিলেন। পাড়া-পড়সী দুই একটি দুষ্ট মেয়ে 'আপদ্ গেল'—বলিয়া মনে মনে কুলার বাতাস দিতে ভুলিল না।

দেলজান বিবাহ-অন্তে আলিনগরে নীত হইলেন। স্ত্রীলোকগুলোর স্বভাব ম'লেও যায় না। বড় মিঞার শেষকালের বিবাহ হইলেও নূতন বৌ দেখিবার জন্য স্ত্রীলোকের ঝাঁক আসিয়া ঝুকিয়া পড়িল এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল—"বড় মিঞার 'নিকা'র * বৌ ত বেশ!"

'নিকা' কথাটা দেলজানকে বড়ই খোঁচা দিল। কিন্তু আজ তিনি নিরুপায়!

দ্বিতীয় প্রতিবেশিনী। বেশ মানে খানিকটা ধলা (শাদা); 'ছিরি' চোহারা ত ততইবচ!

তৃতীয়া। ওলো! এই নাকি সেই দৌলতগঞ্জের নামজাদা সুন্দরী! এ দেখি ধলা মুলার মত খানিকটা লম্বা এক ট্যাঙ্গা মাগি! এর আবার এত নাম-ডাক! আমরা ভাব্‌ছিলাম যে, হুরীই আসে, না পরীই আসে; তা খুব আস্‌ছে!

প্রথমা। তা নেও, বড় মিঞার বুড় কাল; এখন এই ভাল!

---

* 'নিকা' শব্দটা 'নেকাহ্' শব্দের অপভ্রংশ। 'নেকাহ্' অর্থ বিবাহ। কিন্তু বঙ্গীয় মোসলমান সমাজে বিধবা-বিবাহকেই সাধারণতঃ নিকা বলা হয়।

দ্বিতীয়া। আলো হা! তা-বৈ-কি? ধলা গাই যে দুধের সাগর!

রমণী-কণ্ঠের তীব্র-মধুর অনুচ্চ হাস্যে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল।

তৃতীয়া। নে থাম; ঘাস-জল দিতে পার্‌লে কালা গাইরও দুধ হয়।

প্রথমা। সত্যি নাকি? আয় ত তোরে ঘাস-জল দেই, দেখি দুধ বাড়ে নাকি?

তৃতীয়া। কেনলো পোড়ারমুখি! আমি কি গাই?

দ্বিতীয়া। না,—তুমি ওলো আবাল (বলদ)! আবার হাস্যধ্বনিতে গৃহ শব্দায়মান হইল।

এমন সময়ে সেখানে একটী সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা আসিয়া বলিল, "আমি বৌ দেখ্‌ব।"

জনৈক বর্ষীয়সী রমণী বলিল,—"আজিজা এস মা, বৌ দেখ্‌বে?" বলিয়াই তাহাকে কোলে লইয়া দেলজানের মুখের কাপড় খুলিয়া দিতে লাগিলেন এবং দেলজানও যথাসাধ্য জোরের সহিত কাপড় টানিয়া মুখমণ্ডল আবৃত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রমণী বিরক্ত হইয়া বলিল, "ওমা! এমন বৌ ত দেখি নাই, এ যে জোর করে!"

পূর্ব্বোক্ত তৃতীয়া। তা আর করবে না। এ যে ভাতার খাওয়া থুব্‌ড়ো মাগি!

প্রথমা। তা কেন? তুমি এখন কচি তালের শাঁস হ'তে বল না কি?

দ্বিতীয়া। ষাট! ষাট! এ যে পাকা তাল!

দেলজানের চক্ষুদ্বয় একবার অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে দুই তিন জন দুষ্ট স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল—"বাবা! এ যে বাঘ-চোখো বৌ; তবেই হয়েছে বড় মিঞার বথ দেখা!

ইতিমধ্যে তৃতীয়া রমণী সম্বন্ধহীন ভাবে বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা কেবল ধলা হ'লেই কি সুন্দরী হয়? এই আমাদের আজিজা ত অত ফিক্‌ফিকে সাদা নয়; তবু দেখ্‌ত,—কি গঠন! কি চেহারা!"

দেলজান মুহূর্তের জন্য আজিজাকে আড়-চক্ষে দেখিয়া লইলেন।

দুই তিন জন স্ত্রীলোক একত্রে বলিয়া উঠিল,—"তুমিও যেমন; কিসের সাতে কিসের তুলনা! আজিজা কেমন মা'র মেয়ে! আজিজার মার এই প্রায় তিরিশ-চল্লিশ বৎসর বয়স, তবুও—" এমন সময়ে একটী মহীয়সী মহিলা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রায় সকলেই সসম্ভ্রমে মুখের কথা মুখে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কেহ বা নতমুখে বসিয়া রহিল।

তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রশান্তমুখে বলিলেন,—"সকলে কি আরম্ভ ক'রেছ? উহাকে 'গোসল' করাইয়া খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

বর্ষীয়সী কিঞ্চিৎ হাস্যমুখে বলিলেন—"আমরা আর কি বন্দোবস্ত করিব; উনিইত কর্ত্তা।"

মহিলা। (শান্ত ভাবে) সে ত আর আজ নয়; যখন কর্ত্তা হবেন, তখন উনিই তোমাদেরে খাওয়াইবেন।

বর্ষীয়সী। সে আমাদের কপাল!

এমন সময়ে বর্ষীয়সীর কোল হইতে বালিকা বলিয়া উঠিল—"মা! ভাল সুন্দর বৌ।"

মহিলা। (সহাস্যমুখে) আচ্ছা তোমার কাছে ভাল হইলেই ভাল,—বলিয়াই স্নেহময়ী জননী সস্নেহে কন্যাকে কোলে করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দেলজান বুঝিলেন, ইনিই তাঁহার সপত্নী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

——০:*:০——

দেলজানের চক্রান্ত।

বিবাহের পর এক মাস গত হইতে না হইতেই দেলজান পিত্রালয় হইতে দ্বিতীয়বার আলিনগরে আনীত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বামি-গৃহে আসিয়া তেমন সুখ-শান্তি অনুভব করিতে পারিলেন না। কারণ যদিও প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কিছুরই অভাব নাই; তিনি অপ্রত্যাশিত বস্ত্র-অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন; স্বেচ্ছানুযায়ী আহার-বিহারের উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সম্ভবমত সকলেরই আদর-যত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি তিনি যেন বাড়ীর কেহই নহেন। স্বামী হইতে সপত্নী, দাস-দাসী ও পাড়া-প্রতিবাসী—এমন কি, বাড়ীর পশুপক্ষী এবং নির্জ্জীব গৃহ সরঞ্জামগুলিও যেন আজিজার মাতার প্রভাব দ্বারা আচ্ছন্ন; সকলেই তাঁহার নিকট সম্ভ্রম-বিনত; সকলেই তাঁহার অনুগত এবং তৎপ্রতি ভক্তিপরায়ণ। তিনি যদিও দেলজানের সহিত কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় সদ্ব্যবহার ভিন্ন বিন্দুমাত্রও বিরূপ ব্যবহার করেন নাই, তথাপি একজনের এত অধিক কর্ত্তৃত্ব তাঁহার মোটেই সহ্য হইত না। তিনি ভাবিতেন যে, আমি কেন তাঁহার অনুগত হইয়া চলিব? আমি ত আর দাসী নই?

দেলজানের দ্বিতীয় অশান্তি স্বামী। স্বামী তাঁহাকে আদর করেন সত্য, কিন্তু শাসন করিতেও ত্রুটী নাই। এই স্নেহ করিয়া—সোহাগ করিয়া তাঁহার সুখ সম্পাদন করিতে ব্যস্ত হন, আবার বিন্দুমাত্র ত্রুটী পাইলেই

অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হন। এ তিক্ত-মধুর ভাব, এ কোমল-কঠোর ব্যবহার ও মিঠে-কড়া স্নেহ-বিরাগ তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না; তিনি স্বামীর এরূপ ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত; তাঁহার পক্ষে এ যেন "ভালবাসা ও হালে চষা"। তিনি এই সমস্ত দুঃখে জ্বলিয়া পুড়িয়া এক এক বার প্রথম স্বামীর কথা মনে করিতেন; আবার সেই বারিভেদী সিক্তগর্ভ চালা-ঘরের সহিত বর্ত্তমান প্রকাণ্ড টিনের আটচালা গৃহের তুলনা করিয়া—সেই আহার-বিহারের সহিত তুলনায় বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং বর্ত্তমানের ব্যবহার্য্য বস্ত্রালঙ্কারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তখনি তাহা ভুলিয়া যাইতেন।

দেলজানের তৃতীয় অশান্তি—আজিজা; তিনি ভাবিতেন—"এই মেয়েটার 'গঠন-গাঠন' যদিও একটু ভাল, তবু সে ত কোন কালেও তাঁহার অপেক্ষা সুন্দরী নহে। কিন্তু তবু পোড়া লোকগুলো তাঁহার প্রশংসা না করিয়া—যে আসে সেই ঐ মেয়েটার এত প্রশংসা করে কেন? মেয়েটাকে কারও কিছু বল্‌বার সাধ্য নাই; আবার বাটীতে মৌলবী রাখিয়া পড়ান হচ্ছে; এমন কাণ্ড ত বাবার জন্মেও শুনি নাই; মেয়ে প'ড়ে কি দারোগা হবে না কি?"

সাত আট মাস পরে তিনি বড় মিঞা সাহেবের সম্মুখে এই প্রতিবাদটা একদিন করিয়াই ফেলিলেন; কিন্তু বড় মিঞা সাহেব তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। কয়েক দিন পরে আবার বলায় তিনি দেলজানকে সাবধান করিয়া দিলেন। মাসখানেক পরে দেলজান ঐ কথা পুনর্ব্বার তুলিলে তিনি ধমক দিয়া বলিলেন,—"সাবধান, আজিজার উপর যে হিংসা কর্‌বে, তার ভাল হবে না।"

ইহার দুই তিন মাস পরে বড় মিঞা সাহেব একদিন কোন বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে একটু উত্তেজিত ভাবে আসিয়া গৃহের মধ্যে বসিয়াছেন,

এমন সময়ে দেলজান আসিয়া বলিলেন,—"বাপজানের 'ফয়তা'র * জন্য 'মিঞা ভাই' যে একশত টাকা চেয়ে গেল, তার কি হ'ল।"

বড় মিঞা। সেত সাম্‌নে মাসে দিবই ব'লেছি।

দেলজান। সে ব'লে গেছে যে, এই মাসে পাইলেই ভাল হয়।

বড় মিঞা। টাকা ত আর গাছের ফল নয় যে, যে যখন চাবে, তখনি অমনি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিব!

দেলজান। না, এখন গাছের ফল হবে কেন? মেয়ে পড়াবার সময় গাছের ফল হয়!

বড় মিঞা। (কিঞ্চিৎ উত্তেজিতভাবে) দেখ, তোমার কথা-বার্ত্তা মোটেই ভাল নয়; শুন্‌লে নিতান্ত ছোট লোকের চেয়েও অধম মনে হয়।

দেলজান। (কিঞ্চিৎ তীব্রকণ্ঠে) তা ত হবেই; ভাল কথা ভাল শুনাবে কেন? 'ফয়তা' নেক কাজ; আর মেয়ে-ছেলে পড়ে হয় ছিনাল হবে, নয়——'

বড় মিঞার আর সহ্য হইল না; তিনি রোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "বেহায়া, তোর একটুও লজ্জা-ভয় নাই; তুই আমার মুখে মুখে কথা বলিস্‌"!—বলিয়াই দেলজানের মুখ ও মস্তক ব্যাপিয়া এক ভীষণ চপেটাঘাত করিলেন। শরাহত কপোতীর ন্যায় দেলজান মাটিতে ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। নারী-কণ্ঠের করুণ ক্রন্দনে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। আজিজার মাতা গৃহে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে কোন কথাই বলিলেন না। কিন্তু 'স্বভাব যায় না মলে'—এই যে প্রবাদ বাক্য আছে, ইহা অতি সত্য। আমরাও

* 'ফয়তা' শব্দটী 'ফাতেহা' শব্দের অপভ্রংশ। মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ কামনার্থ ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট সামাজিক অনুষ্ঠান বিশেষকে 'ফাতেহা' বলে। 'ফাতেহা শব্দের

দেখিতে পাই, আহারের সময় দুই একটা বিড়াল বিষম বিরক্তিকর মিউ মিউ শব্দ করিতে থাকে। ঐ শব্দ হইতে তাকে থামাইবার জন্য খাবার দিলে সে তাহা খাইয়া আবার মিউ মিউ করিতে থাকিবে। পুনর্ব্বার খাবার দিলে যদি খাইতে না পারে, তবু উহা সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়াও আবার মিউ মিউ আরম্ভ করিবে, এজন্য তা'কে প্রহার করিলে, সে একটু দূরে পলাইবে; কিন্তু আবার মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সেই মিউ মিউ আরম্ভ করিবে। সুতরাং মনে করিতে হইবে, ইহাই তাহার স্বভাব।

দেলজানের স্বভাবও অনেকটা সেইরূপ; সঙ্কীর্ণ ও বিদ্বিষ্ট হৃদয়ের কলুষ-উদ্গীরণ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য স্নেহ-আদর ও সুখ-সম্পদ প্রদান সকলই নিষ্ফল হইল; শাসন ও ভৎ‌র্সনা ভাসিয়া গেল; এমন কি শেষ উপায় প্রহারেও তাঁহার শিক্ষা হইল না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পাঁচ ছয় মাস পরে একদিন দেলজানের করুণ ক্রন্দনে আজিজার মাতা দৌড়িয়া গিয়া দেখিলেন যে, বড় মিঞা সাহেব বাম করে তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক দক্ষিণ করস্থিত তাল-পত্রের পাখার বাঁট দ্বারা তাঁহাকে ভয়ানক প্রহার করিয়া সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করিতেছেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে দেলজানকে স্বামীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া একটু ভৎ‌র্সনা-পূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন,—"ছি! আপনি ক্রমান্বয় কিরূপ হইতেছেন? এ সব লোকে শুনিলে বলিবে কি? ও যে পোয়াতি মানুষ!" বড় মিঞা সাহেব লজ্জিত হইয়া বহির্ব্বাটী চলিয়া গেলেন।

এই দিবস হইতে দেলজান অনেকাংশে আজিজার মাতার অনুগত হইয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বভাব-চরিত্রও কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল। ক্রমশঃ তাঁহার ভাগ্য-কুঞ্জে সুখের ফুল ফুটিল। কয়েক মাস পরেই দেলজান একটী সুদর্শন পুত্র প্রসব করিলেন। আজিজার মাতা সস্নেহে নবজাত শিশুর মুখচুম্বন করিলেন; সহোদরাধিক স্নেহ যত্নে

প্রশৃতির সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার সুস্থতা সম্পাদন করিলেন। আজিজার মাতা পুত্রের নাম রাখিলেন মতিয়র রহমান। সকলেই সেই নাম অনুমোদন করিলেন। মহা ধূমধামে শিশুর 'আকিকা' করা হইল। পুত্র প্রসব করিবার পর হইতেই দেলজানের আদর ও সম্মান প্রতিপত্তি একটু একটু করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তিনিও ক্রমশঃ পূর্ব্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শিশুপালন বিষয়ে দেলজান একেবারেই অনভিজ্ঞা ছিলেন। এজন্য আজিজার মাতাই শিশুকে দুগ্ধ পান করাইতেন, স্নান করাইতেন এবং অধিক সময়ে আপনার কাছেই রাখিতেন। আজিজা শিশুকে কোলে লইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন। যখন শিশুকে কোলে লইয়া তাহার সদ্য প্রস্ফুটিত শতদল-বিনিন্দিত কচি মুখে চুম্বন প্রদান করিতেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে সুপবিত্র নির্ম্মল ভ্রাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিত। এই জন্য শিশুও যতই বড় হইতে লাগিল, ততই আজিজা ও তদীয় মাতার অনুগত হইয়া পড়িতে লাগিল। শিশু দেলজানের কাছে আসিলেই কাঁদে, অস্থিরতা প্রকাশ করে; কিন্তু আজিজা বা তাঁহার মাতার কাছে গেলেই শান্ত হয়—হাস্য এবং খেলা করে।

দেলজানের এ ভাব সহ্য হইল না। তিনি শিশুর খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা প্রভৃতি নানা ছুঁতা ধরিয়া পৃথক্ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বড় মিঞা সাহেব তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া শেষে বিরক্ত হইয়া আজিজার মাতার নিকট প্রস্তাব করিলেন। আজিজার মাতা সম্মতি প্রদান করায় দেলজান চারি বৎসরের শিশু পুত্রসহ পৃথক্ হইলেন।

পৃথক্ হইয়া দেলজান সুবিধার পরিবর্ত্তে বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। বাটীর কেহই তাঁহার গৃহে আহার করিত না। একমাত্র শিশু পুত্র মতি; সেও অনেক সময়েই ছুটিয়া গিয়া আজিজার

মাতার গৃহে আহার করে। সুতরাং দেলজানকে এক প্রকার নিজের জন্যই তিন বেলা রন্ধন করিতে হয়; অথচ বর্ত্তমানে ইহাতে তিনি সম্পূর্ণ অনভ্যস্তা হইয়া পড়িয়াছেন; কারণ এপর্য্যন্ত সকলে একত্র থাকায় তিনি আজিজার মাতা ও তাঁহার অন্যতমা বিমাতার পাকেই আহার করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াই রন্ধন করিতে যাইতেন না; কারণ রন্ধনে তিনি কোন কালেই নিপুণা নহেন এবং এজন্য তিনি অনেক সময়ে নিরীহ পূর্ব্ব স্বামীরও মৃদু তিরস্কার সহ্য করিয়াছেন। সুতরাং এখানে তিনি ইচ্ছা করিয়াই অন্য কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। মাসের মধ্যে কচিৎ এক আধ দিন রন্ধন করিতেন বটে, কিন্তু তাহাও আজিজার সম্পূর্ণ সাহায্যে। অতএব এখন এই তিন সন্ধ্যা রন্ধন করা তাঁহার স্কন্ধে নিদারুণ বোঝার মত চাপিয়া পড়িয়াছে। মানুষ যে কেবল নিজের জন্য নানা রকম সুখাদ্য প্রস্তুত ও রন্ধন করিতে পারে না; বরং পাঁচজনকে খাওয়াইবার জন্য যে তাহা অনায়াসে করিতে পারে এবং পাঁচজনকে খাওয়ানই যে তাঁহার সুখ—এবং সে সুখ যে আত্মভোজন অপেক্ষাও অধিক তৃপ্তিকর, এ কথাটা দেলজান এত দিনে যেন একটু বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন যে, সংসারে অন্য কাজ করিয়া নিজের জন্য তিন সন্ধ্যা রন্ধন করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে কষ্ট করিয়া শিশু পুত্রের জন্য করিবে, কিন্তু সেও প্রায়ই আজিজার মাতার ঘরে খাইতেছে। কারণ সেই ঘরেই নিয়মিত সময়ে রন্ধনাদি হইয়া থাকে। তিনি দুই একদিন কাঁদা-কাটা সত্ত্বেও তাহাকে জোর করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া ধরিয়া-বাঁধিয়া খাওয়াইতে গিয়া দেখিলেন, তাহাতে লাভ নাই—বরং নিজের পুত্রই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া উঠে। বিশেষতঃ এজন্য বড় মিঞা সাহেব একদিন তাঁহাকে তীব্রভাবে তিরস্কার করিলেন। পূর্ব্বতম বজ্র সম চপেটাঘাত ও পাখা-প্রহারের

কথা মনে হওয়ায় তিরস্কারে ভীত হইয়া তিনি উহাতে নিরস্ত হইলেন, এবং অগত্যা এক বেলা রাঁধিয়া দুই বেলা খাইয়াই দিন কাটাইতে লাগিলেন। রন্ধনে বিরক্তি ও অজ্ঞতাহেতু তিনি প্রায়ই কাঁচকলা সিদ্ধ করিয়া বা বেগুন পোড়াইয়া কাজ চালাইতেন, মাছ তরকারী দূষিত করিয়া ফেলিয়া দিতেন। আজিজার মাতা এই সমস্ত অসুবিধা দেখিয়া আবার তাঁহাকে একত্র হইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু লজ্জা ও অভিমানবশে দেলজান তাহাতে সম্মত হন নাই। অগত্যা আজিজার মাতা প্রায় প্রতিদিনই আজিজার দ্বারা তাঁহাকে ব্যঞ্জনাদি পাঠাইয়া দিতেন। দেলজান পাঠাইতে নিষেধ করিতেন; কিন্তু অযোগ্যতার জন্য গ্রহণেও বিরত হইতেন না। পাছে গ্রহণে অসম্মত হয়, এই জন্য মাতার আদেশে আজিজা অনেক সময়ে ব্যঞ্জনাদি লইয়া গিয়া দেলজানের গৃহে তাঁহার সহিত একত্র আহারাদি করিতেন।

দেলজান এই করুণাটুকু একান্ত অনিচ্ছার সহিত গ্রহণ ও হজম করিতেন। তাঁহার আশা ছিল, বড় মিঞা সাহেব আর কত দিন; মতি বড় হইলে এ সমস্তই ত তাঁহার; তখন ইহার প্রতিশোধ দিবে।

কিন্তু যখন আজিজার সহিত আবুল ফজলের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল, তখন তাঁহার অন্তর চমকিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার আশাতরু শিকড় মেলিতে না মেলিতেই বিপক্ষের গাছে ফুল ফুটিতে —ফল ধরিতে আরম্ভ হইল। তিনি ভাবিলেন, আবুল ফজলের সহিত বিবাহ হইলে আজিজা ত চিরকালই এই বাড়ী থাকিবে। আজিজার মা চিরদিনই এইরূপ বড় 'বিবির' * মত থাকিবে। উহারা বয়সে বড়, বুদ্ধিতেও বড়; সুতরাং আমার মতিকে উহাদেরই অধীন হইয়াই থাকিতে

* সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার সহিত অবস্থানকারিণী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভদ্রমহিলাগণই সাধারণতঃ বিবি বলিয়া কথিত হয়।

হইবে। আর আমি,—আমি ত এখনই এই,—এর পর যদি (বড় মিঞার) কিছু ভাল-মন্দ হয়, তখন আমাকে উহারা রাখ্‌লেই বা দেখে কে? আর তাড়াইয়া দিলেই বা রাখে কে? অতএব এখনই ইহার প্রতিকার করা আবশ্যক। কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রতিকারের কোন উপায় খুজিয়া না পাইয়া স্বীয় ভ্রাতাকে সংবাদ দিয়া আনয়ন করিলেন। ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে পূর্ব্ব বৈরভাবের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে যথেষ্ট সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছে। তিনি ভগিনীর আহ্বানে সত্বর আলিনগরে উপস্থিত হইলেন। ভাই-ভগিনী পরামর্শ করিয়া কার্য্যপদ্ধতি ঠিক করিলেন। সহকারী গ্রহণ করা হইল, বাটীর একটী চাকরকে; এই চাকরটীকে দেলজানের ভ্রাতাই এখানে দিয়াছিলেন। আর একটী সহকারী হইল বড় মিঞার পিতৃব্য ভ্রাতা মৃত জমিরুদ্দিনের পুত্র মাসুদ। মাসুদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে; সে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত বলিয়া বিখ্যাত। আজিজাকে বিবাহ করা, তাঁহার অনেক দিনের ইচ্ছা। এই সূত্রে সে আবুল ফজলের উপর ঘোর শত্রুতা পোষণ করিত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চক্রান্তের সূচনা।

আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ; মেঘলা দিবসের বৈকাল বেলা; সবেমাত্র বৃষ্টি হইয়া আবার রোদ উঠিয়াছে; বৃক্ষ-পত্রে তখনও বারিবিন্দু জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। বৃষ্টি-বিধৌত অবনীর অঙ্গাবরণ স্বরূপ সত্মস্নাত হরিৎবর্ণ ধান্য-ক্ষেত্রগুলির উপর মেঘমুক্ত সমুজ্জ্বল সূর্য্যের কনক কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় অতি সুন্দর দেখাইতেছে! মৃদু-মন্দ পবন ধান্যশীর্ষ কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে; আবার খণ্ড খণ্ড মেঘসমূহ ভাসিয়া ভাসিয়া আগমনপূর্ব্বক সূর্য্যকে আচ্ছাদন করতঃ সমস্ত অন্ধকার করিয়া দিতেছে; সন্ধ্যা হইতেও আর অধিক বিলম্ব নাই।

এমন সময়ে আবুল ফজল বাটী হইতে বাহির হইয়া মধ্য পাড়ার দিকে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেলজানের ভ্রাতা ও বড় মিঞার শিশু-পুত্র মতিয়র রহমান। ইহারা মধ্যাহ্ন সময়ে মিঞাবাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ঘন ঘন বৃষ্টি হওয়ায় এবং দেলজানের ভ্রাতা নানাবিধ গল্পে মশগুল থাকিয়া সময় নষ্ট করায় বাড়ী ফিরিতে দেরি হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য আবুল ফজল তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর করিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদের সহিত বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন।

আবুল ফজল চলিতে চলিতে মতিয়র-রহমানের সহিত রহস্যালাপ করিতেছিলেন,—এমন সময়ে সহসা মাসুদের কণ্ঠোচ্চারিত—"বাছ্রা! ঐ গরুটা কার, ধ'রে আন্‌ত; ধানগুলি খাইয়া একেবারে পয়মাল করিয়াছে।"—এই উচ্চৈঃস্বরে চমকিত হইয়া আবুল ফজল পার্শ্বে চাহিয়া

দেখিলেন, তাঁহাদেরই গাভিটি বড় মিঞা সাহেবের একখানি ধানক্ষেতের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং বড় মিঞার চাকর বাছের সেই দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আবুল ফজলদের বাটীর অদূরেই বড় মিঞা সাহেবের কয়েক খণ্ড জমি ছিল; ঐ জমিগুলিতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও আউশ ধান্য বপন করা হইয়াছিল।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা কৃষিকার্য্য করিতেন না; সুতরাং গরু বাছুরও পালিতেন না। কেবল কতক আবশ্যকে ও কতক সখ করিয়া একটী গাভী প্রতিপালন করিতেন। এই গাভিটী দেখিতে যেমন সুন্দর, গুণেও তেমনি আদরণীয় ছিল; অর্থাৎ গাভিটী প্রায় পাঁচ ছয় সের সুমিষ্ট গাঢ় দুগ্ধ প্রদান করিত। আফতাব-উদ্দীন মিঞা গাভিটীকে সন্তানবৎ যত্নে প্রতিপালন করিতেন; এমন কি, মশার উপদ্রবের সময়ে মসারি খাটাইয়া তাহার নীচে গাভী বাঁধিতেন; প্রবাদের ন্যায় বহুদূর পর্য্যন্ত আফতাব-উদ্দীন মিঞার গাভীপালনের কথা বিস্তৃত হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, আফতাব-উদ্দিন মিঞার উক্ত গাভিটীই বড় মিঞার ক্ষেতে ধান খাইতেছিল। আবুল ফজল বাছেরকে যাইতে দেখিয়া প্রথমতঃ মনে করিলেন,—বাছের গাভিটী তাঁহাদের বাড়ীর দিকেই তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু বাছের গাভীর নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রথমতঃ উহার গলার দড়ি খুলিয়া দুই পেঁচ করণান্তর খুব শক্ত করিয়া বাঁধিল এবং স্বীয় হাতের পাকা কঞ্চির লাঠি দ্বারা উহার সর্ব্বাঙ্গে বেদম প্রহার করিতে লাগিল।

আবুল ফজল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন,—বোধ হয়, বাছের আমাদের গাভী বলিয়া চিনিতে পারে নাই; চিনিলে কখনই এরূপ প্রহার করিত না। অনন্তর তিনি ডাকিয়া বলিলেন—"বাছের! ছেড়ে

আবুল ফজলের কণ্ঠস্বরে বাছের একটু দমিয়া গেল; কারণ আবুল ফজল যে বড় মিঞা সাহেবের জামাই হইবে, তাহাত সে অজ্ঞাত নহে। কিন্তু মাসুদ উচ্চ কণ্ঠে বলিল,—"আমাদের গাই, তবে আর কি স্বর্গে যাই! বাছরা, তুই নিয়ে আয় এই দিকে;—দশ কাঠা ভুঁইর ধান খাইছে; ও যারই গরু হোক; কিছুতেই ছাড়াছাড়ি নেই।"

মাসুদের আদেশে বাছের পুনরায় গাভিটীকে যথেচ্ছা প্রহার করিতে করিতে টানিয়া লইয়া চলিল। অবলা গরু হইলে কি হয়,—তাহারও ত রক্তমাংসের শরীর! দুর্ভাগ্য পশু প্রহার যাতনায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ ও ছুটাছুটি করণান্তর আরও অতিরিক্ত প্রহার খাইতে লাগিল।

আবুল ফজল মাসুদ ও বাছেরের ব্যবহার দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া দেলজানের ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখুন, মাসুদের ব্যবহার?"

দেলজানের ভ্রাতা বলিলেন—"বাপু আপনাদের দেশ, আপনারাই জানেন এ সব কি!"—এই বলিয়া স্বীয় ভাগিনেয়র হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল।

বাছের কিছুতেই প্রহার করিতে ক্ষান্ত হইতেছে না দেখিয়া আবুল ফজল বিচলিত হইলেন। পিতার প্রিয় গাভীর উপর অকারণ এইরূপ নিদারুণ প্রহার দাঁড়াইয়া দেখা তাঁহার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গাভীর দড়ি ধরিলেন। বাছের সসম্রমে ও সভয়ে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে মাসুদ দৌড়িয়া গাভীর নিকটবর্ত্তী হইয়া সরোষে বলিল,—"ফজলু, ভাল চাও ত গরু ছাইড়া দাও।"

আঃ ফজল। ছাড়ি বা না ছাড়ি, তাতে তোমার কি?

মাসুদ। না আমার কেন, তোমার? যা ভাব্‌ছ, তা হচ্ছে না;

আঃ ফজল। বেশ, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আর তোমার মত লোকের সাতে সে সব কথা বল্‌তেও ঘৃণা হয়।

মাসুদ। বটে! ওরে আমার বড় লোকের ই! তোমার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য যে বাড়ীর কাছে—

আঃ ফজল। (বাধা দিয়া) না হয় তোমাদের বাড়ীর কাছেই হ'ত; কিন্তু চৌদ্দপুরুষের খবরটা জানা আছে ত?

মাসুদ। (সক্রোধে) তোর সাতে সে সব কথার দরকার নাই; তুই গরু ছাড়; আমি খোয়াড়ে দিব।

আঃ ফজল। বেশ, লইয়া যাও; কিন্তু মারিতে পারিবে না।

মাসুদ। তোমার হুকুম মত? আমি মারিতে মারিতে লইয়া যাব,—বলিয়া বাছেরের হাতের লাঠি গ্রহণ করিল।

আঃ ফজল। তবে দিব না।

মাসুদ। আচ্ছা দেখা যাক্‌—বলিয়া সদর্পে অগ্রসর হইয়া সজোরে আবুল ফজলের হাত হইতে দড়ি কাড়িয়া লইয়া এবং গাভীটাকে দুই তিনটী বাড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

রোষে, ক্ষোভে, দুঃখে আবুল ফজলের চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইল। ক্রোধে তিনি থর্‌ থর্‌ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন।

এমন সময়ে—"মাসুদ! ভাল চাও ত গরু ছাইড়া দাও,"—বলিতে বলিতে এব্রাহিম নামক আফ্‌তাব-উদ্দিন মিঞার জনৈক প্রজা দৌড়িয়া আসিল; সে নিকটবর্ত্তী হইলে মাসুদ বলিল—"খবরদার এব্রাহিম! আমি গরু খোয়াড়ে দিব।"

এব্রাহিম। তুমি যেরূপ পাজিয়ানা কাণ্ড ক'রেছ, তা'তে তোমার কাছে কিছুতেই গরু ছাইড়া দিব না। বড় মিঞার ধান খেয়েছে,

মাসুদ। বটে! আমি গরু লইয়া যাইতেছি; তোমার সাধ্য থাকে ঠেকাও?

এব্রাহিম ভীত হইল না; সে দ্রুতগতি মাসুদের নিকটবর্ত্তী হইয়া দৃঢ়ভাবে গরুর দড়ি ধারণ করিল। মাসুদ তাহাকে প্রহার করিবার জন্য কঞ্চির লাঠি উপরে তুলিবামাত্র এব্রাহিম সজোরে তাহার হাত ধরিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে লাঠি কাড়িয়া লইল এবং তদ্দ্বারা তাহাকেই প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে আবুল ফজল বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হইয়া এব্রাহিমের হাতের লাঠি ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—"আচ্ছা উহাকে গরু লইয়া যাইতে দাও।"

কিন্তু মাসুদ আর গরুর দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না; সে আবুল ফজল ও এব্রাহিমকে বিবিধ গালাগালি দিতে দিতে ক্রোধে হন্ হন্ করিয়া বাড়ীর দিকে ধাবিত হইল। অবশ্য—"শীঘ্রই যে ইহার মজা দেখাইবে" যাইবার সময়ে এ আভাসটুকু দিতে সে ভুলিল না।

অগত্যা আবুল ফজল গাভী লইয়া ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চক্রান্তের পরিণতি।

সান্ধ্য উপাসনা সমাপনান্তে বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিন সাহেব বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে চাকর বাছের কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"মিঞা সাহেব! আমি আর চাকর থাকৃতি পারূব না।"

বড় মিঞা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"বল্না হয়েছে কি?"

বাছের। (ক্রন্দনের সহিত) হুজুর! ফজলু মিঞাগো গাই আমাগো একখান ভুইয়ের ধান একেবারে খাইয়া ফেলাইছে। তাই আমি সেই গরুটা ধইরা আন্‌তি ছিলাম। এর মধ্যি ফজলু মিঞা আইসা আমাকে ধাক্কা দিয়া ফেলাইয় দিল, আর গরু কাইড়া নিয়া যে সব গালিগালাজ করূল, তা আর কি বল্‌বো।

বড় মিঞা। (উত্তেজিতভাবে) হারামজাদা পাজি! তুই তাদের গরু ধরে আন্‌বার গেলি কেন?

বাছের। আমার দোষ কি? আমি সে গরু চিনি না। মাসুদ ভাই আমাকে ধ'রে আন্‌তি কইল, তাই ধ'রে আন্‌তে ছিলাম।

বড় মিঞা। ও! মাসুদ সেখানে ছিল? তা না হ'লে আর এরূপ কাণ্ড কে বাধাতে পারে!

এমন সময়ে মাসুদ ম্লান মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"চাচা জান! খোদার কছম; আমার কোন দোষ নাই; আমি ধান খাওয়া দেখে গরুটা ধ'রে আন্‌তে বল্‌ছি। বাছুরা গরু ধরেছে, আর ফজলু ছুটে এসে

ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়া গরু কেড়ে নিয়ে, যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি দিতে লাগ্‌ল।

বড়মিঞা। তুমি আবুল ফজলদের গরু ধ'রে আন্‌তে বল্‌লে কেন?

মাসুদ। আমি দূরে থেকে চিন্‌তে পারি নাই; চিন্‌লে বল্‌ব কেন?

বড়মিঞা। তা বেশ;—যখন আবুল ফজল গরু নিতে এল; তখন ছেড়ে দিলে না কেন?

মাসুদ। সে কোন কথা না ব'লেই গরু কেড়ে নিয়ে গালাগালি দিতে আরম্ভ কর্‌ল।

বড়মিঞা। তুমি কিছু না বল্‌লে আবুল ফজল গালাগালি কর্‌বে, আমার এ বিশ্বাসই হয় না; কারণ সে সেরকম ছেলেই নয়।

মাসুদ। আল্লার কিরে চাচাজান! যদি আমি মিথ্যা কথা বলি; আমি কেবল ব'লে ছিলাম যে, ফজলু! ধানও খাওয়াইয়া আবার উল্টা মারামারি কেন?—ফজলু অমনি আমাদের চৌদ্দপুরুষ তুলে গালাগালি দিতে দিতে বল্‌তে লাগল, "তোদের বাপ-দাদা আমাদের বাড়ী চাকর খেটে খেয়েছে।" তা ছাড়া "চাষা, লাঙ্গলা, ছোট লোক" এইরূপ যত ব'লেছে, তা আর কি কব; সেই জন্য আমি রাগ করে গরু ধর্‌তেই এব্রাহিম এক লাঠি নিয়া আমাকে মার্‌তে আসল; ফজলু আমাকে ঢিল ছুড়িয়া মার্‌তে মার্‌তে বল্‌ল, "হারামজাদ চাষা! তোদের সঙ্গে কুটুম্বিতার কথা হ'য়ে আমাদের জাত গিয়াছে।" আমার কথা বিশ্বাস না হয়, মামুজানকে (দেলজানের ভ্রাতাকে) ডাকিয়া শোনেন। যদি আমার কথা মিথ্যা হয়, আপনার পায়ের জুতা দিয়া আমাকে শও জুতা মারেন।

মাসুদের কথার কৌশলে আত্মসম্মানে আঘাত লাগা বশতঃ বড় মিঞা

করিলেন। বলা বাহুল্য, দেলজানের ভ্রাতা যতদূর সম্ভব মাসুদের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিল। সকল কথা শুনিতে শুনিতে ক্রোধে বড় মিঞার আপাদ-মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। নিদারুণ ক্রোধ ও অভিমানে তাঁহার বিবেক সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইল। তিনি "আচ্ছা কাল দেখা যাইবে" বলিয়া গম্ভীরভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীর মধ্যে গমন করিয়া বড় মিঞা সাহেব গম্ভীরভাবে একখানা ছোট টুলের উপর উপবেশন করিলেন। অপ্রত্যাশিত ক্রোধে তিনি তখনও জ্বলিতেছিলেন। ক্রোধবশে আত্মহারা হইয়া তিনি মিঞাবংশের বিনয়-নম্র ভদ্রস্বভাব ভুলিয়া গেলেন; আবুল ফজলের সর্ব্বজন বিমোহন মধুর চরিত্র ভুলিয়া গেলেন। তিনি কেবল ভাবিতে লাগিলেন, আমি দুধ দিয়া কাল সাপ পুষিতেছি; এখনই এই, বিষদাঁত না উঠিতেই ফণা ধরা, পক্ষ না উঠিতেই উড়লম্ফ!—এর পর একটু কিছু হইলে ত দেশে থাকাই দায় হইবে। কি সাহস! দুই পাতা ইংরাজি (তাও আমার খরচে) না পড়িতেই আমার বংশ তুলিতে সাহস করে! কে কবে তাহাদের বাড়ী কি করিয়াছে—বড় মিঞা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—সেই কথা তুলিতে সাহস করে! এখন যে ইচ্ছা করিলে তাহাদের বংশশুদ্ধ চাকর রাখিতে পারি; কিন্তু সেই কি না আমাকে বংশ তুলিয়া গালি দিতে সাহসী হয়? ও বংশ চিরকালই প্রখর; আমি আবার ঐ বংশে মেয়ের বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। ভাগ্যে এখনও বিবাহ হয় নাই; সময় থাকিতেই আত্মমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে; নচেৎ চিরকাল আমার মেয়েকে অবজ্ঞা করিয়া আমাকে জ্বালাতন করিত।

বড় মিঞা গম্ভীর ভাবে বসিয়া ভাবিতেছিলেন বটে, কিন্তু ক্রোধ ও অভিমানের প্রখর দীপ্তি তাঁহার চোখে মুখে স্পষ্ট ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। এমন সময়ে আজিজার মাতা বড় মিঞার নিকটবর্তী হইয়া আসীর

মুখের চেহারা দর্শনে চমকিত হইলেন! কোন গুরুতর কারণ না ঘটিলে যে বড় মিঞার মুখের ভাব এরূপ হয় নাই, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন। তিনি পূর্ব্বমুহূর্ত্তে বৈকালের ঘটনার কথা আভাসে একটু জানিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি উহা আদৌ বিশ্বাস বা উহার গুরুত্ব মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বড় মিঞার মুখের ভাবে এখন তিনি উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন —"কি হয়েছে?"

বড় মিঞা। আর কি হবে; শুন আবুল ফজলের কাণ্ড!—বলিয়া তিনি আদ্যোপান্ত ঘটনা স্ত্রীর নিকট ব্যক্ত করিলেন।

আজিজার মাতা ধীরভাবে বলিলেন,—"সব কথা না জানিয়া বিশ্বাস করা উচিত নহে। আর মাসুদের স্বভাব অতি বদ; সে সত্য মিথ্যা সবই বলিতে পারে।"

বড় মিঞা। মাসুদের কথা না হয় মিথ্যা হ'তে পারে; কিন্তু চাকর আবুল ফজলের নামে মিথ্যা বলিবে কেন?—বিশ্বাস সাহেব (দেল জাহানের ভাই) মিথ্যা বলিবে কেন?—সে ত এখনই তাদের বাড়ী হ'তে 'দাওত' *:খেয়ে আস্‌ল।

আজিজার মাতা। ব্যাপার কি, আমিও ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছি না। আবুল ফজলের যে ব্যবহারের কথা বলিলেন, তাহা ত আমার কিছুতেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ঐরূপ ব্যবহার করা তাহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশেষ তাহার সহিত মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সে কি এরূপ ব্যবহার করিতে পারে?

বড় মিঞা। তুমি উহাদিগকে ঠিক চিন নাই। উহারা এক সময়ে দেশ তাড়াইয়া খাইয়াছে। এখন দারিদ্রের জন্য উপরের চেহারা ভাল

হইলেও ভিতরের স্বভাব যায় নাই। ভাগ্যে মেয়ের বিবাহ হয় নাই, হইলে ত আমাকে চিরকাল জ্বলিয়া মরিতে হইত।

আজিজার মাতা। হঠাৎ একটা মতামত প্রকাশ করা ভাল নহে ; যাহা হয় ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে ঠিক করিবেন।

বড় মিঞা। ভাবা-চিন্তা আর কি? আমার বংশ তুলিয়া যখন গালি দিয়াছে, তখন কিছুতেই ওখানে মেয়ের বিবাহ দিব না।

আজিজার মাতা বুঝিলেন, এখন ইহার প্রতিবাদ করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। সুতরাং তিনি সহজভাবে বলিলেন—"মেয়ের বিবাহ দেওয়া না দেওয়া ত আপনারই ইচ্ছাধীন ; যেখানে ইচ্ছা হয় দিবেন ; আপনি ভাত খান।

বড় মিঞা বলিলেন—"আগে এশার নামাজ পড়িয়া লই।"

অনন্তর তিনি ওজু করিয়া নৈশ উপাসনা শেষ করিলেন, এবং আহারাদি করিয়া দেলজানের গৃহে গিয়া শয়ন করিলেন।

দেলজান শায়িতাবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ের বিবাহের কি কথা হইল।"

বড় মিঞা গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ওখানে মেয়ের বিবাহ দিব না।"

দেলজান। বড় বুবুজান যে ওইখানেই মেয়ের বিবাহ দিবেন।

বড় মিঞা। (কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত) আমার বাড়ীতে থাকিয়া তাহা হইবে না।

দেলজান আর অধিক কথা বলিতে সাহসী হইলেন না ; কিন্তু কাজ হাসিল হইয়াছে বুঝিয়া মনে মনে খুব আনন্দিত হইলেন।

আজিজা অলক্ষ্যে পিতামাতার কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তীব্র যাতনা অনুভূত হইতে লাগিল ; বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভাঙ্গিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিবাদের সূচনা।

ক্রোধের প্রাথমিক বেগ উপশম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বড় মিঞা সাহেবের চিন্তা একটু ভিন্ন পথে পরিচালিত হইল। তিনি মনে মনে আবুল ফজলের স্বভাব চরিত্র বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পক্ষে সহসা ঐরূপ অভদ্রোচিত ব্যবহার করা কদাচ সম্ভবপর নহে; তবে কি মাসুদের দুর্ব্ব্যহারে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে? গোলযোগ যে হইয়াছে, তাহাতে ত সন্দেহ নাই; নচেৎ বাড়ীর চাকর বা আমার শ্যালক মিথ্যা কথা বলিবে কেন? কিন্তু যে কারণই থাকুক, আবুল ফজলের কি এরূপ দুর্ব্ব্যহার করা সঙ্গত হইয়াছে? তাহাদের গাভীটী ধরিয়া আনিলেই বা কি হইত; পরক্ষণেই আমিই ত উহা ফিরাইয়া দিতাম। যাহাকে প্রাণসম কন্যা প্রদান করিতে প্রস্তুত ছিলাম, তাহাদের গরুতে কিম্বা তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বকই যদি আমার দুই এক খণ্ড জমির ধান নষ্ট করে ত সে আর বেশী কথা কি? অথচ ইহারই জন্য, আমার চাকরের হাত হইতে গরু কাড়িয়া লওয়া; আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে অপমান করা! তিনি আবার ভাবিলেন, হয়ত ইহারাই প্রথমে দুর্ব্ব্যহার করিয়াছে, নচেৎ কিছুতেই এরূপ ঘটনা ঘটিত না। যাহা হউক, ইহার অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক, দোষ কাহার?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বড় মিঞা সাহেব ঘুমাইয়া পড়িলেন; সারারাত্রি চিন্তা-চাঞ্চল্যজনিত দুঃস্বপ্নে অতিবাহিত করিলেন; রাত্রের মধ্যে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না, প্রাতঃ উপাসনার আহ্বান-ধ্বনি

তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াও করিল না। ক্রমে রাত্রি সম্পূর্ণ প্রভাত হইয়া গেল; রবি-রশ্মির অগ্রগামী উজ্জ্বল অরুণিমা পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিয়া তুলিল। এমন সময়ে আজিজার কণ্ঠোচ্চারিত—"বাবাজান! ফজরের * নামাজের ওক্ত প্রায় যায়; উঠিয়া নামাজ পড়ুন!"—শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন, এবং অবিলম্বে চক্ষু মুছিয়া খড়ম পায় দিয়া বদ্না † হাতে প্রাতঃ-উপাসনার জন্য বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়াই তিনি দেখিলেন যে, মাসুদ—তুফানউল্লা সরদার, রোস্তম খাঁ, দরবেশ মোল্লা, নাজেম শেখ ও দানেশ ফকির প্রভৃতি কয়েকজন 'মাতব্বর' ‡ গোছের লোকসহ 'হাজির' রহিয়াছে। তিনি এই সমস্ত লোক দেখিয়া এবং মাসুদের আয়োজন বুঝিয়া মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না। কারণ ইহারাই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার হাতের লাঠি এবং ইহাদের বলেই তিনি চতুর্দ্দিকে দিগ্বিজয়ী। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে একত্র হইয়া উপস্থিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, এমন সময়ে মাসুদ অগ্রসর হইয়া বলিল,—"চাচাজান! কালকার কথার কি হইবে? উহারাত সকলেই আসিয়াছে।"

বড় মিঞা। তুমি হঠাৎ সকলকে ডাকিয়া একত্র করিয়াছ কেন? আগে তাহাদের নিকট শুনা যাক্, কি উত্তর দেয়? পরে যাহা হয়, করা যাইবে।

রোস্তম খাঁ। বড় মিঞা সা'ব! এর আর শুনা-শুনি কি? বলেন ত এখনি সেই গাইটা ধ'রে নিয়ে আসি।

তুফান সরদার। সেই ভল; আগে গরুটা ধরে আনা যাক, দেখি এব্রাহিমের কোন্ বাবা ঠেকায়!

* ফজর—প্রভাত। † বদ্না—জলপাত্র। ‡ মাতব্বর—প্রধান।

দরবেশ মোল্লা। সত্যিই, ওদের বড় বৃদ্ধি হইয়াছে; একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার!

নাজেম সেখ। উই পোকায় পর জালায় মর্‌বার জন্যি।

উল্লিখিত কয়েক জনের কথা শেষ হইলে বুদ্ধিমান প্রৌঢ় দানেশ ফকির অগ্রসর হইয়া বলিল, "বড় মিঞা শা'ব, বাস্তবিকই এ কথাটা কেমন, যদি এব্রাহিমের মত লোক আপনার ভাইয়ের বেটার উপর হাত তুলে, তবে আর থাকে কি! এর একটা বিচার হওয়াই আবশ্যক।

তখন বড় মিঞা একটু ভাবিয়া বলিলেন, বিবাদ ফ্যাসাদের কোন দরকার নাই; দরবেশ, তুমি মামুদকে সঙ্গে লইয়া মিঞাপাড়া গিয়া আবুল ফজলের বাপকে ব'লে আইস যেন, তাদের কোন গরু বাছুর আমার জমিতে না আসে। আর ইব্রাহিমকে বলে দাও, যেন তার বংশাবলী কেউ আমার জমী-জায়গা না পাড়ায়; নচেৎ ভাল হইবে না। মাসুদের আশা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ না হইলেও আংশিক পূর্ণ হওয়ায় সে আনন্দিত মনে দানেশের সহিত মিঞাপাড়া গিয়া বড় মিঞার আদেশের উপর চারিগুণ রং ফলাইয়া স্বীয় বাহাদুরি প্রকাশ করিল। এব্রাহিমের বাড়ীর সম্মুখেই বড় মিঞার একখণ্ড জমি ছিল, এবং তাহার সংলগ্নে আবুল ফজলদের একখণ্ড জমি এব্রাহিম বহুদিন হইতে ভাগে চাষ করিয়া আসিতেছিল। সকলে জানিত, উহা এব্রাহিমেরই জমি। উক্ত উভয় জমির মধ্যস্থিত আলি দিয়াই এব্রাহিমের বাটী হইতে বাহির হইবার পথ। পথের পার্শ্বে অর্থাৎ আইলের সহিত সংলগ্নভাবে আবুল ফজলদের অংশে একটী কাঁঠাল গাছ ও একটী খেজুর গাছ ছিল। বলা বাহুল্য, গাছ দুইটীর ফল এব্রাহিমই ভোগ করিত। মাসুদ একখানি কোদালির সাহায্যে উক্ত আইলের পথটী সম্পূর্ণ উড়াইয়া দিল এবং গাছ দুইটী

আপনাদের জমির অন্তর্ভুক্ত করিয়া কাটাগাছের দৃঢ় বেড়া দিয়া এব্রাহিমের বাটীর বাহির হইবার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া দিল।

মাসুদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে এব্রাহিমের বাকি থাকিল না, কিন্তু সে নিজে কিছু না বলিয়া ভিন্ন পথে যথাযথ ঘটনা ব্যক্ত করিবার জন্য মিঞাবাড়ী গমন করিল। আফতাব-উদ্দিন মিঞা তখন বহির্ব্বাটীতে একখানি তক্তপোষের উপর বসিয়াছিলেন; পিতা পুত্রে কথাবার্ত্তা হইতেছিল; আবুলফজল একখানি টুলের উপর উপবিষ্ট ছিলেন।

আফতাব-উদ্দিন। আবুল ফজল! আমি ত কালই তোমাকে বলেছি যে, মাসুদ ইচ্ছা করিয়াই বিবাদ করিতে আসিয়াছিল। তুমি গাইটা কেড়ে এনে যে মন্দ কাজ করেছ, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু ঐরূপ করার দরুণ মাসুদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে। এই দেখ না, বড় মিঞা নিজেই দানেশের দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তাঁর জমিতে যেন আমাদের গরু-বাছুর না যায়।

আবুল ফজল। এ আর কি রকম বিচার! গরুটাকে বৃথা যে রকম মেরেছে, তাতে আজও তার গায় বাড়িগুলি ফুটে রয়েছে; মতির মামু নিজ চখে সে সব দেখে গিয়েছে; অথচ তিনি সে সব কিছু না জানিয়াই এই রকম ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলেন?

"এরূপ ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। কেবল মৌলবী এরফান আলি সাহেব এবং আজিজার মা'র গুণেই উহারা ইদানিং যা শান্ত-শিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এখন আবার যে শনির দল (বিশ্বাস বংশ) জুটিয়াছে, তা'তে আজিজার ম'ার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হওয়া দুষ্কর।"—আফতাব-উদ্দিন মিঞা এই কথার দ্বারা ইঙ্গিতে আজিজার সহিত আবুল ফজলের বিবাহের ভবিষ্যৎ অসম্ভবিতার আভাস প্রদান

করিলেন। আজিজার নামে আবুল ফজলের অন্তরও একটু দমিয়া গেল, কিন্তু তিনি বেশী কিছু না ভাবিয়াই সরল ভাবে পিতাকে বলিলেন, "আপনি একবার তাঁহাকে (বড় মিঞাকে) সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলুন ; যদি তিনি না শুনেন, তবে আর কি করা যায়! খোদা না করুন, যেন আমরা তাঁহার জমি-জমার প্রত্যাশী হই।"—কথা কয়টী অলক্ষ্যে আবুল ফজলের মুখ হইতে যৌবন-সুলভ তেজস্বিতার সহিত বাহির হইয়া গেল।

আফ্‌তাব-উদ্দিন। আমি বুঝাইতে চেষ্টার ত্রুটী করিব না ; কারণ তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া আমাদের এখন মন্দ ভিন্ন ভাল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

পিতার কথাগুলি আবুল ফজলের প্রাণে আবার আঘাত করিল। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নতমুখে চিন্তা করিতেই এব্রাহিম আসিয়া মাসুদের কথা বলিতে লাগিল। তাহার কথা শুনিতে শুনিতে আফতাব-উদ্দিন মিঞা একটু উত্তেজিত হইলেন এবং তখনই এক জোড়া চটীজুতা পায় দিয়া ছাতা হাতে মধ্যপাড়ায় গমন করিলেন। বড় মিঞার সহিত আফতাব-উদ্দিন মিঞার সাক্ষাৎ হইল। আফতাব-উদ্দিন আবুল ফজলের কথানুযায়ী পূর্ব্বদিনের প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিলেন ; বড় মিঞা মাসুদের ও স্বীয় শ্যালকের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তদ্রূপ বলিলেন। প্রকৃত ঘটনা মোকাবেলা করিবার জন্য দেলজানের ভ্রাতাকে ডাকা হইল ; কিন্তু সে ইহার আগে—বড় মিঞার অনুপস্থিতি কালে তাঁহাকে না বলিয়াই বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং ফল কিছুই হইল না ; কেহই কাহার কথা পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অগত্যা আফতাব-উদ্দিন মিঞা বহুদিনের সৌহৃদ্যের পরিবর্ত্তে অন্তরে এক অপ্রত্যাশিত অসদ্ভাবের বীজ রোপণ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন

তিনি বাটী আসিয়া দেখিলেন যে, এব্রাহিম—সলিমদ্দিন, নাসিরুদ্দিন ও ফৈজুদ্দিন প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন সহ উপস্থিত! ইহারা ক্ষমতায় বড় মিঞার দলের লোক অপেক্ষা অনেক দীন হইলেও সাহসে কিছু-মাত্রও হীন ছিল না। সুতরাং সকলেই একবাক্যে বড় মিঞার দলের বাড়াবাড়ির নিন্দা করিয়া মাসুদের নির্ম্মিত বেড়া ভাঙ্গিয়া পথ পরিষ্কার করিবার জন্য আফতাব-উদ্দিন মিঞার আদেশ প্রার্থনা করিলেন।

কিন্তু আফতাব-উদ্দিন মিঞা বিবাদ-ফাসাদ বাধাইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। তিনি বলিলেন,—"তোমরা বেড়ার পার্শ্ব দিয়া আমার জমিতে পথ করিয়া লও; আল্লাহ্‌তালাই অত্যাচারের বিচার করিবেন।"

আফ্‌তাব-উদ্দিন মিঞার গ্রাম্য-জীবনের এই দুর্লভ ধৈর্য্যের ফলে আপাততঃ বিবাদ আর বাড়িতে পারিল না; কিন্তু আজিজার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কায় আবুল ফজলের হৃদয় ব্যাকুল ও বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি ইহার প্রতিকার-আশায় অতি বিনয়ের সহিত মৌলবী রফি-উদ্দিনের নিকট একখানি পত্র লিখিলেন। মৌলবী সাহেব বড় মিঞাকে পত্র পড়িয়া শুনাইলেন এবং নিজেও আবুল ফজলের জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন;—বড় মিঞার মনও একটু নরম হইল। ইতিমধ্যে আজিজার মাতা নানারূপে আবুল ফজলদের নির্দ্দোষিতা বুঝাইয়া অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা স্বামীর মন আরও নরম করিলেন।

বড় মিঞা সাহেব বলিলেন যে, যদি আফতাব মিঞা এব্রাহিমের সমস্ত সম্পত্তি আমাকে কওলা করিয়া লিখিয়া দেন, তবে তাঁহাদের সহিত নিষ্পত্তি করিব এবং আবুল ফজলের সহিত মেয়ের বিবাহ দিব।

আজিজার মাতা। যদি মেয়ের বিবাহই দিতে চান, তবে আর তাঁহা-

বড় মিঞা কঠোর ভাবে বলিলেন,—"কিছুতেই না !. এব্রাহিমের মত লোক যখন আমার ভাইয়ের বেটার উপর হাত তুলিয়াছে, তখন উহাকে উচ্ছন্ন না করিয়া আমি কিছুতেই ক্ষান্ত হইব না।"

আজিজার মাতা বিষণ্ণ মুখে বলিলেন,—"তবে আমি আর কি বলিব ; আপনি যা ভাল বুঝেন, তাই করুন।

বড় মিঞার আদেশে মৌলবী সাহেব আফতাব-উদ্দিন মিঞার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাযথ বর্ণনা করিলেন। আফতাব-উদ্দিন মিঞাও পুত্রকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলেন।

আবুল ফজল মৌলবী সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তিনি যখন আমাদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিতে ইচ্ছুক ; তখন এব্রাহিমের উপর অত্যাচার করিয়া বৃথা আমাদিগকে মনকষ্ট দিয়া কি ফল! বিশেষতঃ এব্রাহিমের কোনই দোষ নাই ; সে আমাদিগের জন্যই যা দুই এক কথা বলিয়াছে। এমতাবস্থায় নিজেদের স্বার্থোদ্ধার জন্য তাহাকে বিপন্ন করা কদাচ মনুষ্যোচিত কার্য্য হইতে পারে না।

আফাতব-উদ্দিন মিঞা পুত্রের কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মৌলবী সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মৌলবী সাহেব ! আপনিই বলুন ; এব্রাহিম আমার প্রজা ; আমার পুত্রের সম্মান রক্ষার্থেই সে মাসুদের সহিত গোলমাল করিয়াছে। এক্ষণে আমাদের স্বার্থের জন্য এব্রাহিমের অনিষ্ট করা কি মানুষের কাজ ? আপনি বড় মিঞাকে বলিবেন, "তিনি যদি একান্তই প্রতিশোধ দিতে চান, এব্রাহিমের পরিবর্ত্তে আমরা গ্রহণে প্রস্তুত আছি।"

সঙ্গে সঙ্গে আবুল ফজলও বলিলেন,—"মৌলবী সাহেব ! তিনি ইচ্ছা করিলে আমাকে যদৃচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু আমাদের জন্য অন্যে বিপন্ন হইবে, ইহাতে আমরা আদৌ সম্মত হইতে পারি না ; বরং তিনি

এব্রাহিমের উপর অত্যাচার করিলে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে তাহার পক্ষাবলম্বনই করিতে হইবে।"

মৌলবী সাহেব এই সমস্ত কথা বড় মিঞাকে জ্ঞাপন করিলে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি উক্ত কথার দ্বারা ইহাই বুঝিলেন যে, আমি ইচ্ছা করিয়া উহাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপনে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও আমাকে হেলায় অপমান করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আজিজার মাতার সহিত কথা বলায় তিনি শান্ত—অথচ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "বুঝিলাম খোদাতালার ইচ্ছা আমাদের অসার আশার বিপরীত। আপনার প্রস্তাবে তাঁহারা সম্মত হইলে আমি মেয়ের বিবাহ দিয়া সুখী হইতে পারিতাম না।"

বড় মিঞা সাহেব স্ত্রীর এই মৃদু ভর্ৎসনায় অন্তরে ব্যথিত হইলেন এবং স্বীয় প্রস্তাবের অবৈধতাও কতকাংশে অনুভব করিলেন, কিন্তু নিজ সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না।

এই সমস্ত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে আবুল ফজল ও আজিজার হৃদয়াকাশে বিষাদ ও নিরাশার মেঘ ক্রমশঃ ঘনিভূত হইতে লাগিল। আবুল ফজল কয়েক দিন পরে হৃদয়ভরা বেদনা লইয়া স্কুলে চলিয়া গেলেন।

মাসুদের চক্রান্তে আফতাব-উদ্দিন মিঞা ও এব্রাহিমের পক্ষের লোক-দিগের গরু-বাছুর বৈধাবৈধ কারণে অবিরত 'খোয়াড়ে' প্রেরিত হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অন্তিম-শয়নে।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা ও বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিনের মধ্যে আন্তরিক অসদ্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয় দলস্থ সাধারণ লোকদিগের মধ্যেও শত্রুতা অস্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মাসুদের উত্তেজনায় বড় মিঞার দলের লোকেরা গায় পড়িয়া আফতাব-মিঞার দলের লোকের সহিত বিবাদ বাধাইবার জন্য অতিমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু আজিজার মাতার যত্নে ও বড়মিঞা সাহেবের সহানুভূতির অভাবে তাহারা সাহস করিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারিল না। বিশেষতঃ আফতাব-উদ্দিন মিঞা ও তাঁহার দলের লোকেরা যে কোন কারণেই হউক, বিবাদ-বিসম্বাদ এড়াইয়া যাইবার চেষ্টাই করিতেছিলেন, সুতরাং শত্রুতা স্পষ্ট আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছিল না।

এইরূপে আষাঢ় মাস গত হইল; শ্রাবণ মাসে বন্যায় প্রবল প্রবাহে বঙ্গভূমি ভাসিয়া গেল; প্রকৃতির অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল; কিন্তু উভয় দলের প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকদিগের আন্তরিক অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন হইল না।

আজিজার অন্তরাকাশ যে আশালোকে উদ্ভাসিত হইতেছিল, সহসা সে আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া তথায় নিরাশার প্রগাঢ় তমসা সঞ্চিত হইতে লাগিল; বালিকার মানসিক ভাবের প্রতিচ্ছায়া ক্রমশঃ তাঁহার মাধুরী-

মণ্ডিত মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাঁহার কৌতূহলভরা নয়নযুগলের উজ্জ্বল ও চঞ্চল দীপ্তি ক্রমশঃ শান্ত ও করুণ হইয়া আসিল।

প্রতিভাময়ী জননী কন্যার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া ব্যথিত হইলেন। অলক্ষ্যে সাময়িক উপদেশ ও আশা দানে তাঁহার অন্তর শান্ত ও প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় শ্রাবণ মাস গত হইল। ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে আজিজার মাতা সহসা একদিন জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে সামান্য জ্বর বলিয়া কেহই বড় গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু জ্বর প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; অষ্টম দিবসে জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। জ্বরের উত্তাপে আজিজার মাতা ভুল বলিতে লাগিলেন। আজিজা অশ্রুমুখে পিতার নিকট মাতার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। বড়মিঞার অন্তর চমকিয়া উঠিল! কারণ আজিজার মাতার স্বাস্থ্য এরূপ ভাল ছিল যে, বিবাহিত জীবনে বড়মিঞা তাঁহাকে অসুস্থ দেখিয়াছেন বলিয়া মনেও করিতে পারিলেন না।

অনন্তর বড়মিঞা তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, আজিজার মাতা জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। তিনি তখন স্ত্রীর নিকটে বসিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এক অপ্রত্যাশিত আশঙ্কায় তাঁহার দেহ-মন অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে বড়মিঞা স্বয়ং পুটিখোলা গিয়া সরকারী ডাক্তার লইয়া আসিলেন। ডাক্তার তিন চারি দিন ঔষধ প্রদান করিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। দ্বাদশ দিনে জ্বরের সহিত নানাবিধ দুঃসাধ্য লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ডাক্তার সন্দিহান হইয়া অন্য চিকিৎসক আনিবার পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে সেই দিনই আট টাকা দর্শনী ও পাল্কিভাড়া দিয়া পলাশপুরের প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ কবিরাজ

রামচরণ রায়কে লইয়া আসা হইল। তিনি আসিয়া যাবতীয় অবস্থা দর্শনান্তর ত্রিদোষযুক্ত সন্নিপাত জ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিলেন যে, চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ দিবস গত না হইলে আরোগ্য হওয়া সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না।

এই দিবস হইতে সকলেই রোগের গুরুত্ব অনুভব করিলেন; সকলের মুখেই এক অব্যক্ত আশঙ্কার ছায়া স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। আজিজা পূর্ব্ব হইতেই দেহপাত করিয়া অহর্নিশি জননীর সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিলেন; এই দিন হইতে বড়মিঞা স্বয়ং কন্যার সহিত জাগিয়া মহিয়সী স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বড়মিঞার দ্বিতীয়া স্ত্রী দেলজান পর্য্যন্ত এ সময়ে রোগীর সেবা-যত্ন করিতে ক্রটী করিলেন না।

চতুর্দ্দশ দিবসে আজিজার মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কবিরাজ নির্দ্ধারিত দর্শনী ও পাল্কিভাড়া লইয়া নিত্যই আসিতেছিলেন। তিনি এই দিবস হইতে কস্তুরী প্রভৃতি তীব্রতর ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধের গুণে আজিজার মাতা ষোড়শ দিবসে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। সপ্তদশ দিবসে তাঁহাকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ বলিয়া অনুমিত হইল। সকলে একটু আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু কবিরাজ যখন শেষ বেলায় বলিয়া গেলেন যে, আজ সকলে সাবধানে থাকিবেন; ঔষধ পত্রাদি রাত্রে বিশেষরূপ সতর্কতার সহিত সেবন করাইবেন; এবং তিনি ইহাও বলিয়া গেলেন যে, কাল আমার নিকট দুইপ্রহর পরে লোক পাঠাইবেন; লোক না পাঠাইলে আমি আসিব না।—এই কথায় সকলেই অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িল; শঙ্কাকুলিত চিত্তে সকলেই রোগীর পরিচর্য্যার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আজিজার মাতা ঘুমাইয়া পড়িলেন; বড়মিঞা এবং আজিজা রোগীর নিকট জাগিয়া রহিলেন। আজিজা মাতার চরণদ্বয়ে

পুরাতন ঘৃত গরম করিয়া মালিশ করিতে করিতে কয়েক দিনের অনিদ্রা-জনিত অবসাদে মাতার পায়ের নিকটেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। বড়মিঞা বসিয়া ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর; চারিদিকে গভীর তমসা; বিশ্ব-জগৎ গভীর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন! এমন সময়ে আজিজার মাতা সহসা—'আল্লা ও রসুলের' পবিত্র নামসংবলিত প্রথম কলেমা উচ্চারণ করিতে করিতে নয়ন উন্মুক্ত করিলেন। বড়মিঞা সযত্নে স্নেহময়ী স্ত্রীর মস্তক স্বীয় কোলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি?"

আজিজার মাতা শান্ত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার মুখে একটু পানি দিন্; একটা কথা বলিব।"

বড় মিঞা অবিলম্বে মুখে পানি দিলেন। পানি খাইয়া আজিজার মাতা সস্নেহে স্বামীর হাত বুকের উপর রাখিয়া করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"আমি এইমাত্র, বাবাজানকে স্বপ্নে দেখিয়াছি; তিনি আমাকে ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন। আমার বিশ্বাস, আমার ইহকালের সম্বন্ধ ফুরাইয়া আসিয়াছে; তাই আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি আর আপনার 'খেদমত' * করিতে পারিব না! অতএব আমার যাবতীয় 'গোনাখাতা' † মাফ করুন এবং যাহাতে 'বেহেস্ত' পাই, তন্নিমিত্ত 'দোয়া' ‡ করুন।

বড় মিঞা কাতর ভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাকেও কি আবার বেহেস্ত পাওয়ার জন্য 'দোয়া' করিতে হইবে। তোমার কি অপরাধ আছে যে, তাহা ক্ষমা করিব?"

আজিজার মাতা। স্ত্রীলোক পদে পদে স্বামীর নিকট অপরাধিনী। স্বামী-সেবাই স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ও পুণ্য কার্য্য। পৃথিবীতে

এমন স্ত্রীলোক কেউ নাই যে, স্বামীর সম্পূর্ণ প্রাপ্য পরিশোধ করিয়াছি,—এমন কথা বলিতে পারে। যে মহিমা বিবির ন্যায় জগতে কোন রমণীই পতিসেবা করিতে পারেন নাই, তিনিও "স্বামীর এক বিন্দু প্রাপ্যও পরিশোধ করিতে পারি নাই" বলিয়া পরিতাপ করিয়া গিয়াছেন। "যে রমণী যতই পুণ্যকার্য্য করুক, মৃত্যকালে যদি স্বামী সন্তুষ্ট না থাকেন, কিংবা স্বামী ক্ষমা না করেন, সে রমণী কিছুতেই "বেহেস্তে" যাইতে পারিবে না *।"

তখন বড় মিঞা এক অব্যক্ত বেদনাব্যথিত অন্তঃকরণে স্ত্রীকে ক্ষমা করিয়া স্ত্রীর নিকট ক্ষমা গ্রহণ করিলেন। প্রকৃতি কাতরভাবে এই দৃশ্য দর্শন করিয়া অশ্রুপাত করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই আজিজার মাতা আজিজাকে ডাকিলেন। পিতার আহ্বানে আজিজা তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাতার :মুখের কাছে আসিয়া বসিলেন। স্ত্রীর অনুরোধে বড় মিঞা নিজ বিছানায় যাইয়া শুইয়া গড়াইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মা মেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আজিজা, মা! একটা কথা বলিব, মন দিয়া শুন।"

আজিজার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; তিনি ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "কি মা?"

মা। আচ্ছা এ পৃথিবীতে সকলেরই কি মা-বাপ চিরদিন বাঁচিয়া থাকে?

মেয়ে। অসময়ে যাদের মা-বাপ মরে, তারা বড়ই অভাগা! কিন্তু একথা কেন মা?

মা। আজিজা! আমি এই মাত্র তোমার নানাজানকে স্বপ্নে দেখিয়াছি; বোধ হয় এ যাত্রা আমি বাঁচিব না। আমি মরিলে তুমি কি করিবে?"

---

* পবিত্র হাদিস।

আজিজার অন্তর আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিল। তিনি অশ্রুপ্লাবিত নয়নে ও রুদ্ধকণ্ঠে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"মা! আমি তা হ'লে বাঁচিব না।"

তখন মাতা অতি স্নেহের সহিত মেয়ের কণ্ঠে ও কপালে চুম্বন প্রদান করিয়া বিবিধ অমূল্য উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ সরল উপদেশে আজিজার হৃদয়-কলি পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি মুগ্ধকর্ণে মাতার অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যখন উপদেশ-প্রভাবে আজিজা অনেকটা প্রকৃতিস্থা হইলেন, তখন মাতা অলক্ষ্যে কন্যার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;—"মা! আল্লা যাহা করেন, মানবের কল্যাণের জন্যই করেন। আমরা অনেক সময়ে না বুঝিয়া বৃথা পরিতপ্ত হই ও দুঃখ পাই।"

আজিজা। মানুষ সুখের ঘটনায় সুখী এবং দুখের ঘটনায় দুঃখী হয়, ইহা ত স্বাভাবিক; যদি ইহা নিরর্থক ও বৃথা হয়, তবে আমরা সুখ বা দুঃখ অনুভব করি কেন?

মা। সুখ-দুঃখ মানসিক প্রবৃত্তির স্ফুরণ মাত্র। প্রবৃত্তি যাহার যত আয়ত্তাধীন, সুখ-দুঃখ-বোধ তাহার তত কম। এই বোধশক্তি আবার দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। অনেকে শারীরিক খুব পরিশ্রম করিতে পারে, কিন্তু মানসিক একটুও চিন্তা করিতে পারে না। অনেকে আবার ইহার বিপরীত। কেহ কেহ সামান্য একটু দুঃখে বা কষ্টে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে, অনেকে আবার তাহা গ্রাহ্যও করে না। ফলকথা প্রবৃত্তি যে যতদূর আয়ত্ত করিবে, দুঃখ কষ্টের হাত হইতে সে ততদূর মুক্ত হইবে। ইহার জলন্ত প্রমাণ মনসুর। তিনি দৈহিক ও মানসিক প্রবৃত্তি এমন ভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, মানসিক হিসাবে তিনি ত কিছু গ্রাহ্যই করেন নাই, বরং রাজাদেশে যখন তাঁহার

হস্ত-পদসমূহ কর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন তিনি বিন্দুমাত্রও কাতরতা প্রকাশ না করিয়া জগতে প্রবৃত্তি আয়ত্ত করার জ্বলন্ত আলেখ্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

আজিজা। মানসিক এবং দৈহিক ভাবের কি কোন পার্থক্য আছে? উভয় কি পৃথক্?

মা। শুধু পার্থক্য নহে; উভয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন জিনিস; উভয়ের গতি উভয়ের প্রকৃতি এবং উভয়ের কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র। এই পার্থক্য অনুভব করিতে না পারিয়া—এবং অনেকে এই উভয়কে অভিন্ন মনে করিয়া সংসারে মহা বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিয়া থাকে। বাবাজানের মুখে শুনিয়াছি, পৃথিবীর অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পর্য্যন্ত এই উভয় বস্তুকে জোর করিয়া এক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ এই উভয়ের পার্থক্য ও কর্ত্তব্য এমন সুন্দর ভাবে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে, ঐ দুই বস্তুর সংঘর্ষণ দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার আশঙ্কা মোসলেম-সমাজে একেবারেই নাই।

কন্যা। উহা কিরূপ, ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

মা। এই যেমন পিতা-পুত্র বা মাতা-কন্যার সম্বন্ধ। পিতা বা মাতার ধর্ম্ম পুত্র বা কন্যার মানস-ধর্ম্মের প্রতিকূল হইতে পারে। এস্থলে অনেক শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে, মাতা-পিতার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া তাঁহাদের যাবতীয় আদেশ ও ধর্ম্মের অনুসরণ কর? ইহার ফলে আমরা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে পিতৃ-আদেশে মাতৃহত্যার দৃষ্টান্ত পর্য্যন্ত দেখিতে পাই; কিন্তু ইহা স্বভাব ও মানস-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। ফলতঃ আত্মা যে ভাবের প্রতিকূল, সেখানে জোর করিয়া আত্মোৎসর্গ করা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। এ জন্যই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য পালন এবং সন্তানের আত্মার কার্য্য সাধন জন্য

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিধান রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যেমন বিবাহ। কোন কোন ধর্ম্মে বিবাহ মাত্রকেই অন্ধভাবে নরনারীর আত্মার সংমিলন বলিয়া বিবৃত করা হইয়াছে; এবং আত্মার সংমিলনের দোহাই দিয়া বিধবা রমণীর পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ করা হইয়াছে; অথচ ঐ ধর্ম্মেই আবার স্ত্রীহীন পুরুষের পুনঃ দ্বারপরিগ্রহণের বিধান রহিয়াছে! বস্তুতঃ এইরূপ অস্বাভাবিক আত্মার সংমিলনের কথা যে সম্পূর্ণ অর্থশূন্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যেহেতু দাম্ভিকা স্ত্রীর সহিত বিনয়ী স্বামীর, কঠোর-হৃদয় স্বামীর সহিত স্নেহশীলা স্ত্রীর, কিংবা আস্তিক স্ত্রীর সহিত নাস্তিক স্বামীর আত্মার মিলন সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইজন্যই ইস্‌লাম বিবাহ সম্বন্ধকে পবিত্র দৈহিক সম্বন্ধে পরিণত করিয়া যতদূর সম্ভব উহার পবিত্রতা ও পার্থিব মর্য্যাদা রক্ষা করিবার বিধান প্রদান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আত্মাকে মানসধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য অতি সঙ্গত ভাবে মুক্ত রাখা হইয়াছে।

কন্যা। আত্মিক ও দৈহিক সম্বন্ধ কি একাধারে সংযোজিত হইতে পারে না?

মা। পারে, কিন্তু পার্থিব জীবনে তাহা সচরাচর প্রায়ই ঘটে না। বরং মানবের সংসার-জীবনে উহার বিপরীত দৃষ্টান্তই অধিক পরিদৃষ্ট হয়। দৈহিক প্রগাঢ়তর সম্বন্ধযুক্ত নর-নারীর মধ্যেও আত্মার গতি প্রায়ই বিভিন্নমুখী হইয়া থাকে। আবার মানসধর্ম্ম প্রতিপালনস্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া আত্মার গতি যে দিকে ধাবিত হয়, নরনারীর দৈহিক গতি সেই দিকে পরিচালন করিবার কালে সংসার-জীবনের দৈহিক সম্বন্ধ অধিকাংশ স্থলেই বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। যদি এরূপ না হইয়া প্রত্যেক দৈহিক সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির মধ্যেই পরস্পর আত্মার সম্মিলন সাধিত হইত, তাহা হইলে ত এই নশ্বর সংসারেই অক্ষয় স্বর্গের অনন্ত মাধুরী ও শোভা

সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু পার্থিব জীবনে সেরূপ মণিকাঞ্চন সংযোগ একান্তই দুর্লভ। তবে ইহার একমাত্র উপায় এই যে, যদি প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া দৈহিক সম্ভোগবাসনা পরিহার করা যায়, তবে আত্মার সম্বন্ধ স্থলে দেহের সত্তা এবং দেহের সম্বন্ধের স্থলে আত্মার সত্তা বিনিময় করা চলে; কিন্তু ইহা সাধনার অধীন।

কন্যা মুগ্ধহৃদয়ে স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া জননীর অমূল্য উপদেশ সুধা পান করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে জননী জল পান করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করায় আজিজার মোহ ভাঙ্গিল। তিনি তাড়াতাড়ি মাতার মুখে পানি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! তোমার এখন কেমন বোধ হইতেছে?"

জননী। মা! আমি বড়ই অস্থিরতা অনুভব করিতেছি। তুমি আমাকে একটু কোরান শরিফ পড়িয়া শুনাও।

আজিজা মাতৃবাক্যে উঠিয়া গিয়া অজু করিলেন এবং কোরান শরিফ নামাইয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অতি ধীর ও মধুর স্বরে পড়িতে লাগিলেন। আজিজার মাতা অতৃপ্ত হৃদয়ে সেই শোকতাপনাশক পবিত্র ঐশীবাণী শুনিতে শুনিতে যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রণার সহিত স্বীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। উষার অঞ্চল ভেদ করিয়া প্রভাতের অরুণ-দীপ্তি পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিয়া তুলিল। আজিজা উঠিয়া গিয়া পুনরায় অজু করিয়া ফজরের নামাজ পড়িতে লাগিলেন। নামাজ শেষ করিয়া আজিজা অশ্রুপূর্ণনয়নে অতি করুণ ভাষায় মাতার আরোগ্য কামনা করিয়া আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় পিতার আহ্বানে আজিজা তাড়াতাড়ি প্রার্থনা শেষ করিয়া

চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং বুকের মধ্যে একরূপ গড়্ গড়্ শব্দ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

আজিজা নিকটে যাওয়া মাত্র জননী কন্যার হাত ধরিয়া স্বামীর হাতে দিলেন এবং ভগ্নস্বরে বলিলেন, "আজিজা ও মতীকে খোদার কাছে সমর্পণ করিয়া গেলাম।" শিশু মতীয়র রহমানকে তিনি ইতিপূর্ব্বেই কোলে লইয়া বড় মিঞার কোলে দিয়াছিলেন।

আজিজার মাতা আর কথা বলিতে পারিলেন না। নিদারুণ গড়্ গড়্ শব্দে তাহার কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সেদিন শুক্রবার; বেলা অনুমান দেড় প্রহরের সময়ে অষ্টাদশ দিন নিদারুণ সন্নিপাতিক জ্বর ভোগের পর, ভাগ্যবতী আজিজাজননী স্বামী, সন্তান ও পরিজনগণের অশ্রুস্নাত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার পবিত্র আত্মা পিতার অমর আত্মার কাছে চলিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিবাদ বাধিল।

আজিজার মাতার মৃত্যুর পর চারি মাস গত হইয়া গিয়াছে। এই চারি মাসে প্রকৃতির কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অবনীর বক্ষের উপর বর্ষার প্লাবন বহিয়া গিয়াছে; তাহার পরেই প্রকৃতি আবার কয়দিনের জন্য শরতের সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া সে স্বপ্ন ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতেই নিদারুণ হেমন্তের নিপীড়নে সারারাত্রি অশ্রুপাত করিয়া কাটাইয়াছে, এবং সেই অশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গেই নির্দ্দয় শীতের নিষ্পেষণ! বসুধার সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত; কোথাও হর্ষের লেশমাত্রও নাই।

প্রকৃতির অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিনের সংসারেরও কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। চিরপরিবর্ত্তনশীল ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে আজিজার মাতার পুণ্য-মন্দিরে এখন দেলজান অধিষ্ঠাত্রী। যে পুণ্যাসন-অধিষ্ঠিতা দেবীর নিকট আপামর সকলেই সম্ভ্রম বিনত থাকিত, আজ সেই আসনঅধিষ্ঠিতা অধিনেত্রীর নিকট সকলে ভয় সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থিত। শান্তি ও শৃঙ্খলার পুত-রাজ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশে চেষ্টিত।

আজিজার মাতার মৃত্যুতে গ্রামবাসিগণ মনে এরূপ আঘাত পাইয়াছিল যে, কিছু দিন পর্য্যন্ত শত্রু মিত্র সকলেই শোকসন্তপ্ত ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। গ্রাম কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত নীরব নিস্তব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এ ভাব স্থায়ী হইতে পারিল না। মাসুদ ও তুফানউল্লা প্রভৃতি

বড় মিঞার দলের দুর্দ্দান্ত লোকদিগের প্ররোচনায় পূর্ব্ববিবাদ ক্রমশঃ জ্বলিয়া উঠিল ; এবং এইরূপ নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তিন চারি মাস গত হইল। পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে পবিত্র রমজানের * চাঁদ উঠিয়া বিশ্বজগতে এক মঙ্গলময় প্রেরণার প্রবাহ বহিয়া গেল, সে শুভ প্রেরণার অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে মোসলেম-জগতের সুষুপ্ত কমনীয় পূত বৃত্তিসমূহ জাগিয়া উঠিল। যাবতীয় মোসলেম-সন্তান শোক-তাপ ও বিবাদবিসম্বাদ বিস্মৃত হইয়া এক মাসের জন্য সাধ্য পক্ষে পুণ্যানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। আলিনগরের মোসলেম অধিবাসিগণও পবিত্র রমজান অনুষ্ঠানে বিরত রহিল না।

আজিজা মাতার মৃত্যুতে প্রথমে বড়ই শোকাতুরা হইয়া পড়িয়াছিলেন ; বালিকা অহর্নিশি অশ্রুপাত করিয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার এই বিষাদাচ্ছন্ন ভাব ও পরিম্লান মুখচ্ছবি পিতার সহ্য হইল না। তিনি দিবা-নিশি বালিকার মন শান্ত করিতে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। পিতার আন্তরিক আগ্রহে এবং বালক মতিয়র রহমানের আবদার-উত্তেজনায় শীঘ্রই আজিজার শোক অনেকটা অপনোদিত হইল। তখন তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, সংসারে ক্রমেই বিশৃঙ্খলা ঘটিবার উপক্রম হইতেছে। ক্ষুদ্রপ্রাণী দেলজান বর্ত্তমান অবস্থায় গর্ব্বান্ধ হইয়া কোন দিকেই তাল সামলাইতে পারিতেছে না ; লাভের মধ্যে নিজে সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া মরিতেছে এবং অন্যান্য সকলকেও উত্ত্যক্ত ও জ্বালাতন করিয়া মারিতেছে। তদ্দর্শনে আজিজা ধীরভাবে পরলোকগতা জননীর শৃঙ্খলা-অনুযায়ী সকলের আহারাদি প্রস্তুত ও আবশ্যক সাংসারিক কার্য্যগুলি তাঁহার অন্যতমা বিমাতার সাহায্যে

---

* রমজান—ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বিগণের অবশ্য পালনীয় একমাসব্যাপী উপবাস ব্রতকে রমজান কহে।

ক্রমশঃ নিজ আয়ত্তে আনয়ন করিলেন। ফলতঃ আজিজার মাতার আসন বাহ্যিক ভাবে দেলজান অধিকার করিলেও কন্যাই মাতার আভ্যন্তরীন সাম্রাজ্যে আধিপত্য করিতে লাগিলেন। দেলজান উপরে উপরে কর্তৃত্ব করিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন; কারণ আজিজার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার সাহস ও ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। দেলজান ইহা বেশ বুঝিতেন যে, আজিজার দ্বারা যাহা হইতেছে, তাহার দ্বারা উহা হওয়া কদাপি সম্ভব নহে। তথাপি আজিজা কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে দেলজানের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতে লাগিলেন; শিশু মতিয়র রহমান আজিজা ভিন্ন আর কিছুই জানিত না।

ক্রমশঃ রমজান আসিল। আজিজা সমস্ত ভুলিয়া পরলোকগতা জননীর আত্মার কল্যাণ কামনার্থে পিতার দ্বারা যথাসম্ভব দান, ধ্যান ও দরিদ্র-ভোজনাদি পুণ্যানুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

শেষ রমজানে আবুল ফজল একত্রে বড়দিন ও ঈদের ছুটি পাইয়া বাড়ী আসিলেন। এই মাসেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদানার্থে মনোনয়ন পরীক্ষায় অতি সুন্দর ফল প্রাপ্ত হইয়া মনোনীত হইয়াছেন। আবুল ফজলের পড়ার খরচ বিগত কয়েক মাস হইতে তাঁহার পিতাই প্রদান করিয়া আসিতেছেন। আজিজার মাতার অনুরোধ রক্ষার্থে বড় মিঞা আবুল ফজলের পড়ার খরচ দিতে সম্মত থাকিলেও বিবিধ গোলযোগ ও মতান্তর বশতঃ আফতাব-উদ্দিন মিঞা তাহা গ্রহণ করেন নাই। তৎপরে আজিজার মাতার মৃত্যুর পর এ সম্বন্ধে আর কোন কথাও উঠে নাই।

আবুল ফজল যখন আজিজার মাতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অন্তরে এমন যাতনা অনুভব করিয়াছিলেন, যেন সেই মুহূর্তে যাবতীয় আশা ভরসার সহিত তাঁহার সমস্ত হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া গেল।

তিনি মাতৃহারা বালকের ন্যায় কয়েকদিন পর্য্যন্ত যখন তখন ক্রন্দন ও অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

আবুল ফজল বাটী আসিয়া পর দিবস মধ্যপাড়ায় গমন পূর্ব্বক অশ্রুমুখে আজিজার মাতার সমাধি 'জেয়ারত' * করিলেন। বড় মিঞা ধীর ভাবে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন মাত্র, কিন্তু তিনি এই অল্প কয়েক দিনে এমন হৃদয়হারা হইয়াছিলেন যে, আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও তাঁহাকে বাটীর মধ্যে আহ্বান করিতে পারিলেন না। আজিজা অলক্ষ্যে সকলি দেখিলেন; বালিকা মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আবুল ফজল অবিলম্বে বাটী ফিরিয়া আসিলেন; আসিবার সময়ে পথে মাসুদ গায় পড়িয়া তৎপ্রতি এমন দুই একটী বাক্য প্রয়োগ করিল যে, আবুল ফজল ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া ভবিষ্যতে সে পাড়ায় যাওয়ার আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলেন।

রমজানের আর দুই দিন মাত্র বাকি, জগৎময় মহোৎসব "ঈদল ফেতরে"র আগমনজনিত শুভ সাঁড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই সাধ্য পক্ষে সেই মহোৎসবের আয়োজনে ব্যাপৃত। কেহ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসিগণকে ভোজ্য প্রদান করিবে। কেহ তাঁহার কঠোর শ্রমার্জ্জিত ও সারা বৎসরের সঞ্চিত দুইটী টাকা ব্যয় করিয়া নিজ আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াইবে; কেহ বা কত যত্নে পুঞ্জিকৃত এক সের চাউল জ্বাল দিয়া আপন স্নেহভাজনের সম্মুখে প্রদান পূর্ব্বক হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবে। কেহ সহস্র সহস্র টাকার বস্ত্রালঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে, স্ত্রী-পরিবারে পরিধান করিবে; কেহ নিজ পুরাতন বস্ত্রগুলি ধুইয়া যত্ন করিয়া রাখিতেছে; উৎসব সকলের নিকটেই সমান।

---

* জেয়ারত—ভক্তিভাবে দর্শন।

† ঈদ—উৎসব; ফেতর—দান-বিশেষ; ঈদল-ফেতর—দানোৎসব।

আটাসে রমজানের বৈকাল বেলা মাসুদ হঠাৎ মিঞা-পাড়ায় উপনীত হইল। এব্রাহিমের বাড়ীর সম্মুখের যে জমীতে গোলমাল করিয়া মাসুদ ইতিপূর্ব্বে বেড়া দিয়াছিল, সেই জমীতে মটর কলাই বুনান হইয়াছিল। মাঘ মাস; কলাইগাছগুলি ফলে জড়াইয়া পড়িয়াছে। একটী দশ বর্ষীয় বালক ক্ষেতের মধ্যে বসিয়া 'সীম' * তুলিতেছে। মাসুদ দ্রুতগতি ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বালকের হাত ধরিল, এবং "হারামজাদা, তোর বাবার জমির সীম তুলিতেছিস্"—বলিয়া বালকের দুই গণ্ডে দুইটী নির্দ্দয় চপেটাঘাত করিল। যন্ত্রণায় বালক চীৎকার করিয়া উঠিল। বালকের চীৎকারে এব্রাহিমের বহির্ব্বাটীতে একটী স্ত্রীলোক বাহির হইল, এবং স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া গভীর আকুলতার সহিত উন্মাদিনীর মত বালকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বালক এব্রাহিমের পুত্র। মাসুদ যখন তাহাকে প্রহার করে, তখন এব্রাহিম আবুল ফজলদের বাটী হইতে একখানা বোম্বাই ইক্ষু চাহিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী আসিতেছিল। সারাদিন রোজার উপবাসজনিত অস্থিরতা, তাহার উপর মাসুদের দুর্ব্ব্যবহার দর্শনে তাহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া গেল; সে অতি দ্রুতবেগে উক্ত ক্ষেতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এব্রাহিম যখন ক্ষেতের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তখন বালক তাহার মাতার নিকট গমন করিয়া গণ্ড দেখাইয়া কাঁদিতেছে, এবং মাসুদ সগর্ব্বে রণজয়ী বীরের ন্যায় এদিক ওদিক দেখিতেছে। এমন সময়ে সহসা এব্রাহিম আড় চক্ষে পুত্রের অবস্থা দর্শন পূর্ব্বক মাসুদের দিকে অগ্রসর হইয়া পরুষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মাসুদ! ও তোমার কি করিয়াছে?" মাসুদ সহসা এব্রাহিমের কণ্ঠস্বরে ও তাহার চেহারা দর্শনে একটু ভীত হইল; কিন্তু "আমি বড় মিঞার ভাই পো"—এই

সাহসে বুক ফুলাইয়া বলিল, "দেখ তোমার ছাওয়াল * কতখানি ভুঁইর কলাই নষ্ট করেছে।"

মামুদ কথা বলিয়া শেষ করিতে না করিতেই এব্রাহিম উন্মত্তের মত অগ্রসর হইয়া—"তোর গুষ্টির মাথা করেছে ; শুওর, তোরে আজ জাহান্নামে † দিব"—বলিয়া হস্তস্থিত ইক্ষুর দ্বারা মামুদের কটি ও জানুতে ভীষণ ভাবে দুই তিন বার প্রহার করিল। ইক্ষুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল ; মামুদও চীৎকার করিয়া দৌড়াইতে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল ; এব্রাহিম ক্রুদ্ধ দৈত্যের ন্যায় অগ্রসর হইয়া মামুদের পিঠে, বুকে নির্দ্দয় ভাবে পদাঘাত করিতে লাগিল।

পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহ হইতে দুই একজন লোক দৌড়াইয়া আসিয়া এব্রাহিমকে ঠেলিয়া মামুদকে উঠাইল। এব্রাহিম ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় তখনও গর্জ্জন করিতেছিল ; কিন্তু আর মারামারি করিতে না পারিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া চলিল। এব্রাহিমের স্ত্রী স্বামীর ক্রোধ দর্শনে নীরবে আপন কাজে নিরত হইল। বালক কান্না পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইল।

উল্লিখিত ঘটনার পরদিবস প্রাতঃকালে মামুদ, তুফানউল্লা প্রভৃতি বড় মিঞার পক্ষীয় প্রায় পঁচিশ তিরিশ জন লোক একত্রিত হইয়া মিঞা-পাড়া আগমনপূর্ব্বক এব্রাহিমের বংশাবলী উল্লেখ করিয়া বিবিধ অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। এব্রাহিমের একখণ্ড জমীর রাই সরিষা সম্পূর্ণ পদদলিত ও বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ চাষ করা জমি হইতে ঢিল তুলিয়া এব্রাহিমের বাড়ীর মধ্যে ঢিল ছুড়িবার জন্যও অগ্রসর হইল ; কিন্তু দরবেশ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ধীর বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনিচ্ছার জন্য অগত্যা তাহাতে নিরস্ত হইতে হইল।

* ছাওয়াল—ছেলে। † জাহান্নাম—[illegible]

এব্রাহিম পূর্ব্বদিবস ক্রোধ উপসম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিল। প্রভাতে লোক জন দেখিয়া সে দ্রুতগতি আত্ম-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। কয়েকজন পাড়া-পড়শীকে ডাকিয়া আনিয়া বাড়ীর মধ্যে জমা করিল। দুই এক জনকে আফতাব-উদ্দিন মিঞার নিকট সংবাদ দেওয়ার জন্য মিঞা বাড়ী পাঠান হইল, এবং সে নিজে এক সাংঘাতিক শূকর মারা বর্ষা লইয়া বাড়ীর সদর পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্যান্য সকলের হাতে দা, কাচি, কোচ, সড়কী ও লাঠি দেওয়া হইল।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা বাড়ী ছিলেন না; সংবাদবাহকদ্বয় শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল ; তাহাদের সঙ্গে আবুল ফজল আসিলেন এবং বড় মিঞার লোক সকলের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিবাদ ফাসাদ হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন,—"বাবজান বাড়ী নাই ; তিনি বাড়ী আসুন ; এব্রাহিমের দোষ হইয়া থাকিলে বিচার করা যাইবে।"

আবুল ফজলের কথায় এবং প্রধানতঃ এব্রাহিমের দলের লোক সাহস করিয়া বাড়ীর বাহির না হওয়ায় বড় মিঞার লোক সমস্ত ফিরিয়া চলিল। মাসুদ আবুল ফজলকে লক্ষ্য করিয়া দুই চারিটী ইতর ভাষা প্রয়োগ করিতে ভুলিল না।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা বেলা দুই প্রহর বাদে বাড়ী আসিলেন ; তিনি সমস্ত ঘটনা শুনিয়া এব্রাহিমকে নির্দ্দোষ জানিয়াও তিরস্কার করিলেন, এবং পাড়ার সকলকে ডাকিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ সে দিবস গত হইল ; সান্ধ্য আকাশের অরুণিমা-রঞ্জিত ললাটে মঙ্গলময় ঈদের শুভ চিহ্নস্বরূপ দ্বিতীয়ার চন্দ্র পরিদৃশ্যমান হইয়া বিশ্ববাসীকে এক স্বর্গীয় আনন্দময় ও পুণ্যময় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আগুন জ্বলিল।

আজ মঙ্গলময় ঈদ! বিশ্বজগতে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে হর্ষের অপূর্ব্ব স্পন্দন পরিলক্ষিত হইতেছে; শীত-সুপ্ত অবনী ঈদ-বাসরের নবারুণ-রাগস্পর্শে আনন্দে হাস্য করিতেছে!

আজ মোস্লেম-জগতে মহামিলনের অতলনীয় বাসর। যাবতীয় মোসলেম-সন্তান শোকতাপ বিস্মৃত হইয়া, দ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া গিয়া, বাদ-বিসম্বাদ বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পর মিলনাশায় সমুৎসুক! আজ তাঁহাদের এক মাসব্যাপী উপবাসক্লিষ্ট দেহে নববলের সঞ্চার হইয়াছে; অপ্রস্ফুটিত হৃদয়-কলি পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। আজ তাঁহাদের সাধনা সিদ্ধি হইবে; আজ এই পবিত্র দান-ভোজন উৎসবের আনুকুল্যে তাঁহাদের যাবতীয় কঠোর সাধনা, ঐকান্তিক আরাধনা ও উপবাস বিধাতার নিকট স্বীকৃত হইবে।

ঈদ-রজনী প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জগতের কোটী কোটী মোসলমান, পবিত্র মনে স্নান ও ওজু * সমাপন করিলেন। অনন্তর সাধ্যপক্ষে সুদৃশ্য বসন-ভূষণে বিভূষিত হইয়া উপাসনার্থ 'ঈদগাহে' † সমবেত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখোচ্চারিত সুমধুর পবিত্র 'তকবির'-ধ্বনিতে ‡ পথ-প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিল।

---

* ওজু—শরীর পবিত্র করিবার জন্য শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশানুযায়ী হস্ত মুখ প্রক্ষালন করা।

† ঈদগাহ—ধর্ম্মোৎসব-উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান বা প্রান্তর।

‡ তকবীর—খোদাতালার মহিমা ও প্রশংসা-সূচক বাক্য।

বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বেই ঈদের উপাসনা শেষ করিতে হয়। একতার আদর্শ আলয়—সাম্যের পবিত্র তীর্থ,—মৈত্রির পুণ্যভূমির অতুলনীয় অনুষ্ঠান—ইস্‌লামের উপাসনা-পদ্ধতি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই উহার স্বরূপ বুঝিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ দীন-লেখনী উহার স্বরূপ ও মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে একান্তই অক্ষম।

উপাসনা-অন্তে হজরতের প্রশংসা-সূচক 'দরুদ' * পাঠ করিতে করিতে করে করে বক্ষে বক্ষে সংমিলন। দ্বেষ-গর্ব্ব-বিভ্রান্ত হৃদয়ে রাজা-প্রজায়, ধনী-দরিদ্রে, পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, শত্রু-মিত্রে আগ্রহপূর্ণ অন্তঃকরণে পরস্পরের অকপট আলিঙ্গন;—কি মধুর সে দৃশ্য!

রমণীগণ ঈদের উপাসনায় যোগদান করেন না বটে, কিন্তু তাঁহা-দিগকেও এই মহোৎসবে অবস্থানুযায়ী সর্ব্বোত্তম বসন-ভূষণে বিভূষিতা হইতে হয়। সম্বন্ধানুসারে উপাসনা-প্রত্যাবৃত্ত স্বজনগণের সহিত অন্ত-র্নিহিত ভাব ও আনন্দ বিনিময় করিতে হয়! মাতার সহিত পুত্রের, ভ্রাতার সহিত ভগ্নীর, স্বামীর সহিত স্ত্রীর—সেই পবিত্র ভাব বিনিময় কত প্রাণস্পর্শি! কত মনোরম! কত মধুর! তাহা একমাত্র ভুক্তভোগীই অনুভব করিতে সক্ষম।

পাঠক! এ শুভ বাসরে একবার আলিনগরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। দেখুন, তথায় 'ঈদ্' বিষাদে পরিণত হইয়াছে; শান্তি ও উপা-সনার পরিবর্ত্তে চাঞ্চল্য ও কলহ ভীষণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; পবিত্রতার পুণ্য শাসনে শয়তানের ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।

আলিনগরে দুইটী ঈদগাহ; একটী মিঞাপাড়ায় আফতাব-উদ্দিন মিঞার বাড়ীর সন্নিকটে, এবং দ্বিতীয়টী খোন্দকার-পাড়ায় অবস্থিত ছিল। মিঞাপাড়ার ঈদগাহ অতি পুরাতন ও বৃহৎ। উৎসবের জন্য উহার সংলগ্ন

---

* দরুদ—বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদের প্রশংসাজ্ঞাপক বাক্য।

প্রায় দশ বিঘা নিষ্কর জমি ছিল; কিন্তু খোন্দকার-পাড়ার ঈদগাহের সংলগ্ন দুই তিন বিঘার অধিক জমি ছিল না। মিঞাপাড়ার ঈদগাহের জমি প্রথমতঃ মিঞা সাহেবদিগেরই তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁহারাই উক্ত জমির উপসত্ব হইতে মহা ধুমধামের সহিত সমস্ত গ্রামবাসীর ঈদোৎসব উপযোগী ভোজনাদি সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু ভাগী প্রজাগণ রীতিমত ফসলাদি না দেওয়ায় এবং স্বয়ং তত্ত্বাবধানে অসমর্থতাপ্রযুক্ত উক্ত জমিগুলি বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিনের পিতার তত্ত্বাবধানে প্রদান করেন। সেই হইতে এ পর্য্যন্ত বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিনের দ্বারাই এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। ভোজনের জন্য গ্রামবাসিগণকে বড় মিঞাদের দ্বারাই নিমন্ত্রণ করা হইত। উপাসনার্থে আফতাব-উদ্দিন মিঞাই সকলকে আহ্বান করিতেন।

ঈদের দিবস প্রাতঃকালে নামাজের সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য যখন আফতাব-উদ্দিন মিঞার লোক মধ্য পাড়ায় উপস্থিত হইল, তখন বড় মিঞা তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, আমরা এব্রাহিমকে একঘরে করিয়াছি। তাহার সহিত কেহ একত্রে আহার করিতে বা তাহাকে লইয়া নামাজ পড়িতে পারিবে না। যদি তোমরা ইহাতে সম্মত থাক, আমরা তোমাদের পাড়ায় গিয়া নামাজ পড়িব। নচেৎ আমরা তোমাদের পাড়ায় গিয়া নামাজ পড়িব না এবং তোমাদের সহিত একত্রে সিন্নিও * খাইব না।

আফতাব উদ্দিন মিঞা এই সমস্ত কথা শুনিয়া একান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্বয়ং বড় মিঞার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অনেক রকম বুঝাইলেন, এবং পবিত্র ঈদের দিবস এই সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে ক্ষান্ত থাকিবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, আজকার দিন বাদে আপনি এব্রাহিমের যে শাস্তি করিবেন,

---

* ঈদোৎসবে যে সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে চলিত কথায় সাধারণতঃ 'সিন্নি' বলা হইয়া থাকে।

তাহাতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু বড় মিঞা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি স্পষ্টভাবে বলিলেন,—"এব্রাহিম আমার শত্রু; তাহার সহিত যে থাকিতে চায়, সেও আমার শত্রু;—তাহার সহিত খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি আমার কোনই সম্বন্ধ নাই।"

আফতাব-উদ্দিন মিঞা বিফলমনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। পাড়ার সকলকে ডাকিয়া সব কথা বলিলেন। মিঞাপাড়ার সকলেই মধ্যপাড়ার লোকদের উপর বিরক্ত হইয়াছিল, সুতরাং সকলেই মত প্রকাশ করিলেন, "বেশ! তাহারা আমাদের সহিত নামাজ না পড়ে বা একত্রে না খায়, ক্ষতি নাই, এবং আমাদের আর দলবাধার সাধও নাই। পদে পদে অপমান হওয়ার চেয়ে যেমন আছি, তেমন থাকাই ভাল। তাহারা আমাদের নিষ্কর জমি আর সিন্নি ভাগ করিয়া দিক্।"

বড় মিঞার নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠান হইলে তিনি বলিলেন,—"নিষ্কর জমিতে কাহারও দখল নাই; সিন্নি পৃথক করিয়া দিব না, কারণ এ সিন্নি বরাবর এক সঙ্গেই হইয়া আসিতেছে। আমরা এব্রাহিম বাদে আর সকলকে নিমন্ত্রণ করিব; যাহার ইচ্ছা হয় আসিয়া খাইবে, ইচ্ছা না হয় না আসিবে। আর আমরা এবার হইতে পৃথক্ ঈদগাহ প্রস্তুত করিয়া নামাজ পড়িব।"

এই সংবাদে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইল। আফতাব-উদ্দিন মিঞা আবুল ফজলের নিকট কি করা উচিত, জিজ্ঞাসা করিলেন। আবুল ফজল বলিলেন,—"ঈদের দিনে বিবাদ বিসম্বাদ করা একেবারেই অনুচিত। মধ্যপাড়ায় পৃথক্ ঈদগাহ হইলে দুই পাড়ার লোকের মিলনের পথে চির-অন্তরায় স্থাপিত হইবে। আপনি তাহাদিগকে বলুন, যদি এব্রাহিম নামাজ না পড়িলে তাহারা আসিয়া নামাজ পড়ে, তবে একত্রে নামাজ পড়া হউক; কিন্তু আমরা এব্রাহিমকে বাদ দিয়া সিন্নি খাইতে পারিব না।"

সকলে অনেক ওজরাপত্তি করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে বড় মিঞাকে তদনুযায়ী সংবাদ দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "যদি তোমরা এব্রাহিমকে ত্যাগ করিয়া সিন্নি না খাও, আমরা তোমাদের সহিত নামাজ পড়িব না ”

এ কথার উপর আর কথা নাই ভাবিয়া আফতাব-উদ্দিন মিঞা স্বয়ং গিয়া বলিলেন,—"বড় মিঞা সাহেব! নিষ্কর সাধারণের জন্যই প্রদান করা হইয়াছে। যদি আপনারা একত্র অনুষ্ঠান করিতে অসম্মত হন, আমাদের প্রাপ্য আমাদিগকে পৃথক করিয়া দিন্।"

বড় মিঞা বলিলেন,—"পূর্ব্বে যখন ভাগাভাগী হয় নাই, এবারও হইবে না; আপনাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইবে। এইখানে আসিয়াই সিন্নি খাইবেন।"

আফতাব। ইহা নিতান্তই অবিচার! কিন্তু মনে রাখুন, আইন অনুসারে আপনারা ভাগ দিতে বাধ্য। আর ইহাও ভাবা উচিত যে, এ সমস্ত পূর্ব্বে আমাদেরই ছিল, আজ আপনাদের হইয়াছে; আবার কাল অন্যেরও হইতে পারে। ক্ষমতার অহঙ্কারে একজনকে অবমাননা করিলে আল্লার কাছে তাহা সহ্য হইবে না।

আফ্‌তাব-উদ্দিন মিঞার কথাগুলি অবজ্ঞাজনক ভাবিয়া বড় মিঞা রাগের সহিত বলিলেন,—"আইন দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে, দেখান যাইবে। একগুয়েমী যাদের বংশের দোষ, অহঙ্কারের জন্যই যাদের এই দুর্দ্দশা, তাদের মুখের কোন উপদেশ আমি শুন্‌তে চাই না। ভাগ্যে—

আফতাব-উদ্দিন মিঞা আর কোন কথা শুনিলেন না। তিনি অবিলম্বে উঠিয়া চলিয়া আসিলেন; এবং নিজ হইতে টাকা খরচ করিয়া ঈদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। সমস্ত গোলমালে বেলা অধিক হওয়ায় প্রায় বারটার সময়ে নামাজ পড়িলেন।

বড় মিঞার নূতন জায়গা মনোনীত করিতে আরও অধিক সময় লাগিল। তাহাদের নামাজ প্রায় একটার * সময়ে সম্পন্ন হইল।

মিঞা-পাড়ায় পৃথক্ দল হইতেছে দেখিয়া এবং এব্রাহিমকে একঘরে করিতে অসমর্থ হইয়া বড় মিঞা ক্রোধে জ্বলিয়া গেলেন। তিনি তৎ-ক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া প্রলোভন ও ভয়প্রদর্শন দ্বারা আফতাব-উদ্দিন মিঞার দল ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার যত রাগ এখন এব্রাহিমের পরিবর্ত্তে আফতাব-উদ্দিন মিঞার উপর পতিত হইল।

বড় মিঞার প্রেরিত লোকের সঙ্গে ক্রমশঃ মিঞাপাড়ার লোকের বচসা ও বিবাদ বাড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। আফতাফ-উদ্দিন মিঞা তাহাদিগকে পাড়া ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহারা আদেশ গ্রাহ্য করিল না। তখন দুই দলের মৌখিক বিবাদ ক্রমশঃ হাতাহাতি বিবাদে পরিণত হইল। বড় মিঞার লোকেরা গলাধাক্কা খাইয়া মিঞাপাড়া হইতে তাড়িত হইল।

কিন্তু পরক্ষণেই বড় মিঞার আদেশে মধ্যপাড়ার যাবতীয় লোক লাঠি, সড়কী, ঢাল প্রভৃতি লইয়া মিঞাপাড়ার দিকে ধাবিত হইল। তাহাদের অসভ্য চীৎকার, গালাগালি ও নর্ত্তন কুর্দ্দনে গ্রাম কাঁপিয়া উঠিল। মিঞা-পাড়ার লোকেরাও প্রমাদ গণিয়া লাঠি ইত্যাদি লইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল।

বড় মিঞার লোকেরা প্রথমে আসিয়া এব্রাহিমের বাড়ীর সম্মুখে আবুল ফজলদের যে জমি ছিল, সেই জমির ফসল এবং উহার মধ্যের কাঁঠাল ও খেজুর গাছ দুটী কাটিয়া ফেলিল; কিন্তু তাহাতেও যখন মিঞা-পাড়ার লোকেরা বিবাদে অগ্রসর হইল না, তখন তাহারা মহা বীরত্বের সহিত মিঞাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল;—উদ্দেশ্য মিঞাবাড়ীর নিকটবর্ত্তী

---

* বলা বাহুল্য, বারটা অর্থাৎ দুই প্রহরের পর ঈদের নামাজ পড়া সিদ্ধ নহে।

হইয়া তাঁহাদের অপমান করা। গ্রামবাসিগণ ইহা বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্বেই মিঞাবাড়ীর সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক একখান চাষ করা জমি সম্মুখে রাখিয়া সারিবন্দী ভাবে দণ্ডায়মান হইল। বড়মিঞার লোকেরা নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা তীব্রকণ্ঠে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। তাহারা নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তুমুলবেগে অগ্রসর হইল। মিঞাপাড়ার লোকেরাও চাষ করা জমি হইতে অজস্র ঢিল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের গতিরুদ্ধ হইল। অজস্র ঢিল নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের চখে মুখে আঘাত করিতে লাগিল। অনেকেরই শরীরের নানাস্থানে কাটিয়া রক্ত বাহির হইল। তখন তাহারা অগ্রগমনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পশ্চাদাবর্ত্তনের উপক্রম করিবে, এমন সময়ে তুফান-উল্লা প্রভৃতি বড় মিঞার পক্ষীয় দুর্দ্ধর্ষ লাঠিয়ালগণ সেই শিলাবৃষ্টির ন্যায় ঢিলবর্ষণের মধ্য দিয়া চক্রাকারে লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে অগ্রসর হইয়া মিঞাপাড়ার লোকদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য সকলেও অগ্রসর হইয়া আসিল। তখন উভয় দলে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। লাঠিতে লাঠি আঘাতিক হইয়া ভয়ানক শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। কিন্তু মিঞাপাড়ার লোকেরা মধ্যপাড়ার দুর্দান্ত লোকদিগের সম্মুখে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না; তাহারা অবিলম্বে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। মধ্য-পাড়ার লোকেরা সগর্ব্বে মিঞাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। আফতাব-উদ্দিন মিঞা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আবুল ফজল সবলে মাতার হস্ত হইতে গুলিভরা বন্দুক গ্রহণ করিয়া বহির্ব্বাটীতে গমনপূর্ব্বক পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। এমন সময়ে হাফেজ নামক এব্রাহিমের একজন জ্ঞাতি তুফান-উল্লার লাঠির ভীষণ আঘাতে সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়ায় সকলের চৈতন্য হইল এবং দরবেশের মুখে—* * রা, কি ন্যাহো, শিগ্‌গীর

সারো”—উচ্চারিত হওয়ায় সকলে রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আপনাপন বাড়ীর দিকে পলায়ন করিল।

তখন মিঞাপাড়ার সকলে আসিয়া হাফেজকে তুলিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ঈদ বিষাদে পরিণত হইল। সমস্ত গ্রামে হাহাকার ও ক্রন্দনের ঘোর রোল পড়িয়া গেল। সকলের মুখেই আতঙ্কের ছায়া স্পষ্ট পরিস্ফুট ও ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

যথাসময়ে পুলিসে সংবাদ প্রেরিত হইল; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পুলিসের দারোগা মহাশয় সদলবলে গ্রামে আবির্ভূত হইলেন, এবং যথাবিধি এজাহার লিখিয়া লইলেন। আহত হাফেজকে সদরে চালান দেওয়া হইল। রাত্র আগত হওয়া বশতঃ দারোগা মহাশয় রায়পাড়া রায়মহাশয়-দিগের বৈঠকখানায় গিয়া আস্তানা ফেলিলেন; কারণ সেদিন আসামী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার সময় কিম্বা ইচ্ছা দারোগা বাবুর আদৌ ছিল না।

রাত্রে মোকর্দ্দমার যথাবিধি তদবির করা হইল। রায় মহাশয়ের মারফতে দারোগা বাবুর শূন্য পকেট পূর্ণ হইল। তিনি মোকর্দ্দমাটীকে যথাসাধ্য হাল্‌কা করিয়া রিপোর্ট দিলেন। আসামিগণ জামীনে মুক্ত রহিল।

এই ঘটনার পর এক মাসের মধ্যে আরও তিনটী মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়। প্রথম মোকর্দ্দমা গরু ছিনান; বড় মিঞার পক্ষীয় লোকের দ্বারা এব্রাহিমদের বিরুদ্ধে স্থাপিত; বলা বাহুল্য, ঐ মোকর্দ্দমা কৃত্রিম। দ্বিতীয় মোকর্দ্দমা প্রথম দিনের বিবাদকালে কর্ত্তিত খেজুর ও কাঁঠাল গাছের ক্ষতিপূরণ জন্য এবং তৃতীয় মোকদ্দমা বড় মিঞা ও তাঁহার দলস্থ লোক সকলকে বিবাদ হইতে নিরস্ত করণার্থে জামীন-মুচলেকায় আবদ্ধ করার জন্য। এই দুইটী মোকর্দ্দমাই আফতাব-উদ্দিন মিঞা স্থাপন করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আজিজার বিবাহ।

ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। ঈদোৎসবের পরে প্রায় দুই মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। শীত-সঙ্কুচিত প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে হর্ষের স্পন্দন পরিলক্ষিত হইতেছে। বৃক্ষাদি পুরাতন পত্রাবরণ পরিত্যাগ করিয়া নব মঞ্জুরিত স্নিগ্ধ শ্যামল ও হরিৎ পল্লব-বস্ত্রে দেহ সজ্জিত করিতেছে। বনে উদ্যানে নানাজাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া বসন্ত-বিলাসনিরতা অবনীর সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধ বিকীরণ করিতেছে। মলয়-প্রবাহিত ধীর সমীরণ সেই সুগন্ধরাশি অপহরণ করিয়া বঙ্গ-পল্লীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতেছে। আম্র বৃক্ষের শাখাশীর্ষে আম্রমুকুল গঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং তাহার মধুর সুগন্ধ বাতাসে ভাসিয়া বালকবালিকাগণের প্রাণে এক অতুল আনন্দ প্রদান করিতেছে। বনকুঞ্জসমূহ কোকিল, দোয়েল ও হরিদ্রা প্রভৃতি সুকণ্ঠ বিহঙ্গের কণ্ঠধ্বনিতে মুখরিত ও শব্দায়মান।

এই সময়ে বড় মিঞা কন্যার বিবাহের জন্য একান্ত উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। আফতাবদ্দিন মিঞার সহিত মনান্তর ও বিবাদ হেতু আবুল ফজলের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ একরূপ ভাঙ্গিয়াই গিয়াছিল। এইজন্য বড় মিঞা সাহেব প্রতিবিধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া আবুল ফজল অপেক্ষা উচ্চ কুলোদ্ভব গুণবান্ ও উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিবার জন্য চারিদিকে লোক প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

মাসুদ একান্ত দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া দরবেশের দ্বারা আজিজাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল; প্রস্তাবের সহিত মাসুদ তাহার

সমস্ত সম্পত্তি আজিজার নামে লিখিয়া দিবে, এরূপ আভাসও প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু বড় মিঞা সাহেব উক্ত প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া মামুদের সমস্ত আশা ভরসা চূর্ণ করিয়া দিলেন।

গড্ডি-নিবাসী 'শাহ' উপাধিধারী সৈয়দ সাহেবগণ ফরিদপুর জিলার অন্যতম সম্ভ্রান্ত বনিয়াদি ও শ্রেষ্ঠ বংশ। এই বংশে এক সময়ে এমন কয়েকজন কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের প্রভাবে ইহাঁরা বংশানুক্রমে কৌলিক খ্যাতিপ্রতিপত্তির সহিত বহু নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য স্থানের ন্যায় ইহাঁদেরও পরবর্ত্তী কুলপ্রদীপগণ বিলাসস্রোতে গা ভাসাইয়া নিত্য সংখ্যাতীত ঘৃত-পক্ক পক্ষীবিশেষের সদ্ব্যবহারে নিরত থাকায় ব্যয়াধিক্যবশতঃ ক্রমশঃ সব দিকেই অনাটন হইতে থাকে। এই অনাটন হেতু সম্পত্তিগুলি ক্রমশঃ হস্তান্তরিত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহাঁদের অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তন এবং শেষাংশে দুরবস্থার চরম পরিণতি সংসাধিত হয়। তখন হইতে ইঁহারা হিন্দুদিগের ঘৃণিত কৌলিন্যপ্রথা অবলম্বন পূর্ব্বক যেখানে সেখানে বিবাহ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। কেহ কোন জমিদার-কন্যা বিবাহ করিয়া শ্বশুরবাড়ীর সব-ম্যানেজারের পদ অধিকার করেন; কেহ কোন কুলগৌরবপ্রার্থী উকিল, ডেপুটী বা মুন্সেফ-তনয়াকে বিবাহ করিয়া টোরে টোরে ভ্রমণার্থে বা বাসাবাড়ীর হেফাজত করণার্থে সহকারী কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন। আবার কেহ কেহ বা শ্বশুরবাড়ীর একাংশে বা সম্পত্তিবিশেষের মধ্যে আস্তানা ফেলিয়া উহার চিরাধিপত্য ভোগ করিতে নিরত হন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া,—খ্যাতনামা পিতৃ-পুরুষগণের পবিত্র সমাধিসমূহ শৃগালাদি বন্য পশুর আবাসে পরিণত করিয়া ইঁহারা যেখানে বা যাঁহার আশ্রয়েই গিয়াছেন, আপনাদের

বিশ্বগ্রাসী ভোগ-বিলাসের বিষম তাড়নায় তাঁহারই ঘোর অধঃপতন সাধন করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বেই শাহ বংশের শেষরত্ন সৈয়দ নূরল হক্ গড়ির শাহ-নিকেতনকে জনশূন্য কাননে পরিণত করিয়া কমলাবতী গ্রামের খান কলিমুদ্দিন বাহাদুর নামক একজন পুলিস ইন্স্পেক্টরের জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কলিমুদ্দিন সাহেবের মাত্র দুইটী কন্যা ছিল। দ্বিতীয়া কন্যাকে নিকটবর্ত্তী গ্রামের জনৈক সুশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত বিবাহ দেওয়া হয়।

কলিমুদ্দিন সাহেবের মৃত্যুর পরে, তদীয় সম্পত্তি উভয় জামাতা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া গ্রহণ করেন। উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া কলিমুদ্দিন সাহেবের দ্বিতীয় জামাতা বর্ত্তমানে এক বিপুল সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন। তিনি দেশের মধ্যে এক্ষণে একজন খ্যাতনামা তালুকদার। আর সৈয়দ নূরল হক্ সাহেবের অংশের সম্পত্তি অধিকাংশই প্রায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। বাকি যাহা আছে, তাহাও নিত্য কোরমা-পোলাও জোগাইতে জোগাইতে দুরূহ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে।

সৈয়দ নূরল হক্ সাহেবের একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্রের নাম সৈয়দ আবদুল হক্; বয়স অনুমান একুশ বৎসর; চেহারা অতি সুন্দর। তিনি গত বৎসর দেশীয় মিশনারী স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছেন এবং খরচের অভাবে কলেজে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া এক বৎসর বাড়ীতেই বসিয়া রহিয়াছেন। সৈয়দ নূরল হক্ সাহেবের ইচ্ছা, পুত্রের বিবাহ দিয়া শ্বশুরের অর্থে কলেজে পড়াইবেন। অবশ্য কন্যা সম্প্রদানের আশায় সৈয়দ সাহেবের পুত্রকে পড়াইতে অনেকেই আগ্রহান্বিত ছিল, কিন্তু কেবল পড়ার খরচ দিলেই ত চলিবে না; সৈয়দ

সাহেবের পুত্রের সহিত কন্তার বিবাহ দিতে হইলে কন্তাকে আপাদমস্তক স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া দিতে হইবে। সৈয়দ সাহেবদিগের পূর্ব্বতন বড় বড় আত্মীয় স্বজনের তত্ত্ব লইতে হইবে। জামাতাকে জরির জোড়া, সুবর্ণের ঘড়ি চেন ও হীরক অঙ্গুরী দিতে হইবে। ইহার উপর আবার সৈয়দ সাহেব সুর ধরিয়াছেন যে, তাঁহার সম্পত্তি ঋণমুক্ত করিয়া না দিলে পুত্রের বিবাহ দিবেন না। অবশ্য সম্পত্তি ঋণমুক্ত করণার্থে সৈয়দ সাহেব কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দশমবর্ষীয়া কন্যা জোবেদাকে প্রায় দুই সহস্র টাকা পণ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেশীয় এক বাঙ্গাল তালুকদারের পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু সেই টাকার দ্বারা ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি ভিন্ন একটুও কম হয় নাই।

এদিকে দেশে কৌলিন্যের মর্য্যাদা অপেক্ষাকৃত থর্ব্ব হওয়া বশতঃ সৈয়দ সাহেবের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য কেহই সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করায় আবদুল হককে এই এক বৎসর নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হইয়াছে। অবশ্য তিনি চাকুরীর চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, অবশেষে বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিনের কন্যার সহিত আবদুল হকের বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। "এ সম্বন্ধ করিতে পারিলে আফতাব-উদ্দিন মিঞার গর্ব্ব চূর্ণ হইবে এবং বড় মিঞার কুল সম্বন্ধেও আর কেহ কিছু বলিতে পারিবে না"—আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবাসিগণের এইরূপ প্ররোচনায় সৈয়দ বংশে মেয়ে বিবাহ দিতে বড় মিঞার আগ্রহ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। তিনি টাকা পয়সার মমতা পরিত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ স্থির করিলেন। ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সৈয়দ নুরল হক সাহেবকে নগদ এক হাজার টাকা প্রদান করিলেন। জামাতার বস্ত্রাদি এবং তাঁহার আসা যাওয়ার জন্য পাঁচ শত টাকা প্রদান করা হইল।

আবদুল হকের কলেজ অধ্যয়ন জন্য মাসিক তিরিশ টাকা করিয়া দেওয়ার জন্য এক রেজেষ্ট্রীকৃত এগ্রিমেণ্ট দেওয়া হইল। এতদ্ভিন্ন মেয়েকে অন্ততঃ সহস্র টাকার গহনা দেওয়ার কথাও নির্দ্ধারিত হইয়া সম্বন্ধ নির্ব্বাচিত এবং ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবার দিন স্থিরীকৃত হইল।

আবুল ফজল এই সময়ে বাড়ীতেই ছিলেন; কারণ অর্থাভাবপ্রযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাড়ী অবস্থান করাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাড়ী থাকা তাঁহার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। আজিজা অন্যত্র বিবাহিতা হইতেছে—এ সংবাদ নিদারুণ বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়-শৈলের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম-চেষ্টার উন্নত চূড়াগুলি অহোরহ চূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। আজিজা—শৈশবের স্নেহময়ী আজিজা; যৌবন-নিকুঞ্জে প্রস্ফুটিত সর্ব্বপ্রথম কুসুমস্বরূপিনী আজিজা!—যাঁহাকে হৃদয়ের পবিত্র মন্দিরে—প্রীতির পুণ্যাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবুল ফজল দুই বৎসর নিশ্চয়রূপে আরাধনা করিয়া আসিতেছেন; যাঁহার মাধুরী মণ্ডিত কমনীয় প্রতিকৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি জীবন-সংগ্রামের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন; জীবন-মরুভূমিতে যাঁহাকে একমাত্র সরসীজ্ঞানে আবুল ফজল পথ অতিক্রম করিতেছিলেন, সেই স্নেহময়ী আজিজা—আবুল ফজলের সেই হৃদয়ারাধ্য প্রাণপ্রতিমা আজিজা আজ অপরের হইতেছে, এ চিন্তা তিনি কিছুতেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল; প্রতিভা ও চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইল; মনসংযোগ উড়িয়া গেল। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং আজিজার বিবাহের তারিখ নির্দ্ধারিত হইবার কয়েকদিন পরে কাতর মনে, কাতরভাবে পিতার নিকট বলিলেন, "বাবাজান! বাড়ীতে আমার পড়াশুনার সুবিধা হইতেছে না;

বিশেষতঃ কতকগুলি বিষয় বুঝিবার জন্য ফরিদপুর গিয়া মাষ্টারদের সাহায্য লওয়া একান্ত দরকার।"

পুত্রের মনোভাব বুঝিতে পিতার বিলম্ব হইল না। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে আবুল ফজলকে খরচের টাকা দিলেন। আবুল ফজল ফরিদপুর যাত্রা করিলেন। আজ আলিনগর ত্যাগ করিতে তাঁহার হৃদয় হাহাকার করিতে লাগিল; যেন আলিনগরের কল্লোলময়ী সিন্ধুস্রোতে তিনি স্বীয় জীবনের সর্ব্বোত্তম রত্ন বিসর্জ্জন দিয়া চলিলেন!

ফরিদপুর গিয়াও আবুল ফজল পড়াশুনায় মনসংযোগ দিতে পারিলেন না। তাঁহার ভাবান্তর প্রথমে বাল্যবন্ধু সতীশের নিকট ধরা পড়িল। সতীশ সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া দুঃখিত হইলেন এবং বন্ধুর সাহায্য হেতু বড় মিঞাকে অনুরোধ করিবার জন্য পিতার নিকট পত্র লিখিলেন। বলা বাহুল্য, পুত্রের পত্র পিতার নিকট হেলায় উপেক্ষিত হইল।

আবুল ফজল ফরিদপুর যাওয়ার পরে আফতাব-উদ্দিন মিঞা বড় মিঞাকে কন্যাদানে সম্মত করিবার জন্য যথাসম্ভব হীনতা স্বীকারপূর্ব্বক শেষ চেষ্টা করিলেন; চেষ্টা বিফল হইল।

দশমাস পূর্ব্বে আজিজার হৃদয়োদ্যানে যে নিরাশা-বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই ধীর সমীরণ আজ ঘোর ঝঞ্ঝায় পরিণত হইয়া সেই রম্য কানন শ্রীহীন করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমতঃ বালিকা মহীয়সী মাতার স্নেহ ও মাতার প্রভাবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া হৃদয় শান্ত রাখিয়াছিলেন। তারপর সহসা মাতার মৃত্যুতে বালিকা অন্তরে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, সেই আঘাতেই তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু মাতৃশোক অপনোদন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অন্তরে আশা হইল, হয়ত গত কথা সকলেই ভুলিয়া যাইবে; সকলেরই মানসিক ভাব পরিবর্ত্তিত হইবে এবং তিনিও তাঁহার চিরভক্তির আধার,—চির প্রীতিভাজন আবুল

ফজল—যাঁহাকে তিনি অতি পবিত্র ভাবে স্বীয় হৃদয়ের ভক্তি-প্রীতি নিবেদন করিয়া আসিয়াছেন,—তাঁহাকেই ধর্ম্মপতিরূপে প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু ঈদের দিবস যখন উভয় পক্ষে তুমুল বিবাদ বাধিবার সূচনা হইল, তখন এক অব্যক্ত আশঙ্কায় আজিজার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি শঙ্কিত মনে দেলজানের নিকট গিয়া বলিলেন,—"মা! এই বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে নিরস্ত থাকিতে তুমি বাবাজানকে নিষেধ কর না কেন?"

দেলজান আজিজার প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কেন! ফজলুদের সহিত বিবাদ হইতেছে, সেই জন্য নাকি?"

আজিজা মাতার অসঙ্গত বিদ্রূপে মরমে মরিয়া গেলেন এবং নীরবে স্থানান্তরে গমন করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

ইহার পরে যখন উভয় দলে পরস্পর মোকদ্দমা স্থাপন করিতে লাগিল, তখন আজিজা ভবিষ্যৎ আশায় সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়িলেন। অনন্তর যখন কমলাবতী গ্রামে তাঁহার বিবাহ স্থিরীকৃত হইয়া গেল, তখন বালিকা একেবারে হতাশ-সাগরে মগ্ন হইয়া গেলেন। মানসিক অবস্থার সহিত তাঁহার দৈহিক অবস্থারও বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল।

কিন্তু আজিজা অন্তরে যতই দগ্ধ হউন, বাহিক যথাসম্ভব সংযত ও শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। বিশেষ ভাবে কেহই তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইল না।

বিবাহের চারি পাঁচ দিন পূর্ব্বে বড় মিঞা একদিন দেলজানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজিজা দিনে দিনে অমন শুকাইয়া যাইতেছে কেন? তার কোন অসুখ বিসুখ হয় নাই ত?"

দেলজান। আমি আর তার কি জানি! মেয়ের মনমত বিয়ে দাও নাই, তাই ত দেখি, ভাল মত নায় না, খায় না, শোয় না; আবার একলা

হ'লে লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে! আমরা লেখাপড়াও শিখি নাই, অত চলাচলিও জানি না।

কথাগুলি দেলজান শ্লেষের ভাবে বলিলেও বড় মিঞার হৃদয়ে অন্ত-ভাবে আঘাত করিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া নিরুপায় জ্ঞাপক দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আজিজাকে ডাকিলেন। আজিজা নতনেত্রে পিতার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে বড় মিঞা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মা! তুমি বৃথা চিন্তা করিয়া শরীর নষ্ট করিতেছ কেন? আমার সমস্ত সম্পত্তিই ত তোমার আর মতীর; তোমার যাতে কোন কষ্ট না হয়, আমি তাহা করিয়া যাইব।"

পিতার এ নির্দ্দয় সহানুভূতিতে আজিজার ধৈর্য্যের-বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; তাঁহার চক্ষু দুইটী অশ্রুতে প্লাবিত হইল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে পিতার সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। হায়! ভাবপ্রবণতা-পরিশূন্য হৃদয়, সংসার-মদমোহাসক্ত পুরুষ! তুমি বালিকার হৃদয়-বেদনা কি বুঝিবে?

ক্রমে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। উৎসব ও আনন্দের বন্যায় আলিনগর প্লাবিত হইল। মহাসমারোহে বরযাত্রী আগমন করিল। একে একে বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হইতে লাগিল।

আজিজা সারাদিন মায়ের স্নেহাপ্লুত মুখচ্ছবি মনে করিয়া রোদন করিলেন। স্বীয় জীবনের আশৈশব আকাঙ্ক্ষার পরিণাম ভাবিয়া অত্যন্ত অস্থিরতা অনুভব করিতে লাগিলেন। বিবাহে বয়স্থা রমণীর ইসলাম-ধর্ম্মানুমোদিত অধিকারের * কথা স্মরণ করিয়া কখনও তাঁহার হৃদয়-

---

* ইসলাম-ধর্ম্মানুসারে বয়স্থা রমণীগণ বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে কদাচ বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। যদি কেহ বয়স্থা রমণীর অসম্মতিতে বলপূর্ব্বক বিবাহ প্রদান করে, তবে শাস্ত্রানুযায়ী উক্ত রমণী ইচ্ছা করিলে সে বিবাহ [illegible] পারিবেন। শরহে বেকায়া, হেদায়া প্রভৃতি।

বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া পরক্ষণেই আবার তাঁহার চিত্ত নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের সময়ে বালিকা সহসা মাতার অন্তিম উপদেশগুলি স্মরণ করিলেন। মন কতকটা শান্ত হইল।

যথাসময়ে বিবাহ সম্পর্কীয় উকিল আজিজার নিকট আগমন পূর্ব্বক বরের পরিচয় ও পঞ্চসহস্র মুদ্রা যৌতুকের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সম্মতি প্রার্থনা করিলেন। সমবয়সী রমণীগণ আজিজার অঙ্গে বিবাহ-সম্পর্কীয় বসন-ভূষণ পরাইয়া দিয়া তাঁহার নীরব সম্মতি * জ্ঞাপন করিলেন।

আজিজার সম্মতি গ্রহণান্তর আবদুল হককে যথাবিধি স্বীকারোক্তি করাইয়া, আল্লাহ ও রসুলের প্রশংসা-জ্ঞাপক পবিত্র 'খোত্‌বা' পাঠ করা হইল। অনন্তর সকলে নব-দম্পতির কল্যাণ-কামনা করিয়া আল্লার নিকট প্রার্থনা করিলেন। বিবাহ সম্পন্ন হইল।

ইহার পর পরস্পর সন্দর্শনার্থে দম্পতীকে নির্জ্জন কক্ষে প্রেরণ করা হইল। স্বামী-স্ত্রীর এই নির্জ্জন সংমিলনকে ইস্‌লাম-শাস্ত্রে "খেলওয়াতে-সহিয়া" বলে। ইহার শাস্ত্রীয় সূত্র এই যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর এমন স্থানে এবং এমন অবস্থায় একত্রিত হইবে যে, যেন তাহাদের দাম্পত্য ব্যবহারের কোন প্রকার অন্তরায় বিদ্যমান না থাকে। এই 'খেলওয়াতেসহিয়া'

---

* বিবাহ ব্যাপারে বয়স্থা স্ত্রীলোকের পক্ষে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকৃতি বা সম্মতি প্রদান করাই বিধি। স্পষ্ট বাক্যে সম্মতি প্রদান করা ব্যতীত নীরব থাকা, বিবাহ-সম্পর্কীয় বসন-ভূষণ পরিধান করা, মৃদু হাস্য করা এবং আনন্দজ্ঞাপক মৃদু ক্রন্দন করাও সম্মতি-স্বরূপ গণ্য হইবে। কিন্তু উচ্চ ক্রন্দন, কঠোর প্রত্যাখ্যান ও বসন-ভূষণাদি পরিধান না করা অসম্মতি স্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে স্ত্রীজাতির শাস্ত্রানুমোদিত অধিকার ও স্বাধীনতা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হওয়াতেই যে, এই সমস্ত নিয়ম ও প্রথা সৃষ্ট ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।—শরেহ বেকায়া।

দ্বারা ঐস্‌লামিক বিবাহের পূর্ণতা সাধন হয়, এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের উপর পরস্পরের পূর্ণ অধিকার জন্মে।

আজিজা পূর্ব্বেই গৃহে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি কম্পিত পদে গৃহে প্রবেশ করিয়া নীরবে শয্যার একপার্শ্বে উপবেশন করিবার অল্পক্ষণ পরেই আবদুল হক্ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। আজিজা সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবদুল হক সযত্নে পত্নীর হাত ধরিয়া আপনার পার্শ্বে বসাইলেন এবং মুগ্ধদৃষ্টিতে তাঁহার লাবণ্যপ্লাবিত বদনমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। আজিজাও মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীর দেবোপম মোহন-মূর্ত্তি দর্শন করিলেন; অনন্তর যাহাতে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত বিধাতার নিকট আন্তরিক প্রার্থনা করিয়া কম্পিত-দেহে শঙ্কিত-হৃদয়ে পতির করে আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত-নলিনী।

আবুল ফজল ও সতীশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদানার্থে একত্রে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। রমেশ বাবু নামক সতীশদের একজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কলিকাতায় বাস করিতেন; উভয়ে ট্রেণ হইতে নামিয়া প্রথমে সেই বাটীতেই গিয়া উঠিলেন।

রমেশ বাবু যশোহরের অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত তালুক-দারের সন্তান। তাঁহার বাল্যজীবন পল্লীগ্রামেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু পল্লীধ্বংসী ম্যালেরিয়ার প্রকোপে তাঁহার পিতামাতার অকালমৃত্যু হওয়ায় তিনি পড়িবার জন্য কলিকাতা গমন করেন এবং এফ, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটরীয়েটে কার্য্য গ্রহণ করেন। কার্য্যে উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়ায় তিনি কলিকাতার এক ভদ্রলোকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন এবং পৈত্রিক সম্পত্তি প্রায় অর্দ্ধমূল্যে আত্মীয়-স্বজনদিগকে প্রদান করিয়া সেই টাকার দ্বারা একটী সাইকেলের দোকান করেন। তিনি বর্ত্তমানে মাসিক দেড়শত টাকা বেতন পান।

রমেশ বাবুর দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবোধচন্দ্র দুই বৎসর বি, এ, ফেল করিয়া এখন দোকানের কার্য্য পরিচালন করিতে-ছেন। কনিষ্ঠ পুত্র প্রবোধচন্দ্রের বয়স আঠার বৎসর। বর্ত্তমান বৎসরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কন্যা সর্ব্বকনিষ্ঠা! নাম প্রভাত-নলিনী; বয়স তের বৎসর মাত্র।

প্রভাত-নলিনী মেয়েটী অত্যন্ত সুন্দরী; মুখখানি সত্যই যেন সদ্য প্রস্ফুটিত শিশির-সিক্ত প্রভাত-নলিনীর ন্যায় স্নিগ্ধ লাবণ্যে ঢল ঢল করিতেছে; কৈশোর-সুলভ সুক্ষীণ অঙ্গসৌষ্ঠব প্রথম যৌবনের স্বপ্নস্পর্শে ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চেহারায় এমন এক অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় আনন্দের জ্যোতি বিভাসিত যে, তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখিলেই স্নেহ করিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। প্রভাত-নলিনী কলিকাতার একটী হিন্দু পাঠশালার ছাত্রী; হিন্দু-পরিবারের আদর্শ শিক্ষায় সুশিক্ষিতা।

যাহা হউক, জিনিসপত্র যথাস্থানে সংরক্ষণ পূর্ব্বক আবুল ফজল অন্যত্র যাইয়া থাকিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করায় রমেশ বাবু বলিলেন,—"অন্যত্র যাইবার আবশ্যক কি? এখানে যথেষ্ট জায়গা রহিয়াছে; তোমাদের পড়াশুনার সুবিধা হইবে। আমি পার্শ্বের বাড়ীতে তোমার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।"—এই বলিয়া তিনি বাড়ীর ঝির দ্বারা পার্শ্বের বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইলেন।

সেই বাড়ীখানি দ্বিতল হর্ম্ম্য-বিশিষ্ট; বাটীর অধিপতি একজন কলিকাতিয়া মুসলমান; প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। কণ্ট্রাক্টরের কাজ করিয়া অনেক টাকা জমাইয়াছে, কয়েকখানি বাড়ীও করিয়াছে।

গৃহস্বামী মহোদয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গ-ভারতের কোন্ স্থানের অধিবাসী, তাহা কেহই সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহেন। পাড়ার গুজব, তিনি কোন 'বাঙ্গাল' দেশের লোক; বাঙ্গলা বলিলে লোকে হাসে, এইজন্য বহুদিন হইতে তিনি বাঙ্গলা বলা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার "মেড়ুয়া প্যাটন" উর্দ্দুকেই মাতৃভাষা করিয়া লইয়াছেন। অনন্তর টাকার বলে কলিকাতার এক উর্দ্দুভাষী চর্ম্ম-ব্যবসায়ীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া একেবারেই কলিকাতিয়া বনিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার পারিবারিক ভাষাও উর্দ্দু;—কিন্তু বাঙ্গালাগন্ধী।

যাহা হউক, অল্পক্ষণ পরেই উত্তর আসিল,—"বড়ি মিঞা সাহেবের বাড়ীতে কয়েকদিন হইল ঝি আসিতেছে না; এইজন্য বাড়ীর মেয়েরাই পাক করিয়া থাকে; সুতরাং তাহারা কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে অসমর্থ।"

অগত্যা রমেশ বাবু সেই পাড়ার সাদেক নামক তাঁহাদেরই অফিসের একজন কেরাণীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সাদেকের বাড়ী নদীয়ায়। তিনি ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণী; দশটাকা ভাড়ার একখানি খোলার বাড়ীতে পরিবার লইয়া কায়ক্লেশে অবস্থান করেন। তিনি সানন্দে আবুল ফজলের আহারাদির ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে থাকার স্থানাভাবের কথা বিনীতভাবে জ্ঞাপন করিলেন। রমেশ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র প্রবোধ বলিলেন,—"থাকার স্থান এইখানেই হইবে। আপনি কেবল দিবসের অন্নাহারের বন্দোবস্ত করিবেন; জলযোগ ও নৈশ-আহারের বন্দোবস্ত আমরাই করিয়া দিব।" বলা বাহুল্য আবুল ফজল সেই স্থানেই অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

ক্রমশঃ পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। আবুল ফজল যথাবিধি দুইদিন পরীক্ষা প্রদান করিলেন; কিন্তু দিবাগত রাত্রে তাঁহার সামান্য অসুখ বোধ হইল এবং প্রভাতেই জ্বর আসিল। আবুল ফজল জ্বর-যাতনা-বিকম্পিত দেহে বসিয়া আবশ্যক পুস্তকাদি দেখিতে লাগিলেন; কারণ পরীক্ষা দিতে যাওয়াই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু আনুমানিক বেলা নয়টার সময়ে তাঁহার জ্বর এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি কিছুতেই বসিয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না; শুইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অত্যন্ত কাতরতার সহিত ছটফট্ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরীক্ষা দেওয়ার আশা একেবারেই বঞ্চিত হইল।

সতীশ মহা সমস্যায় পড়িলেন। কারণ রমেশ বাবু ও সুবোধ কেহই বাড়ী নাই; একমাত্র প্রবোধ, সেও পরীক্ষার্থী। অথচ আবুল ফজলের জ্বরের বেগ দর্শনে তাঁহাকে একেলা রাখিয়া যাওয়াও কিছুতেই সঙ্গত বোধ হইল না। অনন্তর সতীশ প্রবোধকে বলিলেন, "ভাই, তুমি যাও; আবুল ফজলকে এ অবস্থায় রাখিয়া আমি যাইতে পারি না।"

প্রবোধ মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সে কি হয়! তিন চারি ঘণ্টা সময়ের জন্য একটী বৎসর নষ্ট করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। আমি বরং মাকে বলিয়া আসি,—আমরা যতক্ষণ না ফিরি, নলিনী ও ঝি আবুল ফজলকে দেখিবে।" সতীশ ভাবিয়া প্রবোধের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন এবং যথাবিধি বন্দোবস্ত করিয়া উভয়ে ক্ষুণ্ণমনে পরীক্ষা প্রদানার্থ যাত্রা করিলেন।

প্রবোধ ও সতীশ যখন চলিয়া গেলেন, তখন আবুল ফজলের গাত্র প্রায় অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত। তিনি জ্বরের ঘোরে অচৈতন্যবৎ ঘুমাইতেছিলেন। তিন চারি ঘণ্টা এইরূপে অতিবাহিত হইল; প্রায় দুইটার সময়ে তাঁহার জ্বর একটু কম হইল। তিনি মুদিত চক্ষে বলিলেন,—"ভাই সতীশ, এক গেলাস পানি দাও।"

মধুর-কণ্ঠে উত্তর হইল—"সতীশ বাবু এখানে নাই; আপনার পার্শ্বেই লেমোনেড ও গ্লাস রহিয়াছে।"

আবুল ফজল সেই বীণাধ্বনিবৎ কোমল কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার শয্যার অদূরে একখানি চেয়ারের উপর একটী অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা উপবিষ্টা রহিয়াছে; পার্শ্বে বাড়ীর ঝি; বালিকা নলিনী। আবুল ফজল তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার দেখিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভাবে তাঁহার মুখের উপর কখনও দৃষ্টিনিক্ষেপ

করেন নাই। তিনি আজ বালিকার মাধুরী-মণ্ডিত মুখমণ্ডলে যে সৌন্দর্য্যের ছটা দর্শন করিলেন, বোধ হয়, এক আজিজা ভিন্ন আর কাহার মুখে তিনি জীবনেও এমন করুণ সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করেন নাই।

আবুল ফজল অবিলম্বে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন এবং গ্লাসে লেমোনেড ঢালিয়া অল্প পরিমাণ পান করিলেন; কিন্তু তাহাতে বোধ হয় তৃপ্ত হইতে পারিলেন না; কারণ অল্পক্ষণ পরে বালিকার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিলেন,—"সতীশ জল আছে কি?"

প্রভাত-নলিনী শান্তকণ্ঠে বলিলেন,—"দাদারা ত কেহই বাড়ী নাই; আমি আনিয়া দিব কি?" তাহার কণ্ঠস্বরে এমন আকর্ষণী ছিল যে, আবুল ফজলের অনিচ্ছা থাকিলেও 'না' বলিতে পারিতেন না। যাহা হউক, আবুল ফজল বলিলেন, "আপনি কষ্ট করিবেন?"

"আমার কোন কষ্ট হইবে না"—বলিয়া নলিনী উঠিয়া গেলেন এবং অবিলম্বে কাচের গ্লাসে শীতল জল পূর্ণ করিয়া আনয়ন-পূর্ব্বক আবুল ফজলের পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। আবুল ফজল জল পান করিলেন। তদ্দর্শনে যেন সাহস পাইয়া নলিনী বলিলেন, "আপনি কিছু পথ্য করুন। গরম দুধও আছে, কিম্বা দুধ-সাগু প্রস্তুত করিয়া দিই?" আবুল ফজল "এখন নহে" বলিয়া অস্বীকার করিলেন।

বেলা অনুমান পাঁচটার সময়ে সতীশ ও প্রবোধ ফিরিয়া আসিলেন। তখন আবুল ফজলের জ্বর অনেক কম হইয়াছে। সেই দিন অঙ্কের পরীক্ষা ছিল। সতীশ পকেট হইতে প্রশ্নপত্র বাহির করিয়া আবুল ফজলের হস্তে প্রদানপুর্ব্বক বলিলেন,—"তুমি অঙ্কে বরাবর যেরূপ নম্বর রাখিয়া থাক, তা'তে বোধ হয়, আজ পরীক্ষা দিতে পারিলে নিশ্চয় "ফুলমার্ক," (পুরা নম্বর) রাখিতে পারিতে।"

আবুল ফজল একবার প্রশ্নপত্রের দিকে চক্ষু বুলাইলেন। সারা বৎসরের শ্রম ও আশার পরিণাম ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; দুই চক্ষে অশ্রু নির্গত হইল।

প্রবোধ সান্ত্বনাপুর্ণ স্বরে বলিলেন,—"এত আর মানুষের কাজ নহে ; দৈব-বিঘ্নের আর প্রতিকার কি ?"

সন্ধ্যার পরে রমেশ বাবু বাড়ী আসিলেন ; ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ আনাইয়া দিলেন এবং আবুল ফজলকে নানারূপে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

পরদিন যথাসময়ে জ্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, এবং সেদিন জ্বর বিরাম না পাওয়ায় রমেশ বাবুর পরামর্শ অনুসারে সতীশ আবুল ফজলের পিতার নিকট টেলিগ্রাম করিলেন।

আবুল ফজলের পথ্যাদি ডাক্তারের পরামর্শ মত প্রবোধের সাহায্যে নলিনীই প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এ কার্য্যে তাঁহার একান্ত আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত।

দুইদিন পরে আফতাব-উদ্দিন মিঞা কলিকাতা উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন আসিলেন, আবুল ফজল জ্বরে তখন প্রায় অচেতন। তাঁহার শয্যাপার্শ্বে সতীশ, প্রবোধ ও অন্যান্য কয়েকটী হিন্দু-মুসলমান যুবক উপবিষ্ট। সতীশদের পরীক্ষা তখন শেষ হইয়া গিয়াছে।

পরদিন আফতাব-উদ্দিন মিঞা রমেশ বাবু ও ডাক্তারের নিষেধ সত্বেও আবুল ফজলকে বাড়ী লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। যাত্রার সময়ে রমেশ বাবু, সুবোধ, প্রবোধ ও নলিনী উপস্থিত হইয়া বিদায়-সম্ভাষণাদি করিলেন। যেন কোন একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে বিদায় দিতেছেন, তাঁহাদের সকলের মুখে এইরূপ ভাবের আভা ফুটিয়া উঠিল।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ-পূর্ব্বক নলিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মা! তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও অসম্ভব। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার যেমন মন ভগবান তোমাকে সেইরূপ সুখ-সম্পদ প্রদান করুন।" নলিনীর মুখখানি লজ্জা-রঞ্জিত ও নত হইয়া পড়িল।

রমেশ বাবু একজন গ্রাম্য-মুসলমানের শিষ্টতা দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইলেন। দুইটী হিন্দু-মুসলমান পরিবারের সম্প্রীতি দর্শনে স্বীয় গ্রাম্য-জীবনের অস্পষ্ট ঘটনাগুলি মনে করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন!

সতীশ রমেশ বাবুকে প্রণাম করিয়া আবুল ফজলের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন। আজ তাঁহাকে একান্ত চিন্তাভারাক্রান্ত বলিয়া অনুমিত হইল। এ চিন্তা যে কেবল আবুল ফজলের অসুখজনিত, তাহা নহে; বরং চিরকাল শহরবাসিনী নারীকুলের উপর তাঁহার যে অশ্রদ্ধার ভাব ছিল, নলিনীর আদর্শে সেই ভাবের ব্যতিক্রম হওয়াতেই তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও পরিজনগণের সম্মুখে প্রভাত-নলিনী দয়া-মায়া ও পরোপকারের যে আদর্শ প্রদর্শন করিল, কোন পল্লীবালিকার দ্বারা এরূপ কদাচ সম্ভব নহে। এই সমস্ত চিন্তায় তদীয় হৃদয় প্রভাত-নলিনীর একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল।

নলিনীও কয়েকদিন পর্য্যন্ত সতীশের নম্র স্বভাব, উদারতা ও বন্ধু-প্রীতি দর্শনে তাঁহার একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলে চলিয়া গেলে তাঁহার মন বড়ই শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। বালিকার মুখখানি মাধ্যাহ্নিক রবিকিরণতপ্ত নলিনীর ন্যায় কিঞ্চিৎ পরিম্লান ভাব ধারণ করিল। এমন সময়ে প্রবোধ আসিয়া বলিল—"নলি! তোর মুখ অমন শুকাইয়া গিয়াছে কেন?"

প্রভাত-নলিনী। আচ্ছা মেজদা! পল্লীগ্রাম কিরূপ?

প্রবোধ। এই যে সেদিন বাগানে গেছলুম না; ঐ রকম আর কি। গাছ-পালা, বাগান, মাঠ আর ছোট্ট ছোট্ট বাড়ী-ঘর।

প্রভাত-নলিনী। তবে ত খুব সুন্দর মেজদা! আমার ত খুব ভাল বোধ হয়।

প্রবোধ। তুই পল্লীগ্রামে যাবি?

নলিনী। তুমি যদি পল্লীগ্রামে বিয়ে কর, তবে একবার বৌদির সঙ্গে না হয় যাব।

প্রবোধ। আমি? না আমার তুই হাত ঘোমটা দেওয়া বিয়ে করা পোষাবে না। বরং তুই যদি ভাল মনে করিস্, তোকেই না হয় পল্লীগ্রামে বিয়ে দিব, এবং সেই উপলক্ষে বাগান যাওয়া ত্যাগ ক'রে তোদের বাড়ীতে গিয়েই তুই চার দিন নির্জ্জলা দুধ আর পুকুরের তাজা মাছ-টাছ খেয়ে আস্‌ব।

প্রভাত-নলিনী ঈষৎ ক্রোধ-আরক্তিম মুখে পূর্ণ-বিকসিত পদ্মপত্রোপম নয়ন দুটী প্রবোধের মুখের উপর তুলিয়া বলিলেন,—“যাও মেজদা, তুমি ভারি অসভ্য!”

প্রবোধ। বেশ! তুই বল্লি, তাতে কোন দোষ হ'ল না! কিন্তু আমি বল্লাম, আর অমনি সভ্যতার বাইরে নিয়ে ফেল্লি!

নলিনী। তুমি আর আমি?—এমন সময়ে প্রবোধের জননী সেই-স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“আহা! ছেলে দুটী যেন একাত্মা! যেমন চেহারা, তেমনি স্বভাব; যে জ্বর হইয়াছে, কেমন হয় না হয় কে জানে? প্রবোধ, তুই চিঠি লিখ্‌তে বলেছিস্।

প্রবোধ। সতীশ বাবু বাড়ী যেয়েই চিঠি লিখ্‌বে বলে গেছে।

জননী এমন সময়ে সহসা কি ভাবিয়া কন্যার মুখের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; প্রভাত-নলিনীও নতমুখে ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

সৈয়দ সাহেবের প্রকৃতি।

বিবাহের কিছুদিন পরেই সৈয়দ আবদুল হক পড়িবার জন্য কলিকাতা গমন করিলেন এবং সিটী কলেজের প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আবদুল হক যখন কলিকাতা আসিলেন, তখন বেকার ও ইলিয়ট হোষ্টেল ভিন্ন তথায় আর কোন গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত মোসলমান-ছাত্রাবাস ছিল না। সুতরাং তিনি প্রথমে উক্ত ছাত্রাবাসদ্বয়ের কোন একটীতে থাকিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্থান না পাওয়ায় অগত্যা বাধ্য হইয়া কতকগুলি বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র ও কর্ম্মচারীর সমবায়ে পরিচালিত একটী সাধারণ মেসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিন সাহেব স্বীয় প্রদত্ত এগ্রিমেণ্টের কথা বিস্মৃত হইয়া পুত্রাধিক স্নেহের সহিত সাগ্রহে আবদুল হকের অধ্যয়নের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে লাগিলেন।

আজিজা বিবাহের সময়ে কয়েক দিন মাত্র শ্বশুরগৃহে গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার পরে প্রায় এক বৎসর গত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি আর তথায় গমন করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, সৈয়দ নূরল হক সাহেবের অবস্থা তেমন ভাল না থাকার দরুণ তিনি অকারণে পুত্রবধূর ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণে তেমন আগ্রহান্বিত নহেন। তবে মাঝে মাঝে বড় মিঞার নিকট বধূমাতাকে পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতে ভুলিতেন না, কিন্তু স্নেহের আধিক্য এবং জামাতা বাড়ী না থাকা বশতঃ বড় মিঞা সাহেব মেয়ে পাঠান অনাবশ্যক বোধে এক একটা ওজর

করিতেন, তাহাতেই এ বিষয়টী চাপা পড়িয়া যাইত। বিশেষতঃ এই সময়ে সৈয়দ সাহেবের সহিত বড় মিঞার এরূপ সদ্ভাব ছিল যে, এ সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিত না।

আজিজা বিবাহের সময়ে যখন শ্বশুরগৃহে গিয়াছিলেন, তখন শ্বশুর-শাশুড়ী তাঁহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহাদর প্রকাশ করিয়াছিলেন। ননদ প্রভৃতি অন্যান্য সকলেও সেই অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার স্বভাব-মাধুর্য্যে মুগ্ধ এবং তৎপ্রতি অনুরক্ত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। স্বামী অল্পদিনের মধ্যেই গুণবতী স্ত্রীর একান্ত পক্ষপাতী হইয়া তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছিলেন।

তৎপর পিত্রালয়ে অবস্থান কালেও আজিজা কয়েকবার স্বামী-সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন। শ্বশুর প্রতি মাসেই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং মুহুর্মুহুঃ 'বৌমা' সম্বোধনে তৎপ্রতি অতিমাত্র স্নেহ প্রকাশ করিতেন।

এইরূপ আত্মীয়তার সহিত পূর্ণ এক বৎসর গত হইয়া গেল। বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিন সাহেব একবার জামাইবাড়ী গমন করিয়া অত্যন্ত আদর-আহ্লাদের সহিত তিন চারি দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করিলেন। এই সময়ে সৈয়দ সাহেবদিগের সাংসারিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হইতে তাঁহার মনে স্বতঃই কৌতূহল উদিত হইল। তিনি এ সম্বন্ধে আবদুল হকের মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করায় তিনি অকপটে বড় মিঞা সাহেবের নিকট সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলিলেন।

উক্ত কথোপকথনের ফলে বড় মিঞা জানিতে পারিলেন যে, সৈয়দ সাহেবদিগের বাহ্যিক জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা একেবারেই অন্তঃসারশূন্য। তাঁহাদের নিত্য আহার্য্য কোরমা-পোলাও এবং ব্যবহার্য্য মূল্যবান্ সরু কাপড়ের কোনই মূল্য নাই। কারণ হিসাব করিলে তাঁহাদের সম্পত্তি ত দূরের কথা, দেহ পর্য্যন্ত ঋণপ্রদাতা মহাজনের খাস সম্পত্তিতে পরিণত

হইয়াছে। তিনি আরও জানিলেন যে, সৈয়দ সাহেব ইতিপূর্ব্বে বাড়ীর সংলগ্ন নিষ্কর মহলখানি মাত্র ঋণমুক্ত করিবার জন্য কন্যা জোবেদাকে নিম্ন বংশে বিবাহ দিয়া যে টাকা লইয়াছিলেন, এবং ঐ উদ্দেশ্যেই পুত্র আবদুল হকের বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার নিকট হইতে যে টাকা পাইয়াছিলেন, তৎসমস্তই সৈয়দ সাহেবের বিশ্বগ্রাসী উদরের ঘৃত-মাংস যোগাইতে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে; উহার এক কপর্দ্দকও ঋণপরিশোধার্থে প্রদান করা হয় নাই।

বড় মিঞা সাহেব এই সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া একান্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন; এইরূপ রাক্ষস-প্রকৃতি লোকের পুত্রের করে স্বীয় প্রাণোপম কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার মনে একটু পরিতাপেরও উদয় হইল। সহসা আবুল ফজল ও তাঁহার পিতার সৌম্য-শান্ত স্বভাবের কথা মনে করিয়া তিনি একটু বিচলিতও হইলেন। কিন্তু এ চিন্তাকে তিনি মনে স্থান দিলেন না। তিনি কন্যা-জামাতার ভবিষ্যৎ মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সৈয়দ সাহেবদিগের পৈতৃক নিষ্কর সম্পত্তি খণ্ড ঋণমুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং পরবর্ত্তী আহারের সময়ে সৈয়দ সাহেবের নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সৈয়দ সাহেব একান্ত শিষ্টতার সহিত বড় মিঞাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভাই সাহেব! কি করি? একমানুষ, সব দিক্ বজায় রাখিতে পারি না বলিয়াই এরূপ হইয়াছে। তবে আমিও একেবারে নিশ্চিন্ত নাই; কিছু টাকা হাতে আছে, আর দুই তিন শত টাকা কোন মতে যোগাড় করিতে পারিলেই নিষ্কর মহলখানি খালাস করিতে পারি; দেখি খোদায় কি করেন।"

বড় মিঞা সাহেব বলিলেন,—"দুই তিন শত টাকা হইলেই যদি মহল খালাস হয়, তবে সেজন্য আপনাকে কোনই চিন্তা করিতে

হইবে না। আপনি এই তারিখেই আমার সহিত চলুন, আমিই তিন শত টাকা দিব।"

সৈয়দ সাহেব একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিলেন,—"ভাই! সম্পত্তি আমারও যেমন, আপনারও তেমনি। আমি আর কয়দিন আছি? ইহার পরে ত আপনার মেয়ে-জামাইয়েরই সব।" অনন্তর তিনি সেই তারিখেই বড় মিঞার সহিত আলিনগরে গমনপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত টাকা লইয়া আসিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে আজিজা শ্বশুরালয়ে নীত হইলেন এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর স্নেহ-যত্নে ভাসমানা হইয়া দুই তিন মাস পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। এবার জোবেদা সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত বড়ই বিরুদ্ধা-চরণ করিত; নানা কার্য্যে, নানা কথায় আড়াআড়ি করিয়া অকারণ কলহ করিতে প্রয়াস পাইত; কিন্তু মাতার ভয়ে এবং আজিজার সহোদরাধিক স্নেহ ও ক্ষমার প্রভাবে ফলে কিছুই হইয়া উঠিত না।

পাঠক! বোধ হয়, ভুলিয়া যান নাই যে, জোবেদা সৈয়দ সাহেবের একমাত্র কন্যা। তিনি ঋণপরিশোধের জন্য এই কন্যাকেই অনেক টাকা পণ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেশীয় এক তালুকদার-বাড়ীতে বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিতও সৈয়দ সাহেবের কিছুদিন পর্য্যন্ত বেশ সদ্ভাব ছিল; কিন্তু সৈদয় সাহেবের স্বভাবগুণে তাঁহাদের দ্বারা ঋণপরিশোধ সম্ভবপর না হওয়ায় অচিরেই সদ্ভাব ছিন্ন হইয়া যায়। বিশেষতঃ জোবেদা শ্বশুরবাড়ী গিয়া দুই একদিনের বেশী থাকিতে পারিতেন না; কারণ উক্ত তালুকদার-বাড়ী নিত্য যে রাশি রাশি মোটা চাউলের ভাত ও তরকারী-সংযুক্ত মাছ মাংস রন্ধন করা হইত, জোবেদার সূক্ষ্ম উদরে তাহা একেবারেই সহ্য হইত না। এইজন্য সেখানে গেলেই তিনি একরূপ উপবাস-ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। জোবেদার স্বামী একটু উগ্রস্বভাবের পুরুষ

ছিলেন। তিনি এজন্য জোবেদাকে একটু মৃদু তিরস্কার করিয়া, তাঁহাকে আর বাপের বাড়ী পাঠাইবেন না, এরূপ ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। সৈয়দ সাহেব সে কথা অবগত হওয়া এবং পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহে বিরক্ত থাকা বশতঃ জোবেদাকে আর ছোট লোকের বাড়ী পাঠাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন ; ফলে জোবেদা একাদিক্রমে বহুদিন যাবৎ পিত্রালয়েই অবস্থান করিতেছিলেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহার মনে আদৌ সুখ-শান্তি ছিল না। সুতরাং আজিজাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তিনি কথঞ্চিৎ মনের ক্ষোভ মিটাইতে চাহিতেন।

যাহা হউক, কিছুদিন পরে বড় মিঞা যখন মেয়ে আনিতে গেলেন, তখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত ঋণ পরিশোধ করা হয় নাই। অধিকন্তু মহাজন নালিশ করিয়া ডিক্রি করিয়াছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সৈয়দ সাহেব বিবিধ অপরিহার্য্য খরচের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বড় মিঞা তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া বরং ক্ষুণ্ণমনে ও বিরক্তির সহিত কন্যা লইয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন।

কিয়দ্দিবস অন্তে সৈয়দ সাহেব বধূমাতাকে দেখিবার জন্য আলিনগরে আসিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত ডিক্রির কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য বড় মিঞার নিকট একশত টাকা ধার চাহিলেন। কিন্তু বড় মিঞা সাহেব ধার দেওয়া নিষ্ফল মনে করিয়া পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী সৈয়দ সাহেবের মান্ত-স্বরূপ দশটী টাকা মাত্র প্রদান করিলেন। সৈয়দ সাহেব তাচ্ছিল্যের সহিত তাহা ফেলিয়া দিয়া এবং চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বধূমাতাকে আশীর্ব্বাদ করার কথা বিস্মৃত হইয়া ক্রোধিত ভাবে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনা হইতেই আত্মীয়তার প্রীতিপূর্ণ উর্ব্বর ক্ষেত্রে এক অসদ্ভাবের অশান্তিময় বীজ রোপিত হইল।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সংসার-জীবন।

গ্রীষ্মকাল সমাগত। ক্রমে ক্রমে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা-মকতুব প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ হইতে লাগিল। দীর্ঘকালের কর্ম্মক্লান্ত বালকণ্ঠ-মুখরিত শিক্ষালয়গুলি যেন গ্রীষ্মাবকাশে কিছুদিনের জন্য নীরবে বিশ্রাম-শয্যায় শায়িত হইল। কত পিতা-মাতা নয়নানন্দকর নন্দনের মুখচন্দ্র দর্শনের আশার আশাকুল অন্তঃকরণে পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; কত ভ্রাতা-ভগিনী প্রিয়তম সহোদরের সহিত সংমিলনের আশায় নিত্য দিন গণিতে আরম্ভ করিল; কত যুবতী ও বালিকা আগ্রহ-ভরা সলাজ অন্তঃ-করণে রমণী-জীবনের চিরানন্দকর প্রাণপতির সহবাস-সুখাশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে বিদেশবাসী কত যুবক ও কত বালক জনক-জননীর স্নেহ-শীতল ক্রোড়স্পর্শে শান্তিলাভ করিবার আশায়, কেহ কেহ বা ভ্রাতা-ভগিনীর সুনির্ম্মল প্রীতিপূর্ণ সংসর্গ লাভের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য গৃহে ছুটিয়া চলিল। কেহ বা হৃদয়কোণে লুক্কায়িত বালিকা বা যুবতী পত্নীর মুখচন্দ্রিমা দর্শন-আশায় আকুলপ্রাণে গৃহগমনোদ্যত হইল। গ্রীষ্মাবকাশ বঙ্গীয় বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীগণের এক মহা সম্মিলনী।

আজিজা আশাভরা অন্তঃকরণে বহুদিন হইতে প্রিয়পতির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কারণ আবদুল হক প্রত্যেক বন্ধের প্রারম্ভে শ্বশুরালয়ে আগমন করিয়া বন্ধের অধিকাংশ সময় সেই স্থানেই অবস্থান

করিতেন। কিন্তু এবার নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইল; আবদুল হক আলিনগরে আসিলেন না। আজিজা নিত্য আকুল-নেত্রে পথ অবলোকন করিতেন, কিন্তু একদিনও তাঁহার অন্তরের আশা ফলবতী হইত না। বালিকা ভাবিতেন, তবে কি তিনি এবার বাড়ী আসেন নাই? অথবা তাঁহার কি কোন অসুখ করিয়াছে?—এই চিন্তায় বালিকা মর্ম্ম-বেদনায় অধীর হইয়া উঠিতেন; অলক্ষ্যে অশ্রু-বিন্দু নির্গত হইয়া তাঁহার গণ্ড সিক্ত করিয়া দিত। কিন্তু আজিজা অতি সতর্কতার সহিত দেলজানের কুটিল দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতেন; ভ্রমেও স্বীয় হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য বা কাতরতা প্রকাশ হইতে দিতেন না। ক্রমে বৈশাখ মাস গত হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ অতীত হইল; তথাপি আবদুল হক আলিনগরে আসিলেন না; এইবার আজিজা একান্ত বিচলিতা হইয়া পড়িলেন; দেলজান তাঁহার কাতরতা ধরিতে সক্ষম হইলেন।

বড় মিঞা সাহেব মামলা-মোকর্দ্দমায় অতিমাত্র ব্যস্ত থাকার দরুণ এ বিষয় আদৌ মনোযোগ দিতে পারেন নাই; আবদুল হককে আসিবার জন্য তিনি দুই তিন খান পত্র লিখিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন।

একদা নৈশ ভোজনান্তে বড় মিঞা সাহেব পান চিবাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেলজান বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,—"এবার জামাই আসিল না, মেয়ে যে ভাবিয়া ভাবিয়া কালা হইয়া গেল।"

দেলজানের বাক্যে বড় মিঞার চৈতন্য হইল; তিনি পরদিন প্রাতঃকালে সর্ব্বপ্রথমে আবদুল হককে আনিবার জন্য পত্রসহ লোক প্রেরণ করিলেন।"

একদিন অন্তেই লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"সৈয়দ সাহেব পুত্র পাঠাইলেন না; বিশেষতঃ তিনি আর যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'ছোট লোকের মেয়ের সহিত পুত্রের বিবাহ দেওয়া অতি

অন্যায় কার্য্য হইয়াছে ; কারণ তাহারা আদর যত্ন ও ভদ্রতা প্রভৃতি কিছুই জানে না ! নচেৎ একমাস পুত্র বাড়ী আসিয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাকে লইয়া যাইবার কথা নাই ; অতএব এরূপ স্থলে যাওয়া আমরা অপমান বোধ করি ; তবে পুত্রবধূকে ত আর ফেলিয়া দেওয়া চলে না ; আমিই দুই তিন দিনের মধ্যে বধূমাতাকে লইয়া আসিতেছি' ।"—ইত্যাদি ।

বড় মিঞা শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া গেলেন। তিনি বুঝিলেন, টাকা না দেওয়াতেই সৈয়দ সাহেব এই খেলা খেলিয়াছেন ; নচেৎ পূর্ব্বে তিনি বিনা আহ্বানে পুত্র পাঠাইয়াছেন,—নিজেও আসিয়াছেন ; আর এবার লোক পাঠানেও মান রক্ষা হইল না ! কিন্তু অনবরত টাকা দিয়া আত্মীয়তা রাখা অসম্ভব ; খোদা যাহা করেন, তাহাই হইবে ।

কিন্তু কিছু ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্ব্বেই আজিজাকে লইয়া যাইবার জন্য সৈয়দ সাহেবের প্রেরিত পাল্কী ও লোক উপস্থিত হইল। তিনি বিরক্ত হইয়া ভাবিলেন, মেয়ে পাঠাইয়া কাজ নাই ; দেখা যাক কি হয়। কিন্তু তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া দেলজানের দ্বারা আজিজার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। আজিজা সলজ্জ ভাবে নানা কারণ দেখাইয়া, "যাওয়াই সঙ্গত"—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। দেলজান তাঁহার কথার মাথা-মুণ্ডু বুঝিতে না পরিয়াই হউক, কিংবা স্বীয় স্বভাব-গুণেই হউক, বড় মিঞার নিকট আসিয়া স্পষ্ট বলিলেন,—"মেয়ে সেখানে যাইতে চাহে।" বড়মিঞা শুনিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু যথাযোগ্য আয়োজন করিয়া মেয়ে পাঠাইয়া দিলেন ।

আজিজা এবার শ্বশুরালয়ে গিয়া পূর্ব্ব ব্যবহারের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। শ্বশুরের সে স্নেহ-সম্বোধন নাই ; শাশুড়ীর সে আদর যত্নের একান্তই অভাব। সর্ব্বোপরি জোবেদার দৌরাত্ম্য চরমে উঠিয়াছে। আজিজাকে অপদস্থ করা যেন তাঁহার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্যে পরিণত

হইয়াছে। আজিজা সর্ব্বপ্রথমে জোবেদার দ্বারাই "ছোট লোকের মেয়ে" বলিয়া সম্বোধিত হইলেন। তিনি পিতৃনিন্দায় একান্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—"ভগিনি! আপনি আমাকে যত ইচ্ছা গালাগালি দিন, মন্দ বলুন, তাহাতে আমি দুঃখিত হইব না। কিন্তু আমার পিতা ত আমার ন্যায় আপনারও মুরব্বী *! সুতরাং তাঁহাকে মন্দ বলিয়া কি ফল?" জোবেদা আজিজার প্রতি গর্ব্বস্ফীত নয়নের তীব্র কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া বলিলেন,—"ছোট লোক, চাষা আবার মুরব্বী! ওরূপ মুরব্বী মানিতে গেলে আর চলে না।"

আজিজা। সে হিসাবে আপনার স্বামীও ত সৈয়দ বা তদনুরূপ কুলীন নহেন! আপনি কি তাঁহাকে মান্য করিবেন না?

জোবেদা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া মুখে যাহা আসে, তাহাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

আজিজা কিছু বলার পূর্ব্বেই জোবেদা বলিলেন,—"ছোট লোকের মেয়ে" বলায় তোমার বৌ একেবারে জ্বলিয়া গিয়াছেন। যাঁকে তাঁকে যা ইচ্ছা, তাই বল্‌তে চান।"

আজিজা। আমি ত কাকেও কিছু বলি নাই; আপনিই আমার পিতাকে ছোটলোক, চাষা—যা ইচ্ছা তাই বলিয়াছেন।

আজিজার শাশুড়ী বলিলেন,—"থাক বাপু! আর শুনিয়া কাজ নাই। তোমার বাপের ব্যবহার মুচী-মেথরের চেয়েও অধম; চাষা, ছোট লোক কোথায় লাগে!" অনন্তর কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার বাপু এ সব কথায় কাজ নাই। তুমি কারও সঙ্গে কিছু বল্‌তে যেও না।"

* মুরব্বী—গুরুজন।

"ও! কথা না বলিলে আমার ভারি মান কমিয়া যাইবে"—বলিয়া জোবেদা তথা হইতে সগর্ব্বপদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। আজিজা ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন,—"আমি ত অন্যায় কিছুই বলি নাই; আমার বাপ যে নামজাদা ভদ্রলোক নহেন, তাহা ত আপনারা আগেই জানিতেন; এখন আর তাহা বলিয়া ফল কি?"

শাশুড়ী। থাক্ বাপু! আপনি ঠগ্‌লে বাপ্‌কে বল্‌তে নাই। ছোট লোকের সঙ্গে নসব * কর্‌লে ওরূপ হয়েই থাকে! ভাল মানুষ কখনও শও পঞ্চাশ টাকার জন্য অমন চামারের মত মুখ কর্‌তে পারে না।—বলিয়া তিনিও চলিয়া গেলেন।

আজিজা ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে গমন করিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিলেন।

কিন্তু আজিজার প্রতি আবদুল হকের ব্যবহারে কোনই ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আবদুল হক তাঁহাকে পূর্ব্বের মতনই প্রাণ ভরিয়া ভাল-বাসিতেন এবং স্নেহ-সম্বোধনে ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে তাঁহার তুষ্টি সম্পাদনে ব্যস্ত হইতেন। আজিজাও প্রাণ দিয়া পতির সেবা ও তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিয়াই হৃদয়ের সকল জ্বালা নির্ব্বাণ করিতেন।

কিন্তু সৈয়দ সাহেব আবদুল হকের মনেও বড় মিঞার সম্বন্ধে হীন ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন। আজিজা পিতার সম্বন্ধে পতির এই অন্যায় ধারণা অবগত হইয়া মর্ম্মাহত হইলেন, এবং এ সম্বন্ধে স্বামীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে দুই একবার আবদুল হকের মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে যত্নবান্ হইলেন; কিন্তু ফলে দেখিলেন যে, আবদুল হক উহা আলোচনা করিতে একেবারেই উদাসীন। সুতরাং তিনি আপাততঃ এ চেষ্টায় ক্ষান্ত হওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন।

---

* নসব—সম্বন্ধ।

আজিজার প্রতি আবদুল হকের সদ্ব্যহার জোবেদার নয়নে একেবারেই সহ্য হইত না। তিনি এ জন্য অপ্রাসঙ্গিক ভাবে আজিজাকে যেরূপ জ্বালাতন করিতেন, আজিজার সত্য মিথ্যা দোষ ত্রুটী আবদুল হকের কাণে তুলিয়া তাঁহার মন ভাঙ্গিতেও সেইরূপ প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু স্বভাবের পার্থক্যহেতু আবদুল হক জোবেদাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না; সুতরাং তাঁহার কথা ত অগ্রাহ্য করিতেনই, অধিকন্তু আজিজাকে চিন্তান্বিত বা বিষাদাচ্ছন্ন দেখিলেই জোবেদা কোন দুর্ব্যবহার করে কিনা, তাহা জানিতে চেষ্টিত হইতেন; কিন্তু আজিজা স্বাভাবিক মধুর স্বভাবগুণে কিছুই বলিতেন না।

এইরূপে গ্রীষ্মকাল গত হইল। আবদুল হক পড়িবার জন্য কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

শত্রুকে সহায়শূন্য একাকী পাইলে শত্রুর মনে যেরূপ আনন্দ হয়, আবদুল হক চলিয়া যাওয়ায় আজিজাকে একাকিনী পাইয়া জোবেদার মনেও তেমনি আনন্দ হইল। তিনি এইবার বিদ্বেষসম্ভূত যতগুলি বাণ রচিত হইতে পারে, একে একে রচনা করিয়া আজিজার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। জোবেদা মাতার অত্যধিক প্রশ্রয়ে পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশ্যভাবে আজিজাকে অহঃরহ দুর্ব্বাক্য বলিতেন। কিন্তু এখন হইতে তিনি কেবল দুর্ব্বাক্য বলিয়াই ক্ষান্ত না থাকিয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন।

আবদুল হক কলিকাতা যাওয়ায় তিন চারি দিন পরে জোবেদা আজিজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ভাবি সাহেব! আমাদের একটা বাঁদী, সেও এখন বুড়া হইয়াছে। সে আপনার অত কাজ-কর্ম্ম করিতে পারিবে না। আপনি বাপের বাড়ী হইতে বাঁদী * আনাইয়া লউন।"

* বাঁদী—দাসী।

আজিজা। একজন বাঁদী আনান কিছু কঠিন নহে। কিন্তু আমার কাজের মধ্যে ত গোসল করার এক কলসী পানি আনা! ইহারই জন্য সংসারে এক জন বাঁদী বাড়াইলে কি ভাল হইবে?"

জোবেদা। কেবল গোসল করার এক কল্সী বুঝি! পাঁচ ওক্ত ওজু করায় পাঁচ কলসী, কাপড় ধোয়ার সাত কলসী, এগুলি কে আনে? আপনার কাপড় চোপড় কে ধুইয়া দেয়? আপনার ঘরই বা কে লেপিয়া দিবে?

আজিজা। (রহস্যভাবে) আপনার ফর্দ্দের দুই একটী কাজ না হয় আপনিই করিয়া দিবেন। ভ্রাতৃবধূর কাজ করিলে ত আর কেহ বাঁদী বলিবে না?

জোবেদা। (ক্রোধের সাহিত) ছোট মুখে বড় কথা! আমি ত আর কেউর বাপের বাড়ীর বাঁদী নই। ফের আমার সহিত ওরূপ কথা কইলে ভাল হইবে না' ব'লে দিচ্ছি!

আজিজা। আচ্ছা ভাই মাফ করুন। কিন্তু আমি এক জন বাঁদী আনিলে তার খরচ ত আপনাদিগকেই দিতে হইবে?

জোবেদা। ভারি মজা আর কি? পরে খরচ দিবে, আর উনি বাঁদীর বিবি হইবেন! যার যার বাঁদীর খরচ তাকেই দিতে হইবে।

আজিজা। আমি খরচ দিব কোথা হইতে?

জোবেদা। কেন, বাপের বাড়ী হইতে।

আজিজা। তিনি ত আপনাদের মতে ছোট লোক; যদি তিনি না দেন?

জোবেদা। আমি অত উকিলি জেরা জানি না। ভালয় ভালয় বলিয়া দিলাম। না শুনিলে নিজের পানি ঘাট হইতে নিজে আনিয়া লইতে হইবে এবং নিজের কাপড় নিজে ধুইতে হইবে।

আজিজা। আমি ঘাটে গেলে আপনাদের মান থাকিবে ত?

জোবেদা। ছোট লোকের মেয়ে ঘাটে গেলে আমাদের মানের কিছুই হইবে না।

আজিজা। ছোট লোকের মেয়ে হইলেও আপনাদের বাড়ীর বৌ ত?

জোবেদা। ভাল মানুষের বাড়ী ওরূপ দুই চারিটা বৌ থাকে।

আজিজা। সত্যি নাকি? আচ্ছা বেশ! আমিও বোধ হয় তেমনি একটী। তবে আমি না হয় ঘাটে যাইয়াই পানি আনিব।

জোবেদা। কাজেই যাইতে হইবে!

আজিজা। কবে হইতে? আজই কি?

জোবেদা। আমি অত খবর জানি না। আপনি আমার চুলগুলি বাঁধিয়া দিন ত দিন, নয় মার কাছে যাই। আমার কাজ আছে।

আজিজা জানিতেন, মাতা ভ্রমেও কন্যার চুল বাঁধিয়া দেন না। সুতরাং তিনি একটু মৃদু হাস্য করিয়া সযত্নে জোবেদার চুল বাঁধিয়া দিলেন, এবং সেই সঙ্গে তাড়াতাড়ি নিজের চুলগুলি বাঁধিয়া লইয়া রন্ধন করিতে গেলেন।

কিন্তু সহস্র প্রকারে কৃতজ্ঞ ও উপকৃত হইয়াও জোবেদা নিজ স্বভাব ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার ইঙ্গিতে নিত্য আজিজার ওজু-গোছলের পানির অনাটন ও বিবিধ প্রকারের অসুবিধা হইতে লাগিল। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া বাড়ীময় ওজুর পানি তালাস করিয়া পাইতেন না। এজন্য তিনি রাত্রেই ওজুর জন্য পরিমিত পানি গৃহে লইয়া রাখিয়া দিতেন। কিন্তু ইহাও জোবেদার সহ্য হইত না। তিনি আজিজার গৃহেই থাকিতেন এবং কৌশলে রাত্রেই আজিজার সংগৃহীত পানিটুকু ফেলিয়া দিতেন। সুতরাং অজু করিয়া নামাজ পড়িতে আজিজার নিত্যই বেলা হইতে লাগিল এবং তজ্জন্য সৈয়দ সাহেবের নাস্তা প্রস্তুত হইতেও নিত্য দেরী

হইতে লাগিল। আজিজা শাশুড়ীর নিকট বলিয়া ইহার কোনই প্রতীকার করিতে পারিলেন না।

সৈয়দ সাহেব কয়েক দিন পরে এক দিন আজিজাকে বলিলেন, "মা, তুমি একটু সকালে উঠিও; নাস্তা খাইতে বেলা হইলে আমার বড় কষ্ট হয়।"

আজিজা মৃদু-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"আমি সকালেই উঠি, কিন্তু ওজুর পানি না থাকায় নামাজ পড়িতে দেরী হয়।"

সৈয়দ সাহেব তদ্দণ্ডে প্রৌঢ়া দাসীকে ডাকিয়া তীব্র কণ্ঠে কৈফিয়ত তলব করিলেন,—"ওজুর পানি থাকে না কেন?"

দাসী ভয়াকুল স্বরে বলিল,—"আমার দোষ কি? জোবেদা বাড়ীতে পানি রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

সৈয়দ সাহেব কঠোর ভাবে বলিলেন, "তুই রোজ রাত্রে সব পানির কলসী ভরিয়া রাখিবি। ফের যদি সকালে বাড়ীতে পানি নাই কখনও শুনি, তোর পিঠের চামড়া থাকিবে না।"—এই দিন হইতে আজিজার প্রভাতের পানির কষ্ট দূরীভূত হইল।

বড় মিঞার উপর সৈয়দ সাহেবের যতই আক্রোশ থাকুক, অকারণে বধূকে জ্বালাতন করা তিনি আদৌ সঙ্গত মনে করিতেন না। তবে পিতার সঙ্গে সঙ্গে আজিজার উপরও যে সৈয়দ সাহেবের একটু বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু আজিজা যেরূপ প্রাণপণে তাঁহার সেবা যত্ন করিতেন, তাহাতে স্বভাবতঃই তাঁহার হৃদয় তৎপ্রতি স্নেহপ্রবণ হইয়াছিল।

আজিজা তৈল ও পানির অভাবে সময় মত স্নান করিতে পারিতেন না। তৈল ও পান-সুপারি প্রভৃতি জোবেদা যে কোথায় লুকাইয়া রাখিতেন, কাকেও তাহার সন্ধানে সমর্থ হইত না।

স্নানের পানি আনার সময়ে জোবেদা বাঁদীকে অন্য কাজে নিযুক্ত রাখিতেন। সুতরাং আজিজা অনেক দিন স্নান না করিয়াই সৈয়দ সাহেবকে খাবার দিতেন। শাশুড়ীর নিকট এ বিষয়ের অনুযোগও পূর্ব্ববৎ নিষ্ফল হইল।

এক দিন আজিজা দুই প্রহরের সময়ে যখন বিনা স্নানে সৈয়দ সাহেবকে খাবার দিতেছিলেন, তখন সৈয়দ সাহেব তাঁহার রন্ধনময়লাযুক্ত বস্ত্রাদি দেখিয়া বলিলেন,—"মা তুমি গোসল কর নাই? রন্ধন করিয়া সকালে সকালে গোসল করিয়া ফেলিও।" আজিজা কোন কথা বলিলেন না। তিন চারি দিন পরে আর এক দিন সৈয়দ সাহেব মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেছিলেন; আজিজা খাবার দিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বাতাস দিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার ময়লা কাপড় দেখিয়া সৈয়দ সাহেব সহসা তদীয় মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন, তাঁহার মুখখানি একান্ত বিশুষ্ক। তৈলহীন রুক্ষ কেশজাল ঘর্ম্মসিক্ত কপালের উপর বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সৈয়দ সাহেবের মনে একটু সন্দেহ হইল। তিনি একটু রূঢ় ভাবেই আজিজাকে বলিলেন, "মা! আমি ত তোমাকে সকালে সকালে গোসল করিতে বলিয়াছি; গোসল কর নাই কেন?"

আজিজা নেত্রদ্বয় ভূমিসংলগ্ন করিয়া অতি নম্রস্বরে বলিলেন, "বাড়ীতে পানি নাই।"

এইবার সৈয়দ সাহেবের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি অর্দ্ধ-পরিমিত আহার করিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন, এবং বাহিরে যাইতে সম্মুখেই দাসীকে দেখিয়া সজোরে তাহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক নির্দ্দয়-ভাবে চর্ম্মচটিকা প্রহার করিতে লাগিলেন। দাসী জোবেদার দোষ দিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে বিবি সাহেবা আসিয়া বলিলেন

"হইয়াছে কি?" সৈয়দ সাহেব ক্রোধের সহিত বলিলেন,—"তোমার মেয়ের বাড়াবাড়ি ভাল নহে, বলিয়া দিতেছি।"

বিবি সাহেবার যত রাগ আজিজার উপর পতিত হইল। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ও! বুঝিয়াছি; মেয়ে সকলের চোখের কাঁটা হইয়াছে; আচ্ছা আমি ওকে এখান হইতে পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছি।"

আজিজা বিনীত ভাবে শাশুড়ীর নিকট স্বীয় নির্দ্দোষিতা ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা আদৌ বিশ্বাস না করিয়া বরং সৈয়দ সাহেবের নিকট বলার জন্য তৎপ্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "আমরাও শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করিয়াছি; কিন্তু কোটনা কথা বলা ত দূরের কথা, কোন দিন মুখের দিকেও তাকাইয়া দেখি নাই। কলিকালে সবই সম্ভব! পোড়াকপালে মেয়েটাকে এক হতচ্ছাড়া বংশে বিয়া দিয়াছি; নইলে ও সকলের চোখের কাঁটা হইবে কেন? আচ্ছা আমি ওকে পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছি, সকলের আপদ ঘুচিয়া যাইবে।"

আজিজা শাশুড়ীর বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, জীবন গেলেও আর শ্বশুরের নিকট কোন কথা বলিবেন না। আর বলিলেই বা কি হইবে? তিনি পুরুষ মানুষ; দৈবাৎ কোন একটা বিষয় চক্ষু বা কর্ণগোচর হইলে না হয় তিনি তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবেন। কিন্তু আহারে, বিহারে, শয়নে, উপবেশনে এমন কি, সংসার-জীবনের প্রতি কার্য্যে নারীজীবনে যে সমস্ত অসুবিধা সূচিত হইতে পারে, তিনি তাহার কি করিতে পারেন? সুতরাং শাশুড়ী-ননদের বিদ্বেষবশতঃ দারুণ অসুবিধা ও অশান্তির মধ্যে আজিজার সংসার-জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল!

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

আবুল ফজল ও চক সাহেব।

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, আবুল ফজল কলিকাতা হইতে পীড়িত হইয়া পিতার সহিত বাড়ী আসেন। তৎপরে তিনি প্রায় মাসাবধি রোগ-শয্যায় শায়িত থাকিয়া আরোগ্য লাভ করেন। পরবর্ত্তী দুই তিন মাসে তাঁহার স্বাস্থ্যও অনেক ভাল হইল; কিন্তু তাঁহার চির প্রফুল্ল সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডলের বিষাদাচ্ছন্ন মলিন ভাব আর কিছুতেই অপনোদন হইল না। বিষকীটাহত অর্দ্ধস্ফুট কুসুমের ন্যায় তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট বদন ও শোকতপ্ত নিরুদ্যম নয়নজ্যোতিঃ পিতা, মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট বড়ই নিরানন্দকর হইয়া উঠিল। কিন্তু আফতাবউদ্দিন মিঞা এ সম্বন্ধে পুত্রকে প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া তাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের ভার সম্পূর্ণরূপে খোদাতালার উপর নির্ভর করিলেন।

গ্রীষ্মাবকাশ অন্তে আবুল ফজল পড়িবার জন্য আবশ্যক ব্যয় ভূষণ লইয়া ফরিদপুর যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মাতা পুত্রকে স্নেহসম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাবা! তুমি ত নির্ব্বোধ নও; তবে কেন খোদার মর্জিতে সন্তুষ্ট না হইয়া বৃথা ভাবিয়া ভাবিয়া দেহ মন খারাপ করিতেছ? তুমি তোমার পবিত্র বংশের এক মাত্র আশা ভরসা এবং পিতা-মাতার এক মাত্র পুত্রসন্তান। তোমার মুখ চাহিয়াই আমরা যত দুঃখ-কষ্ট ও আপদ-বিপদ নীরবে সহ্য করিতেছি। সমস্ত কাজে খোদার উপর নির্ভরপূর্ব্বক তোমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার মুখ চাহিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিও।"

আবুল ফজলের মাতা কিরূপ প্রকৃতির রমণী, আমরা এতক্ষণ তাহার উল্লেখ করিতে অবসর পাই নাই। বিশেষতঃ উপাখ্যানের প্রথম অংশে আজিজার মাতার ন্যায় মহিমময়ী উচ্চপ্রকৃতি রমণীর গৌরবপূর্ণ চিত্রের পার্শ্বে অন্য চিত্র অঙ্কন করিতে আমরা স্বভাবতঃই শঙ্কিত হইয়াছি। যাহা হউক, এইবার আমরা আবুল ফজলের মাতার পরিচয় দিব। আবুল ফজলের মাতা একজন ধনবান্ তালুকদারের কন্যা। বাল্যকালে ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মধ্যে প্রতিপালিতা হইলেও তাঁহার মধুর প্রকৃতিই তাঁহাকে ভিন্নরূপে গঠিত করিয়াছে। তিনি ধর্ম্মপরায়ণা, নিরভিমানী, প্রখরবুদ্ধি-বিহীনা, শান্ত ও নম্রস্বভাবা রমণী। অসন্তুষ্টি, অভিমান, বিচক্ষণতা ও বিদ্বেষের ক্ষীণ ছায়াও তাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি আজীবন ক্ষণেকের জন্যও কখন স্বামি-পরিজনের অসন্তুষ্টি উৎপাদন এমন কি, স্বীয় গর্ভজাত পুত্র-কন্যাদিগকেও কদাপি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়া তিরস্কার করেন নাই। তাঁহার অমায়িক নম্র স্বভাবে মুগ্ধ না হয়, জগতে বোধ হয় এমন হৃদয় বিরল।

আবুল ফজল মাতার বাক্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাবতীয় দুশ্চিন্তার মূল হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে তিনি পদে পদে ব্যর্থকাম হইতে লাগিলেন। যে আজিজার চিন্তা তিনি সযত্নে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টিত হইতে লাগিলেন, সে চিন্তা প্রবলতর হইয়া অহরহঃ তাঁহার মর্ম্মস্থল দংশন করিতে লাগিল।

একদা আবুল ফজল সান্ধ্য-প্রার্থনা অন্তে মোনাজাত * করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিয়াছেন, এমন সময়ে আজিজার চিন্তা তাঁহার চিত্তকে বিষম আন্দোলিত করিয়া তুলিল। অলক্ষ্যে অশ্রু নির্গত হইয়া

* মোনাজাত—প্রার্থনা।

তাঁহার গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া গেল। আবুল ফজল মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া দেখিলেন, নিজের কল্যাণ সাধন ও পিতামাতার উপদেশ পালন প্রভৃতির জন্য পরস্ত্রীর পাপ চিন্তা বিসর্জ্জন দিতে তিনি যতই চেষ্টা করিতেছেন, ততই তিনি সেই ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছেন। তখন তিনি যেন একান্ত নিরুপায় হইয়া কাতরকণ্ঠে সেই উত্তোলিত হস্তেই খোদাতালার সমীপে প্রার্থনা করিলেন,—"প্রভো! আমার মনের যাতনা ও চেষ্টা সবই তুমি জান। তুমি শক্তি না দিলে আমি কিছুতেই এ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। করুণাময়! তুমিই দয়া করিয়া তোমার এ অধম দাসকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দাও।"

ভক্তের করুণ প্রার্থনা ভক্তরঞ্জন খোদাতালার নিকট উপেক্ষিত হইল না। পর দিবস ফরিদপুরে মওলানা * শাহ † সুফী ‡ জাফর হোসেনী নামক একজন বিখ্যাত পীর § শুভাগমন করিলেন। স্থানীয় সমস্ত ধার্ম্মিক মোসলমান তাঁহার পবিত্র হস্তে বয়েৎ ¶ হইয়া দীক্ষাগ্রহণ করিতে লাগিলেন। আবুল ফজলও স্বীয় বেদনাভরা হৃদয় লইয়া পীর সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। আল্লার অনুগ্রহে পীর সাহেবের করুণ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। তিনি সস্নেহে তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহার সমস্ত অবস্থা অবগত হইলেন। অনন্তর আজিজার মাতা যেরূপ উপদেশের দ্বারা আজিজার হৃদয় শান্ত করিয়াছিলেন, পীর সাহেব সেই শ্রেণীর উচ্চ-তত্ত্বের উপদেশ দ্বারা তাঁহার চিন্তাভার লাঘব এবং অন্তরের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য নিয়মিত অজিফা ††শিক্ষা দিয়া তাঁহার কল্যাণের জন্য খোদার নিকট শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। অনুগৃহীত ভক্তের আশীর্ব্বাদ

* মওলানা—মহামান্য প্রভু; † শাহ—সম্রাট্, ধর্ম্মাধিপতি।
‡ সুফী—বিরাগী পুরুষ। § পীর—গুরু; ¶ বয়েত—দীক্ষা।
†† অজিফা—জপবাক্য, আরাধনা বিশেষ।

খোদার নিকট বিফল হয় না; আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গেই আবুল ফজলের হৃদয়ভার অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। তিনি তৃপ্তমনে খোদাতালার গুণানুবাদ করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাগত হইলেন।

বড় মিঞার সহিত বিবিধ মামলা মোকর্দ্দমায় লিপ্ত থাকা হেতু আবুল ফজলের পড়ার ব্যয় সঙ্কুলান আফতাব-উদ্দিন মিঞার পক্ষে একান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি পুত্রকে এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া কোনরূপে কায়ক্লেশে তাঁহার মাসিক ব্যয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ফরিদপুরে একজন মোসলমান জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আগমন করিলেন। তিনি স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট স্বীয় শিশু পুত্রের জন্য জনৈক সদ্বংশ-জাত সচ্চরিত্র গৃহশিক্ষক চাহিলেন। হেড মাষ্টার আবুল ফজলকে নির্ব্বাচিত করায় তিনিই তথায় সাগ্রহে নিযুক্ত হইলেন এবং আফতাব-উদ্দিন মিঞাও এক গুরুভার হইতে আপাততঃ অব্যাহতি পাইয়া খোদার শোকর * করিলেন।

প্রতিভা কখনও চিরকাল অপরিজ্ঞাত থাকে না। মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আবুল ফজলের সুপ্ত প্রতিভা উদ্দিপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি পর বৎসর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অতি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার স্থান অধিকার করিলেন। তাঁহার যশে দেশ ভরিয়া গেল। বঙ্গের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তৎপ্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। তিনি পিতামাতার তুষ্টি সম্পাদনের সহিত দেশ ও সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়া কলিকাতা কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন।

আবুল ফজল কলিকাতা যাইবার সময়ে যে জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। তিনি আবুল ফজলকে বিশেষ সমাদর করিয়া তাঁহাকে একখান পত্র প্রদান করিলেন। পত্র জনৈক

---

* শোকর—কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ।

বিখ্যাত বস্ত্র-ব্যবসায়ীর নামে প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি পত্র পাঠ আনন্দের সহিত আবুল ফজলকে থাকিবার জন্য তাঁহার প্রাসাদতুল্য হর্ম্ম্যের এক বিস্তৃত দ্বিতল কক্ষ প্রদান করিলেন। আবুল ফজল সেই স্থানে থাকিয়া বিশেষ সুখ-স্বচ্ছন্দের সহিত প্রাপ্ত বৃত্তির দ্বারা স্বীয় অধ্যয়নজনিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অমায়িক ব্যবহার ও চরিত্র-মাধুর্য্যে অল্প দিনের মধ্যেই ছাত্রসমাজে তাঁহার নাম বিশেষভাবে সমাদৃত হইতে লাগিল।

আবুল ফজল যে বৎসর কলিকাতা যাইয়া কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন, আবদুল হক সেই বৎসর দ্বিতীয় বাৎসরিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি এই বৎসর মেস পরিত্যাগ করিয়া হোষ্টেলে আসিয়াছেন। তিনি পিতারই ন্যায় অপব্যয়ী ছিলেন; সুতরাং গভর্ণমেণ্ট হোষ্টেলে থাকিয়া নবাবী চালচলন বজায় রাখিতে শ্বশুরের প্রদত্ত পঁচিশ টাকা তাঁহার পক্ষে একেবারেই যথেষ্ট নহে। এই জন্য তিনি প্রত্যেক মাসেই বড় মিঞার নিকট দশ পনর টাকা অতিরিক্ত চাহিয়া পাঠাইতেন। বড় মিঞা সাহেবও কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিরাপত্যে উহা প্রদান করিতেন।

আবদুল হকের গুণের মধ্যে তিনি অতি সুন্দর ইংরাজী বলিতে পারিতেন। এই জন্য সমশ্রেণীতে 'হক সাহেব' বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু তাঁহার কুলগত দম্ভ ও অত্যধিক বাবুয়ানার জন্য সকলেই তৎপ্রতি একটু বিরক্ত ছিলেন।

আবদুল হক যে হোষ্টেলে থাকিতেন, আবুল ফজল অনেক সময়ে সমশ্রেণীয় বালকগণের সহিত সেই হোষ্টেলে যাইতেন। উক্ত বালকদ্বয় উভয়েই সদ্বংশজাত ও একদেশবাসী; সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই উভয়ের সহিত উভয়ের পরিচয় হইল। তাঁহাদের পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি থাকিল না। আবদুল হক প্রতিযোগিতা

ক্ষেত্রে নিজকে বিজেতা মনে করিয়া আবুল ফজলের উপর একটু দম্ভের দৃষ্টি প্রতিফলিত করিতে চেষ্টিত হইতেন, কিন্তু ছাত্রসমাজে অনুদিন তাঁহার প্রভাবের বিকাশ দেখিয়া তাহাতে সাহসী হইতেন না। আবুল ফজল বরং "আজিজা অযোগ্য পাত্রে অর্পিতা হন নাই"—মনে করিয়া আন্তরিক বিষাদের মধ্যেও একটা অনাবিল শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহার এই আনন্দে আবিলতা স্পর্শ করিয়াছিল, আমর নিম্নে উহার কারণ বিবৃত করিতেছি।

আবুল ফজল হোষ্টেলে যাইতে যাইতে উহার প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, ছাত্রগণের উচ্চ শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন শ্রেণী পর্য্যন্ত সকলেই এক বিজাতীয় বিকৃত আদর্শের অনুসরণ করিতেছে। মাদ্রাসার ছাত্রগণ পর্য্যন্ত উহার প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। তাঁহাদের আহার-বিহারে, বসন-ভূষণে ও শয়ন-উপবেশনে সর্ব্বত্রই এক বিকৃত ব্যভিচার বিদ্যমান। ধর্ম্ম ও সামাজিকতার সহিত তাঁহাদের জীবনের কোনই সম্বন্ধ নাই। তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে নিত্য আট ঘটিকার সময়ে নিদ্রা হইতে সুকোমল সুমার্জ্জিত দেহখানি তুলিয়া শয্যায় বসিয়াই নিদ্রালস ঢুলু ঢুলু নয়নে টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া দর্পণ, চিরুণী, ব্রাস, ক্ষুর, শান এবং দুই তিন রকম সাবান ও পাউডার বাহির করিয়া টেবিলের উপর সজ্জিত করা; তৎপর ঘণ্টাব্যাপী কোমল হস্তের ক্ষৌরকার্য্য; অনন্তর টুথ পাউডার ও ব্রাস যোগে দন্তধাবন এবং সুবাসিত তৈল মর্দ্দন; তৈল মর্দ্দনান্তে সাবানাদি অঙ্গে মাখিয়া স্নান; স্নানান্তে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দ্রুতগতি আহার সমাপন; আহার করিয়া কলেজে গমন—কেহ অসভ্য জাতিবিশেষের ন্যায় মুক্ত মস্তকে ও অর্দ্ধোলঙ্গ বেশে এবং কেহবা দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও দেহ ও স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ অনুপ-যোগী দারুণ অসুবিধাকর কোট, প্যাণ্ট পরিয়া, নেকটাইয়া আঁটিয়া এবং

গুরুভার হ্যাটে মস্তক আবৃত করিয়া। তৎপর যথাসময়ে কলেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন; পোষাক পরিচ্ছদ ও পুস্তকাদি বিশৃঙ্খল ভাবে ফেলিয়া বিশ্রাম উপভোগ করণ। অনন্তর জলযোগ;—তাহাও অদ্ভুত ধরণের! কখন শীতকালে বরফ জল, কখনও বা দারুণ গ্রীষ্মে তপ্ত চা। পুষ্টিকর দুগ্ধ রুটী ও তরকারী এবং সুখাদ্য ফলাদির পরিবর্ত্তে ছাত্রগণ বিকৃতরুচির প্রভাবে স্বাদশূন্য কেক, বিস্কুট ও বিস্বাদু চা প্রভৃতি খাইয়া দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। জলযোগের পর তাস খেলা, অসময়ে নিদ্রা যাওয়া, অস্বাভাবিক ধূমপান করা, অশ্লীল গল্পে সময় নষ্ট করা এবং মনশ্চাঞ্চল্যকর বিলাস-বিলসিত ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণে বাহির হওয়া। এই সমস্ত শেষ হইলে সন্ধ্যার পর নৈশ আহার; মানবীয় রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া জীববিশেষের ডালে বসিয়া আহার করার ন্যায় চেয়ার-টেবিলে উপবিষ্ট আদব-কায়দা বিবর্জ্জিত ছাত্রগণ যেরূপ বিকৃত ধরণে অনর্থক অশ্লীল গল্পগুজব ও তর্কাভিনয়ে মত্ত হইয়া ভোজন-ক্রিয়া সমাপন করে, তাহা দেখিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। কেহ টেবিলের উপরিস্থিত ভাত-তরকারির নিকটেই সবুট পাদুখানি তুলিয়া দিয়া বামহস্তসংলগ্ন কাঁটার দ্বারা মাংসখণ্ডের অংশবিশেষ মুখের মধ্যে প্রদান-পূর্ব্বক উচ্চ ভাষায় 'পর্দ্দা' বা আবরণ প্রথার অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা প্রমাণ করিয়া কোরান হাদিসের মুণ্ডপাত করিতে সমুদ্যত! কেহবা রুটীখণ্ডে সুরুয়া-সংলগ্ন করিতে করিতে রোজা-নামাজের * অনাবশ্যকতা ঘোষণা করিয়া ধর্ম্মকে চিরতরে বিদায় দিবার অভিলাষী! কেহ অন্নগ্রাস চর্ব্বণ করিতে করিতে একাধিক বিবাহকে নামান্তরে ব্যভিচার বলিয়া জগন্মান্য পয়গম্বর সাহেবকে পর্য্যন্ত ব্যভিচারী সাজাইতে প্রস্তুত!! এবং কেহবা জলের গ্লাস মুখের কাছে ধরিয়া "কালের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও

* প্রত্যেক মোসলমানের অবশ্য পালনীয় উপবাস-উপাসনা।

পরিবর্ত্তন আবশ্যক”—বলিয়া সেই পরিবর্ত্তন সাধনে নিজেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-রূপে আবির্ভূত হইতে সমুৎসুক! অনন্তর আহারান্তে ঘণ্টা খানেক পড়িয়া পিতামাতার অর্থের সদ্ব্যবহার করা; তৎপর পুনঃ গল্পে বা নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে মগ্ন হওয়া। অবশ্য ইহার উপর অতিরিক্ত থিয়েটারে যাওয়া, বায়স্কোপ দেখা প্রভৃতি ত আছেই; কিন্তু আর কিছু আছে কিনা, তাহা সেই ছাত্র-সমাজই বলিতে পারেন; আমরা বলিতে অসমর্থ।

আবুল ফজল এই সমস্ত দেখিয়া একান্ত মর্ম্মাহত হইতেন এবং ছাত্র-গণকে বন্ধুরূপে উপদেশ দিয়া সতর্ক ও সংযত করিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের উপহাস ও গ্রাহ্যহীনতার আবিল স্রোতে তাহা কোথায় ভাসিয়া যাইত।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সতীশের পরিণয়।

সতীশচন্দ্র আবুল ফজলের এক বৎসর পূর্ব্বেই কলিকাতা আসিয়াছেন, পাঠকগণ একথা অবগত আছেন। তিনি একটী হিন্দু হোটেলে থাকিতেন এবং সেই খানেই পিতার প্রদত্ত অর্থে কোনরূপ কায়ক্লেশে নিজের ব্যয়-ভূষণ নির্ব্বাহ করিয়া পড়া শুনা চালাইতেছেন। সতীশচন্দ্রের কায়ক্লেশে ব্যয়-ভূষণ নির্ব্বাহের কথা পাঠকের পক্ষে একটু অস্বাভাবিক বোধ হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা সতীশচন্দ্রের পিতা তারিণীচরণ রায়ের প্রকৃতির সহিত সুপরিচিত, তাঁহাদের পক্ষে ইহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্য বোধ হইবে না। কারণ সাধারণতঃই সুদখোরদিগের অন্তঃকরণ কার্পণ্য দোষযুক্ত, সঙ্কীর্ণ ও কঠিন হইয়া থাকে। তারিণীচরণ বাবুর সেই দোষ একটু অধিক ছিল; এই জন্য অগাধ ধন-সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি সতীশচন্দ্রের পড়ার খরচ স্বীয় বিবেকানুযায়ী কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া কুড়ি বাইশ টাকা যাহা হইত, তাহার অতিরিক্ত এক পয়সাও প্রদান করিতেন না; সুতরাং শহরের ছাত্র-সমাজে দশ জনের সহিত মিলিয়া মিসিয়া চলিতে সতীশচন্দ্রকে সময়ে সময়ে বড়ই অস্বচ্ছলতা ভোগ করিত হইত। কিন্তু তিনি এসম্বন্ধে পিতাকে কোনরূপ উত্যক্ত করিতেন না।

প্রবোধচন্দ্রের সহিত সতীশের বড়ই সদ্ভাব ছিল। পাঠক! প্রভাত-নলিনীর ভ্রাতা প্রবোধের কথা বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই। প্রবোধ ও সতীশ একবৎসরেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; উভয়ে এক কলেজেই পড়িতেন; তদ্ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়তাও ছিল, তাহা

পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রবোধ অনেক সময়েই সতীশকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। প্রবোধের পিতা, মাতা ও ভ্রাতা সতীশকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। সতীশ অনেক সময়ে তাঁহাদের বাড়ীতে আহার ও জলযোগ করিতে বাধ্য হইতেন। অনেক সময়ে প্রবোধের পিতা-মাতা সতীশকে হোটেল ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেন; কিন্তু পিতার অনিচ্ছা জানাইয়া সতীশ অস্বীকার করিতেন।

প্রভাত-নলিনী সতীশচন্দ্রকে দেখিলে হৃদয়ে এক অবক্তব্য চাঞ্চল্য অনুভব করিতেন; এক অজানা আকর্ষণে তাঁহার হৃদয় সতীশের দিকে আকৃষ্ট হইত। বালিকা মাতা ও ভ্রাতার সহিত অনেক সময়ে সতীশের সম্মুখে আসিতেন বটে, কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচের প্রতিচ্ছায়া তাঁহার চোখে মুখে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইত।

সতীশচন্দ্র প্রথম দর্শনেই নলিনীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সৌন্দর্য্যানুরক্তি ক্রমশঃ আশক্তির আকুলতায় পরিণত হইল। অতঃপর তিনি নলিনীকে যত অধিকবার দেখিবার সুযোগ পাইলেন, তাঁহার আকুলতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে নলিনীকে দেখিবার প্রলোভনে তিনি সময়ে অসময়ে প্রবোধের আহ্বানে তাঁহাদের বাড়ী যাইতেন এবং আবশ্যকাতিরিক্ত সময় প্রবোধের সহিত গল্পগুজবে কাটাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেন। এইরূপে নলিনীর চিন্তা সতীশের হৃদয় মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিল; লেখা পড়ার প্রতিও তাঁহার আর পূর্ব্বের মত মনঃসংযোগ রহিল না।

আবুল ফজলের বাসা হিন্দু হোটেল হইতে বেশী দূরে অবস্থিত ছিল না; সুতরাং উভয়ের প্রায় নিত্যই দেখা সাক্ষাৎ হইত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের বন্ধুত্বও ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইতেছিল।

আবুল ফজল সতীশের সহিত মাঝে মাঝে প্রবোধদের বাড়ী বেড়াইতে যাইতেন। একদিন উভয়ে প্রবোধদের বাড়ী যাইয়া দেখিলেন, বৈঠকখানার কক্ষে বসিয়া প্রবোধ একখানি খাতায় কি লিখিতেছেন এবং নলিনী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একখণ্ড বহির পাতা উল্টাইয়া ছবি দেখিতেছেন! তাঁহার বিমুক্ত কেশদাম শুভ্র অঙ্গাবরণের উপর যেন সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছে! অনাবৃত মুখমণ্ডল হইতে মাধুরী যেন ঝরিয়া পড়িতেছে! আবুল ফজল যে বৎসর প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে আসেন, সেই বৎসর মাত্র কয়েক দিনের জন্য নলিনীকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আর এখন অনেক পার্থক্য! এ পার্থক্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব! সুগঠিত পূর্ণাঙ্গ মুকুলের সহিত সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমের যে পার্থক্য,—স্নিগ্ধ উষার সহিত প্রফুল্ল প্রভাতের যে পার্থক্য, বালিকা নলিনীর সহিত নব-যৌবন-রাগ-রঞ্জিতা নলিনীরও সেই পার্থক্য। আবুল ফজল মুহূর্ত্তের জন্য নলিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন এবং প্রবোধকে ডাকিবার জন্য সতীশকে সঙ্কেত করিলেন। সতীশ "তুমি ডাক" বলিয়া অস্বীকার করিলে আবুল ফজল তাঁহার মুখের দিকে বিস্মিতভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; সতীশ সে চাহনীতে লজ্জিত হইয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। অনন্তর আবুল ফজল "প্রবোধবাবু বাড়ী আছেন"—বলিয়া সম্বোধন করিতেই প্রবোধ "আসুন! আসুন!" বলিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। সতীশ ও আবুল ফজল উভয়েই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। নলিনী দ্রুত অন্য দ্বার দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া প্রবোধ বলিলেন,—"নলি! যাচ্ছিস কেন? এঁরই যে সেবার আমাদের বাড়ীতে জ্বর হইয়াছিল।" নলিনী কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আবুল ফজলের দিকে চাহিলেন; তাঁহার সুন্দর মুখে সৌন্দর্য্য, আনন্দ, কৌতূহল ও সঙ্কোচ যেন এক সঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিল!

নলিনী চলিয়া গেলে তিন জনে খানিকক্ষণ বসিয়া নানা গল্প করিলেন; গল্পে সতীশের মনঃসংযোগের অভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইল।

অতঃপর সতীশ ও আবুলফজল যখন প্রবোধদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথে আসিলেন, তখন আবুল ফজল বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "কেমন, দর্প চূর্ণ হইয়াছে? দেখিলে, সুন্দর মুখের প্রভাব কেমন?"

সতীশ। দেখ্‌বে আবার কি? তোমার যত সৃষ্টিছাড়া কল্পনা! সকলেই তোমার মত কি না?

আবুল ফজল। সকলে আমার মত কি না জানি না; কিন্তু কল্পনাটা যে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া নহে, সে কথা বোধ হয় জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

সতীশ। আচ্ছা বেশ! তবে কল্পনাটা একবার কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া দেখ না?

আবুল ফজল। চেষ্টা করাটা বোধ হয়, তোমার খুব অনুকূল! কার্য্যে পরিণত হইলে ত হাতে স্বর্গ!

সতীশ। মনে কর, তোমারই মত স্বর্গভোগ! স্বর্গের মাধুরীর ছাপ্‌ মুখে এখনও একটু একটু ফুটে আছে না?

সতীশের শ্লেষে আবুল ফজল মনে একটু ব্যথা পাইলেন এবং "সকলেই ত আর আমার মত দুর্ভাগ্য নহে"—বলিয়া বিদায় হইয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। সতীশও সহসা কথাটা বলিয়া ফেলার জন্য একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন।

ইহার পরে আবুল ফজল নানা সূত্রে সতীশের চিত্ত-বিকার ধরিয়া ফেলিলেন; সতীশও ক্রমে আবুল ফজলের নিকট মনের কোন কথাই আর গোপন রাখিল না এবং আবুল ফজলও এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া সতীশকে আশ্বাস প্রদান করিলেন।

যথা সময়ে আবুল ফজল কথাপ্রসঙ্গে প্রবোধের নিকট সতীশের সহিত নলিনীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাঁহাদের মত জানিতে চাহিলেন। প্রবোধ সানন্দে পিতা-মাতার নিকট জ্ঞাত হইয়া আবুল ফজলকে বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে মা ও বাবার খুব মত আছে। পল্লীগ্রাম বলিয়া দাদার যা একটু আপত্তি! সে যাহা হউক, আগামী বর্ষাকালে আমরা আলিনগরে ঘটক পাঠাইব।" বলা বাহুল্য, এই সময় হইতে সতীশ প্রবোধদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিলেন।

ক্রমে গ্রীষ্মের নির্ম্মল নীলাকাশে অভিমানের মত বর্ষার মেঘরাশি সঞ্চিত হইয়া অবিরল অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক অবনীর অঙ্গ সিক্ত করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে বন্যার জলে বঙ্গপল্লী ভাসিয়া গেল। এমন সময়ে একদিন একখানি বৃহৎ পান্সী নৌকা আলিনগরের রায়বাড়ীর ঘাটে আসিয়া লাগিল। নৌকার আরোহী রমেশ বাবুর পুত্র সুবোধ ও তাঁহাদের একজন আত্মীয়। বলা বাহুল্য, তাঁহারা প্রভাত-নলিনীর বিবাহের প্রস্তাব লইয়াই আসিয়াছিলেন।

তারিণী বাবু ইতিপূর্ব্বে কন্যা কমলার বিবাহ দিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ সরখেল নামক একজন এম, এ, বি, এল, উকিলের সহিতই কমলার বিবাহ হয়। পাঠকগণ সম্ভবতঃ ভুলিয়া যান নাই যে, এই যতীন্দ্রনাথ সরখেলের সহিতই একদিন নৌকাপথে আবুল ফজলের আলাপ হইয়াছিল। বিবাহে বরপক্ষ পণস্বরূপ কিছু গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তথাপি যোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে যথাসাধ্য চাপিয়া খরচ করিলেও তারিণী বাবুর বুকের রক্তসদৃশ অর্থরাশির প্রায় আড়াইটী সহস্র সংখ্যা খরচের বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে। এই জন্য তিনি মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ ছিলেন; কারণ পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি স্বীয় অর্থাধারের শূন্য অংশ পূর্ণ করিবার যোগ্য লোক দেশে কাহাকেও দেখিতেছিলেন না। সুতরাং কলিকাতা

হইতে পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ আসায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; ভাবিলেন, এইবার সুদে আসলে মেয়ের বিবাহের ক্ষতিটা পূরণ করিয়া লইব।

সমাগত অতিথিযুগল আহারাদি সমাপনান্তে অভিলষিত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। রায় মহাশয় গ্রামের পাঁচজনকে লইয়া বৈঠকখানা গোলজার করিয়া পুত্রের সম্বন্ধবিষয়ে গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করিলেন। কত জমিদার, তালুকদার, উকিল, হাকিম প্রভৃতি তাঁহার পুত্রের জন্য নগদ টাকা, জমা-জমি, বাড়ী-ঘর ও অপর্য্যাপ্ত অলঙ্কারাদি দিতে চাহিয়াছেন, তাহার সত্য-মিথ্যা বিরাট্ কাহিনী ব্যক্ত করিলেন। মোসাহেবগণ সমস্তই অকাট্য সত্য বলিয়া প্রমাণ করিল। পরিশেষে রায়মহাশয় প্রাচীন আত্মীয় বলিয়া আগন্তুক ভদ্রলোকদিগের প্রতি বিশেষ:সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক তিন হাজার টাকা নগদ, দুই হাজার টাকার অলঙ্কার ও এক হাজার টাকা অন্যান্য খরচের জন্য দাবী করিলেন। সকলে "এ অতি সামান্য' 'নিতান্ত সুলভ' বলিয়া প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। কিন্তু এই সামান্য এবং সুলভ প্রস্তাবেও আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়ের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা বলিলেন,—"আপনারা যাহাই মনে করুন, আমাদের অবস্থা সেরূপ স্বচ্ছল নহে; সামান্য কারবার মাত্র সম্বল। তবে কোন মতে হাজার তিনেক টাকা ব্যয় করিতে পারি। যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক এর মধ্যে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন, একান্ত বাধিত হইব। অবশ্য বিবাহের পর জামাতার যাবতীয় পড়ার খরচ আমরা দিব।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে মুখ বিকৃত করিলেন; রায় মহাশয় বিদ্রূপাত্মক গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রত্যাখ্যানবাণী শুনাইয়া উঠিয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে যাইবার সময়ে—"এতেই দেশের বনিয়াদি ঘরে মেয়ে দেওয়ার আশা!" "এ যে আধাআধি মাছের দর" এবং "শহরের লোকগুলি

নিতান্ত চামার”—প্রভৃতি মিষ্ট-বাণী শুনাইয়া যাইতে ভুলিল না। অগত্যা আগন্তুকদ্বয় ভগ্নমনোরথ হইয়া বিদায় হইলেন।

সুবোধ কলিকাতা আসিলে প্রস্তাবের পরিণাম জানিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন; সতীশের পিতার ব্যবহারে সকলেই বিরক্ত হইলেন। সতীশের হৃদয়ে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! সুখস্বপ্নাচ্ছন্ন যুবকের দেহ-মন অহরহঃ দুশ্চিন্তার দারুণ দাবানলে দগ্ধ হইতে লাগিল; তাঁহার প্রফুল্ল মুখখানি নিদাঘ-সন্তপ্ত কুসুমের ন্যায় মলিন ভাব ধারণ করিল।

আবুল ফজল নানারূপে সতীশকে বুঝাইয়া তাঁহার উৎসাহ আনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। সতীশ এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। তাঁহার অবস্থায় আবুল ফজল ও প্রবোধ প্রভৃতি যারপরনাই দুঃখিত হইলেন।

তারিণী বাবু পুত্রের অকৃতকার্য্যতার সংবাদ শুনিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার যত উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত হইল দেখিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। অতঃপর আরও কত টাকা নিজ হইতে অনর্থক ব্যয় করিতে হইবে, ভাবিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত বিবাহপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে সুবোধ নলিনীর বিবাহের জন্য অন্য একখানি সম্বন্ধ স্থির করিলেন। পাত্র বি, এ, পড়ে; অবস্থা ভাল; টাকা পয়সার তাঁহারা প্রার্থী নহেন; কেবল মেয়ে পছন্দ হইলেই সম্বন্ধ করিতে প্রস্তুত; সুতরাং এ সম্বন্ধ যে নিশ্চয়ই হইবে; তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

আবুল ফজল একদিন প্রবোধের সহিত কথাপ্রসঙ্গে নলিনীর বিবাহের কথা জানিতে পারিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি এ সম্বন্ধে ভগ্নহৃদয় সতীশকে কিছু না বলিয়া প্রবোধের আনুকূল্যে তাঁহার পিতার সহিত কথা উত্থাপনপূর্ব্বক যথোচিত বিনয়ের সহিত সতীশের অবস্থার আভাস

প্রদান করিলেন। বুদ্ধিমান্ রমেশবাবু বলিলেন,—“সতীশের জন্য আমরাও দুঃখিত ; আমরা তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করি। কিন্তু রায় মহাশয়ের ব্যবহারে সুবোধ বড়ই বিরক্ত হইয়াছে ; সে কিছুতেই এ কাজে সম্মত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি যেরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে যদি সতীশের পিতা সম্মত হন, আমি এখনও প্রস্তুত আছি। উহার অধিক ব্যয় করা আমার অসাধ্য।” আবুল ফজল আর কিছুই বলিলেন না ; কিন্তু ইহার দুই তিন দিন পরে, প্রবোধের মাতার আহ্বানে আবুল ফজল প্রবোধের সহিত তাঁহাদের বাড়ী গেলেন। প্রবোধের মাতা নিঃসঙ্কোচে প্রবোধ ও আবুল ফজলকে ডাকিয়া নিকটে বসিতে বলিলেন। আবুল ফজল সসঙ্কোচে উপবেশন করিলে তিনি বলিলেন,—“বাবা, তুমি প্রবোধের বন্ধু ! অতএব আমার পুত্রতুল্য। সতীশকেও আমি পুত্রতুল্য মনে করি ; আমার একান্ত ইচ্ছা, সতীশের সহিত নলিনীর বিবাহ দিই ! কিন্তু তাহার পিতা যেরূপ দাবী করেছেন, তাতে সম্বন্ধ করা আমাদের অসাধ্য। তুমি সেদিন তাঁর নিকট যা বলেছ, আমি সব শুনেছি ; যদি আমাদের প্রচুর টাকা থাক্‌ত, তাহ'লে মেয়ে জামাইকে দিলে সে ত আর জলে ফেলা হ'তো না। কিন্তু আর অধিক খরচ কোর্‌তে আমরা একেবারেই অসমর্থ। আমরা যেরূপ প্রস্তাব করেছি, যদি তোমরা তাতে রায় মহাশয়কে সম্মত কোর্‌তে পার, তবেই সম্বন্ধ হয়। আমি আশা করি, সতীশের কল্যাণের জন্য এবং আমাদের অনুরোধে তুমি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট চেষ্টা কোর্‌বে।”

আবুল ফজল প্রবোধের মাতার যুক্তিপূর্ণ কথার বিন্দুমাত্রও প্রতিবাদ না করিয়া বলিলেন,—“আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ; আমি এ সম্বন্ধে চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি করিব না, এবং আশা করি, ঈশ্বরেচ্ছায় আপনাদের আশা পূর্ণ করিতে পারিব।”

"ভগবানের প্রসাদে যেন তোমাদের বন্ধুত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করত প্রবোধের মাতা নলিনীকে ডাকিয়া পান তৈয়ার করিয়া দিতে বলিলেন। প্রবোধ উঠিয়া গিয়া কক্ষান্তর হইতে পান লইয়া আসিলেন। সেই কক্ষে রমণীকণ্ঠের মধুর হাস্যালাপ স্পষ্ট শ্রুত হইল। বলা বাহুল্য, সুবোধের পত্নী মায়া প্রভাত-নলিনীকে তীব্র শ্লেষ-রহস্যে বিদ্ধ করিতেছিলেন।

আবুল ফজল বাসায় আসিয়া মনে করিলেন, যেরূপেই হউক সতীশের পিতাকে মত করাইয়া সতীশকে এই বিবাহ দিতেই হইবে ; নচেৎ তাঁহার পরিণাম বড়ই মন্দ হইবে। সহসা আবুল ফজল স্বীয় আকাঙ্ক্ষার বিষাদময় পরিণাম ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং সতীশকে এখন সব কথা বলা উচিত ভাবিয়া তাঁহার বাসস্থান অভিমুখে চলিলেন।

আবুল ফজল যাইয়া দেখিলেন, সতীশ বাসায় নাই ; অন্যান্য ছাত্রেরাও প্রায় সকলেই বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছেন। আবুল ফজল অগত্যা সতীশের বিছানায় বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সময় কাটাইবার জন্য টেবিলের উপর হইতে একখান পুস্তক লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

পুস্তক খুলিতেই তন্মধ্য হইতে একখানি পত্র বাহির হইল ; আবুল ফজল সতীশের পিতার লিখিত পত্র দেখিয়া পড়িতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, উভয়ের চিঠি পত্র প্রায়ই উভয়ে পড়িতেন। উক্ত পত্রের মধ্যে অন্যান্য সংবাদের সহিত নিম্নলিখিত কথাগুলিও লিখিত ছিল :—

''সতীশ ! তুমি ফেইল করিয়া কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তা আর কি বলিব। অনর্থক কতকগুলি টাকা নষ্ট হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার রমেশ বাবু মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধের জন্য ঘটক পাঠাইয়াছিলেন, এবং তিন হাজার টাকা ও পড়ার খরচ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ; কিন্তু

ছয় হাজার টাকা ও পড়ার খরচ চাহিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেই। যদি এবার পাস হইতে, নিশ্চয় তাঁহারা পাঁচ হাজার টাকা দিতেন। সবই অদৃষ্ট! এখন যদি তাঁহারা পূর্ব্ব প্রস্তাবে সম্মত হন, ঐ স্থানের কোন কলেজের ছাত্রের দ্বারা চেষ্টা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। যদি ঐ সম্বন্ধ না হয়, তবে দেশেও একখান সম্বন্ধ আছে; তাঁহারা হাজার টাকা, পড়ার ব্যয় ও অলঙ্কারাদি দিতে চাহেন; অগত্যা তাহাই করা যাইবে।"

"কিছু মনে করিও না; একা মানুষ, সংসারের খরচ ক্রমেই বাড়িতেছে; কমলার বিবাহেও প্রায় তিন চারি হাজার টাকা খরচ হইল। তার পর দেশের অবস্থা ভাল নহে; টাকা কড়ি মাত্রই আদায় হইতেছে না। এ অবস্থায় মাসে মাসে পঁচিশ তিরিশ টাকা খরচ করা একেবারেই অসাধ্য! এ সমস্ত খরচ করা টাকা-পয়সাওয়ালা চাকুরে লোকের কাজ।"

পত্রে পুনঃ চিহ্ন দিয়া লিখিত আছে :—

"বড় মিঞাদের সহিত আফতাব-উদ্দিন মিঞাদের গোলযোগ চলিতেছে, তাহা জান। তাঁহাদের মধ্যে অনেক মামলা-মোকদ্দমা চলিতেছে। আফতাব-উদ্দিন মিঞাদের অবস্থা শোচনীয়। তাঁহাদের নামে যে পাঁচশত টাকার মর্টগেজ খত ছিল, তাহা দ্বিগুণ টাকা লইয়া বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিনের নিকট বিক্রয় করিয়াছি। ইহাতে আফতাব মিঞাদের সঙ্গে নিশ্চয় মনান্তর হইবে। তুমি আবুল ফজলের সহিত বেশী মিশামিশি করিও না।

"এত টাকা খরচ করিয়া কমলার বিবাহ দিলাম; সুখ হইল না। জামাইটা অর্দ্ধ ম্লেচ্ছ! সংসার-বুদ্ধি একেবারেই নাই। পশার-প্রতিপত্তি কিছু না হইতেই বিনা পয়সায় লোকের কাজ করিয়া বাহাদুরি দেখান আরম্ভ করিয়াছে। বিনা পয়সায় আফতাব মিঞাদের মোকদ্দমা চালাইতেছে; আমি নিষেধ করিয়াছি, শুনে নাই। কমলার সহিত ইহা

লইয়া কলহ হইতেছে। সে কমলাকে প্রায়ই সঙ্কীর্ণহৃদয়, হিংসুক ও গোঁড়া প্রভৃতি বলিয়া তিরস্কার করে। আমি কমলাকে লইয়া আসিয়া আর পাঠাইব না মনে করিয়াছি।"

আবুল ফজল পত্র পড়িয়া যথাস্থানে রাখিবার পূর্ব্বেই সতীশ গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আবুল ফজলের হাতে পত্র দেখিয়া একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন; অশ্রুতে তাঁহার চক্ষু ভরিয়া আসিল। আবুল ফজল নিজেদের সর্ব্বনাশের বিষয় বিস্মৃত হইয়া বলিলেন,—"সতীশ এদিকে এস, কথা আছে।"

সতীশ ব্যাকুলভাবে আবুল ফজলের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"ভাই আবুল ফজল! বল, উপায় কি? আশৈশব বন্ধুতার কি এই শোচনীয় পরিণতি হইবে? এ সর্ব্বনাশ নিবারণের কি কোন উপায় নাই?"

আবুল ফজল। সর্ব্বনাশ বটে; কিন্তু সূত্রপাতে এত বিচলিত হইলে চলিবে কেন? সময়োচিত প্রতিকারের জন্য দৃঢ়ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ের বিহিত ব্যবস্থা করা যাক্।

অনন্তর আবুল ফজল নানারূপে সতীশের মনশ্চাঞ্চল্য দূরীভূত করিয়া নলিনীর বিবাহপ্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন এবং রায় মহাশয়ের পত্র বর্ত্তমান ব্যাপারের সম্পূর্ণ অনুকূল বলিয়া আনন্দপ্রকাশ করিলেন।

কিন্তু সতীশ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"যৌতুক যখন সর্ব্বসাধারণের মুখে সমাজের মহা অনিষ্টকর কুপ্রথা—এমন কি, মহাপাপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, তখন আমি কিছুতেই সেই মহাপাপে আত্মবিক্রয় করিব না। বরং পিতার অনিচ্ছাক্রমে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি যৌতুক গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিব না; ইহাতে অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক।"

আবুল ফজল কোনরূপ যুক্তিতে সতীশকে সম্মত করিতে না পারিয়া অগত্যা প্রবোধের দ্বারা তাঁহার মাতার নিকট সব কথা বলিয়া পাঠাইলেন।

প্রবোধের মাতা আবুল ফজলকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"বাবা! সতীশকে বুঝাইয়া বলিও, পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচরণ করা সুবোধ পুত্রের কার্য্য নহে। বিশেষতঃ যুবকদের পক্ষে কোন বিষয়ে একগুঁয়েমী একেবারেই অশোভনীয়। ভগবান্ করিলে, সতীশ জীবনে এ কুপ্রথা দূরীভূত করিবার অনেক সুযোগ পাইবে। এখন আমরা সমর্থপক্ষে পুত্র-কন্যাকে কিছু উপহার দিতেছি, সময়ে অসময়ে আমাদিগকে সাহায্য করিলেও ইহার শোধ হইতে পারিবে। সদিচ্ছা মনে থাকিলে তাহা অনেকরূপে সাধন করা যায়। তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিও, তাহার পিতার অমতে আমরা কিছুতেই সম্বন্ধ করিব না।"

বলা বাহুল্য, সতীশ এ উপদেশ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। অনন্তর নলিনীর পিতা ঘটক পাঠাইয়া সম্বন্ধ ও শুভকার্য্য সম্পাদনের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন।

কন্যাপক্ষে সুবোধ ভিন্ন আর কাহারও আপত্তি ছিল না। সুবোধ নানা ওজর করিয়া স্বীয় অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেছিলেন। কিন্তু শাশুড়ীর ইঙ্গিতে সুবোধের পত্নী মায়া একদিন তাঁহার অসম্মতি-তরুর শিকড় কাটিয়া দিলেন। সুতরাং সে বৃক্ষ আর ফল-পুষ্প প্রসব করিল না। কৌতূহলচিত্তা পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন, বিস্তৃতি ভয়ে আমরা আপনাদিগকে মায়ার অস্ত্রকৌশল শিক্ষা দিতে পারিলাম না।

বর-পক্ষে সতীশের ভগ্নীপতি যতীন্দ্রনাথ সরখেল একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। তিনি বরপণের বিবাহে সহানুভূতি দেখান ত দূরের কথা, উহার সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিতেই অসম্মত হইলেন এবং সতীশকে তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিলেন। সতীশ মর্ম্মাহত হইয়া যাবতীয় অবস্থা

ব্যক্ত করিয়া আবুল ফজলের দ্বারা তাঁহার নিকট পত্র লিখাইলেন; পত্র পাইয়া তিনি সতীশকে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বিবাহে যোগদান করিবেন না, সে কথা স্পষ্ট লিখিলেন।

পাঠক বোধ হয়, বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, যতীন্দ্রনাথ সরখেল অত্যন্ত উদারহৃদয় তেজস্বী যুবক। নব্য সংস্কারক দলের তিনি একজন পাণ্ডাবিশেষ। তিনি ইতিপূর্ব্বেই হিন্দু-সমাজ হইতে বরপণ প্রভৃতি কুপ্রথাগুলি তুলিয়া দিবার জন্য কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রের পত্নী কমলার স্বভাব পতির মত উদার ও অমায়িক ছিল না; বিশেষতঃ তিনি বিদ্বেষপরায়ণা ও সঙ্কীর্ণচিত্তা ছিলেন। এই স্বভাবের পার্থক্যবশতঃ স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে আদৌ সদ্ভাব ছিল না; সুতরাং কমলা যখন ভ্রাতৃবিবাহে যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, তাঁহার স্বামী তখন স্পষ্ট বলিলেন যে, যে বিবাহে বরপণ লওয়া হইতেছে, সে বিবাহে তুমি ত দূরের কথা, আমার কোন আত্মীয়স্বজনই যোগ দিতে পারিবে না।

কমলা স্বামীর হৃদয়ের উচ্চতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তিনি বরং পিতা ও ভ্রাতার প্রতি স্বামীর অনর্থক হিংসা মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং ভ্রাতৃবিবাহে তিনি নিশ্চয়ই যাইবেন, স্বামীর মুখের উপর তাহা স্পষ্ট বলিলেন। যতীন্দ্র উত্তরে বলিলেন,—"যদি আমার স্ত্রী হও, কিছুতেই যাইতে পারিবে না।"

কমলা। আমি বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুতেই কার্য্য করিতে পারিব না; যদি আমাকে যাইতে দেওয়া না হয়, আমি অন্ন-জল ত্যাগ করিব।

যতীন্দ্র অনেক প্রকারে বুঝাইয়াও যখন কমলাকে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"দেখিতেছি তোমাদের মত অপদার্থ স্ত্রীলোকের জন্যই ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজে স্ত্রীত্যাগ-

প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। তোমার যা ইচ্ছা হয়, করিতে পার ; কিন্তু মনে রাখিও, এ বিবাহে গেলে আমার সহিত তোমার আর কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না।"

কিন্তু কমলা স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী আচরণে সমর্থ হইলেন না ; তিনি স্বামী কর্ত্তৃক কঠোরভাবে তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত হইয়াও ভ্রাতৃবিবাহে যোগদান করিতে পিত্রালয়ে গমন করিলেন। রায় মহাশয় সমস্ত শুনিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন,—"আর ও ম্লেচ্ছের বাড়ী গিয়া কাজ নাই।"

যথাসময়ে শুভদিন ও শুভক্ষণে সতীশের সহিত প্রভাত-নলিনীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। ভ্রাতৃবধূ মায়া প্রভাত-নলিনীকে আনন্দে, সোহাগে, স্নেহে ও রহস্যে অভিভূত করিয়া শুভ-বাসরে স্বামীর করে সমর্পণ করিলেন। আন্তরিক আশা পূর্ণ হওয়ায় যুবক-যুবতী অতুল স্বর্গীয় আনন্দে ভাসমান হইলেন। সে শুভ রজনীতে আনন্দাতিশয্যে হৃদয়ের নীরব অভিব্যক্তি ভিন্ন কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই !

আবুল ফজল বন্ধুপত্নীর মুখদর্শন করিয়া সুবর্ণ মোহর প্রদান করিলেন। রমেশ বাবুর পরিবারে তিনি সুপরিচিত ও প্রিয়পাত্রস্বরূপ গণ্য হইলেন।

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ ।

পল্লী-বধূ ।

বিবাহের পরে সতীশ শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্নেহশীল শ্বশুর-শাশুড়ীর ঐকান্তিক যত্নে, প্রেমময়ী পত্নীর স্বর্গীয় ভালবাসায় এবং আত্মীয়গণের অকৃত্রিম প্রীতিতে বিভোর ও প্রফুল্লচিত্ত সতীশ নিরুদ্বেগে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। সতীশ অনেক সময়েই আবুল ফজলকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া যাইতেন। রমেশবাবুর স্ত্রী তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ক্রমে তিনি সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। কৃতজ্ঞহৃদয় প্রভাত-নলিনী স্বামীর উপদেশানুযায়ী ক্রমে তাঁহাদের সৌভাগ্যের নিদানস্বরূপ আবুল ফজলকে নিঃসঙ্কোচে অভ্যর্থনা করিতে অভ্যস্তা হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ আবুল ফজলের বিনয়-নম্র অমায়িক স্বভাব, সংযত দৃষ্টি, অকপট বন্ধুপ্রীতি ও সরল সদালাপে ক্রমে তৎপ্রতি সুবোধ এমন কি, তৎপত্নী মায়ারও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইল।

বিবাহের পর বৎসরে সতীশ ও আবুল ফজল একত্রে এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। আবুল ফজল প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে এ বৎসর বৃত্তি লাভ করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহাতে কোনরূপ অসুবিধা হইল না; কারণ তিনি যাঁহার বাড়ী থাকিয়া পড়িতেন, সেই উন্নতহৃদয় ব্যবসায়ী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অধ্যয়নের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সুতরাং এক গুরু চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তিনি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলেন।

ক্রমে গ্রীষ্মের বন্ধ উপস্থিত হইল; আবুল ফজল ও সতীশ একত্রে বাড়ী গমন করিলেন। তারিণী বাবু এই সঙ্গে নলিনীকে পাঠাইবার জন্য রমেশবাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু নলিনী অসুস্থ থাকা হেতু তাঁহাকে পাঠান হইল না।

এই সময়ে আলিনগরের অবস্থা যারপরনাই শোচনীয় হইয়াছিল; গ্রামের সকলেই মামলা-মোকদ্দমায় জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বড় মিঞার নিকট মর্টগেজ বিক্রয়ের কথা রাষ্ট্র হওয়ায় আফতাব-উদ্দিন মিঞার সহিত তারিণীচরণ রায়ের একরূপ প্রকাশ্য শত্রুতাই চলিতেছিল। রায় পাড়ার অন্যদল—যাঁহারা এতদিন বড় মিঞার পক্ষে ছিলেন,—তাঁহারা এক্ষণে আফতাব-উদ্দিন মিঞার পক্ষে যোগ দিয়া তারিণীচরণ রায়ের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিলেন। ফলে ইহাদিগকে জব্দ করিবার নিমিত্ত বড়মিঞা ও তারিণী বাবু এক যোগে ভীষণ আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সতীশ ও আবুল ফজল বাড়ী গিয়া গ্রামবাসিগণের অবস্থা দর্শনানন্তর মর্ম্মাহত হইলেন। উভয়ে মিলিয়া এই গোলযোগ দূরীভূত করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়াও সফলমনোরথ হইতে পারিলেন না। অধিকন্তু সতীশ আবুল ফজলের সহিত ঘনিষ্ঠতা করার জন্য পিতার চক্ষুঃশূল হইলেন।

ইতিমধ্যে যতীন্দ্রনাথ সরখেলের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ আসায় রায়-পরিবারে শোকের তুফান বহিয়া গেল। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে শত্রু-মিত্র সকলেই উচ্চাভিলাষী উদারহৃদয় যুবকের জন্য অশ্রুমোচন করিলেন। নিদারুণ পরিতাপে রায় মহাশয়ের অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। বিধাতার কঠোর দণ্ড যেন ভীষণ ভাবে কমলার মস্তকে পতিত হইয়া তাঁহার দর্প, অভিমান ও হিংসাবিদ্বেষ সমস্তই চূর্ণ করিয়া দিল। আবুল ফজল ও সতীশ শোক-ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া ক্ষুণ্ণ-মনে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

বর্ষাকালে প্রভাত-নলিনী আলিনগরে নীত হইলেন। তিনি স্বাভাবিক সুমধুর ব্যবহারে কমলার মনে শান্তি আনয়নের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু কমলা তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিলেন না। নলিনীর সভ্যতাসূচক সুশোভন পোষাক-পরিচ্ছদ, সরল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অমায়িক ব্যবহার, শিষ্ট-সংযত বাক্যালাপ ও সুরুচিসম্মত স্বাস্থ্যবিধায়ী সদাচার তাঁহার চক্ষে কাটার মত বিঁধিতে লাগিল। কমলা স্বাভাবিক হিংসা-বশে নলিনীকে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রভাত-নলিনী জল আনিতে ঘাটে যাইতেন না; সঙ্গে যে ঝি ছিল, সেই জল আনিয়া দিত। কিন্তু কমলা বলিয়া দিলেন,—"ও সব কলিকাতার বিবিয়ানা দেশে খাটিবে না; আমরা মুচি-মেথর ঝি-চাকরের ছোঁয়া জল ব্যবহার করি না; স্বয়ং ঘাটে যাইয়া জল আনিতে হইবে।"

নলিনী বিনয়ের সহিত বলিলেন,—"ঠাকুরঝি! আমি কখনও ওসব কাজ করি নাই; আর তুমিই বল, আমি বৌ-মানুষ হ'য়ে দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে কিরূপে ঘাট হ'তে জল আন্‌ব?"

কমলা। তুমি ত আর মোসলমান বাড়ীর পর্দ্দা-ঘেরা বিবি নও যে, লোকের মাঝে ঘাটে গেলে মান যাইবে? হিন্দু বাড়ীর সব ঝি-বৌই ঘাটে যাইয়া স্নান করে ও জল আনিয়া থাকে, তাতে কেউর মানও কমে না; জাতও যায় না।

প্র-নলিনী। আচ্ছা ঠাকুরঝি, আর কিছু দিন যাক্, তার পরে যা হয় কোর্‌ব। এখন ঝিই জল আনুক; সে আমাদের পরিচিত; সমাজে ওদের জল চলিত আছে।

কমলা সেদিন আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু দুই তিন দিন পরে একদিন নলিনীকে বলিলেন,—"বৌদি! আজ ঘরগুলি লেপিয়া ফেল।"

ঝি বলিল,—"দিদি রান্না করতে যাক্, আমিই ঘর লেপে দিচ্ছি।"

কমলা তাহাকে ধমক দিয়া অন্য কাজে পাঠাইয়া নলিনীকে বলিলেন, "যাও না বৌদি! রান্না না হয় আমিই করবো এখন।"

নলিনী ভাবিতেছিলেন,—কিরূপে ঘর লেপিব? তিনি মাতার নিকট রন্ধন ও অন্যান্য কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কলিকাতার পাকা বাড়ী ও কলের জলের কল্যাণে ঘর লেপা ও জল আনা শিক্ষা করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

নলিনী ভাবিতেছেন দেখিয়া কমলা বলিলেন,—"যে এ সমস্ত কাজ কর্‌তে পারবে না, তা'কে হিন্দুবাড়ী বিয়ে দেওয়া কেন? কলিকাতার কোন সাহেববাড়ী বা নবাববাড়ী বিয়ে দিলেই হ'ত; তা হ'লে বডি সেমিজ প'রে, খাটে চেয়ারে ব'সে, নাটক নভেল প'ড়ে বিবিয়ানা করা মানাত ভাল। হিন্দুবাড়ী যে ও সব চল্‌বে না, তা আগেই ভাবা উচিত ছিল।

প্রভাত-নলিনী কমলার কর্কশ বাক্যে ব্যথিত হইয়া গায়ের সেমিজ প্রভৃতি খুলিয়া রাখিয়া ঘর লেপিতে গেলেন, এবং কমলার নির্দ্দেশানুযায়ী গোবর-মাটী জলে গুলিয়া অতি কষ্টে একখানি গৃহ লেপিয়া তাঁহার জেদ রক্ষা করিলেন। দাসী কমলার আচারে স্তম্ভিত হইলেও কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

পরদিন কমলা নলিনীকে ঘাটে পাঠাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কিন্তু নলিনী লোকের সম্মুখে কিছুতেই ঘাটে যাইতে সম্মত না হওয়ায় অগত্যা কমলা পিতার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। বৃদ্ধ রায় মহাশয় দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থার প্রতি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া রুক্ষ স্বরে বলিলেন,—"সে কি বাপু! ও সব মোছলমানী ম্লেচ্ছাচার হিন্দুবাড়ীতে চল্‌বে না। আমরা অপর জাতির ছোঁয়া জল স্পর্শও করি না। এ কলকাতা নয়; এ দেশে ঘাটে যাওয়া, জল আনা দেশাচার;

তাতে আপত্তি কর্‌লে চল্‌বে কেন? লোকের সামনে ঘাটে যেতে লজ্জা হয়, সকালে সকালে যাইয়া জল লইয়া আসিও।"

তখন নলিনী কমলাকে বলিলেন,—"ঠাকুরঝি, আজ কোন মতে তুমি চালাও; কাল আমি যেরূপে পারি, জল আন্‌ব।" নলিনীর গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে দেখিয়া কমলা ক্ষান্ত হইলেন।

পরদিন প্রভাত-নলিনী ঊষাকালে ঝিকে সঙ্গে লইয়া ঘাটে গেলেন, এবং প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই স্নান করিয়া জল লইয়া আসিলেন। নলিনী স্বয়ং কলসী কক্ষে করিয়া আনে কি না, কমলা লক্ষ্য করিতে ভুলিল না।

এইরূপ তিন চারি দিন চলিল; একদিন ঘাটে গিয়া ঝি বলিল, "দিদি! জামাই বাবু এই সব বুঝেই তোমাকে এ সমস্ত কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং মা সেই জন্যই আমাকে সঙ্গে দিয়েছিলেন; কিন্তু এরা যেন তোমাকে দিয়া কাজ করাবার জন্য পণ করেছে। কিন্তু দিদি তোমার যেরূপ চেহারা হ'য়েছে, তা'তে এইরূপ সময়ে জলে ভিজ্‌লে নিশ্চয়ই তোমার অসুখ কর্‌বে। আমি বলি, জামাই বাবুর কাছে কিংবা মার কাছে একখান পত্র দাও।"

নলিনী ম্লান হাস্যের সহিত তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"ছি! তাঁরা এসব শুন্‌লে কি মনে কর্‌বেন? এখানে সকলেই যখন করে, তখন আমি কর্‌লে দোষ কি? তবে আমার অভ্যাস নাই; তাই একটু কষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস কর্‌লে সবই সহ্য হ'য়ে যাবে।"

ক্রমে আরও কয়েক দিন গত হইল; কিন্তু হঠাৎ একদিন নলিনী জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। হায়! যে আজন্ম বিবিধ সুখোপাদানপূর্ণ বিলাসের ক্রোড়ে লালিত-পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; তাঁহাকে সহসা দুঃখের, অভাবের ও কষ্টের আবর্ত্তে ফেলিয়া দিলে সে বাঁচিতে পারে কি?

নলিনীর অসুখ নিত্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আট দিনেও যখন জ্বর বিরাম না হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন রায় মহাশয় শঙ্কিত হইয়া কলিকাতায় তার করিলেন। দুই দিন পরেই প্রবোধ ও সতীশ ডাক্তার লইয়া আলিনগরে আসিলেন। নিয়মিত চিকিৎসায় প্রায় কুড়ি বাইশ দিন পরে নলিনী আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য বিশেষ-রূপ ভঙ্গ হইয়াছিল; সুতরাং স্বাস্থ্য-সম্পাদনের জন্য প্রবোধ তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন; সঙ্গে সতীশও গেলেন। নলিনীর নিষেধ সত্ত্বেও কলিকাতায় সকলেই ঝির মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বিশেষ বিরক্ত হইলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কেহ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। সতীশ একদিন কমলার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া নলিনীর নিকট দুঃখ করিতেছিলেন; তাহাতে নলিনী বাধা দিয়া বলিলেন,—"অসুখ-বিসুখ সকলেরই হয়; তাতে ঠাকুরঝির দোষ কি? আমি ওসব কাজ কখনও করি নাই, তাই একটু কেমন কেমন বোধ হো'ত।"

সতীশ নলিনীর হস্তাকর্ষণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন,—"আচ্ছা এর পরে যদি আবার কর্‌তে হয়, তবে কিরূপ বোধ হ'বে?"

নলিনী স্মিত মুখে বলিলেন,—"আধুনিক কলেজের উদার-নৈতিক ছাত্র মহোদয়দিগের পক্ষে সত্য মিথ্যা না বুঝে হাকিমগিরি কিংবা তিলকে তাল করে হাওয়া খাওয়ার বদলে তিন ঘণ্টা ব'কে-ঝ'কে উকিলগিরি করা যেরূপ বোধ হ'বে; কিংবা কেবল রাশি রাশি বই পড়ে সহসা সংসারের আবর্ত্তে পড়্‌লে যেমন বোধ হ'বে, অনেকটা সেরূপ বোধ হ'লেও হোতে পারে।"

সতীশ নলিনীকে হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন,—"নলিনি! তুমি সত্যই প্রভাতের নলিনী,—বরং তাহা হইতেও স্নিগ্ধ। বোধ হয়, আমি খুব ভাগ্যবান্।"

নলিনী স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"অন্ততঃ তোমার কাছে সেরূপ হইলে আমারও পরম সৌভাগ্য!"

সুখে আনন্দে দম্পতির দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে প্রাবৃটের মেঘ-মুক্ত আকাশে শরতের নির্ম্মল হাসি ফুটিয়া উঠিল। পূজার অবকাশে আনন্দে ও হর্ষে বঙ্গদেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আবুল ফজল কলিকাতা হইতে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। বাড়ীতে পূজা বলিয়া রমেশ বাবু সতীশকে যাইতে দিলেন না।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ ।

আদর্শ বন্ধুত্ব ।

পূজার বন্ধ ফুরাইয়া গেল ; দেশ-বিদেশ হইতে ছাত্রবৃন্দ ছুটিয়া আসিয়া কলিকাতার স্কুল-কলেজগুলি গোলজার করিয়া তুলিল। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলেও আবুল ফজল কলিকাতা আসিলেন না। আজ আসিবে, কাল আসিবে বলিয়া সতীশ কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া শেষে আবুল ফজলের নিকট পত্র লিখিলেন। ইতিমধ্যে নলিনী একদিন আবুল ফজলের কথা জিজ্ঞাসা করায় সতীশ বলিলেন,—"এখনও তিনি আসেন নাই ; বোধ হয়, জ্বরজারি হইয়া থাকিবে। এ সময়ে দেশে প্রায়ই ম্যালেরিয়া হয়।"

নলিনী সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"তবে তুমি এখনই একখান পত্র লিখ। অসুখ করিলে বরং কলিকাতা আসাই সঙ্গত ; তাতে বেশ উপকার হ'তে পারে।"

সতীশ। কলিকাতা ত আর সকলের পক্ষে নলিনীর ন্যায় আনন্দ-নিকেতন নহে ; বিশেষতঃ আত্মীয়স্বজন-বিহীন ব্যক্তির পক্ষে কিরূপ, তাহা বোধ হয়, তুমি অনুমান কর্‌তেও পার্‌বে না।

নলিনী। না, আমাদের কি আর হৃদয় আছে ? না আমরা এ দুনিয়ার মানুষ যে, পৃথিবীর লোকের কষ্ট বুঝ্‌ব ?

সতীশ। বুঝ্‌লেও অনেক সময়ে কিছু করা যায় না। নলিনী বাধা দিয়া বলিলেন, "তা অনেকটা ঠিক ! কিন্তু ইচ্ছা থাক্‌লে যে একেবারেই

কিছু করা যায় না, এ কথাও আমি মানি না। মনে করুন, তিনি যদি অসুস্থাবস্থায় এখানে আসেন, তবে মা-বোনের কথা ছেড়ে দিলেও আমরা অন্ততঃ আত্মীয়ের অভাবও কি কথঞ্চিৎ পূর্ণ কোর্‌তে পারি না?" সতীশ আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—"নলিনি! হৃদয়ের এই মহত্ত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পার্‌লে বড়ই সুখী হ'ব।" "তোমার আশীর্ব্বাদ"—বলিয়া নলিনী সতীশকে আর একখান পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন। সতীশ পত্র লিখিতে বসিলেন।

তিন চারি দিন পরে আবুল ফজলের পত্র আসিল। পত্র পাইয়া সতীশ চিন্তিত হইলেন; উহাতে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত ছিল,—

'প্রিয় সতীশ! তোমার পত্র যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছে। আমরা সকলে ভাল আছি; তোমাদের বাড়ীতেও সকলে ভাল আছেন। * * বিশেষ কারণবশতঃ কলিকাতা আসিতে আমার একটু বিলম্ব হইবে। সাক্ষাৎ মত সব কথা বলিব। তোমার শ্বশুরালয়ে সকলকে যথাবিধি আমার সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিবে। সকলের কুশল লিখিতে ভুলিও না।"

পত্রের মর্ম্ম সতীশ, নলিনী, প্রবোধ বা তাঁহার মাতা কেহই ভাল বুঝিতে পারিলেন না। পুনঃ পুনঃ পত্র লেখা সত্ত্বেও আবুল ফজল এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু লিখিলেন না।

ক্রমে বড় দিনের বন্ধ আসিল। সতীশ কয়েক দিনের জন্য বাড়ী গেলেন। বাড়ী গিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ব্যাপারটী এই:—

সতীশের পিতা বড় মিঞার নিকট আবুল ফজলদের যে মর্টগেজ বিক্রয় করিয়াছিলেন, বড় মিঞা সেই মর্টগেজে নালিশ করিয়া আবুল ফজলের পিতার নামে প্রায় এগার শত টাকার ডিক্রি করিয়াছেন। যথাবিধি ডিক্রি জারি দেওয়াও হইয়াছে। অবিলম্বে

ডিক্রির টাকা না দিলে হয়ত তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তিই নিলামে বিক্রীত হইয়া যাইবে; অথচ আফতাব-উদ্দিন মিঞা টাকা দিবার কোনই উপায় দেখিতেছিলেন না। প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের—ধনীর সহিত দরিদ্রের কলহের পরিণাম যাহা হয়, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া তিনি যে পাঁচ শত টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত ঐ বাবদে খরচ করিয়াও নিজেদের জিনিস পত্র প্রায় সবই বন্ধক দিয়াছেন। বিষয় সম্পত্তিটুকু যাহা ছিল, তাহাও এবার যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং অর্থসংগ্রহে একেবারে নিরুপায় হইয়া পূজার বন্ধে আবুল ফজল বাড়ী আসিলে তিনি অতি দুঃখে তাঁহাকে কোন কাজ-কর্ম্মের যোগাড় দেখিতে বলিলেন। পড়া ছাড়িয়া দেওয়া বিশেষ মনঃক্ষোভের বিষয় হইলেও, আবুল ফজল অম্লান বদনে পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কাজ-কর্ম্মের যোগাড় দেখিতে লাগিলেন।

সতীশ আবুল ফজলের সহিত দেখা করিয়া পড়া ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য তাঁহাকে অনেক মন্দ বলিলেন এবং পুনঃ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন; কিন্তু আবুল ফজল নিজেদের অবস্থা ব্যক্ত করিয়া এইরূপ বলিলেন,—"ভাই সতীশ! তুমি বুঝিতেছ না; পড়া ছাড়িয়া দেওয়ায় তুমি যতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়েছ, আমি ও আমার পিতা-মাতা তাহা হইতে অনেকগুণ অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু উপায় নাই। আমি এখন পড়্‌তে গেলে শুধু যে বিষয় সম্পত্তি যা'বে তাহা নহে; বরং আমার পিতামাতা ও পরিজনদিগকে সম্পূর্ণ পথের ফকির হ'তে হ'বে। তার চেয়ে কোনরূপ কাজ কর্ম্ম ক'রে পিতামাতাকে শান্তিতে রাখা কি লেখা পড়া হ'তে আমার পক্ষে মহান্‌ কর্ত্তব্য নয়? বল ভাই, তুমিই বিবেচনা করিয়া বল।"—বলিতে বলিতে আবুল ফজলের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল।

সতীশ আর কিছু বলিলেন না—বলিতে পারিলেন না। তিনি আবুল ফজলের নিকট হইতে ব্যথিত চিত্তে ফিরিয়া গিয়া আফতাব-উদ্দিন মিঞাদিগকে সাহায্য করিতে,—তাঁহাদিগকে উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পিতার নিকট অশেষ প্রকার অনুরোধ করিলেন; কিন্তু সে অনুরোধ ত ব্যর্থ হইলই, অধিকন্তু শত্রুপুত্র আবুল ফজলের সহিত সদ্ভাব রাখিলে ভবিষ্যতে ভাল হইবে না,—রায় মহাশয় সতীশকে একথা স্পষ্ট বলিয়া দিলেন। অগত্যা বেদনাভারাক্রান্ত হতাশ হৃদয় লইয়া সতীশ কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

সতীশ কলিকাতা গিয়া সকলকে যথাবিধি সম্ভাষণপূর্ব্বক পাঠগৃহে গমন করিলেন। তাঁহার অবস্থার সম্পূর্ণ ভাবান্তর লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি পুস্তকাদি খুলিয়াও তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। নিদারুণ চিন্তার প্রজ্বলিত বহ্নিতে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। ভক্তিভাজন পিতাকর্ত্তৃক প্রিয়তম সুহৃদের সাংসারিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ জীবনের কি ভীষণ অনিষ্ট সংসাধিত হইল এবং তিনি তাহার কোনই প্রতিকার করিতে সমর্থ হইলেন না,—ভাবিয়া সতীশ অস্থির হইয়া উঠিলেন।

সতীশ পড়া-শুনা বিস্মৃত হইয়া সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় আকাশ-পাতাল ভাবিতেছেন, এমন সময়ে প্রভাত-নলিনী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তাচ্ছন্ন স্বামীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রায় দশ মিনিট অবস্থান করিলেও যখন সতীশ তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিলেন না, তখন নলিনী অগ্রসর হইয়া স্বামীর গাত্রে হস্তার্পণ করিলেন। সতীশ চমকিতচিত্তে নলিনীকে নিকটে দেখিয়া হৃদয়ের ভাব গোপনপূর্ব্বক সাদরে নিকটে আকর্ষণ করিলেন। নলিনী সকরুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাড়ীর সংবাদ ভাল ত? বাবা ও ঠাকুরঝি কেমন আছেন?"

"সকলেই ভাল আছেন"—বলিয়া সতীশ অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই নলিনী বলিলেন,—"খাবার প্রস্তুত; মা ডেকে পাঠিয়েছেন; মেজদাও তোমার জন্য ব'সে আছেন।"

তখন সতীশ আহার করিতে গমন করিলেন এবং আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ প্রবোধের সহিত গল্প করিয়া কাটাইলেন। গল্পে তাঁহার আদৌ মনঃসংযোগ হইল না; অনন্তর প্রবোধের নিদ্রা আসিলে সতীশ উঠিয়া শয়নগৃহে গমন করিলেন।

শয়নগৃহে গিয়া দেখিলেন, প্রভাত-নলিনী নীরবে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার লাবণ্যোজ্জ্বল প্রফুল্ল মুখচন্দ্রিমার উপর একটুখানি গাম্ভীর্য্যের মলিন আভা প্রতিফলিত হইয়াছে। সতীশ গৃহে প্রবেশ করিতেই নলিনী সাদরে তাঁহার হাত ধরিয়া শয্যার উপর বসাইলেন এবং আবেগপূর্ণ মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি পড়্‌বার ঘরে কি ভাব্‌ছিলে?"

সতীশ প্রেমময়ী পত্নীর প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ব্যথিত স্বরে বলিলেন,—"নলিনি! আমি এক গুরুতর চিন্তায় পড়েছি; অনুতাপে আমার হৃদয় জ্ব'লে যাচ্ছে; তোমার কাছে বল্‌লে যদি প্রতিকারের আশা থাক্‌ত, বহু পূর্ব্বেই বল্‌তেম; কিন্তু—"

নলিনী বাধা দিয়া বলিলেন,—"প্রতিকারের আশা না থাক্‌লেও লোকে আত্মীয়-স্বজনের কাছেই দুঃখের কথা ব'লে থাকে। যদি কোন আপত্তির কারণ না থাকে, আমার কাছে বল্‌তে দোষ কি?"

"দোষ কিছু নাই"—বলিয়া সতীশ নলিনীকে আদ্যোপান্ত সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। বাল্য-জীবনে তাঁহাদের উভয় পরিবারের মধ্যে কিরূপ সদ্ভাব ছিল এবং কিরূপ সখ্যতার সহিত তাঁহারা বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; তৎপর আজিজার সহিত আবুল ফজলের পরিণয়-প্রস্তাব;

আজিজার অন্যত্র বিবাহ হওয়া ; তজ্জন্য আবুল ফজলের ব্যাকুলতা ; উভয় পরিবারের শত্রুতা ; সতীশের পিতার নিকট আবুল ফজলের পিতার ঋণ গ্রহণ ; অনন্তর সতীশের বিবাহের পূর্ব্বে সেই ঋণ-পত্র আবুল ফজলদের প্রবল শত্রু বড় মিঞার নিকট হস্তান্তরিত করা ; আবুল ফজলের সহিত বন্ধুত্বচ্ছেদনার্থ পিতার আদেশ এবং তাহা অবগত হইয়াও সতীশের সুখ-শান্তির জন্য তাঁহার পরিণয়ব্যাপারে আবুল ফজলের ঐকান্তিক চেষ্টা। তৎপর যেরূপে আবুল ফজলের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি প্রতিহত এবং তাঁহার পিতা যে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন, সতীশ নলিনীর নিকট একে একে বিস্তৃতরূপে সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। কথাগুলি শুনিতে নলিনী যেরূপ আগ্রহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, তাহাতে অলক্ষ্যে যেন সতীশের হৃদয়ভার অনেক কমিয়া গেল।

নলিনী ব্যথিত ভাবে বলিলেন, "তুমি বাবাকে বিশেষরূপ ধ'রে কেন ইহার কোনরূপ প্রতিকার কোর্‌তে চেষ্টা কোর্‌লে না ?"

সতীশ। আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কিন্তু তাঁ'র যেরূপ মেজাজ, তা'ত জানই।

নলিনী। আচ্ছা আমি, তুমি ও ঠাকুরঝি যদি একত্রে বাবাকে ধ'রে বসি, তবুও কি তিনি শুন্‌বেন না ?

সতীশ। বোধ হয় না ; বিশেষতঃ কমলা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ কর্‌বে।

নলিনী এই বিষাদমিশ্রিত বাক্যালাপের মধ্যেও মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"যা হোক্ ; আচ্ছা ভাই বোন্ !"

সতীশ। সকলেই ত আর তোমার মত ভ্রাতৃগতপ্রাণা নহে !

নলিনী। না ছি ! তা কি হ'তে আছে ? যদি স্বামী হিংসা করেন ?

নলিনী। তা তুমি নিজে ভেবে দেখলেই ত পার। যাক্ সে কথা; আচ্ছা ঠাকুরঝি কেন বিরুদ্ধাচরণ কোর্‌বেন?

সতীশ। তাঁর স্বভাবই ঐ রকম।

নলিনী। তবে ত বড়ই বিপদ্; আবুল ফজলের পড়া বন্ধ হইলে ভয়ানক অনিষ্ট হ'বে।

সতীশ। সে সাধারণ অনিষ্ট নহে; আবুল ফজল পড়া ত্যাগ কর্‌লে একটী পরিবারের—এমন কি, দেশের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হ'বে, তুমি বোধ হয়, তা' বুঝ্‌তে পার্‌বে না; কারণ তাঁ'র মত প্রতিভাশালী ছাত্র আমাদের দেশে যতদূর জানি, তাহাতে আর দ্বিতীয় নাই। নানা বিপদ্ অশান্তির আবর্ত্তে প'ড়েও আবুল ফজল স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হ'য়েছে। সুতরাং দেশ ও সমাজ তাঁ'র নিকট অনেক আশা করে।

নলিনী শুনিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিলেন,—"আচ্ছা, আমরা পড়া যদি তাঁর পড়ার কোনরূপ বন্দোবস্ত কোরে দিতে পারি, তবে তিনি বন্ধ কোর্‌বেন না ত?"

সতীশ। আমি সেরূপ বলেছিলাম; কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত পিতামাতাকে দুঃখের আবর্ত্তে ফেলে তিনি পড়া চালা'তে সম্মত নহেন।

নলিনী। তবে কি আর কোন উপায় নাই?

সতীশ। একমাত্র উপায়—তাঁহাদিগকে এই এক হাজার টাকা ধার দেওয়া বা সাহায্য করা; কিন্তু তা আমরা পার্‌ব কি?

নলিনী শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; তখন সতীশ তাঁহাকে বলিলেন,—"যদি আমরা মা ও বাবাকে (নলিনীর জনক-জননী) সব কথা ব'লে অনুরোধ করি, তবে আমাদের অনুরোধে কি তাঁরা আবুল ফজলকে এক হাজার টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন?"

নলিনী একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"তাঁহারা দিতে পারবেন কি না বা দিবেন কি না, তাই আগে বুঝে দেখা আবশ্যক; যদি না দেন বা দিতে না পারেন, তবে না বলাই উচিত। আচ্ছা, আমি আগে ভেবে দেখি, পরে যাহা হয় করা যাবে। অবশ্য কোনরূপ সদুপায় কোর্‌বই; তুমি কোন চিন্তা কোরো না।"

নলিনীর বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সতীশ শয়ন করিলেন; কিন্তু উত্তেজনার মুখে "কোনরূপ সদুপায় কোর্‌বই"—বলার সঙ্গে সঙ্গেই যেন স্বামীর সমস্ত চিন্তা নলিনীতে সঞ্চারিত হইল।

ক্রমে রজনীর অন্ধকার অপসৃত হইয়া দিবসের আলোকে অবনী উদ্ভাসিত হইল; কিন্তু নলিনীর হৃদয় হইতে দুশ্চিন্তার তমসা অপসৃত হইল না। পিতামাতাকে বলিব কি না; তাঁহারা শুনিবেন কি না, যদি না শুনেন, তবে কি মনে করিবেন?—এইরূপ নানা চিন্তায় নলিনী দুই প্রহর বেলা কাটাইয়া দিলেন। তৎপরে লোক দেখানোর মত কিছু আহার করিয়াই ভ্রাতৃবধূ মায়ার গৃহে গিয়া শয়ন করিলেন। মায়া নলিনীর ভাবান্তর একটু লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি পরিহাস করিয়া বলিলেন,—"মুখখানি শুকনো কেন? ঠাকুর-জামাই কিছু ব'লেছেন নাকি? বল না, তা হলে এক নম্বর ফাইল করা যাক্‌।"

নলিনী হাসিয়া বলিলেন,—"বল্‌লেও নিরুপায়; কারণ কল্‌কাতার হাইকোর্টে অভিযোগ করা আমার অসাধ্য।"

"বটে! এরই মধ্যে দেশের জন্য ওকালতি আরম্ভ ক'রেছ? আর কয়েকদিন গেলে বোধ হয় দুজনে মিলে দ্বিতীয় 'কলিকাতা-রহস্য' রচনা আরম্ভ কোর্বে!"

"তা বিচিত্র কি? রহস্যে যে তোমরা একেবারে আচ্ছন্ন!"

"তোমাদের চেয়েও ?"—বলিয়া নলিনীর প্রফুল্ল গণ্ডদেশে দুইটী অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া মায়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন ; নলিনী তাঁহার আলমারি খুলিয়া একখণ্ড উপন্যাস লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

উপন্যাস খানিতে কলিকাতার স্বামি-স্ত্রীর চরিত্র অঙ্কিত ছিল ; সাধ্বী-স্ত্রী কি প্রকারে নরপশু মাতাল স্বামীর তৃপ্তির জন্য নানা অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াও নিজের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন ; ধন, অলঙ্কার, মান, অভিমান ত্যাগ করিয়া কিরূপে কুপথগামী স্বামীকে সুপথে আনয়ন করিয়াছিলেন ; সেই সমস্ত বিবরণ পড়িতে পড়িতে নলিনীর মুখখানি যেন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। এমন সময়ে মায়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"কি পড়া হচ্ছে ?"

নলিনী। আচ্ছা বৌদি! স্বামীর অসৎ কার্য্যের সহায়তার জন্য এরূপ করা কি সঙ্গত ?

মায়া উক্ত পুস্তকের ঘটনাবলীর বিবরণ উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"স্বামী স্ত্রীর পরমারাধ্য দেবতা ; স্ত্রী তাঁহার করুণার পাত্রী সেবিকা মাত্র! সে তাঁহার দেবতার দোষ-গুণ বিচার করিবে কেন ? স্বামীর তুষ্টির জন্য বিনা বিচারে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করা পতিপ্রাণা সতী স্ত্রীর পক্ষে কিছুই নহে। তবে আজকালকার যে সমস্ত শিক্ষাভিমানিনী নবীনা, স্বামীকে প্রিয়পাত্র, বন্ধু বা সংসার-জীবনের একজন সহচর মাত্র মনে করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র! কারণ তাঁহারা পতি-প্রেম ও পতিভক্তি হইতে আত্মমর্য্যাদাকেই বড় বলিয়া জানেন।"

নলিনী মায়ার কথার কোন উত্তর দিলেন না ; স্বামীর চিন্তাপনোদনের জন্য সহসা একটী কল্পনা তাঁহার অন্তরে উদিত হইল। তিনি রজনীতে যথাসময়ে স্বামিসকাশে উপস্থিত হইয়া সতীশ কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই আলমারি খুলিলেন এবং তাহা হইতে নিজের সমস্ত মূল্যবান্

অলঙ্কার বাহির করিয়া তাহা বিক্রয়পূর্ব্বক আবুল ফজলকে বিপদ্ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত সতীশকে অনুরোধ করিলেন। সতীশ নলিনীর হৃদয়-মাহাত্ম্যে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখে কথা সরিল না। অনন্তর নলিনীকে হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া আবেগভরে বলিলেন,—"নলিনি! তোমার হৃদয়ের উচ্চতা ও মহত্ত্ব আমি কখনও ভেবে দেখ্‌বার সুযোগ পাই নাই। আজ আমি শুধু চমৎকৃত হই নাই, বরং নিজেকে পরম ভাগ্যবান্ মনে কর্‌ছি। কিন্তু প্রিয়তমে! এই সব অলঙ্কার তোমার পিতামাতাই তোমাকে দিয়েছেন; আমার এগুলি গ্রহণ কর্‌বার কি অধিকার আছে?"

নলিনী সরল ভাবে ও প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—"যা'র দেহ ও হৃদয়ের উপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তা'র সামান্য অলঙ্কারের উপর অধিকার আছে কি না? কলেজে যদি এ শিক্ষাও না হয়, তবে আমার বল্‌বার কিছুই নাই।"

সতীশ নলিনীর প্রেমপূর্ণ স্নেহে আনন্দিত হইয়া সোহাগ ও সম্প্রীতি-পূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"কলেজে না হ'লেও আজ তোমার কাছে হ'ল। কিন্তু মা ও বাবা জান্‌লে কি মনে কর্‌বেন?"

নলিনী। তাঁহারা আমাকে যখন দিয়েছেন, তখন আমি উহা ইচ্ছা-মত ব্যবহার কর্‌তে পারি। ইহাতে তাঁহারা বৃথা কিছু মনে কোর্‌বেন কেন?

সতীশ। তাঁহারা ত তোমাকে জলে ফেলে দিতে দেন নাই?

নলিনী। স্বামীকে দিলে কি জলে ফেলা হয়?

সতীশ। সর্ব্বত্র না হ'লেও কোন কোন স্থানে ত হ'তে পারে?

নলিনী। যাহার নিকট হয় হোক, আমার নিকট নয়।

সতীশ। মা ও বাবা জিজ্ঞাসা কর্‌লে কি ব'লবে?

নলিনী। বোধ হয় জিজ্ঞেস্ কোর্‌বেন না। যদি করেন, যা হয় একটা কিছু বোল্‌বো।

সতীশ। মিথ্যা কথা বল্‌বে না ত?

নলিনী একটু ভাবিয়া বলিলেন, “যখন কোন অপকর্ম্ম কর্‌লেম না, তখন মিথ্যা বল্‌ব কেন? বল্‌তে হয়, সত্য কথাই বল্‌ব।”

সতীশ নলিনীর হৃদয়মাহাত্ম্যে ও মানসিক সংসাহসে একান্ত মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে হৃদয়াবদ্ধ করিয়া বলিলেন, “আজ তুমি আমাকে এক মহা চিন্তার হস্ত হইতে উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে এক চির কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ কর্‌লে।” আবেশবিহ্বল প্রভাত-নলিনী নীরবে তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ ও তৃপ্তি জ্ঞাপন করিলেন।

কয়েকদিন পরেই সতীশ অলঙ্কারগুলি লইয়া দেশে গমন করিলেন। আবুল ফজল ও তৎপিতা প্রথমে কিছুতেই সে অলঙ্কার গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই; কিন্তু পরিশেষে সতীশের একান্ত আগ্রহে ও অনুরোধে ধারস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। অলঙ্কারগুলি বন্ধক দিয়া প্রায় সহস্র টাকা পাওয়া গেল। সুতরাং আফতাব-উদ্দিন মিঞা সহজেই বড় মিঞার ডিক্রির সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া সকলকেই চমৎকৃত করিলেন; কিরূপে টাকা সংগৃহীত হইল, তাহা আফতাব-উদ্দিন মিঞা, আবুল ফজল, সতীশ ও নলিনী ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিলেন না।

যথাসময়ে আবুল ফজল অধ্যয়নে যোগদান করিলেন।

ষড়্‌বিংশতি পরিচ্ছেদ।

আবদুল হকের স্বেচ্ছাচার।

বড়মিঞা গিয়াসুদ্দিনের সহিত ক্রমশঃ সৈয়দ আবদুল হকেরও মনান্তর প্রকাশ পাইতে লাগিল। কারণ আবদুল হক কলিকাতা থাকিতে থাকিতে বিলাস-ব্যসন ও বাবুয়ানায় একান্ত অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সমপাঠী অবস্থাপন্ন ছাত্রবৃন্দের সহিত সমানতোড়ে জাঁক্‌জমক রক্ষা করিতে তাঁহার খরচের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। এইজন্য তিনি প্রতিমাসেই বড়মিঞার নিকট অধিক টাকা চাহিতে লাগিলেন। বড়মিঞা প্রথম প্রথম অতিরিক্ত টাকা দিলেন বটে, কিন্তু পিতার ন্যায় পুত্রকেও অপব্যয়ী দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং সৈয়দ সাহেবের সহিত অসদ্ভাব হেতু তিনি নানা ওজরাপত্তি করিয়া অতঃপর প্রতি মাসেই টাকা কম করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। এদিকে আবদুল হক কেবল বিলাস-ব্যসনের সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া আমোদপ্রিয় ধনী ছাত্রবৃন্দের সহিত ক্রমে ক্রমে থিয়েটার বায়োস্কোপেও যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত অসচ্ছলতা ক্রমশঃ অপরিহার্য্য অভাবে পরিণত হইয়া উঠিল; সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া শ্বশুরের নিকট লিখিলেন যে, "যদি আপনি আমাকে প্রতি মাসে চল্লিশ টাকা করিয়া নিয়মিত ভাবে না দেন, তবে অগত্যা হয় আমাকে পড়া ত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ বাধ্য হইয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।" বড় মিঞাও উহার উত্তরে বিরক্তির সহিত লিখিলেন,—"বাবা! মাসিক চল্লিশ

টাকা দেওয়া আমার অসাধ্য; তবে আমি যাহা দিতে চাহিয়াছি, তাহা দিতে এখনও প্রস্তুত আছি। অন্য উপায় অবলম্বনের কথা লিখিয়াছেন; সে সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছুই নাই। একটী মেয়ে আপনাদিগকে দিয়াছি; তাহাকে দুঃখ-কষ্ট দিয়া যদি আপনাদের সুখ হয়, দিবেন; পরকালে খোদা আছেন।" ফলতঃ এই সময় হইতে শ্বশুর-জামাইয়ের সদ্ভাব ছিন্ন হইয়া গেল।

ইহার পরে আবদুল হক একবার বাড়ী গেলেন। এখন পর্য্যন্ত আজিজার অপার্থিব ভালবাসায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। আজিজার ভগ্ন স্বাস্থ্য ও শীর্ণ চেহারা দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন এবং আজিজা কিছু না বলিলেও তৎপ্রতি মাতা ভগিনী প্রভৃতির ব্যবহার প্রকারান্তরে অবগত হইয়া তিনি তাঁহাদের প্রতি বিষম বিরক্ত হইলেন। এমন কি, তিনি আজিজাকে স্পষ্টভাবে মাতা ও ভগ্নীর বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু আজিজা নানারূপে বুঝাইয়া স্বামীকে শান্ত করিলেন; সুতরাং পিতা মাতার সহিত আবদুল হকের মনান্তরের হেতু আপাততঃ চাপা পড়িয়া গেল।

আজিজা এতদিন কেবল যে শাশুড়ী-ননদের দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়াছেন মাত্র, তাহা নহে; তিনি প্রায় দেড় বৎসর হইল, পিত্রালয় যাইতে পারেন নাই? সুতরাং স্নেহশীল পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের সন্দর্শন হইতে তিনি বঞ্চিতা রহিয়াছেন। মাঝে মতিয়র রহমান আসিয়া আজিজাকে এক দিনের জন্য আলিনগরে লইয়া যাইবার জন্য কত অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু সৈয়দ সাহেবেরা সে অনুরোধ রক্ষা না করায় সে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার পর আর কেহ এখানে আসেন নাই।

এত মনস্তাপ এবং নির্য্যাতনের মধ্যেও আজিজা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত একমাত্র খোদাতালার উপর নির্ভর করিয়া জীবনাতিবাহিত করিতেছিলেন;

তাঁহার আশা ছিল, স্বামী উপযুক্ত হইলে একদিন এ দুঃখের অবসান হইবে। তখন পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী সকলকেই সুখী করিতে পারিব। কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত সামান্য ঘটনায় তাঁহার এই সুখের কল্পনার মূল উৎপাটিত হইল; তাঁহার আশা, উৎসাহ, সুখ, শান্তি ও কল্পনা এক নিরাশা ও মনস্তাপের কঠোর স্রোতে ভাসিয়া গেল। ঘটনাটি যথাযথ নিম্নে ব্যক্ত করিতেছি।

আবদুল হক কলিকাতা বাসকালীন বায়স্কোপ থিয়েটার প্রভৃতি দেখিয়া যে কথঞ্চিৎ ধর্ম্মে আস্থাশূন্য ও আমোদপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, পাঠক তাহার আভাস পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। এই আমোদপ্রিয়তানিবন্ধন তিনি বাড়ী আসিয়া মোটেই স্ফূর্ত্তিভোগ করিতে পারিতেছিলেন না। প্রেমময়ী পত্নীর অপার্থিব ভালবাসাও তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসহীন চঞ্চল মনে শান্তি প্রদানে সমর্থ হয় নাই। তিনি অহরহ একটা আমোদের উপলক্ষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন।

এমন সময়ে সহসা একটী উপলক্ষ জুটিয়াও গেল। আবদুল হকদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের এক হিন্দু মহাজনের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ঢাকা হইতে যাত্রা ও খেম্‌টার দল আনীত হইল। আবদুল হক স্থানীয় হিন্দু যুবকগণের সহায়তায় স্বগ্রামে ঐ যাত্রা ও খেম্‌টার দল আনিবার বন্দোবস্ত করিয়া স্বয়ং উহাদিগকে দেয় টাকার এক চতুর্থাংশ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

আবদুল হকের উৎসাহে উৎসাহিত হিন্দু যুবকগণ ক্রমান্বয় দুই রাত্রির জন্য একপালা যাত্রা ও একপালা খেম্‌টা দেড়শত টাকায় ঠিক করিয়া আসিলেন এবং বায়নার টাকা দিবার জন্য আবদুল হকের নিকট ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আবদুল হকের নিজের নিকট এক পয়সাও ছিল না। আজিজার নিকট পিতৃদত্ত পঞ্চাশটী টাকা ছিল, আবদুল হক

তাহা জানিতেন এবং সেই টাকার বলেই তিনি বড় জোরে হিন্দুমহলে দাতা নাম লিখাইয়া আসিয়াছিলেন।

আজিজাকে লইবার জন্য বড় মিঞা গিয়াসউদ্দিন যখন শেষবার পুত্র মতিয়র রহমানকে প্রেরণ করেন, তখন তিনি আজিজাকে দেওয়ার জন্য মতিয়র রহমানের নিকট পঞ্চাশটী টাকা দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি সৈয়দ সাহেবেরা আজিজাকে না পাঠান, তবে তাহাকে এই টাকা কয়টী দিয়া আসিবে। মতিয়র রহমান সেই টাকা পঞ্চাশটী আজিজাকে দিয়া গিয়াছিল এবং উহা আজিজার নিকটেই ছিল। পরে আবদুল হক বাড়ী আসিয়া একদিন আজিজার সহিত কথাপ্রসঙ্গে নিজের খরচপত্রের অভাব ও সেই সঙ্গে বড়মিঞার পুর্ব্বপ্রেরিত পত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করিলে আজিজা বলিয়াছিলেন, "আপনি খোদার ওয়াস্তে বাবাজানের সহিত কোনরূপ রূঢ় ব্যবহার করিবেন না; তিনি যাহা দেন, আপাততঃ তাহাই গ্রহণ করুন। তিনি ইতিপূর্ব্বে আমাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; অতিরিক্ত খরচের জন্য তাহাই লইয়া যাইবেন; পরে যাহা অভাব হয়, আমি আনাইয়া দিব। ভাবিয়া দেখুন, ইঁহাদের ব্যবহারে এবং আমাকে সেখানে না পাঠানে তিনি কিরূপ মর্ম্মাহত; তার পর আপনিও যদি পরের মত ব্যবহার করেন, তবে তাঁহার মনঃকষ্টের আর সীমা থাকিবে না।" বলা বাহুল্য, আজিজার সকরুণ বাক্যে আবদুল হক সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন; কারণ তাঁহার টাকার অভাব, অথচ সেই অভাবই যখন আজিজা পূরণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, তখন তিনি কোনরূপ দ্বিরুক্তি করা আদৌ আবশ্যক বোধ করেন নাই।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরেই আবদুল হক পূর্ব্বোক্ত যাত্রা ও খেম্‌টার জন্য অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হন এবং হিন্দু যুবকগণের তাড়নায় প্রতিশ্রুত অর্থ দিবার জন্য আজিজার নিকট চল্লিশটী টাকা প্রার্থনা করেন।

আবদুল হক্ অসময়ে হঠাৎ অতগুলি টাকা চাওয়ায় আজিজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"আপনার বাড়ী হইতে যাওয়ার আরও কয়েকদিন বাকি আছে; আজ হঠাৎ টাকার কি দরকার হইল?"

আঃ হক। দরকার না হইলে আর চাইতেছি। যদি আমাকে দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে আজই দাও।

আজিজা। আপনাকে দেওয়ার জন্যই ত রাখা হইয়াছে; আমি উহার এক পয়সাও খরচ করি নাই। আপনি বাড়ী হইতে যাওয়ার সময়ে লইয়া যাইবেন, এই ত জানি। তবে দরকার হইয়া থাকে; এখনি লইয়া যান; কিন্তু দরকারের বিষয় আমাকে জানাইলে দোষ কি?

"দোষ আর কি"—বলিয়া আবদুল হক আজিজাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। শুনামাত্র আজিজার উজ্জল মুখখানি রাহুগ্রস্ত শশীর ন্যায় একেবারে মলিন হইয়া গেল। তিনি ক্ষুন্ন স্বরে বলিলেন, "আপনি যাত্রা থিয়েটারে যান?"

আবদুল হক বিস্মিত ভাবে আজিজার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাতে দোষ কি?"

আজিজা। দোষ ভয়ানক! আপনি কি জানেন না যে, গান-বাদ্য শ্রবণ করা মোসলমানের পক্ষে 'হারাম' *।

আবদুল হক। ও সব কাঠ-মোল্লাদের গোঁড়ামী! মোসলেম-জগতে চিরকাল সঙ্গীতচর্চ্চা হইয়া আসিয়াছে। মোসলমান রমণীরাও সঙ্গীতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তা ছাড়া অনেক পীর-ফকিরেও গানবাদ্য শ্রবণ করেন।

---

* হারাম—অবৈধ, অসিদ্ধ। কোরান ও হাদিসে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বিধান বিবৃত হইয়াছে।—দোরেঁাল-মোখ্‌তার প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

আজিজা। আমার বোধ হয়, আপনি কখনও মনোযোগ দিয়া শরিয়তের * কেতাব পড়েন নাই, তাই এরূপ কথা বলিতেছেন। মোসলেম জগতে অনেক পাপকার্য্য হইয়াছে ও হইতেছে; মোসলমান নর-নারী প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অনেক পাপ করিয়াছে ও করিতেছে; পীর-ফকির-নামধারী মানবগণও যে সময়ে সময়ে পথভ্রষ্ট হন নাই, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? তা ছাড়া সমাজে এখনও এরূপ অনেক পাপানুষ্ঠান চলিতেছে। আপনি কি সেগুলিকে জায়েজ † বলিতে চান?

আবদুল হক স্বীয় বিদ্যার বহর দেখাইয়া আজিজার মুখবন্ধ করিবার জন্য বলিলেন,—"প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি না; গানবাদ্যের কথাই আমার আলোচ্য। তুমি যেরূপ বলিতেছ, যদি গান-বাদ্য সেরূপ মহাপাপ হইত, তবে কখনও তাহা শিক্ষিত সমাজের উচ্চ স্তরে, এমন কি বাগদাদের খলিফাদিগের প্রাসাদে পর্য্যন্ত অবাধে চলিতে পারিত না। আমরা কোন পুস্তকে পড়িয়াছি, "জগজ্জননী ফাতেমাও অনেক গান জানিতেন এবং গান গাহিতেন, ইতিহাসে তাহা লিখিত আছে ‡।" "তা ছাড়া হজরত গানবাদ্য করিতে আদেশ করেছেন," এরূপ 'হাদিসও' কোন কোন মাসিক কাগজে পড়েছি §।

আজিজা। বাগদাদের খলিফাগণ ইস্‌লামের আদর্শ নহেন। খোলফায়ে রাশেদীনই ¶ আমাদের আদর্শ। আমরা বাল্যকালে অনেক সময়ে নানাজানের মুখে এ সমস্ত কথা শুনেছি। আপনি বোধ হয় জানেন

---

* শরিয়ত—ধর্ম্মবিধি। † জায়েজ—সিদ্ধ।

‡ সম্প্রতি প্রকাশিত একখানি উপন্যাসে এইরূপ ভ্রমাত্মক মত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

§ 'আল-এসলাম' নামক মাসিকপত্রে এইরূপ ভ্রান্ত মত ব্যক্ত হইয়াছিল।

¶ হজরতের পরবর্ত্তী ধর্ম্মনেতা চতুষ্টয়।

যে, তাঁর মত আলেম * দেশে কেউ ছিলেন না। আমার বেশ মনে আছে, একদা তিনি এক গীত-বাদ্যকারী ভণ্ড ফকিরকে হেদায়েত † করিয়াছিলেন। সেই ফকিরও এই রকম অনেক তর্ক তুলিয়াছিল। নানাজান তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "গীত-বাদ্যের যে হাদিস আছে, উহা জইফ ও মনসুখ ‡। জননী ফাতেমা গান গাহিতেন যাহারা বলে, তাহারা একেবারেই অজ্ঞ; কোন কোন গ্রন্থে এক শ্রেণীর 'কসিদা' সংগৃহীত হইয়াছে দেখা যায়, কিন্তু উহা সঙ্গীত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উহা সচরাচর আবৃত্তির প্রচলিত কবিতাবিশেষ। কোন কোন অদূরদর্শী ধর্ম্মদ্রোহী উহাকেই সঙ্গীত বলিতে চাহে, কিন্তু ইহা স্পষ্ট ধৃষ্টতা।" অধিকন্তু নানাজান দৃঢ়তার সহিত প্রামাণ্য কেতাবের প্রমাণ দিয়া বলিয়াছিলেন,—"মোসলমানের পক্ষে গানবাদ্য নিঃসন্দেহ হারাম; গানবাদ্য শ্রবণকারিগণ শয়তানের দাসদাসী-বিশেষ; উহারা স্বর্গের আনন্দ হইতে চিরবঞ্চিত হইবে। এমন কি, যাহারা শরিয়ত এন্‌কার করিয়া গানবাদ্য শ্রবণ করিবে, তাহারা কাফের হইবে, শাস্ত্রে ইহারও প্রমাণ আছে §।—আপনি পুস্তক ও মাসিক পত্রের কথা বলিতেছেন; উহাতে নানাশ্রেণীর লোকে নানা কথা লিখিয়া থাকে, সুতরাং গলৎ ¶ থাকা কিছুই বিচিত্র নহে।"

আবদুল হক বিদ্রূপপূর্ণ-স্বরে বলিলেন,—"আজিজা! এসব আষাঢ়ে গল্প কোথায় শিখেছ? এইরূপ কুসংস্কারেই আমাদের সমাজের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। তোমাদের কথায় বোধ হয়, দুনিয়ার আমোদ-প্রমোদ ও কাজকর্ম্ম সব ছাড়িয়া কেবল মালা টেপা ও পশ্চিম দিকে কপাল ঠোকাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য।"

---

* আলেম—ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্। † হেদায়েত—সৎপথে আনয়ন।

‡ জইফ ও মনসুখ—দুর্ব্বল, রহিত ও পরিত্যক্ত।

§ এন্‌কার—প্রত্যাখ্যান। ¶ গলৎ—ভ্রম।

¶ শরিয়তের বহুগ্রন্থে এই সমস্ত মত বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

আজিজা বিনীত ভাবে বলিলেন,—"আপনি ধর্ম্মের বিষয়ে সংযত ভাবে কথা বলিবেন, ইহাই আমার অনুরোধ। কারণ শরিয়তের কথায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিলে মহাপাপে পতিত হইতে হয়। ভাবিয়া দেখুন, আপনারা যে মহাপুরুষের বংশধর বলিয়া দাবি করেন, যাঁহার পবিত্র বংশমাহাত্ম্যে আপনারা জগতের শিরোভূষণ, তাঁহার অমর আত্মা এসব কথা অবগত হইলে কি বুঝিবেন? তাঁহার পবিত্র আদেশ ও রীতিনীতি হইতেও কি আপনি স্বীয় অভিমতকে উচ্চাসন দিতে চান? আমি আপনার নিকট একান্ত নগণ্য, তাহা জানি; আপনার জ্ঞান, বিদ্যা ও সম্ভ্রম আমার অপেক্ষা কত অধিক উচ্চ, তাহাও বুঝি; কিন্তু তবুও যে আপনার নিকট বাচালতা প্রকাশ করিতেছি, সে কেবল দায় পড়িয়া,—কর্ত্তব্যের অনুরোধে; কারণ ইহা ধর্ম্মের কথা; ইহা আষাঢ়ে গল্প নহে। যাহা বলিলাম, ইহা সমস্তই আমি নানাজান ও মার নিকট শুনেছি।"

আবদুল হক আজিজার কথায় নরম হইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা মানিলাম উহা মন্দ কাজ। কিন্তু স্বামীর কথা শুনা কি স্ত্রীর উচিত নহে? স্বামী কি স্ত্রীর পক্ষে মাননীয় নহে?"

আজিজা। শুধু মাননীয় কেন? খোদা ও রসুল ভিন্ন স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর ন্যায় মাননীয় আর দ্বিতীয় নাই। হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যদি মানবজাতীর পক্ষে মানবকে সেজদা * করা জায়েজ হইত, তবে রমণীদিগকে তাহাদের নিজ নিজ স্বামীকে সেজদা করিতে আদেশ করিতাম †। স্বামী অসন্তুষ্ট থাকিলে মহাপুণ্যশীলা রমণীও স্বর্গে স্থান পাইবে না ‡; ইহা অপেক্ষা আর কত শুনিতে চান?

---

* সেজদা—সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।

† হাদিস। ‡ ইহাও হাদিসের উক্তি।

আবদুল হক। তবে আমার একটা কথা রাখিতে এত আপত্তি করিতেছ কেন? মানুষের মতভেদ থাকেই। হয় ত আমি যাহা ভাল বুঝিতেছি, তুমি তাহা মন্দ বুঝিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের বুদ্ধির বিরুদ্ধে আমাকে সন্তুষ্ট করাও ত তোমার কর্ত্তব্য। তুমিই ত বলিতেছ, স্বামীই রমণীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়।

আজিজা। তা ঠিক; জগতে নারীর পক্ষে স্বামীই শ্রেষ্ঠ। পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এমন কি আত্মবিসর্জ্জন দিয়াও নারীর পক্ষে স্বামীর তুষ্টিবিধান ও আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে খোদাতালা নরনারী সৃষ্টি করিয়া নরজাতিকে নারীজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন *, যে খোদার প্রেরিত—রসুল স্ত্রীকে তাহার স্বামীর আদেশ পালন ও তুষ্টিবিধানের শিক্ষা দিয়াছেন †, সেই খোদা ও রসুল হইতে ত স্বামী বড় নহেন; সুতরাং তাঁহাদের আদেশ পালন ও সন্তুষ্টিবিধান হইতে স্বামীর আদেশপালন বা তুষ্টিবিধান কখনই অগ্রণী হইতে পারে না ‡। যদি আপনার আদেশ কেবল আমার বিবেক কিংবা কেবল সামাজিক রীতির বিরুদ্ধ হইত, আমি অম্লানবদনে প্রতিপালন করিতাম। কিন্তু ইহা যে খোদার আদেশ!

আবদুল হক। অত কথা শুন্‌বার আমার অবসর নাই। তুমি তাহা হইলে টাকা কয়টী দিতে নারাজ?

আজিজা। আপনার কথায় আমার হৃদয় বিদ্ধ হইতেছে। টাকা ত তুচ্ছ! এ দাসীর যাহা কিছু আছে, সমস্তই কি আপনার নিজস্ব নহে? কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, এই অপকার্য্যে কি কপর্দ্দকও ব্যয় করা উচিত §?

---

* কোরানের উক্তির মর্ম্ম। † হাদিসের শিক্ষার মর্ম্ম। ‡ ইসলামী ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ধারা।—আকায়েদ-উল-ইস্‌লাম দ্রষ্টব্য। § অসৎ কার্য্যে অর্থ ব্যয় করা মহাপাপ।—শরিয়তুল-মোসলেমীন।

আবদুল হক। তোমার কাছে উচিত কি না, জানি না ; কিন্তু জগতে এমন স্ত্রীলোকও আছে, যাঁরা স্বামীর তুষ্টির জন্য নিজের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া স্বামীকে অশ্রাব্য পাপমন্দিরেও পৌছাইয়া দিতে পারে।

আজিজা। এরূপ কাল্পনিক পতিভক্তির প্রতি ধন্যবাদ ! কিন্তু কোন আত্মজ্ঞানসম্পন্না ধর্ম্মশীলা মোসলমান-রমণী ওরূপ কার্য্য করিতে পারেন না।

আবদুল হক। (বিরক্তির সহিত) তা পার্‌বে কেন ? টাকার মূল্য যে তা'দের কাছে অনেক বেশী ! যাক, আমি চল্লিশটী টাকা হাওলাত চাহিতেছি ; দিবে কিনা, তাই বল ?

আজিজা। এই পাপের আগুন জ্বালায়ে পল্লীবাসী নরনারীর ধর্ম্ম ও চরিত্র দগ্ধ কর্‌বার জন্য ?

আবদুল হক। তা'তে তোমার কি ?

আজিজা। না আমার আর কি ! স্বামী ধর্ম্মের মাথা খাইয়া, পবিত্রতার মাথায় লাথি মারিয়া পাপ অভিনয় প্রদর্শন করিবেন ; কলুষিত চরিত্রা বারবিলাসিনীর পাপদৃষ্টিতে স্বামীর পবিত্র দেহ কলুষিত হইবে ; তাহাদের নৃত্য-গীতে হৃদয়ে পাপের জোয়ার বহিবে ; তাহাতে স্ত্রীর আর কি !

আবদুল হক বাধা দিয়া বলিলেন,—"যাক্, আর বক্তৃতা শুনে কাজ নাই। টাকা তোমার নিকট আমার সম্ভ্রম হ'তেও বড়, এতদিন পরে তাহা বুঝিলাম ! আর বুঝলাম, এতদিন বাড়ীতে তোমার স্বভাব সম্বন্ধে যাহা শুনেছি, তাহা একেবারে মিথ্যা নহে ; আমিই ভুল বুঝ্‌তাম।"

দুঃখে পরিতাপে আজিজা কাঁদিয়া ফেলিলেন ; অশ্রুপ্লাবিত নয়ন মুছিয়া আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"আপনি যখন আমার মনের দুঃখ বুঝ্‌লেন না, তখন আর ব'লে ফল কি ? আপনি টাকা লইয়া যাহা ইচ্ছা করুন।" কিন্তু "ওরূপ কৃপণের রক্তশোষা টাকা চাই না ; উহা অতি

তুচ্ছ মনে করি”—বলিয়া আবতুল হক সবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আজিজা ক্ষোভে দুঃখে স্বীয় বুদ্ধিহীনতার বিষয় ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আবতুল হক আজিজার উপর রাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন, এবং সারাদিন নানাস্থানে টাকার জন্য চেষ্টা করিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু কোন স্থান হইতেই টাকা যোগাড় করিতে পারিলেন না। এদিকে যথা সময়ে বায়না না পাইয়া যাত্রা ও খেম্‌টার দল চলিয়া গেল; সুতরাং কমলাবতী গ্রামখানিও সেবারকার মত দুশ্চরিত্র নরনারীর পাপ পদস্পর্শ হইতে পরিত্রাণ পাইল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে তিন চারি দিন অতীত হইল; আবতুল হক্ অভিমানবশে আজিজার সহিত ভালমত কথা বলিলেন না। আজিজা কত প্রকারে ত্রুটি স্বীকার করিলেন, কতরূপ দীনতার সহিত ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, কতরূপে তাঁহার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু অভিমানদৃপ্ত আবতুল হক সে সমস্তই অগ্রাহ্য করিলেন। অনন্তর আবতুল হক বাড়ী হইতে যাইবার সময়ে আজিজা যখন অত্যন্ত কাতরতা ও বিনয়ের সহিত টাকাগুলি লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখনও দুর্ব্বিনীত আবতুল হক উপেক্ষার সহিত আজিজার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান-পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় চূর্ণ করিয়া চলিয়া গেলেন। আজিজার সংসার-জীবনের একমাত্র অবলম্বনটীও যেন এতদিন পরে সহসা ছিন্ন হইয়া গেল।

আবতুল হক চলিয়া গেলে আজিজা জোবেদাকে অনেক প্রকারে তোষামোদ করিয়া শ্বশুরের দ্বারা টাকাগুলি আবতুল হকের নিকট ডাক-যোগে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আবতুল হক টাকা ফেরত পাঠাইলেন। এই ব্যাপারে প্রকৃত কথা জানিতে না পারিয়া সকলেই আজিজাকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। আবতুল হকের মাতা ও জোবেদা স্পষ্টই বলিতে

লাগিলেন, "বাপের ন্যায় আজিজাও ঘোর অর্থপিশাচ ; নইলে অকারণে আবদুল হক এরূপ কর্‌বে কেন ?" অনন্তর তাঁহারা আবদুল হককে উচ্চ-বংশে আর একটী বিবাহ দিতে হইবে, এইরূপ কল্পনা আঁটিতে লাগিলেন।

টাকাগুলি ফেরত আসিলে সৈয়দ সাহেব আজিজাকে বলিলেন,—"মা, তোমার টাকাগুলি ফেরত এসেছে ; ও চিরকালই ঐরূপ একগুঁয়ে। টাকাগুলি আমি রাখ্‌ব, না তোমার দরকার আছে ?"

আজিজা ব্যথিত ভাবে বলিলেন,—"আমার কিছুই দরকার নাই ; আপনিই উহা খরচ ক'রে ফেলুন।"

সৈয়দ সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া আজিজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ; আজিজার সেবাশুশ্রূষাগুণে তিনি বরাবরই তৎপ্রতি আন্তরিক সন্তুষ্ট ছিলেন।

কিন্তু সৈয়দ সাহেব সন্তুষ্ট থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে আজিজার প্রতি তাঁহার শাশুড়ী ও জোবেদার অত্যাচার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। সুতরাং আজিজার স্বাস্থ্য অনিয়মিত আহার-বিহার ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-জনিত কষ্টে মনস্তাপে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এইরূপে পাঁচ ছয় মাস গত হইলে সকলেই জানিতে পারিলেন, আজিজা অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু এ অবস্থায়ও তাঁহার আবশ্যক যত্নাদি করা হইল না। তখন আজিজা একান্ত অসুস্থ হইয়া পিত্রালয়ে যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু আবদুল হকের উপর ওজর দিয়া কেহই তাহাতে মত দিলেন না। ইহার অল্পদিন পরেই আবদুল হক বাড়ী আসিলেন এবং আজিজার অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আলিনগরে পত্র লিখিলেন। মতিয়র রহমান আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল।

আজিজাকে আলিনগরে পাঠাইয়া আবদুল হক নিশ্চিন্ত মনে কলিকাতায় আসিলেন এবং শ্বশুরের টাকাতেই এল-এ পাস করিয়া বি-এ পড়িতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সোফিয়া।

এইবার বিলাসপুরী কলিকাতা আবদুল হকের চক্ষে নূতন শোভা, নূতন সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিতে লাগিল। কারণ এতদিন পত্নী-প্রেমের যে স্বাভাবিক বন্ধনে তাঁহার অন্তরাত্মা আবদ্ধ এবং হৃদয়-মন সংযত ছিল, আজিজার প্রতি অন্যায় অভিমান ও কুসংসর্গের বশে সেই পবিত্র বন্ধন ক্রমেই শিথিল হইয়া যাইতে লাগিল। অনন্তর আজিজাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার চিন্তা হইতে হৃদয় মুক্ত করিয়া লওয়ায় এবং মাতা-ভগিনী কর্তৃক অন্য বিবাহ করিবার জন্য প্ররোচিত হওয়ায় তাঁহার মানসিক গতি এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ধাবিত হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে মুক্ত সৌন্দর্য্য ও স্বাধীন প্রেমের উপাসক হইয়া উঠিলেন। পবিত্রতা ও আন্তরিকতাশূন্য নয়নরঞ্জক বাহ্যিক শোভা-সৌন্দর্য্যের পঙ্কিল আকর্ষণে ক্রমেই তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইতে লাগিল! তাঁহার ভাবমুগ্ধ তরল চিত্তে এখন হইতে কেবল নূতন ধরণের কল্পনা-পুষ্প ফুটিতে লাগিল।

আবদুল হক কলেজে যাইবার সময়ে পথে যাইতে যাইতে যখন দেখিতেন যে, বিরাটকায় যুগতুরঙ্গম-চালিত সুবৃহৎ গাড়ীগুলি কলিকাতার রাজপথ কাঁপাইয়া ধাবিত হইতেছে; তাহার সুবিশাল বক্ষমাঝে সারি সারি সুসজ্জিত সৌন্দর্য্য-প্রতিমা—আননে তাঁহাদের গরবমাখা অর্দ্ধস্ফুট হাসি; নয়নে কোটি চিত্তবিমোহনকারী বিদ্যুৎ কটাক্ষরাশি; রত্নমৃণালে প্রস্ফুটিত

কনকপুষ্প-সদৃশ মনোহর করপদ্মে স্বর্ণালঙ্কৃত পুস্তক; শ্বেতপদ্মলাঞ্ছিত চিত্তহারী শুভ্র অঙ্গাবরণের উপর সর্প-শিশুসম বেণীবদ্ধ কুন্তল-লীলা অথবা নির্ম্মল নালাকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার ন্যায় সমুজ্জ্বল সূক্ষ্ম নীলাম্বরীর উপর সমীরণ-সন্তাড়িত নিতম্বস্পর্শী চঞ্চল কেশদামের মধুর খেলা;—প্রতি অঙ্গে তাঁহাদের সহস্র পিপাসিত চক্ষু লুটিয়া পড়িতেছে—প্রতি প্রত্যঙ্গের মৃদু কম্পনে গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দের সহিত চারি দিকে কামনার কোটী কোটী বাণবৃষ্টি হইয়া নর-চিত্ত জর্জ্জরীভূত করিতেছে,—তখন আবদুল হক ভাবিতেন, কোন্ ভাগ্যবান্ এই কল্পকুঞ্জের কুসুম লাভ করিয়া আনন্দে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক কৃতার্থ ও ধন্য হইবে? আবার যখন বৈকাল বেলা নানা বয়সের নরনারী হাস্য-উল্লাসে, আনন্দ-গল্পে ও ছন্দ-গন্ধে বিভোর হইয়া বাহির হইত—যখন ইহুদী ও পার্শী সুন্দরীরা মানবচিত্ত দগ্ধ করিবার জন্যই যেন সূক্ষ্ম শাড়ীর অন্তরাল হইতে পুষ্পপরাগরঞ্জিত নবনীতুল্য অঙ্গের কনককান্তি ফুটাইয়া পথ অতিক্রম করিত—যখন চৌরঙ্গির চারিদিক্ হইতে বদ্ধকটী স্ফীতবক্ষ ইউরোপীয় যুবতীগণ হংসমিথুনের ন্যায় বিলাতী জুতার সূক্ষ্ম গোড়ালীতে ভর দিয়া—অর্দ্ধোন্মুক্ত বাহু ও বক্ষের ব্রীড়া বিকাশ করিয়া—স্বর্ণ কেশের সৌন্দর্য্য ও সুনীল নয়নের বিদ্যুদ্দীপ্তি ছড়াইয়া স্বামি-প্রিয়জনের পাশে পাশে হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া আসিত; যখন সভ্যতা ও সৌন্দর্য্যের নবীন উপাসিকা সদ্যঃ-আবরণ-উন্মুক্তা বঙ্গ-ললনাগণ আবেশ-বিহ্বল ভাবে ভাবমুগ্ধ আননে হাওয়া খাইতে বহির্গত হইত; যখন সরমের প্রতিমার মত, সৌন্দর্য্যের লতাটীর মত সোনার তরু বাঙ্গালী মেয়ে ও মাড়য়ারী মহিলারা ঘোম্‌টাঘেরা মুখের মধুর মাধুরী এবং চকিত নয়নের চাহনীর সহিত অঙ্গভরা অলঙ্কারের মধুর ধ্বনিতে পথিকচিত্তে উন্মাদনার তরঙ্গ তুলিয়া গঙ্গার ঘাট গোলজার করিবার জন্য শঙ্কিতা-শফরীর ন্যায়—চকিতা কুরঙ্গীর

ন্যায় ধীর-মন্থর চঞ্চল গতিতে পথ অতিক্রম করিত;—অথবা যখন কলিকাতার রাজপথসমূহের ধারে ধারে দ্বিতল ত্রিতল হর্ম্ম্যশ্রেণীর লতাপাতা-পুষ্পঘেরা গবাক্ষমালার ঝালরযুক্ত সুদৃশ্য পর্দ্দার বক্ষ ভেদ করিয়া অপ্সরাকান্তি নানাবয়সী রূপসী-কুলের সৌন্দর্য্যভরা মুখমণ্ডলের অমীয় কান্তি চকিতে ফুটিয়া চকিতে মিলিয়া দর্শকের প্রাণে কামনার তীব্র শিখা জ্বালাইয়া দিত;—যখন বিদ্যুল্লতার ন্যায় তাঁহাদের স্বর্ণমৃণাল-লাঞ্ছিত বাহুলতা ও কনকপুষ্পনিন্দিত কোমল করপদ্ম জানালার থাকে থাকে—পর্দ্দার ফাঁকে ফাঁকে বিকশিত হইয়া নয়নে ধাঁধা লাগাইয়া দিত, তখন আবদুল হক ভাবিতেন—এহেন উন্নত-সুন্দর পরম ভাগ্যবান্ গৌরবোন্নত জাতি-সকলের সুখ-বিলাস সাধনের জন্য বিলাসবতী বসুমতী দাসীর ন্যায় ইহাদের গরবমাখা চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িবে না কেন? আবার যখন বুঁচী পাঁচী হইতেও অধমাধম রূপহীনা কুৎসিতা ও বুড়ী ধাড়ী নারীর দল দূরদৃষ্ট মরু-মরীচিকার ন্যায় শুধু অঙ্গাভরণের উজ্জ্বল প্রভায় কলিকাতার পথ আলো করিয়া নানাকার্য্যে এদিক্ ওদিক্ ধাবিত হইত;—যখন লজ্জা-সরম-সঙ্কোচহীনা, হৃতচরিত্রা, কুলটা নারীর অশ্লীল সঙ্গীত-ধ্বনি নিশার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কলিকাতার বাতাসে অপবিত্রতা মিশাইয়া দিত, তখনও উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত আবদুল হক ভাবিতেন, দুনিয়ার সুখ সৌভাগ্য খোদা বুঝি কেবল ইহাদের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন; আর আমরা অধমাধম—কেবল কুসংস্কার ও গোঁড়ামী লইয়াই মরিতেছি!

এই সমস্ত ভাবের তরঙ্গ হৃদয়ে উঠিতে না উঠিতে দুর্ভাগ্যবশতঃ আবদুল হক তদ্রূপ সংসর্গও লাভ করিলেন। কলিকাতায় তখন দুই চারিজন নেচারী মৌলবীর তত্ত্বাবধানে কতকগুলি ধর্ম্মদ্রোহী নাস্তিক ও

গজাইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা পরিবর্ত্তন করা, আধ্যাত্মিকতা ত্যাগ করা, মজহাব ধ্বংস করা, সুদ প্রচার করা, আবরণপ্রথা উঠাইয়া বিকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচার করা এবং রোজা, নামাজ ও ধর্ম্মতত্ত্বের কাল্পনিক ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করাই ইহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ইংরাজীশিক্ষিত যুবকগণের দ্বারাই উহাদের দল পুষ্ট হইতেছিল। আবদুল হক্ এলাহি বখ্‌শ ওরফে এম, ইলিয়াস নামক ঐ দলের জনৈক মেম্বরের সহিত মতের সামঞ্জস্য হেতু বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে লাগিলেন।

এলাহি বখ্‌শ নদীয়া জেলার অধিবাসী জনৈক অবস্থাপন্ন কৃষক-সন্তান। কৃষক পুত্রকে একচোটে দারোগা বা হাকিম বানাইবার উদ্দেশ্যে গ্রাম্য মকতব ডিঙ্গাইয়া একেবারে ইংরাজী স্কুলে পাঠাইল। উক্ত স্কুলটী উদীয়মান বিলাসপন্থিগণের দ্বারা পরিচালিত ছিল; সুতরাং উহাতে শিক্ষার সহিত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার তুমুল তুফান বহিত। এলাহি বখ্‌শ উক্ত ইংরাজী স্কুল হইতে প্রবেশিকার প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই এম্, ইলিয়াস নামে পরিবর্ত্তিত এবং স্বাধীন ভাবের ভাবুক হইয়া উঠিলেন। ইস্‌লামের পবিত্র রীতি-নীতি ও বিধি-নিষেধ তাঁহার নিকট স্বাধীনতার কঠোর অন্তরায় ও ঘোর কুসংস্কারস্বরূপ অনুমিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কেশব বাবুর 'নবসংহিতা', দেবী বাবুর 'বিবাহ-সংস্কার' এবং রবিবাবুর 'কড়ি ও কোমল' 'গোরা' 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি * পড়িয়া তাঁহার মাথা আরও বিগড়াইয়া গেল। অশিক্ষিতা, অপরিচিতা কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার সহিত বিবাহ তিনি বিধাতার

---

* এই সমস্ত পুস্তকে যৌবন-বিবাহের পক্ষপাতমূলক অদ্ভুত ব্যাখ্যা বিবৃত এবং বিকৃত স্ত্রী-স্বাধীনতার জ্বলন্ত আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে।

"ইঙ্গিত-বিরুদ্ধ †" বলিয়া ধারণা করিয়া লইলেন। ইহার ফলে তাঁহার পিতা অনেক টাকা খরচ করিয়া ভাল ভাল যায়গায় তাঁহার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইলেও তিনি উপযুক্ত না হইয়া বিবাহ করিবেন না, এই অজুহাতে বিবাহে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কন্যা দেখিয়া, আলাপাদি করিয়া, স্বভাবচরিত্র অবগত হইয়া যুবতী বিবাহ করা। কিন্তু ইস্‌লাম সমাজে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যৌবন-বিবাহ ইস্‌লামী শিক্ষার বিপরীত না হইলেও দেশে উহার চলন খুব কম! বিবাহার্থে সন্দর্শন ‡ শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও সমাজ উহার ঘোর বিরোধী। সুতরাং তিনি মোসলমান সমাজের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। কলিকাতার কলেজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রকাশ্য ভাবে বিলাসপন্থী সমাজে মিশিয়া তাঁহাদের সংস্থাপিত "সিভিল থিয়েটার" বা "সঙ্গীত-বক্তৃতালয়ে" গমনাগমন আরম্ভ করিলেন, এবং কিছুদিন পরেই তাঁহাদের সামাজিকতার মধুময় আদর্শে মুগ্ধ হইয়া "বিলাস-পন্থাই ইস্‌লামের উন্নত আদর্শ"—এই বাক্য সগর্ব্বে ঘোষণাপূর্ব্বক প্রকাশ্য ভাবে বিলাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। এই দীক্ষাগ্রহণ-প্রভাবে তিনি স্বাধীন প্রেমের ধ্বজাধারিণী, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রীতিদায়িনী পুণ্য-প্রতিমাপুঞ্জের সংসর্গে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন; এবং তাঁহাদের সংসর্গগুণে অল্পদিনের মধ্যেই আদর্শ স্বাধীন প্রেমের স্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিধাতার 'ইঙ্গিত-সিদ্ধ' মতে কমলিনী দেবী নাম্নী একটী ত্রিশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা কুমারীর পবিত্র পাণিগ্রহণ করিলেন! দুর্ভাগ্য কৃষক পুত্রের এই সমস্ত গুণের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াই মনে মনে অনুতপ্ত হইতেছিল, এবং

† প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় এইরূপ বিস্ময়কর মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

‡ ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিধান-অনুযায়ী বিবাহার্থে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সন্দর্শন সিদ্ধ। শরেহ বেকায়া।

আরবি না পড়াইয়া—ধর্ম্ম শিক্ষা না দিয়া পুত্রকে ইংরাজী স্কুলে দেওয়ার উপযুক্ত ফল হইল মনে ভাবিয়া সে নিশিদিন মনে মনে জ্বলিতে ছিল। ইহার পর হতভাগ্য কৃষক পুত্রের বিবাহের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং "কুলাঙ্গার কাফেরের মেয়ে বিয়া কইরাছে" এই বলিয়া সে ক্ষোভে, দুঃখে সেই দিনই এক দলিল রেজেষ্টরী করিয়া এলাহি বখ্‌শকে বঞ্চিত করত সমস্ত টাকা-পয়সা ও জমা-জমি অন্য পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিল। ইহার পরেই দুর্ভাগ্য কৃষক মনের দুঃখে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সমব্যবসায়ী পুত্রগণের কোলে মস্তক রাখিয়া তাহাদের শোকতপ্ত নয়নের অশ্রু-স্নাত হইয়া অনন্তধামে প্রয়াণ করিল।

ইলিয়াস এতদিন পিতার শোণিত জলকরা অর্থেই পড়িতেছিলেন; সহসা সেই অর্থ আসা বন্ধ এবং তৎপরে পিতার মৃত্যু ও তাহার অভিসম্পাতস্বরূপ দলিলের মর্ম্ম অবগত হইয়া তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কোথা হইতে নিজের খরচ চালাইবেন, তাহারই ঠিক নাই; তদুপরি তাঁহার ঘাড়ে একখানি দুর্ব্বিষহ বিলাস-প্রতিমা! তাহাতে বিদ্যা মাত্র সেকেণ্ড ইয়ার পর্য্যন্ত! উহাও কালমাহাত্ম্যে এমন কিছু নহে যে, ভাল চাকুরী পাওয়া যাইবে। ইলিয়াস চিন্তায় অস্থির হইয়া সমাজপতিগণের নিকট নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন; তাঁহারা সহানুভূতিপরবশ হইয়া তাঁহার জন্য চল্লিশ টাকা বেতনের একটী চাকুরী ঠিক করিয়া দিলেন। ইলিয়াস এই সামান্য চাকুরী পাইয়াও যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং মিসেস্ ইলিয়াস—ওরফে কমলিনী দেবীকে লইয়া স্বাধীন প্রেমের স্বাদমাখা সুখের সংসার পাতাইতে বসিলেন।

চাকুরী করিতে করিতে ইলিয়াসের আয় কিছু বর্দ্ধিত হইল, এবং কমলিনীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে শান্তি, সুধা ও সোফিয়া নাম্নী তিনটী কন্যা

জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু যৌবনের উপর বিগতযৌবন বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও জানি না, বিধাতার কোন্ অভিশাপে প্রথমা কন্যা শান্তি সূতিকাগৃহেই পিতা-মাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দুনিয়ার পরপারে গমন করিল। ইহার পরে ক্রমে সুধা ও সোফিয়ার জন্ম হয়; কিন্তু সোফিয়ার জন্মের এক বৎসর পরেই বিধাতার 'ডবল ইঙ্গিত-সিদ্ধ' বিবাহ হইলেও স্বামি-স্ত্রীর পবিত্র প্রণয় অপবিত্রতার মনান্তর-বাষ্পে দূষিত হইয়া গেল! সুতরাং দুইবৎসর পর্য্যন্ত উভয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইবার কমলিনীর স্বাধীনতা একটু অতি মাত্রায় বাড়িতে লাগিল। তিনি স্বাধীনভাবে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত, গল্প, উপবেশন, ভ্রমণ, এমন কি স্থানান্তরে গমন পর্য্যন্ত আরম্ভ করিলেন। স্বাধীন শিক্ষার অসম্পূর্ণতা বশতঃই হউক, কিংবা ইস্‌লামী শোণিতের দোষেই হউক, ইলিয়াসের এতটা তীব্র স্বাধীনতা সহ্য হইল না। তিনি ইহার জন্য কমলিনীকে রুচিবিরুদ্ধ অশ্লীল ও অসভ্য ভাষায় কঠোর তিরস্কার করিলেন; সেই অসভ্য ভাষার কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া সভ্যতাভিমানিনী কমলিনী আফিং খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; বিধাতার ইঙ্গিতের এক অসম্পূর্ণ নাটিকার যবনিকা পতিত হইল।

কমলিনীর অপমৃত্যুর পর ইলিয়াসের উপর আর কোন স্বাধীনার করুণ দৃষ্টি পতিত হইল না; সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া স্বীয় স্বাধীন প্রাণ ও কন্যা দুইটী লইয়াই ক্ষুণ্ণ মনে সংসারজীবন কাটাইতে লাগিলেন। অসবর্ণ বিবাহের অমৃতময় ফলস্বরূপ কন্যা দুইটীর প্রথমা সুধা পঞ্চবিংশতিবর্ষে বেথুন কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করিলেন; কিন্তু রূপের একটু অভাব বশতঃই হউক, কিংবা ইস্‌লামী শোণিতের সংস্পর্শদোষেই হউক, এ পর্য্যন্ত কোন স্বাধীন মন্ত্রদীক্ষিত উদারমতি যুবকের করুণ দৃষ্টি তৎপ্রতি পতিত হইল না! জানি না, কোন্ পাপে বিধাতার

ইঙ্গিতের অভাবে বহু কোর্টশিপ ও আশা-আয়োজন সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। ইলিয়াস তাঁহার জন্য অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত ও দরিদ্র অবস্থার দুই একটী যুবককে মনোনীত করিলেন; কিন্তু সুধা তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না; অধিকন্তু সুধা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শের মধ্যে এরূপ দরিদ্রদিগকে গ্রহণ করিয়া সমাজ ভারাক্রান্ত ও কলুষিত করা উচিত নহে, পিতার মুখের উপর সেকথা স্পষ্ট বলিয়া দিলেন। ফলে পিতা ও কন্যার মনান্তর হওয়ায় কন্যা চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক এক বালিকা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী পদ গ্রহণ করিয়া ঢাকা চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয়া কন্যা সোফিয়ার বয়স কিঞ্চিদূন অষ্টাদশ বৎসর; এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন। সোফিয়া পরমা সুন্দরী; কিন্তু তবুও উপযুক্ত বয়সে তাহার বিবাহ হইল না। কোন বিলাসপন্থী স্বাধীন যুবকই তাঁহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সম্মত হইতেছে না দেখিয়া ইলিয়াস সমাজের উপর আন্তরিক চটিয়া গেলেন। এই সময়ে সহসা চাকুরী যাওয়ায় তাঁহার আয়ও কমিয়া গেল; সুতরাং তিনি বাধ্য হইয়া নিজকে মোসলমান বলিয়া দরখাস্ত করত কন্যা সোফিয়ার জন্য একটী মোসলমান বৃত্তি দেওয়াইলেন এবং নিজে মোসলমান সমাজে মিশিয়া সোফিয়াকে কোন মোসলমান যুবকের নিকট বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মশীল মোসলমানগণ তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত না হওয়ায় তিনি অস্বাভাবিক উদারপন্থী নেচারী মোসলমান দলে মিশিতে বাধ্য হইলেন; এবং এই সূত্র হইতেই আবদুল হকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল।

এম, ইলিয়াস আবদুল হকের প্রকৃতি ও উচ্চ বংশমর্য্যাদা অবগত হইয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে স্বীয় বাসভবনে লইয়া গেলেন এবং কন্যা সোফিয়ার সহিত বিশেষরূপে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

আবদুল হক ও সোফিয়া প্রথম দিনের সলাজ শিষ্টতাপূর্ণ আলাপনেই উভয় উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর প্রায় প্রত্যহই উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপন হইতে লাগিল। একে সোফিয়ার সৌন্দর্য্যোদ্ভাসিত প্রস্ফুট যৌবন;—তদুপরি মনোহরকান্তি যুবকের উন্মাদনা-পূর্ণ সংসর্গ!—বিশেষতঃ তাঁহাকে মজাইবার জন্য পিতার অব্যক্ত নির্দ্দেশ; সোফিয়া যতদূর সম্ভব প্রাণ খুলিয়া ঘনিষ্ঠ ভাবে আবদুল হকের সহিত মিশিতে লাগিলেন। সুমধুর সংযত উচ্চ ভাবপূর্ণ বাক্যালাপ, সভ্যতা-সুলভ চিত্তহারী হাব-ভাব ও স্বাধীন প্রেম-অভিব্যক্তির উন্মত্ত মদিরা পান করাইয়া সোফিয়া আবদুল হককে প্রমত্ত করিয়া তুলিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে নিজেও মজিলেন। আবদুল হক সোফিয়ার চিত্ত-উন্মাদকারী বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও আন্তরিকতাশূন্য উচ্চভাবের বাক্যালাপে আসক্তির পঙ্কিল কূপে একেবারে ডুবিয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন, কি ছার ইহার কাছে আজিজা! স্বর্গের দেবচিত্তমোহিনী দেবীই বা কোথায় লাগে? আবদুল হক ইস্‌লামের আবরণ-প্রথার মর্য্যাদা ও বিধানশাস্ত্রের মুণ্ডপাত করিয়া এইরূপে কিছুদিন যাবৎ স্বাধীন প্রেমের পঙ্কিল কূপে ডুবিয়া রহিলেন। স্বাধীন চরিত্রবাদী স্ত্রীজাতির মর্য্যাদাপ্রচারক বিলাসপন্থিগণের বিস্ময়কর মতানুসারে পবিত্রতা ও রমণীসম্ভ্রম এই সমস্ত ব্যাপারে কতদূর রক্ষিত হইতে পারে, তাহা একমাত্র ভগবান্ ও তাঁহার অদ্ভুত বিলাসী ভক্ত সম্প্রদায়ই বলিতে পারেন।

অনন্তর আবদুল হক সোফিয়ার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইলে ইলিয়াস সানন্দে সম্মতি প্রদান করিলেন। সম্বন্ধ বিষয়ে আবদুল হকের পিতার নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি বড়মিঞা গিয়াসুদ্দিনের উপর যদিও বিরক্ত ছিলেন, তথাপি আজিজার প্রতি সহানুভূতিমূলে প্রথমে পুনর্ব্বার পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু আবদুল হকের মাতার

উত্তেজনায় শেষে মত দিতে বাধ্য হইলেন। বিবাহ কলিকাতাতেই সম্পন্ন হইল। বিবাহ অন্তে বধূ যথাবিধানে শ্বশুরালয়ে প্রেরিত হইলেন।

আবদুল হক এই সময়ে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন। আবুল ফজল আবদুল হকের অধঃপতনের বিষয় অবগত হইয়া আজিজার পরিণাম চিন্তা করত মর্ম্মাহত হইলেন। বড় মিঞা যথাসময়ে এ সংবাদ অবগত হইয়া ক্রোধবশে আবদুল হককে টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন। সর্ব্বোপরি এ সংবাদে আজিজার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার হৃদয়ের আশা-ভরসা নিরাশা ও বিষাদে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি স্বীয় বুদ্ধির দোষ ভাবিয়া অনুদিন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

সোফিয়া কমলাবতী গ্রামে আনীত হইলেন। প্রথমতঃ নব বধূর বয়সাধিক্য দর্শনেই সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তৎপরে তাঁহার ইস্‌লাম-বিরুদ্ধ হাব-ভাব, বিলাসিতা, লজ্জা ও সঙ্কোচহীনতা এবং সর্ব্বোপরি পেথমধরা বাবুআনায় অল্প দিনের মধ্যে সকলেই বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সোফিয়ার প্রখরতায় জোবেদার বাহাদুরী দুই দিনেই বিচূর্ণহইয়া গেল। শ্বশুর শাশুড়ীর আদেশ-উপদেশও তাঁহার নিকট হেলায় উপেক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ কেহই তাঁহাকে কোনরূপে বশে আনিতে পারিলেন না। সকলেই বুঝিলেন, হুরসম আজিজার পুণ্যাসনে এ এক প্রেতিনীর আবির্ভাব হইয়াছে। সোফিয়াও ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া মহা অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুক্ত সমীরণ-সেবিত ফুল্ল প্রাণ প্রাচীরাবদ্ধ বাড়ীর বদ্ধ বায়ুতে অনুদিন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার খোস গল্পাভ্যস্ত আমোদপ্রিয় চিত্ত বদ্ধগৃহের নীরবতা ও সকলের বিদ্বেষ কটাক্ষে অনুদিন পরিম্লান ও বিষণ্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি স্বামীর পরিজনদিগকে সংকীর্ণহৃদয়, হিংসুক, অনুদার ও কুসংস্কারাবদ্ধ জীববিশেষ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিবসান্তে আবদুল হক বাড়ী আসিলেন। উভয় পক্ষ হইতেই তাঁহার নিকট অভিযোগ বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি অন্যান্য সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া সজলচক্ষু সোফিয়ার কথাই অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তস্বরূপ জ্ঞান করিলেন এবং তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া পিতা মাতা ও পরিজনগণের চক্ষুঃশূল হইলেন। সুতরাং তিনি ক্রোধে ক্ষোভে পিতা মাতার উপর রাগ করিয়া সোফিয়ার সহিত কলিকাতা চলিয়া গেলেন এবং তথা হইতে যোগাড় যন্ত্র করিয়া পুলিশ সবইন্‌স্পেক্টরী গ্রহণপূর্ব্বক পত্নীসহ রংপুর জিলায় গমন করিলেন। মোটের উপর আপাততঃ তাঁহার দিন একরূপ সুখে আমোদেই কাটিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

—:)*(:—

রায় মহাশয়ের অন্তিম কীর্ত্তি।

প্রভাত-নলিনী আরও দুই একবার আলিনগরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বেশী দিন অবস্থান করেন নাই। তাঁহার অলঙ্কারগুলির কথা পিত্রালয়ে একমাত্র মায়া ভিন্ন আর কেহই জানিতেন না। নলিনীর অনুরোধে মায়া সে কথা আর কাহাকেও জানান নাই। শ্বশুরালয়েও স্বামী ভিন্ন অন্য কেহই তাহা জানিতেন না। যাহা হউক, নলিনী পূর্ব্বোক্ত ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে চতুর্থ বার আলিনগরে আসিলেন। তাঁহার আসার তিন চারিমাস পরেই বি, এ, পরীক্ষা দিয়া সতীশের বাড়ী আসার কথা থাকায় নলিনীর আর কলিকাতা যাওয়া হইল না। এবার দীর্ঘ দিনের জন্য তিনি আলিনগরেই রহিলেন।

নলিনী অতি যত্নের সহিত বিনয়-নম্র ব্যবহার দ্বারা হিংসাপরায়ণা কমলার সহিত কথঞ্চিৎ সদ্ভাব স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। সুতরাং এখন কমলা উঠিতে-বসিতে তাঁহাকে বিরক্ত ও জ্বালাতন করিতে বিরত হওয়ায় নলিনী অনেকটা শান্তির সহিত কাল কাটাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পাড়ার রায় মহাশয়দিগের জনৈক জ্ঞাতির বাড়ীতে এক বিবাহ উপলক্ষে পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। রায় মহাশয়দিগের বাড়ী হইতে কমলা এবং প্রভাত নলিনীও সে নিমন্ত্রণ হইতে বাদ রহিল না।

কিন্তু এই নিমন্ত্রণের জন্য প্রভাত-নলিনী মহা বিপদে পড়িলেন। কারণ তাঁহার সাধারণ ব্যবহারের অলঙ্কার ভিন্ন গৃহজাত অলঙ্কার এক

খানিও ছিল না। সে সমস্তই তিনি আবুল ফজলকে সাহায্য করার জন্য সতীশকে প্রদান করিয়াছিলেন। নলিনী ধনিকন্যা বলিয়াই কেবল শ্বশুরালয়ে এতদিন তাঁহার অলঙ্কার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা উঠে নাই। মধ্যে কমলা দুই একবার অগ্রাহ্য ভাবে অলঙ্কারের কথা তুলিলেও নলিনী কোনরূপে তাহা চাপা দিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আজ ত আর চাপা দিয়া রাখিবার উপায় নাই। নলিনী ভাবিলেন, আজ হয় মিথ্যা কথা বলিয়া বিধাতার নিকট অপরাধী হইতে হইবে, নয় সত্য কথা বলিয়া ইঁহাদের কোপে পতিত হইতে হইবে। নচেৎ সামাজিকতার অনুরোধেও পাঁচজনের মধ্যে বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া যাইব না, গায়ে যা আছে তাহাতেই হইবে। তাঁহার একথা আজ খাটিতেই পারে না। সুতরাং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নলিনী স্থির করিলেন যে, সকল কথা কমলার নিকট খুলিয়া বলিতে হইবে এবং তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া কোনরূপে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে। কমলার সহায়তা ভিন্ন আর কোনই উপায় নাই। এইরূপ ভাবিয়া নলিনী নিমন্ত্রণদিবসের পূর্ব্বরাত্রে সমস্ত কথা যতদূর সম্ভব দীনতা ও হীনতা স্বীকারপূর্ব্বক কমলার নিকট খুলিয়া বলিলেন এবং যাহাতে সম্ভ্রম রক্ষা হয় ও কেহ প্রকৃত ঘটনা টের না পায়, তজ্জন্য কমলার সাহায্য ও করুণা ভিক্ষা করিলেন।

কমলা ইদানীং প্রভাত-নলিনীর অমায়িক ব্যবহারে চক্ষু-লজ্জা বশতঃ বাহ্যিক তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেও মনে মনে তাঁহাকে বিষবৎ নিরীক্ষণ করিতেন এবং কিরূপে তাঁহাকে জব্দ ও অপ্রস্তুত করিবেন, তজ্জন্য সর্ব্বদাই নানা ছুঁতা অনুসন্ধান করিতেন; কিন্তু নলিনীর সতর্কতা হেতু তদ্রূপ কিছুই খুঁজিয়া পাইতেন না। আজ সহসা অলঙ্কারের ব্যাপার অবগত হইয়া তিনি যেন উদ্দেশ্য সাধনের একটী সুদৃঢ় অবলম্বন হাত বাড়াইয়া প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু নলিনীর অনুরোধ ও

কাতরতায় মনের ভাব মনে চাপিয়া প্রকাশ্য ভাবে বলিলেন,—"আচ্ছা বৌদি! গুরুজন বিদ্যমান থাক্‌তে তোমরা এরূপ নবাবী কর্‌তে গেলে কেন?"

প্রভাত-নলিনী করুণ ভাবে বলিলেন,—"ঠাকুরঝি! যা হবার তা'ত হয়েই গেছে; এক কাজ করে ফেলেছি, তার আর প্রতিকার কি? এখন যা'তে কেহ না জানে, তুমি তারই পরামর্শ দাও।"

কমলা। যা হবার তা হয়ে ত গেছেই; কিন্তু তোমরা কি বুদ্ধিতে এরূপ কাজ কর্‌লে? বাবা শুন্‌লে কি মনে কর্‌বেন?

নলিনী। ঠাকুরঝি, তিনি শুন্‌লে ত সর্ব্বনাশ! তিনি যাতে না শুন্‌তে পান্ বা জান্‌তে না পারেন, তোমাকে তাই কোর্ত্তে হবে।

কমলা। আমি আর তার কি কর্‌বো; বাবা জিজ্ঞেস কল্লে আমি ত আর মিথ্যা বল্‌তে পার্‌ব না। দাদারই বা কি আক্কেল! পিতৃশত্রুর সাতে আবার বন্ধুতা! আর তোমারই বা কোন্ বড় কুটুম যে, নিজের গয়নাগুলি পর্য্যন্ত দিয়া দাতাগিরি দেখাতে গেলে?

নলিনী। আমার কেউ নয়; কিন্তু তোমার দাদার ত বন্ধু? বিশেষতঃ চক্ষের উপর একজনের সর্ব্বনাশ দেখ্‌লে তাঁ'কে সাধ্যপক্ষে সর্ব্বনাশের মুখ হইতে রক্ষা করা কি সকল মানুষেরই উচিত নয়?

কমলা। অত উচিত অনুচিত বুঝ্‌তে গেলে আর সংসার চলে না। আর উচিত কাজই যদি ক'রে থাক, তবে লোকে জান্‌লে আর লজ্জা কি? সকলে জানুক না?

নলিনী। লজ্জা কিছুই নয়। কেবল বাবা অসন্তুষ্ট হবেন বলেই তোমাকে তোষামোদ কর্‌ছি।

কমলা। আমাকে তোষামোদ ক'রে আর ফল কি? আমি ত আর তোমাকে এখনি এক সেট গয়না গ'ড়ে দিতে পারব না।

নলিনী। কেন ঠাকুরঝি! তোমার গয়নাগুলি একদিনের জন্য আমাকে দিলেই ত চল্‌তে পারে। তবে এটুকু অনুগ্রহ করা না করা একমাত্র তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর।

কমলা। সে গয়না আমার কাছে নাই। সবই বাবার কাছে দিয়েছি। আমিত আর পরি না যে, নিজের কাছে রাখ্‌ব।

প্রভাত-নলিনী একটু রহস্য করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা ঠাকুরঝি! গয়নাগুলি একবার চেয়েই লও না কেন? বিদ্যাসাগর কিংবা ব্রাহ্ম-সমাজের বিধান ল'য়ে না হয় তোমাকে আবার সেগুলি পরা'ব!" বলা বাহুল্য, গহনা যে কমলার নিকটেই ছিল, নলিনী তাহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন; তাই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কথাগুলি বলিলেন।

কমলা এতক্ষণ বিবাদের একটা উপলক্ষ খুঁজিতেছিলেন। সুতরাং নলিনীর কথায় কমলা জ্বলিয়া উঠিলেন এবং "মুচী, মোছলমান ম্লেচ্ছাচারী"—বলিয়া কলিকাতার হিন্দু-সমাজকে অজস্র গালাগালি দিয়া ক্রোধের সহিত গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। নলিনী মনের দুঃখে আকাশ-পাতাল ভাবিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রভাত-নলিনী বিবাহ-বাড়ী যাইতে অস্বীকৃতা হওয়ায় রায়-মহাশয় কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন এবং নলিনীর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কমলা উচ্চকণ্ঠে সব কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন।

রায় মহাশয়ের মনে শত বৃশ্চিকদংশনের তীব্র যাতনা আরম্ভ হইল! এত দিন পরে তিনি আফতাব-উদ্দিন মিঞার টাকা দেওয়ার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিয়া নিদারুণ ক্রোধবশে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। পুত্র-বধূর অঙ্গস্পর্শ করার যদি গুরুতর সামাজিক বাধা না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, রায় মহাশয় প্রভাত-নলিনীকে দুখণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিতেন! আর সতীশ সম্মুখে থাকিলে তাঁহার ত কিছুতেই রক্ষা ছিল না!

ক্রোধ কিছু উপশম হইলে রায় মহাশয় বিদ্রোহী পুত্রকে উপযুক্ত দণ্ড দিবার জন্য সতীশকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত ভূ-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা ও বাড়ী-ঘর কমলাকে উইল করিয়া দিলেন এবং মনের দুঃখে অল্প-দিনের মধ্যেই সাংঘাতিক রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সতীশ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিলেন এবং প্রভাত-নলিনীর কাছে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। তিনি রোগাক্রান্ত পিতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া কাতর ভাবে ক্রটী স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ সে দিন কিছুতেই সতীশের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। কয়েকদিন পরে রায় মহাশয় সতীশকে বলিলেন,—"যদি তুমি চির জীবনের মত আবুল ফজলদের সহিত সদ্ভাব ছিন্ন করিয়া শত্রুতা করিবার ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতে পার, আমি তোমাকে সম্পত্তির মালিক করিতে পারি।" সতীশ "ভাবিয়া বলিব" বলিয়া ইহার আর কোন উত্তর দিলেন না এবং রায় মহাশয়ও তাঁহাকে সম্পত্তি প্রদান করিলেন না। ক্রমে তিনি মরণের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে "সতীশ সস্ত্রীক বাড়ীতে বসবাস করিতে পারিবে এবং তাঁহার সন্তানাদি হইলে তাহারা সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইবে"—উইলের সর্ত্তসমূহের মধ্যে এইটুকু সংযোগ করিয়া প্রবীণ রায় মহাশয় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মোহাচ্ছন্ন দেহ মুহূর্ত্তমধ্যে চিতার আগুনে ভস্মীভূত হইল; তাঁহার সুকীর্ত্তি ও কুকীর্ত্তির সহিত অনিত্য ধন-সম্পদ্ সমস্তই এই মায়াময় সংসারে পড়িয়া রহিল।

রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর প্রভাত-নলিনীর পিতা-মাতা সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া দুঃখিত হইলেন; কিন্তু তাঁহারা সতীশ বা নলিনীকে কোনরূপ মন্দ বলিলেন না। বরং তাঁহারা সতীশকে উৎসাহ দিয়া

বলিলেন,—"যখন কোন মন্দ কাজ কর নাই ; তখন এজন্য দুঃখ কি ? ভগবান্ সন্তুষ্ট থাকিলে জীবনে উহা অপেক্ষা শতগুণ ধন-সম্পত্তি কটাক্ষে লাভ হ'তে পারে। বিশেষতঃ রায় মহাশয় যখন সম্পত্তি কন্যাকে দিয়া গিয়েছেন, তখন উহা ত প্রকারান্তরে তোমাদেরই রয়েছে। তোমরা ভিন্ন সংসারে কমলার আর কে আছে ?" অবশ্য তাঁহারা সতীশকে কলিকাতা গিয়া এম্-এ, পড়িবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন। সতীশ নলিনীকে সে কথা বলিলে নলিনী বলিলেন,—"ইহাতে কতকগুলি বাধা আছে ; প্রথমতঃ তুমি কল্‌কাতা গেলে আমরা বাড়ী থাক্‌ব কিরূপে ? আর তুমি বাড়ী না থাক্‌লে তাঁ'রা আমাকে এখানে রাখ্‌তে সম্মত হ'বেন না।"

সতীশ হাসিয়া বলিলেন,—"কেন ? কেহ লুটিয়া লইবে নাকি ?"

নলিনীও সহাস্যে বলিলেন,—"লুটিয়া লইলে ত তোমারই সর্ব্বনাশ !"

সতীশ। কেবল আমার ? তোমার বোধ হয় তা হ'লে কিছু নয় ; বরং—"

নলিনী পদ্মহস্তে স্বামীর মুখ চাপিয়া বলিলেন,—"আগে তোমার দিকের জমা-খরচ ক'রে লই।"

সতীশ। আচ্ছা তার পর ?

নলিনী। তার পর তুমি ও আমি দু'জনেই যদি কল্‌কাতা গিয়ে থাকি, লোকে ত পাঁচ কথা বল্‌বেই ; বিশেষতঃ ঠাকুরঝি একা বাড়ীতে থাক্‌বে কিরূপে ? একা পেয়ে সাধের বোন কমলা দেবীকে যদি কেহ লুটিয়া লয় ? তবেত ভ্রাতার—

সতীশ সবেগে নলিনীর মুখ স্বীয় বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন এবং আদরে তাঁহার পূর্ণিমানিভ ললাটে প্রেমচিহ্ন আঁকিয়া দিয়া বলিলেন,—"সকলের বোন ত আর শহরের সরকারী সরোবরের প্রস্ফুটিত নলিনী নয় যে, স্বদেশ-বিদেশ যেখান হ'তে যে আসবে, সেই নিরাপত্তে লুটে নিয়ে যাবে।"

নলিনী। তা কেন, এ যে ভ্রাতার হৃদয়-কুঞ্জে প্রস্ফুটিত প্রেমাবৃত গোলাপ! কারও কি ছুঁইবার সাধ্য আছে? ভ্রাতারই যে সর্ব্বস্ব!

সতীশ। তা হ'লে তোমার স্থান কোথায়?

নলিনী। আমি ত অপহৃত—লুণ্ঠিত! একস্থানে ফেলে রাখ্‌লেই হ'ল।

সতীশ। তাতে আপত্তি নাই?

নলিনী। আমার আবার আপত্তি কিসের? তোমার না হ'লেই হল।

সতীশ। তুমি ভয়ানক মুখরা হয়েছ?

নলিনী। সে কেবল তোমার গুণে—তোমার বিদ্রূপ কটাক্ষের জ্বালাতনে—তোমার অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়ার দোষে!

সতীশ। আচ্ছা আমিই হার মান্‌লেম। এইবার তোমার শ্লেষবাণগুলি সম্বরণ কর। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কমলাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে কল্‌কাতায় গিয়ে সেখানে দুই বৎসর থেকে এম্‌-এ, পরীক্ষাটা দিয়ে আস্‌লে ভাল হয় না?

নলিনী। সাধে কি আর বলি যে, ভগ্নীপ্রেমে একেবারে আত্মহারা! সে সেরূপ পাত্রই নয়! আমরা যেদিকে যাইতে চাইব, সে নিশ্চয়ই তার বিপরীত দিকে গতি ফিরাইবে।

সতীশ। তুমি বল্‌লেই বোধ হয়, তাই হ'বে। আচ্ছা আমি একবার ব'লে দেখি।

নলিনী। বেশ তাই হোক। বিশেষতঃ ভ্রাতৃত্বের গরিমাটা একবার ওজন ক'রে দেখাও দরকার!

এই সমস্ত ছাই ভস্ম কথা লইয়া স্বামি-স্ত্রী আরও কিছুক্ষণ রহস্যালাপ করিলেন। পরে সতীশ যথাসময়ে কমলার নিকট নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন

কমলা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমি পৈত্রিক ভিটা ত্যাগ ক'রে কোথাও যেতে পার্‌ব না। তোমাদের ইচ্ছা হয়, যাও।"

সতীশ। আমরা ত আর একেবারে ভিটা ছেড়ে যাচ্ছি না। কিছু দিন গিয়ে থাক্‌ব মাত্র। তত দিন বাড়ীতে অন্য লোক বন্দোবস্ত ক'রে যাব।

কমলা। লোক বন্দোবস্তের আর দরকার কি? আমিই ত বাড়ীতে থাক্‌ব। তোমাদের দরকার হইলে, স্বচ্ছন্দে যাইতে পার।

সতীশ কমলার মতলব বুঝিয়া আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই কমলা নলিনীকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—"বৌদি! দাদাকে ভিটা ছাড়া করার মৎলবটা বোধ হয়, তুমিই বার ক'রেছ?

নলিনী। তাতে আমার লাভ?

কমলা। তোমাদের কল্‌কাতার লাভ-লোকশান তোমরাই বুঝ!

নলিনী। তা না হয় বুঝি; কিন্তু এই মৎলবটা যদি আমার না হ'য়ে তোমার দাদার হয়, তবে—?

কমলা। অন্ততঃ তোমার পরামর্শে।

নলিনী। আচ্ছা এখন তা হ'লে যাতে ওরূপ কুমৎলব আর না হয়, তারই পরামর্শ দেওয়া যাবে।

কমলা। দেও বা না দেও—কিন্তু মনে রেখো, যে পাপ মাটিতে বিধবার বিয়ে হয়,—শত প্রকার অনাচার চলে, সেই কলিকাতার পাপ-মাটীতে কমলা জীবন গেলেও যাইবে না; একথা তুমি দাদাকে বেশ করে বলে দিও।

রহস্যপরায়ণা নলিনী সহাস্যে উত্তর করিলেন,—"ঠাকুর ঝি! প্রথম অনাচারটাই বোধ হয় তোমরা আশঙ্কার কারণ; তবে আমরা কাছে থাক্‌তে ভয় কি?" কমলা নলিনীর উপর রোষদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য, প্রভাত-নলিনী সতীশের সঙ্কল্প ত্যাগ করাইলেন। তিনি বাড়ী হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী শ্যামপুরের নবপ্রতিষ্ঠিত হাই স্কুলের হেড্-

মাষ্টারি গ্রহণ করিয়া আইন পড়িতে লাগিলেন। সতীশ পড়ার সুবিধার জন্য সেই স্থানেই থাকিতেন; কিন্তু প্রত্যেক শনিবারে আসিয়া সমস্ত রবিরার সংসারের তত্ত্বাবধান করিতেন।

আবুল ফজল "উপস্থিতি-ন্যূনতার" জন্য সতীশের সহিত বি-এ, দিতে পারেন নাই। পড়া ছাড়িয়া কয়েক মাস বাড়ী থাকাই তাঁহার উপস্থিতি কম হওয়ার কারণ। তিনি রায় মহাশয়ের মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া সতীশের সহিত প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্বদাই পত্র লিখিয়া তাঁহার সংবাদ গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আবুল ফজল সতীশের এক বৎসর পরে ইংলিশ অনারে বি-এ, পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। তাঁহার অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব্ব সাফল্যে দেশ ও সমাজে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। প্রতিভাশালী হিন্দু-সমাজ এক অজ্ঞাতনামা মোসলমান বালকের প্রতিভার অপূর্ব্ব বিকাশ দর্শনে বিস্ময় অনুভব করিলেন।

শিক্ষা-সাফল্যের উজ্জ্বল গৌরব-বিমণ্ডিত আবুল ফজল বাড়ী আসিয়া পিতা-মাতার পদচুম্বন করিলেন। খ্যাতিমান্ পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শনে সাংসারিক দুঃখঝঞ্ঝাট-প্রপীড়িত পিতা-মাতার প্রাণে অনাবিল স্বর্গীয় শান্তি এবং আননে হাস্যমাখা আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

প্রথমাংশ সমাপ্ত।

পল্লী-সংসার।

দ্বিতীয়াংশ।

পল্লী-সংসার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুসুমপুরের জমিদার।

কুসুমপুর পুটিখোলার বাজার হইতে অন্যূন দশ মাইল পূর্ব্বোত্তর কোণে অবস্থিত একখানি গণ্ডগ্রাম। গ্রামের চৌধুরী সাহেবগণ বহু-কালের বনিয়াদী জমিদার। জমিদারীর আয় পূর্ব্বে প্রায় দুই লক্ষ টাকার উপরে ছিল। কিন্তু বঙ্গীয় মোসলমান জমিদারদিগের চিরাচরিত নিয়মানু-যায়ী অদূরদর্শিতা, অনভিজ্ঞতা ও বিলাসিতা-প্রভাবে অনেক সম্পত্তিই হস্তান্তরিত হইয়া যায় এবং মোট জমিদারীর আয় কিঞ্চিদূন লক্ষ টাকায় পরিণত হয়; এতদ্ভিন্ন বহু সহস্র টাকার ঋণও সম্পত্তির উপর চাপিয়া পড়ে। এই সময়ে চৌধুরী নূরল আলম সাহেব জমিদারীর মূল অংশের মালিক ছিলেন এবং তাঁহারই অংশে প্রায় আশি হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি ছিল। তিনি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন; সুতরাং জমিদারী ঋণ-মুক্ত করিতে না পারিলে যে উহা দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইবে না, একথা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াই তিনি দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত দশ হাজার টাকা আয়ের একখণ্ড জমিদারী বিক্রয় করিয়া ফেলেন। উহাতে সম্পত্তিধ্বংসকারী দুর্ব্বহ ঋণগুলি প্রায় সমস্তই পরিশোধ্য হইয়া যায়। অন্যান্য যে ঋণগুলি ছিল, তাহা তত মারাত্মক বা আশঙ্কাজনক ছিল না। অবশ্য দশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ায় জমিদার-পরিবারে যে একটা আন্দোলন না উঠিয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু কে বলিতে পারে যে, ঐ সময়ে দশহাজার টাকা আয়ের মমতা করিয়া ঋণ

পরিশোধ না করিলে কতিপয় বৎসর পরে উক্ত ঋণ বিরাট্ বদন ব্যাদান-পূর্ব্বক আলোচ্য দশ হাজারের সহিত আর বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি গ্রাস করিয়া ফেলিত না।

চৌধুরী নূরল আলম সাহেবের দুইটী পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম চৌধুরী আতাহার আলি এবং কনিষ্ঠের নাম চৌধুরী আনোয়ার আলি। চৌধুরী নূরল আলম সাহেব উভয় পুত্রকেই একজন বিচক্ষণ ও বহুদর্শী মওলানার তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। বিজ্ঞবর মওলানা সাহেবের সুশিক্ষাগুণে উভয় পুত্রই চরিত্রবান্ ও বিচক্ষণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পুত্র-দ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে চৌধুরী নূরল আলম সাহেব সৈয়দগঞ্জের ওয়াকৃফ * ষ্টেটের মতওল্লি † খান বাহাদুর সৈয়দ সামসুজ্জোহার কন্যাদ্বয়ের সহিত উভয় পুত্রের বিবাহ সম্পাদন করেন। যাহাতে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সহসা মনান্তর না ঘটে, তদুদ্দেশ্যেই চৌধুরী সাহেব এইরূপ করিয়াছিলেন। পুত্রদ্বয়ের বিবাহ সম্পাদনের কতিপয় বৎসর পরেই চৌধুরী সাহেব হজ্জ ‡ করিবার জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন এবং যথাবিধি হজ্জ সম্পাদন করিয়া শেষে প্রেরিত মহাপুরুষের পুণ্যোজ্জ্বল সমাধি দর্শন করিবার জন্য পুণ্যভূমি মদীনায় যান। মদীনা যাইবার কয়েকদিন পরেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই দেববাঞ্ছিত পুণ্য ভূমিতেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর উভয় ভ্রাতাই জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইলেন। ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল বলিয়া একযোগে ও বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত জমিদারী পরিচালিত হইতে লাগিল। শুধু যে জমিদারী একত্রে পরিচালিত হইত, তাহা নহে; তাঁহাদের আহার বিহার, শয়ন উপবেশন, এমন কি ভ্রমণ পর্য্যন্তও অনেক সময়ে একত্রে সম্পাদিত

---

* ওয়াকৃফ—ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত। † মতওল্লি—তত্ত্বাবধায়ক।

‡ হজ্জ—মক্কা শরীফে গমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করা।

হইত। ফলতঃ জমিদার-পরিবারের এই অশ্রুতপূর্ব্ব সৌভ্রাত্রের আদর্শ দেখিয়া হিন্দু-মোসলমান সকলেই বিস্মিত হইতেন।

ক্রমে জ্যেষ্ঠ চৌধুরী আতাহার আলি সাহেবের দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র আশরাফ আলি ভিন্ন আর একটী সন্তানও শৈশবের সীমা অতিক্রম করিতে পারিল না। পক্ষান্তরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনোয়ার আলি সাহেবের স্ত্রীর সন্তানাদি হইবার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। কয়েক বৎসর পরে সকলেই বুঝিলেন, তাঁহার সন্তানাদি হইবার আশা নাই। এইরূপে আরও দুই চারি বৎসর অতীত হইল; সকলে চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেবকে পুনঃ বিবাহ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নব্য জগতের সংস্কারবশে বহু-বিবাহের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন বলিয়া এই অত্যাবশ্যক * স্থলেও সহসা বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই।

ইতিমধ্যে চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব একদা কোন আবশ্যক কার্য্য উপলক্ষে মাঁদারিপুর মহকুমায় গমন করেন। তখন তথায় জনৈক প্রবীণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সবডিভিশনাল অফিসার রূপে অবস্থিত ছিলেন। তিনি জিলার প্রতিভাশালী যুবক জমিদার চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেবকে সম্মানপূর্ব্বক নিজ বাসায় নিমন্ত্রণ করিলেন। আনোয়ার আলি সাহেব নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া ডেপুটী সাহেবের অনুপম সৌন্দর্য্য-শালিনী যুবতী কন্যা নূর-মহলকে দেখিয়া একেবারে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধবাদ কোথায় উড়িয়া গেল! তিনি

---

* সন্তানাদি না হইলে স্ত্রী-বিদ্যমানেও অন্য বিবাহ করা আবশ্যক। কারণ নিঃসন্তান ব্যক্তিগণ কোরান-হাদিস তথা জগতের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই নিন্দিত হইয়াছে। তবে মোসলমানগণ কোন অবস্থায়ই চারিটী বিবাহের বেশী করিতে পারিবেন না। — শরেহ বেকায়া।

জনৈক প্রিয়পাত্র উকিলের দ্বারা পরদিনই বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ডেপুটী সাহেবও সৌভাগ্য ভাবিয়া সানন্দে সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। মাঁদারিপুরেই যথাবিধানে উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। চৌধুরী সাহেব নব-বিবাহিতা পত্নীসহ বাড়ী আগমন করিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার স্ত্রী ভিন্ন আর সকলেই আন্তরিক সুখী হইলেন। চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেবের এই স্ত্রীর গর্ভে প্রথমতঃ একটী কন্যা ও পরে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু পুত্র প্রসবের সময়ে ভয়ানক কষ্ট পাইয়া প্রসূতি অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন; পুত্রটীও কয়েক দিন পরে মাতার অনুগমন করিল। কন্যা সালেমা মাতা, ভ্রাতা ও সংসারের সমস্ত স্নেহ লইয়া পিতার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন।

যখন চৌধুরী আনোয়ার আলির কন্যা সালেমা জন্মগ্রহণ করেন, তখন চৌধুরী আতাহার আলির পুত্র আশরাফের বয়স দশ বৎসর। তিনি তখন জেলার এণ্ট্রান্স স্কুলে পড়িতেন। আশরাফ অষ্টাদশ বৎসরের সময়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়ে সালেমা আট বৎসরের বালিকা। সালেমার পিতা আর বিবাহ না করায় কন্যা সালেমা ভিন্ন তাঁহার বিশাল সম্পত্তির অন্য উত্তরাধিকারীর কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এইজন্য চৌধুরী আতাহার আলি সাহেব সম্পত্তি নিষ্কণ্টক করিবার জন্য ভ্রাতৃকন্যা সালেমার সহিত একমাত্র পুত্র আশরাফের বিবাহ দিতে একান্ত আগ্রহান্বিত হইলেন; এবং নানা সুযুক্তি দেখাইয়া চৌধুরী আনোয়ার আলিকে স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব সাধারণতঃ সগোত্র বিবাহের পক্ষপাতী না হইলেও ভ্রাতার সুযুক্তি এবং বংশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। কথা হইল, আশরাফ বি-এ, পাশ করিবার পর বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে বিলাত পাঠান হইবে।

বাইশ বৎসরের সময়ে আশরাফ বি-এ, পাস করিলেন ; সালেমার বয়স তখন বার বৎসর। বাড়ীর সহিত আশরফের সম্বন্ধ খুব কমই ছিল। পড়ার ক্ষতি হইবে মনে করিয়া চৌধুরী আতাহার আলি তাঁহাকে প্রায়ই বাড়ী আনিতেন না ; কচিৎ বাড়ী আনিলেও দুই একদিনের বেশী রাখিতেন না। ইহার ফল হাতে হাতে ফলিল ; দেশ, বাড়ী ও পরিজনের প্রতি তাঁহার মমতা কখনও পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিল না ; বরং স্বাভাবিক যেটুক ছিল, সংসর্গ ও সংস্পর্শের অভাবে তাহাও নষ্ট হইয়া গেল। অধিকন্তু আশরাফ উচ্চশ্রেণীর গুণধর জমিদারপুত্র ও সাহেবদিগের সহিত থাকিয়া তাঁহাদের সংসর্গগুণে অতি অল্প বয়সেই জীবনে অপরিমীত স্বাধীনতা লাভ করিলেন। সালেমার সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত আছে, আশরাফ তাহা জানিতেন। কিন্তু সালেমা কিংবা কোন পল্লী-বালিকার উপর তাঁহার একটুও অনুরাগ বা ভক্তি ছিল না। তিনি সালেমাকে কখনও দেখেন নাই—দেখিবার ইচ্ছাও করেন নাই। বিশেষতঃ সমাজবাদী-দিগের বিবিধ বক্তৃতা শুনিয়া তিনি সগোত্র-বিবাহের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং বিবাহের আশঙ্কায়ই তিনি বি-এ, পাস করার পর নানা ওজর করিয়া কলিকাতায় থাকিতে লাগিলেন। তখন চৌধুরী আতাহার আলি তাঁহাকে বিবাহের কথা স্পষ্ট বলিয়া পাঠাইলেন। আশরাফ পিতার প্রস্তাবের উত্তরে বিলাত হইতে পাস করিয়া না আসিয়া বিবাহ করিব না, লিখিয়া পাঠাইলেন। চৌধুরী আতাহার আলি পুত্রের এই হঠকারিতায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং এই বিবাহ না করিলে তাঁহাকে টাকা-পয়সা বা বিষয়-সম্পত্তি কিছুই দিবেন না বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিলেন। এইরূপ গোলযোগে এক বৎসর কাটিয়া গেল ; বিবাহ সম্পাদন কিংবা আশরাফ আলির বিলাতযাত্রা কিছুই হইয়া উঠিল না। চৌধুরী আনোয়ার আলি বিরক্ত হইয়া ভ্রাতাকে বলিলেন,—"আশরাফ যদি এ

বিবাহ কর্‌তে না চায়, এবং তার প্রকৃতই ইচ্ছা না থাকে, তবে জোর-জুলুম ক'রে ফল কি ? তক্‌দিরে যাহা থাকে, তাহা হইবেই। এখন বৃথা এই অনর্থক গোলযোগ বাধাইয়া তার ভবিষ্যৎ নষ্ট কর্‌লে কি ফল হ'বে ? আশরাফ বিলাত হইতে এসে বিবাহ কর্‌তে চায়, তাকে বিলাত পাঠাইয়া দিন। আগে পড়ে শুনুক, পরে যাহা হয় করা যাইবে।"

আতাহার আলি প্রথমে কিছুতেই এ কথায় সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"যে সামান্য দু'পাতা ইংরাজী প'ড়ে এই বয়সেই মুরুব্বির কথা মান্‌ল না, সে একবার ইংরাজদের দেশ ঘু'রে আস্‌লে কি আর রক্ষা আছে ? তুমি যাই বল ; যদি সে এ বিয়া না করে, তবে আমি যা ব'লেছি তাই ঠিক ; আমি উহাকে কিছুই দিব না।"

আনোয়ার। আমি এ জোর জবরদস্তি ভাল বুঝি না ; যদি সে এখন ভয়ে ভয়ে বাধ্য হয়ে বিয়ে ক'রে পরে ইহার প্রতিশোধ জন্য অসদ্ব্যবহার করে ?

আতাহার আলি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"বিয়ের পর আমি সমস্ত সম্পত্তি সালেমার নামে লিখে দিব। অসদ্ব্যবহার করে, তারই কপাল পুড়্‌বে।"

আনোয়ার আলি বিনয়ের সহিত বলিলেন,—"আচ্ছা আশরাফ একটা জেদ ধ'রেছে ; তার জেদ রেখে বিলাত পাঠায়ে দিন। তাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লই, যাতে পরে সে অবশ্যই এই বিবাহ করে। তারপর যদি না করে, তখন আপনি যা ইচ্ছা হয় কর্‌বেন।"

আতাহার আনোয়ারের অনেক অনুরোধে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আনোয়ার স্বয়ং কলিকাতা গিয়া আশরাফকে যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া বিলাত পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। আশরাফ বিলাত চলিয়া গেলেন।

আশরাফ বিলাত গিয়া এক বৎসর পরে স্পষ্টই লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমি কিছুতেই ও বিবাহ করিব না ; অন্যত্র সম্বন্ধ করা হউক।

আশরাফের এই অবাধ্যতায় বিষম বিভ্রাট ঘটিল। কারণ তাঁহার পিতা তখন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ভুগিতেছিলেন। সুতরাং এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিল। তিনি জীবনে নিরাশ হইয়া আনোয়ার আলির নিষেধ সত্ত্বেও এক দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি প্রদানপূর্ব্বক পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

অবশ্য তিনি আশরাফের সম্বন্ধে অবস্থানুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে ভ্রাতাকে যথেষ্ট উপদেশ প্রদান করিলেন। এই দলীল সম্পাদনের কয়েক দিন পরেই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী চৌধুরী আতাহার আলি সাহেব ভ্রাতার কোলে মস্তক রাখিয়া আত্মীয়-পরিজনদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সালেমা।

কুসুমপুরের জমিদারদিগের আবাসবাটী প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমির উপর সংস্থাপিত। সমস্ত বাড়ীখানি দুইটী দ্বিতল ও কতকগুলি একতল হর্ম্ম্য দ্বারা সুশোভিত; চারি দিকে সমুচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে অনতি গভীর গড়। গড়ের পার্শ্বে বহুদূরব্যাপী সুদৃশ্য ফলোদ্যান। অন্তঃপুরসংলগ্ন ভিতর বাটীর দক্ষিণ দিকের প্রাচীরসংবলিত সদর দরজা হইতে অল্প দূরেই বৃহৎ বৈঠকখানা, কাছারীবাড়ী ও জমিদারী সেরেস্তা। বৈঠকখানা সর্ব্বসাধারণের জন্য এবং কাছারীবাড়ী বিশেষ আগন্তুক অতিথি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। কাছারী সাধারণতঃ 'নূর-মঞ্জিল' নামেই অভিহিত হইত। নূর-মঞ্জিলের সম্মুখে সরোবর; সরোবরের পূর্ব্ব পার্শ্বে মস্‌জিদ ও মোসাফের খানা, পশ্চিমপার্শ্বে স্কুল এবং দক্ষিণ পার্শ্বে খেলিবার ও ভ্রমণ করিবার উপযোগী উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রান্তরের পার্শ্ব দিয়া নানা দিক্‌ যাতায়াতের সুপ্রশস্ত রাস্তাসমূহ। পূর্ব্ব দিকের রাস্তার পার্শ্বেই সাহেবগঞ্জ নামক বাজার। চৌধুরী সাহেবদিগের সৌভাগ্যের মধ্যাহ্নকালেই এই সমস্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল; তখন এই সমস্ত বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহে তাঁহাদিগকে কোনই বেগ পাইতে হইত না; কিন্তু পরে সম্পত্তির আয় কমিয়া যাওয়ায় ঐ সমস্ত নিয়মিত সংরক্ষণ ও সম্পাদন করা তদ্রূপ কষ্টকর না হইলেও, অন্যান্য অনেক অনাবশ্যক আড়ম্বর ও অপব্যয়-প্রভাবে একান্তই দুর্ব্বহ হইয়াছিল;

সুতরাং চৌধুরী সাহেবগণ ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৌধুরী নূরল হক সাহেব কিয়দংশ সম্পত্তির পরিবর্ত্তে যে উক্ত ঋণগুলির অধিকাংশই পরিশোধ করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাকী ঋণগুলি চৌধুরী আতাহার আলি ও চৌধুরী আনোয়ার আলির সময়ে পরিশোধ হয়। চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব অম্বিকাচরণ সেন নামক জনৈক সদ্বংশজাত উকিলকে সমস্ত সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব সম্পত্তি ঋণমুক্ত করিয়া উহার আয়-ব্যয়ের সমন্বয় সাধন করেন। এই সময় হইতে নূর-মঞ্জিলের আমূল সংস্কার এবং অন্যান্য কতিপয় সদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিয়াও চৌধুরী সাহেব স্বীয় জীবনে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিতে সক্ষম হন। জ্যেষ্ঠ আতাহার আলি সাহেব বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেন। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ! ক্ষমা করিবেন; এইবার আমাদিগকে একবার সসঙ্কোচে জমিদার-বাড়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইবে।

বহুসংখ্যক পরিবার পরিজন ও দাস-দাসী সমাচ্ছন্ন জমিদার-বাড়ীর মধ্যকেন্দ্রে অবস্থিত সমুন্নত হর্ম্ম্যের সুসজ্জিত দ্বিতল কক্ষে চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব সুদৃশ্য শয্যাবৃত বহুমূল্য খাটিয়ার উপর তাকিয়া ঠেশ দিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন। চৌধুরী সাহেবের প্রথমা পত্নী স্বামীর পার্শ্বে উপবিষ্ট অবস্থায় বিবিধ মসলাসংযোগে পানের খিলি তৈয়ার করিয়া রৌপ্যনির্ম্মিত পানদানে সাজাইয়া রাখিতেছেন। জনৈক দাসী রৌপ্যনির্ম্মিত হুঁকার উপর হইতে ঝালর-বিশোভিত রৌপ্যকলিকা লইয়া সুগন্ধী তামাক সাজিতেছে। উহার কিছু দূরে এক-খানি বৃহৎ মখমলের উপর বসিয়া চৌধুরী সাহেবের পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা সালেমা সৌন্দর্য্যে কক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া কতকগুলি বহুমূল্য খেলনা লইয়া

পরীকুমারীর মত আনন্দে খেলা করিতেছে। তাহার পুষ্প-পরাগ-রাগ-রঞ্জিত নবনী-তুল্য দেহকান্তি হইতে সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমের মাধুরী এবং কমনীয় মুখকান্তি হইতে স্বর্গীয় হাস্যের আনন্দময় স্নিগ্ধ দীপ্তি যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। সালেমার দুই পার্শ্বে দুইটী অল্পবয়স্কা সুন্দরী দাসী রক্ষণাবেক্ষণ ও আদেশ পালনের জন্য দণ্ডায়মানা।

সালেমা কিছুক্ষণ খেলা করিবার পর সহসা যেন কি মনে করিয়া অস্পষ্ট ভাষায় কি প্রার্থনা করিল; কিন্তু দাসী তাহা বুঝিতে না পারায় কি করিতে হইবে তজ্জন্য দ্বিতীয়ার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এদিকে প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে না দেখিয়া ক্রোধে অভিমানে সালেমার স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি রক্ত-রাগে রঞ্জিত হইয়া গেল। বালিকা দ্বিতীয় দাসীর দিকে ফিরিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও স্পষ্ট স্বরে ফুল আনিতে আদেশ করিল। ফুল আনিতে উভয় দাসী যাইতেছে দেখিয়া সালেমার অসহ্য হইয়া উঠিল; বালিকা ক্রোধবশে প্রথমার প্রতি খেলনা ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়া দাসী ফুলদানে যতগুলি ফুল ছিল, তাহা সমস্তই আনিয়া সালেমাকে প্রদান করিল। সালেমা ফুলগুলি পাইয়া আনন্দিত হইল এবং দাসীর নিকট আরও ফুল প্রার্থনা করিতে লাগিল; কিন্তু আর ফুল না থাকায় দাসী দিতে পারিল না; এদিকে সালেমার ক্রোধ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। বালিকা ফুলের জন্য বিষম আব্দার ধরিয়া দাসীদ্বয়কে অস্থির ও জ্বালাতন করিয়া তুলিল। ক্ষুদ্র বালিকার বিষম উপদ্রবে দাসীদ্বয় অস্থির হইয়া চারিদিকে বিপদ্‌জ্ঞাপক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন চৌধুরী সাহেবের আদেশে বিবি সাহেবা উঠিয়া আসিয়া সালেমাকে শান্ত করিতে যত্নবতী হইলেন; কিন্তু তিনিও তাহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তখন অগত্যা চৌধুরী সাহেব স্বয়ং আসিয়া বালিকাকে কোলে লইলেন এবং নানা দ্রব্য প্রদান-

পূর্ব্বক তাহাকে ভুলাইয়া প্রফুল্ল করিলেন। বালিকা তখন আবার খেলা করিতে লাগিল।

সালেমা পুনরায় আনন্দমনে খেলা আরম্ভ করিলে চৌধুরী সাহেব বিবি সাহেবাকে সহাস্যে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমার সালেমা ছেলে হ'লে কেমন প্রভাবের সাতে জমিদারী শাসন কর্‌তে পার্‌ত!"

বিবি সাহেবা কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—"মেয়েরা বুঝি আর জমিদারী শাসন কর্ত্তে জানে না?"

চৌধুরী সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"জানে এবং পারেও বটে! অভ্যাস কর্‌লে স্বভাবের বিরুদ্ধেও অনেক কাজ করা যায়। কিন্তু শাসন প্রভৃতি বাহ্যিক সামাজিক ব্যাপার কোমল নারী-প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সমস্ত ব্যাপারে রমণীর কোমল প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ও আত্মশাসনে শিথিলতা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সংসারে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়।"

বিবি সাহেবা। আর নারীজাতি সমাজ ও জমিদারী, এমন কি রাজ্য-শাসন করেও যে পারিবারিক জীবনের সামঞ্জস্য ও নারীপ্রকৃতির মাধুর্য্য রক্ষা ক'রেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বুঝি জগতে একটীও নাই?

চৌধুরী সাহেব। দুই একটী থাক্‌তে পারে; কিন্তু স্বাভাবিক অসংখ্য দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে দুই একটী বিপরীত দৃষ্টান্ত কখনও স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হ'তে পারে না। মনে কর কোন কোন দেশে যুগ-যুগান্তের মধ্যে দুই একটী রমণী যুদ্ধ ক'রেছে বা যুদ্ধে খ্যাতিলাভ ক'রেছে ব'লে সমস্ত নারীজাতিই যে যুদ্ধ করিতে সমর্থ বা যুদ্ধে খ্যাতিলাভে সক্ষম একথা যেমন বলা যেতে পারে না, সেইরূপ কোন কোন রমণী জমিদারী পরিচালন বা রাজ্যশাসন ক'রে যদিও স্বীয় প্রতিভাগুণে পারিবারিক জীবন ও নারীপ্রকৃতির উন্নত আদর্শের দৃষ্টান্ত রেখে যেতে সমর্থা হয়ে থাকেন, তাহা হইলেও যে সমস্ত নারীজাতির উহাই স্বাভাবিক আদর্শ কিংবা

তাঁহারা ঐ কার্য্য সম্পাদনের উপযুক্তা, একথা কখনও বলা যেতে পারে না। ফলতঃ আল্লাহ্‌তালা নারীজাতিকে এই সমস্ত সাংসারিক কঠোর ব্যাপারের উপযোগিনী করে সৃষ্টিই করেন নাই।

এমন সময়ে সালেমা খেলা পরিত্যাগপূর্ব্বক সুমধুর হাস্যে গৃহ আলোকিত করিয়া পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া উঠিল। চৌধুরী সাহেবও সকল ভাবনা ভুলিয়া বাৎসল্যের অনুপম সুখ-সলিলে অবগাহন করিতে লাগিলেন।

সালেমা পিতা, পিতৃব্য, বিমাতা ও পরিজনগণের আদর-যত্নে শুক্ল-পক্ষের চন্দ্রিকার ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পিতার অত্যধিক আদরবশতঃ সকলের অতিমাত্র প্রশ্রয়ে তাহার স্বভাবে গর্ব্ব ও অভিমান একটু অধিক মাত্রায় জড়িত হইয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু চৌধুরী সাহেব স্নেহাধিক্যে কন্যার ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হন নাই। তিনি ষষ্ঠ বৎসর বয়সেই সালেমাকে শিক্ষা প্রদানের জন্য একজন প্রবীণ কারী * নিযুক্ত করিলেন। প্রতিভাশালিনী বালিকা এক বৎসরের মধ্যে কোরান শরিফ পড়া শেষ করিয়া সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিল। চৌধুরী সাহেব পরম আনন্দিত হইয়া স্কুলের মৌলবী সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাহার বাঙ্গলা ও উর্দ্দু শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। দশ বৎসর বয়সেই সালেমা সাধারণ ভাবে বাঙ্গলা ও উর্দ্দু লিখিতে পড়িতে সমর্থা হইল।

এই বয়সেই সাধারণতঃ মোসলমান বালিকাগণ পর্দ্দানশীনা † হইবার উপযোগিনী বলিয়া গণ্য হয়। পর্দ্দানশীনা রমণীর পক্ষে পিতা, ভ্রাতা ও স্বামী প্রভৃতি 'মহর্‌রম' ‡—আত্মীয় পুরুষ ভিন্ন "গায়ের মহর্‌রম"—পরপুরুষকে দেখা দেওয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুযায়ী কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। সুতরাং সালেমার

---

* কারী—বিশুদ্ধ কোরান-পাঠক। † পর্দ্দানশীনা—আবরণ-বিশিষ্টা।

‡ মহর্‌রম—যাহাদের সহিত বিবাহ অসিদ্ধ—যেমন পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি। গায়ের-মহর্‌রম—যাহাদের সহিত বিবাহ সিদ্ধ।

বয়স দশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাহার শিক্ষা বিধানের জন্য শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা অনুভূত হইল। বিশেষতঃ এই সময়ে আশরাফের সহিত সালেমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। আশরাফকে 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' কিংবা ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাত পাঠান হইবে, ইহা পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত ছিল। সুতরাং সালেমাকে বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীর উপযুক্তা করিবার জন্য অভিনব প্রণালীর উচ্চ শিক্ষা প্রদানার্থে উচ্চ শিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ আবশ্যক হইল। কিন্তু দেশে এরূপ শিক্ষিতা রমণী পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় তজ্জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রদান করা হইল। বিজ্ঞাপন প্রদানের অল্প দিন পরেই কতিপয় উচ্চ শিক্ষিতা বিবাহিতা ও অবিবাহিতা ব্রাহ্ম-রমণী জমিদার-কন্যার শিক্ষয়িত্রী পদ লাভের জন্য আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু "অবরোধ-মুক্তা 'বেপর্দ্দা' * রমণী পরপুরুষ তুল্য, তাহারা মোসলমানের পবিত্র অন্তঃপুরে প্রবেশযোগ্যা নহে," † এই অজুহাতে জমিদার-পরিবার হইতে কঠোর আপত্তি উত্থিত হইল। কাজেই তাঁহাদিগকে নিয়োগ করা হইল না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর জনৈক প্রবীণা সন্তানবতী হিন্দু বিধবাকে পাওয়া গেল; সুতরাং তাঁহাকেই পৃথক্ আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত সহ একশত টাকা বেতনে নিয়োগ করা হইল। ইনি ম্যানেজার অম্বিকা বাবুর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া ছিলেন।

এই সুশিক্ষিতা মহিলার শিক্ষাগুণে সালেমা চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সেই বাঙ্গলাভাষায় বিশেষরূপে এবং ইংরাজী ভাষায় সাধারণ ভাবে ব্যুৎপন্না হইলেন। তাঁহার প্রতিভা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ভাবুকতা ও রচনাশক্তি দর্শনে শিক্ষয়িত্রীও অনেক সময়ে বিস্মিতা হইতেন। চৌধুরী সাহেব অতঃপর কন্যাকে ইংরাজি কথাবার্ত্তা ও চিঠি পত্র লেখা শিক্ষা দিতে

---

* বেপর্দ্দা—অনাবৃতা। † শরেহ্-বেকায়ার টীকা।

মনোযোগী হইলেন ; কিন্তু এই সময়ে সহসা বিবাহ সম্বন্ধে আশরাফের দৃঢ় প্রত্যাখ্যান পত্র পাইয়া সকলেই ক্ষুণ্ণ হইলেন ; চৌধুরী সাহেব আশরাফের ব্যবহারজনিত বিক্ষোভ, আশরাফের শাসনকল্পে তদীয় পিতার কঠোরতা এবং তাঁহার অকাল মৃত্যু প্রভৃতি নানা সাংসারিক ও মানসিক বিভ্রাটে জড়িত হওয়ায় কন্যার ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আর বিশেষ মনোযোগী হইতে পারিলেন না ; সুতরাং সালেমার ইংরাজি শিক্ষারও আর বিশেষ কোন উন্নতি হইল না।

সালেমার বয়স চতুর্দশ বর্ষ অতীত হইয়া পঞ্চদশে পড়িয়াছে ; যৌবনের স্বপ্নস্পর্শে তাঁহার মনোহর অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পূর্ণ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। পাঠক ! গোধূলির নয়নস্নিগ্ধকর লোহিতাভ সুবর্ণ-রঞ্জিত / স্বর্ণচাপার কনককান্তি দর্শন করিয়াছেন কি ? সালেমার দেহকান্তি তাহা হইতেও মনোহর ! সৌন্দর্য্য অঙ্গে যেন ধরে না ;—লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে ! তাঁহার মুখখানি উষার সদ্যঃপ্রস্ফুটিত শতদল কিংবা বসন্তের ফুল্ল জ্যোৎস্না হইতেও নির্ম্মল ও চিত্তস্নিগ্ধকর ! তাঁহার মধুর হাসি শরতের সুমধুর প্রভাত হইতেও মনোরম ! সালেমা যেখান দিয়া মধুর ভঙ্গিমায় চলিয়া যাইতেন, তথায় সৌন্দর্য্যের সুমধুর তরঙ্গের কোলাহল পড়িয়া যাইত ; সহসা কোন গৃহে প্রবেশ করিলে সে গৃহ যেন আনন্দে হাস্য করিয়া উঠিত ! তাঁহার পরিধেয় বসন-ভূষণ হইতেও যেন চিত্তোন্মাদক সৌন্দর্য্যের ছটা ঝরিয়া পড়িত ! সালেমা কাহারও দিকে মাধুরীভরা নয়নযুগল তুলিয়া নিরীক্ষণ করিলে, তাহার চিত্তে আনন্দের ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হইত ; তাঁহার কণ্ঠধ্বনি দূরাগত ভাসমান বীণাধ্বনির ন্যায় কর্ণে প্রবেশ করিয়া আবেশে চিত্ত উন্মাদিত ও বিহ্বল করিয়া তুলিত ! তাঁহার সুদীর্ঘ কুঞ্চনতরঙ্গায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশদামের শোভাই বা কি মনোহর ! বিধাতা বুঝি তাহার উপমাস্বরূপ কোন কাল জিনিসই

জগতে সৃষ্টি করেন নাই। নব-শিক্ষিতা পাঠিকা! ক্ষমা করিবেন; সুন্দরী-কুলশিরোভূষণ সালেমার সৌন্দর্য্যের স্বরূপ ও লাবণ্যের লালিত্য বর্ণনা করিতে আমরা একান্তই অক্ষম। ভাষারও বুঝি তেমন উপযুক্ত ভাব-প্রকাশের ক্ষমতার অভাব। বিশেষতঃ আধুনিক রুচির বিরুদ্ধে তাঁহার চিত্তহারী কমনীয় কণ্ঠ, মলয়ান্দোলিত বসনাবৃত কল্পনার অর্দ্ধস্ফুট পুষ্পভারাবনত ঈষদুন্নত বিনোদন বক্ষ, ক্ষীণতম কটি ও অনুপম নিতম্ব প্রভৃতি লঘু-গুরু ও স্থূল-সূক্ষ্ম অঙ্গসৌষ্ঠবের মধুর মাধুরী অঙ্কিত করিয়া আপনাদের রোষ-নয়নে পতিত হওয়ার সাহসও আমাদের নাই। ফলতঃ জ্যোৎস্নাময়ী শারদীয় পূর্ণিমা, পুষ্পাভরণা মলয়মুগ্ধা হাস্যাননা স্নিগ্ধ বাসন্তী প্রভাত, কিংবা অনুপম সৌন্দর্য্যময়ী স্বর্গীয় হুরীও বোধ হয় রূপসী সালেমার সহিত উপমিতা হইবার যোগ্যা নহে।

সালেমা একাধারে শোভা-সৌন্দর্য্য ও জ্ঞান-প্রতিভার অতুলনীয় আধার হইলেও তিনি অভিমানিনী ও গর্ব্বিতা। এই জন্য জমিদার-বাড়ীর প্রায় সকলেই তাঁহাকে আশঙ্কার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। তাঁহার বিরাগে দাসদাসীগণের অনেকেরই অদৃষ্টে দুঃখের মেঘ সঞ্চারিত এবং কোপদৃষ্টিতে অনেকেরই হৃদয়ে ভীতির বিরাট ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইত। পিতার আদরে সকলের অত্যধিক প্রশ্রয় বশতঃই তাঁহার স্বভাব এইরূপ হইয়াছিল।

সালেমা পঞ্চদশ বৎসরে পদার্পণ করিলেই চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব অবিলম্বে তাঁহার বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিলেন। আশরাফের সহিত সালেমার বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গ হওয়ার কথা রাষ্ট্র হওয়ায় কতিপয় জমিদার-পুত্র ও উদীয়মান ব্যারিষ্টার সালেমার পাণিপ্রার্থী হইয়া পয়গাম * প্রেরণ করিলেন। বিচক্ষণ চৌধুরী সাহেব সকলের সম্বন্ধেই বিশেষরূপে অনু-

* পয়গাম—বিবাহ-প্রস্তাব।

সন্ধান করিলেন। বিবাহপ্রার্থী ব্যারিষ্টারগণের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে তিনি তাঁহাদিগকে মোসলমান বলিয়াই গণ্য করিতে পারিলেন না! তাঁহাদিগের কাহারও করে কন্যা সম্প্রদান করাকে তিনি এক বিধর্ম্মী খৃষ্টানের কবলে কন্যা বিসর্জ্জন দেওয়ার তুল্যই মনে করিলেন। অনন্তর চৌধুরী সাহেব সালেমার পাণি-প্রার্থী জমিদারপুত্রদিগের সম্বন্ধে সন্ধান লইয়া অল্প আয়াসেই যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাতে তিনি একেবারেই মর্ম্মাহত হইলেন। বঙ্গীয় মোসলমান জমিদারদিগের গৃহে যে অকর্ম্মণ্য ও লম্পট ভিন্ন উপযুক্ত চরিত্রবান্ সন্তান জন্মগ্রহণ করে, এ ধারণা তিনি মন হইতে মুছিয়া ফেলিলেন। অতঃপর চৌধুরী সাহেব উচ্চবংশীয় মধ্যম শ্রেণীর ভদ্রলোক-দিগের মধ্য হইতে যোগ্যপাত্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু এ শ্রেণীর খ্যাতনামা, প্রতিভাশালী ও চরিত্রবান্ বালকদিগের অপরিমিত বিলাসিতা, অদম্য অহঙ্কার, অলস ও স্ফূর্ত্তিহীন জীবন, ভগ্ন স্বাস্থ্য, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি, রক্তহীন পাণ্ডুর ও কৃশ মুখচ্ছবি এবং পৌরুষ-বিহীন সূক্ষ্ম দেহভার দেখিয়া তিনি একেবারেই নিরাশ হইয়া পড়িলেন। হায়! এ সমাজের উন্নতি হইবে কিসে? সাধারণ-শ্রেণীর মধ্যে অবশ্য দুই চারিটী স্বাস্থ্যসম্পন্ন, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবক বিদ্যমান ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সামাজিকতার হিসাবে সম্ভ্রান্ত জমিদার-কন্যার পাণিগ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য!

এইরূপ পাত্র দেখিতে দেখিতেই প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল; সালেমার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল। যোগ্য পাত্রাভাবে চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব একটু চিন্তিত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কমলার কীর্ত্তি।

পাঠক! আমরা এই সুযোগে একবার আলিনগরের অবস্থাটা বিশ্লেষণ করিয়া লইতে চাই। কারণ তারিণীচরণ রায়ের মৃত্যুর পর আলিনগরের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তারিণী বাবু স্বার্থানুরোধে বড়মিঞা গিয়াসুদ্দিনের পক্ষাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র সতীশ আবুল ফজলের অকৃত্রিম বন্ধু এবং তৎপিতা আফতাব-উদ্দিন মিঞার পক্ষাবলম্বী। পক্ষান্তরে শচীন্দ্র দত্ত পূর্ব্বে রায় মহাশয়ের বিরুদ্ধাচরণ হেতু আফতাবউদ্দিন মিঞার পক্ষভুক্ত ছিল; কিন্তু সতীশ আফতাবউদ্দিন মিঞার পক্ষভুক্ত হওয়ায় শচীন্দ্র এখন বড় মিঞা গিয়া-সুদ্দিনের দলে যোগদান করিয়াছে। খোন্দকার পাড়ার খোন্দকার পীর মহম্মদ সাহেব কৌলিক গর্ব্বহেতু বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিনের দ্বারা নানারূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও আফতাবউদ্দিন মিঞার পক্ষভুক্ত ছিলেন; কিন্তু এখন তিনি পরলোকে। তাঁহার দুইটী পুত্রের একটী স্কুলে ও অপরটী মাদ্রাসায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা জানেন। বড় পুত্র এণ্ট্রান্স ফেইল করিয়া সবরেজিষ্ট্রী অফিসের কেরাণীগিরি গ্রহণপূর্ব্বক পুটীখোলা অফিসে শচীন্দ্রের সহযোগী রূপে অবস্থিত। শচীন্দ্রের সহিত তাঁহার খুব বন্ধুত্ব। সুতরাং শচীন্দ্রের সহিত তিনি বড় মিঞার পক্ষেই যোগদান করিলেন। খোন্দকার সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র কলিকাতার মাদ্রাসায় পাস করিয়া হাদিস-তফ্‌সীর ও ফেকা * পড়িবার জন্য হিন্দুস্থান

---

* হাদিস—হজরত মহম্মদের কথা ও কার্য্য; তফ্‌সীর—কোরানের ভাষ্য; ফেকা—বিধান শাস্ত্র।

গমন করিয়াছেন। গ্রাম্য দলাদলির সহিত তিনি সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য। আলিনগরের অন্যান্য লোকেরা কেহ এ পক্ষে কেহ ও পক্ষে; প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রত্যেকেই এই সর্ব্বনাশকর দলাদলি ও মামলা-মোকদ্দমায় জড়ীভূত। উভয় পক্ষ হইতেই অনেকগুলি মামলা চলিতেছে।

বড়মিঞা গিয়াসুদ্দিন ইতিপূর্ব্বে তারিণী বাবুর নিকট হইতে মর্টগেজ ক্রয়পূর্ব্বক উহা ডিক্রি করিয়া আফতাবউদ্দিন মিঞাকে খুব জব্দ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু সতীশের সাহায্যে আফতাবউদ্দিন মিঞা সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পান, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইজন্য সতীশের উপর বড়মিঞার ভয়ানক জাতক্রোধ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি জানিতেন, রায়মহাশয় সম্পত্তি যেরূপ ভাবে কমলাকে দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রকারে কমলাকে হাত করিতে পারিলেই সতীশকে উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া যাইবে। এজন্য তিনি সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

এদিকে পিতৃবিয়োগের পর অল্পদিন যাইতে না যাইতেই কমলা প্রভাত-নলিনীকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। সতীশের প্রতি নলিনীর প্রগাঢ় ভক্তি এবং নলিনীর উপর সতীশের অসীম অনুরাগ কমলার চক্ষে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। ফলতঃ স্বামী-স্ত্রীর অপরিসীম ভালবাসা দর্শন করা স্বামীকর্ত্তৃক চির অভিশপ্ত কমলার বৈধব্য-জীবনের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিল। ভ্রাতা-ভ্রাতৃবধূর হাস্য রহস্য ও আলাপ-ব্যবহারে পলে পলে কমলার মর্ম্ম দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু সতীশ ও নলিনী পূর্ব্বের ন্যায় এখনও কমলাকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করেন।

ইতিমধ্যে শচীন্দ্রের কুদৃষ্টি যুবতী বিধবা কমলার উপর পতিত হইল; সে একদিন সুযোগ মত পুকুরের ঘাটে কমলাকে একাকিনী পাইয়া স্বীয় পাপবাসনা জ্ঞাপন করিল; কমলা তাহার প্রস্তাব সঘৃণায় প্রত্যাখ্যান

করিয়া তাহাকে কঠোর ভাবে তিরস্কার করিলেন এবং পুনশ্চ এরূপ শুনিলে নিশ্চয় ভ্রাতার নিকট বলিবেন বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিলেন। কামোন্মত্ত ও তিরস্কৃত শচীন্দ্র কথাচ্ছলে বন্ধু আফসারউদ্দিন খোন্দকারের নিকট একদা কমলার বিষয় গল্প করিলেন। কৌতূহলাক্রান্ত আফসার কমলাকে দেখিবার জন্য একদিন বহুক্ষণ পুকুরঘাটের পথে কাটাইলেন। যথাসময়ে কমলা স্নান করিয়া সেই পথ দিয়া বাড়ী গমন করিলেন। স্নানসিক্ত ক্ষৌমবস্ত্রাবৃতা যুবতী বিধবার জ্বলন্ত যৌবন ও ফুটন্ত রূপ দেখিয়া তাঁহারও চিত্ত টলিল। তিনি কমলার সৌন্দর্য্যে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার মন হরণ করিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহাকে বিদ্যা-সাগরের 'বিধবা-বিবাহ' মুন্‌শী মেহেরউল্লার 'বিধবা-গঞ্জনা' বঙ্কিম বাবুর 'বিষবৃক্ষ' ও রমেশ বাবুর 'সংসার' নামক বিধবাবিবাহের পরিপোষক মত সংবলিত পুস্তকগুলি কিনিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিলেন। কমলা পুস্তকগুলি পাইয়া বিষম বিস্মিত হইলেন—সেগুলি পড়িয়া তাঁহার চিত্তও বিচলিত হইল, কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত কে পুস্তকগুলি পাঠাইতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিলেও অবশেষে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। কারণ আফসার স্বয়ংই তাঁহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণপূর্ব্বক চিরসুখী করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া পত্র লিখিলেন। কমলার সংযম পূর্ব্ব হইতেই শিথিলতা প্রাপ্ত হইতেছিল ; সুতরাং আফসারের পত্র পাইয়া বিরক্ত হইলেও তিনি এ বিষয়ে কাহাকে কোন কথা বলিলেন না ; কেবল নিজ মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ দেশগৌরব কীর্ত্তিমান্ যুবক আবুল ফজলের তেজঃপূর্ণ মনো-হর মূর্ত্তি কমলার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় তাঁহার অন্তর টলিল—সংযম ভাসিল। যুবতী ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, বিবেক ও লজ্জা-সম্ভ্রম বিস্মৃতির অতল তলে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন। কথাটা একটু খুলিয়া বলিতেছি।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা একবার সতীশের সাহায্যে বড় মিঞার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেও তাঁহার মোকর্দ্দমার চাপে আবার ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কাজেই তিনি এম-এ ও আইন পড়িবার জন্য আবুল ফজলকে খরচ দিয়া কলিকাতা পাঠাইতে পারিলেন না। সুতরাং আবুল ফজল পুস্তকাদি আনিয়া বাড়ী থাকিয়াই এম-এ ও 'ল' পড়িতে লাগিলেন। তিনি বাটী থাকাকালীন সতীশ স্কুল হইতে বাড়ী আসিলে প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ী বেড়াইতে যাইতেন। উভয়ে পড়া-শুনা ও সংসারাদি সম্বন্ধে নানারূপ গল্প ও তর্কবিতর্ক করিতেন। কখন কখন গল্প ও তর্ক এত জমিয়া যাইত যে, নলিনী মাঝে পড়িয়া নিবৃত্ত না করিলে উভয়েই অনর্থক অনেক সময় নষ্ট করিয়া ফেলিতেন।

এই সুযোগেই কমলার সকাম দৃষ্টি আবুল ফজলের উপর পতিত হইল। কমলা তাঁহার রূপলাবণ্য, তেজস্বিতা ও কথাবার্ত্তায় একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং ধৈর্য্যহীনা যুবতী একপত্র লিখিয়া স্বীয় বাসনা আবুল ফজলকে জানাইলেন। আবুল ফজল কমলার পত্র পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন ;—কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। কমলা আবেগপূর্ণ ভাষায় আবার পত্র লিখিলেন ; স্বীয় হৃদয়ের অধীরতা যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করিলেন ; পিতৃপ্রদত্ত সমস্ত সম্পত্তি আবুল ফজলকে লিখিয়া দিবার প্রলোভন প্রদান করিলেন এবং যদি আবুল ফজল ইহাতে সম্মত না হন, তবে নিশ্চয় সে আত্মহত্যা করিবে, শেষে কমলা ইহাও লিখিতে ভুলিলেন না। আবুল ফজল এই পত্রের মৃদু তিরস্কারপূর্ণ এক বিনামী পত্র কমলাকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে কমলাকে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সামাজিকতা, আত্ম-সম্ভ্রম ও সংযম বিষয়ে অসংখ্য উপদেশ প্রদান করা হইল। অধিকন্তু তিনি তাঁহাদের উভয়ের সম্বন্ধ, সামাজিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ দিয়া তাঁহাকে ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করিবার উপদেশ দিলেন। এই পত্র

পাঠানের পর আবুল ফজল সতীশের বাটী যাওয়া ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু সতীশ বাড়ী আসিলে আবুল ফজল তাঁহাদের বাড়ী না যাইয়া পারিতেন না। কারণ সতীশ তাঁহাকে প্রায়ই বাড়ীতে না লইয়া ছাড়িতেন না।

একদা পূর্ণিমা রজনীতে সতীশ আবুল ফজলকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। উভয়ে নানা কথা বলিতে বলিতে সতীশ আবুল ফজলের বিবাহের কথা তুলিলেন। আবুল ফজল সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িবার চেষ্টা করিলে সতীশ সহাস্যে বলিলেন,—"ও সব বাজে কথা রাখ; বিবাহ করবে কি চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করে আইবুড় থাকবে, তাই বল ?"

আবুল ফজল। তোমার সব প্রশ্নই খাপছাড়া। চিরকুমার ব্রত অবলম্বনের কোন কারণ ঘটেছে, কিংবা বিবাহের সাতে আমার যে বিশেষ কোন শত্রুতা আছে, তাত জানি না !

সতীশ। কারণ বা শত্রুতা যে একেবারেই নাই, ইহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। তবে তুমি যদি জানিয়াও না জান, আমি নাচার !

আবুল ফজল। আচ্ছা যদিই বা কোন কারণ থাকে, কিন্তু আমিত তার জন্য কোন প্রতিজ্ঞাই করি নাই। সেরূপ কিছু কখন বলিও নাই। সুতরাং তোমার আশঙ্কার কারণ কি ?

সতীশ। মুখে বল নাই বটে, কিন্তু মনেত বল্‌তে পার; তাই আশঙ্কা।

আবুল ফজল। বেশ জানিয়া রাখ, তোমার আশঙ্কা অমূলক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার বিবাহে যদি কোনরূপ বিভ্রাট ঘট্‌ত; তবে এইরূপ আশঙ্কার কারণ হইত নাকি ?

সতীশ গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"অসম্ভব ছিল না। আমি সেই বিভ্রাটের সামান্য আভাসেই যেরূপ বিচলিত হয়েছিলাম, তাহাতে তোমার সাহায্য না পেলে বোধ হয়, আমি উন্মত্ত হ'য়ে যেতুম।"

আবুল ফজল। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বোধ হয় ঘোর উন্মাদিনী!

গৃহমধ্য হইতে প্রভাত-নলিনী মধুর স্বরে উত্তর করিলেন,—"এ খগেন্দ্র-নগেন্দ্রের যুদ্ধে যোগ্য পাত্রকে পরিত্যাগ ক'রে অযোগ্যের উপর বাণ নিক্ষেপ করা বড়ই অশোভনীয়!"

আবুল ফজল সহাস্যে বলিলেন,—"আপনাদের একজনের গায়ে ফুলের বাতাস লাগ্‌লেও যে অপরের প্রাণে বজ্রসম বাজে, তাত আমি জান্‌তেম না।"

নলিনী। আপনার প্রাণটী বোধ হয় খুব কঠোর; কেউর জন্য একটুও লাগে না! কিন্তু কখনও লাগে নাই কি? আপনি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে ভুল্‌তে পেরেছেন কি?

আবুল ফজল একটু ব্যথিত স্বরে বলিলেন,—"সংসারে সম্পূর্ণরূপে কেহ কাহাকে ভুল্‌তে পারে না; আমিও পারি নাই। আমি তাঁহাকে বাল্যকাল হইতেই সহোদরার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখেছি, এখনও স্নেহ করি। তবে অবস্থানুযায়ী তাঁহাকে যতটুকু ভোলা দরকার, ততটুকু নিশ্চয় ভুলেছি।"

নলিনী। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিনি আপনাকে ভুল্‌তে পারেন নাই।

আবুল ফজল। আমি তাঁহাকে যতদূর জানি; তাহাতে আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, তিনি কখনও স্বামীর অবিশ্বাসিনী পত্নী হ'বেন না।

এমন সময়ে সতীশ বলিলেন,—"কিন্তু বড় মিঞা সাহেবের মেয়ে এখন এইখানেই থাকেন; শুনেছি, স্বামীর সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব নাই।"

আবুল ফজল। তা আমিও জানি। আবদুল হক এক অদম্য প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল যুবক। তিনি অন্য বিবাহ করে পুলিসে চাকুরী নিয়েছেন। অতএব তিনি প্রথমা পত্নীর সহিত যে সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই, ইহাদ্বারা তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

নলিনী। এ সম্বন্ধে স্ত্রীর পক্ষ হইতেও ত ত্রুটি থাকৃতে পারে; স্বামীর প্রতি ব্যবহারে যথোচিত আন্তরিকতার অভাবেও ত এইরূপ হ'তে পারে?

আবুল ফজল। অন্ততঃ আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু যদি উহা সম্ভব হয়, সে জগতের অভিসম্পাতের পাত্র!

নলিনী। অবস্থা ও কার্য্যপরম্পরায় সকলেরই পদস্খলন ও চিত্ত-বিকার ঘট্‌তে পারে!

আবুল ফজল। পারে বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য ও আত্মবিস্মৃতি কোন অবস্থায়ই প্রশংসনীয় নহে! পদস্খলন সর্ব্বত্রই দোষের।

এমন সময়ে সতীশ বাধা দিয়া বলিলেন,—"ও সব বাজে কথা ছাই এখন থাক্; কেবল দুনিয়ার দোষগুণ দেখ্‌লে লাভ লোকসানের আশা বড় কম। আমার জিজ্ঞাস্য, তুমি এখন বিবাহ কর্‌তে সম্মত আছ কিনা, তাই স্পষ্ট ভাবে বল?"

আবুল ফজল। এত দ্রুত গরজ যে!

সতীশ। গরজ দায় প'ড়ে। আমার দুই তিনটী পরিচিত উকিল ও ডেপুটী আমার মাথাটা খারাপ ক'রে দিবার উপক্রম করেছে।

আবুল ফজল। কি অপরাধে?

সতীশ। অপরাধ বিষম! অর্থাৎ আমার একজন উচ্চশিক্ষিত বন্ধু অবিবাহিত। সুতরাং এই অপরাধে তাঁহারা নিজ নিজ রূপবতী, গুণবতী, বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী ও যুবতী কিংবা অন্ততঃ উহার অধিকাংশ গুণসম্পন্না

ভগিনী বা কন্যা প্রভৃতি তদীয় পাদপদ্মে উপহার দিয়ে তাঁহার আইবুড় নামটী ঘুচাইতে সমুৎসুক !

আবুল ফজল। সতীশ, ঠাট্টা ছাড়। তুমি বোধ হয়, আমার অবস্থা বুঝ্‌ছ না। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না হ'লে বিবাহ প্রসঙ্গের আলোচনা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা মাত্র।

সতীশ। কেন ?

আবুল ফজল। এই আর বুঝ্‌লে না ? পণ্ডিতি কর্‌লে লোকের এই দশাই হয়। এই জন্যই দশ বৎসরের পণ্ডিতের সাক্ষ্য আমেরিকার আদালতে অগ্রাহ্য ! কথাটা হচ্ছে এই যে, "যে ব্যক্তি স্ত্রীর ভরণপোষণ কর্‌তে সমর্থ নহে ; বিবাহ তাহার পক্ষে দোষাবহ* ।"

সতীশ। ইউনিভার্সিটির উচ্চতম কেন্দ্র অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে তুমি যে বিলাতি-বেম্ম মত পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া উঠেছ, তা আর আমি কি ক'রে জান্‌ব।

আবুল ফজল বাধা দিয়া বলিলেন,—"তুমি ভুল বুঝেছ ; ইহা কেবল অভিনব বিলাতি-ব্রাহ্ম মত নহে ; বরং ইহা ইস্‌লামী বিধান-শাস্ত্রের বিশেষ নির্দ্দেশ ও সমস্ত সভ্যজাতির অনুমোদিত মত।"

সতীশ। বেশ, তাহা হইলে তোমার মতে যাবতীয় উপার্জ্জন-অক্ষম ব্যক্তির এবং সমস্ত অনভিজ্ঞ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার বিবাহ বোধ হয় দোষাবহ ও অসিদ্ধ ?

---

* সাধারণতঃ বিবাহ করা 'সুন্নত'—অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের অনুষ্ঠিত ও আদিষ্ট পুণ্য কার্য্য ; চরিত্রহীনতার আশঙ্কা-স্থলে বিবাহ করা 'ওয়াজেব'—অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সামর্থ্য না থাকিলে বিবাহ করা 'মকরূহ'—অর্থাৎ দোষাবহ। খোলাসাতল্‌-নেকাহ্‌ ও শরেহ বেকায়ার টীকা দ্রষ্টব্য।

আবুল ফজল। এ তোমার বাড়াবাড়ি! দোষাবহ হইলেই যে তাহা অসিদ্ধ হইবে, তার ত কোন মানে নাই, আর দোষের কারণ যদি বিদ্যমান না থাকে, তবে দোষাবহ কার্য্যও নির্দ্দোষ হয়। মনে কর, উপার্জ্জনাক্ষম ব্যক্তির বিবাহের বাহ্য-সংসারের দায়িত্ব কোন যোগ্য ব্যক্তি গ্রহণ করিলেন; যেমন বালক-বালিকার বিবাহের দায়িত্ব তাঁহাদের পিতা-ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজন গ্রহণ করিলেন; এতদ্দ্বারা দোষের প্রকৃত কারণই যখন দূরীভূত হইল, তখন আর উহা অসিদ্ধ হইবে কেন?

এইরূপ আরও নানা কথোপকথনের পর আবুল ফজল বাড়ী চলিলেন; সতীশও শয়ন করিতে গেলেন।

আবুল ফজল যখন বাড়ী চলিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। গগন-প্রান্তে সমুজ্জ্বল চন্দ্র আপন মনে হাস্য করিতেছে; নীল আকাশে প্রস্ফুটিত তারকাপুঞ্জ শ্যাম-সরোবরে স্বর্ণকৌমুদীর ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে; জ্যোৎস্না-ময়ী পুলকিতা রজনীর সর্ব্বাঙ্গে আনন্দ ও শান্তির অনাবিল মাধুর্য্য ভাসিয়া বেড়াইতেছে!

আবুল ফজল এমন সময়ে সতীশদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যেই সদর পথে পদ স্থাপন করিলেন, অমনি পার্শ্বদেশ হইতে শ্বেতবসনা নিরা-ভরণা এক রমণীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। আবুল ফজল চমকিত-চিত্তে তাহার উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহার অনাবৃত মুখের দিকে চাহিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"কে কমলা? তুমি এত রাত্রে বাড়ীর বাহিরে কেন?" কমলা কথা বলিলেন না—বলিতে পারিলেন না। তিনি উন্মত্তার ন্যায় আবুল ফজলের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পদ-প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন এবং আবেগরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "নিষ্ঠুর! আমি তোমারই জন্য বাইরে এসেছি; তোমার জন্য আমি অহোনিশি জ্বলে মরছি। আমাকে এ জ্বলন্ত আগুন হইতে রক্ষা করে,

তোমার ঐ কোমল চরণে স্থান দিয়ে আমার এ পোড়া প্রাণ তোমাকে শীতল কর্‌তেই হবে।"

আবুল ফজল সসঙ্কোচে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিরস্কারের সহিত সহানুভূতিপূর্ণ দৃঢ় স্বরে কমলাকে বলিলেন,—"ছি কমলা! লোকে ইহা শুন্‌লে,—কেহ এই ব্যাপার দেখ্‌লে কি বল্‌বে? আমরা এক গ্রামের অধিবাসী; তোমার ভ্রাতা আমার সুহৃদ; তুমি আমার ভগ্নিতুল্য। আমার দ্বারা কি তোমার বা তোমাদের বংশের ও কুলের এইরূপ সর্ব্বনাশ হ'তে পারে? অসম্ভব! তুমি প্রকৃতিস্থা হও, ধৈর্য্যধারণ কর; যদি তুমি একান্তই পুনর্ব্বিবাহিতা হ'তে চাও, আমি যেরূপে পারি সতীশকে ব'লে কোন বিধবা-বিবাহার্থী হিন্দু-যুবকের সাতে তোমার বিবাহ দেওয়াইয়ে দিব।"

কমলা। আমি হিন্দু চাই না—আমি কুলমান চাই না; আমি চাই তোমাকে। বল তুমি আমাকে আশ্রয় দিবে কি না? তুমি যাহাকে সর্ব্বনাশ বল্‌ছ, উহাই আমার সর্ব্বস্ব।

আবুল ফজল। কমলা! পাগ্‌লামী ত্যাগ কর; তুমি যে ভীষণ প্রলাপ বক্‌ছ; তাহার পরিণাম একবার ভেবে দেখ। বুঝে দেখ, এরূপ কাজ কর্‌লে দেশের লোকে কি বল্‌বে? তোমার ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজন কি মনে কর্‌বে? কেমন করে তা'দিগকে মুখ দেখাবে?

কমলা। আমি যথেষ্ট ভেবে দেখেছি। দেশের লোকের কথায় কারও কিছু আসে যায় না। আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই অনেক কিছু করে থাকে; তারা আবার কি মনে কর্‌বে? আর তা'দিগকে মুখ দেখাইবার বা তা'দের মুখ দেখ্‌বার আবশ্যকতাই বা কি?

আবুল ফজল। তোমার আবশ্যকতা না থাক্‌লে কিংবা তুমি না দেখ্‌লেও সকলেই যে দেখ্‌বে না, তার ত কোন মানে নাই!

কমলা। ও বুঝ্‌লাম, তুমি আমাকে ঘৃণা কর! আমি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকন্যা হয়েও স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে বিধাতার অভিশম্পাত-স্বরূপ পাপ বৈধব্যজীবনের অবসান কর্‌বার জন্য তোমার চরণে আশ্রয় ভিক্ষা কর্‌ছি; রমণীসুলভ লজ্জা, ভয়, মান, অভিমান ও জাতি-ধর্ম্ম ত্যাগ করে আমার দেহমন সর্ব্বস্ব নিবেদনপূর্ব্বক তোমার করুণা ভিক্ষা কর্‌ছি, কিন্তু তুমি সাম্যবাদী মুসলমান-সন্তান! তুচ্ছ স্বার্থ ও অভিমান বশে হেলায় প্রত্যাখ্যান করে আমাকে পাপময় বৈধব্য জীবন-যাপনের জন্য উল্টা উপদেশ দিচ্ছ! ধন্য তোমাদের উচ্চশিক্ষা!

আবুল ফজল। কমলা, তিরস্কার কর্‌তে ইচ্ছা হয় যদৃচ্ছা কর; আমি দুঃখিত হ'ব না। কিন্তু নিশ্চয় জেনো, আমি তোমাকে ঘৃণা ত করিই না, বরং নিজ ভগিনীর ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখি এবং চিরকাল দেখ্‌ব। তুমি যা বল্‌ছ, যদি উহা কালোপযোগী হ'ত; দেশাচার ও সামাজিকতার বিরোধী না হ'ত কিংবা সমাজ ও দেশাচারকে প্রত্যাখ্যান করে চল্‌বার মত শক্তি আমার থাক্‌ত, তবে নিশ্চয় আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতাম। কিন্তু উহা আমার সাধ্যের অতীত।

কমলা। মিথ্যা কথা! দেশে এমন অনেক হ'য়ে থাকে; তাতে কারও কিছু হয় না। যদি আমার প্রতি তোমার ঘৃণা না থাকে, তবে যেরূপেই হউক, আমাকে গ্রহণ কর্‌তেই হ'বে। আমি আর কোন কথা শুন্‌ব না।

আবুল ফজল। আমি অসমর্থ। তুমি শীঘ্র বাড়ীর মধ্যে যাও; কেহ দেখ্‌লে সর্ব্বনাশ হবে।

কমলা। হয় হউক, তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হ'লে আমি কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ কর্‌ব না।

আবুল ফজল ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—"তুমি যদি সহজে প্রতিনিবৃত্ত না হও, তবে অগত্যা আমি তোমার এ সব কাণ্ড সতীশকে বলে দিতে বাধ্য হব !"

কমলা। বেশ তাই বল ; বলে আমার সর্ব্বনাশ করে তবে যাও ; নচেৎ আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দিব না।—বলিয়াই কমলা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে আবুল ফজলের হস্তদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন।

আবুল ফজল ঘৃণার সহিত তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ছি কমলা ! এত হীন প্রবৃত্তি তোমার ! তোমার কথা শুন্‌তেও এখন আমার ঘৃণা হচ্ছে ; তোমার মুখ দেখাও পাপ !"—বলিয়াই আবুল ফজল দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

আবুল ফজলের বাক্যে নিরাশার দাবদাহে কমলা জ্বলিয়া উঠিলেন ! পদদলিতা ক্রুদ্ধা সর্পিনীর মত সরোষে মাথা তুলিয়া বলিলেন,—"বটে, এত স্পর্দ্ধা ! আচ্ছা দেখি, সতীশ তোমাকে কিরূপে রক্ষা করে ? মনে রেখো, আজ যে গর্ব্বে আমার আশা ভরসা চূর্ণ করে মাতালের মত আমাকে পদদলিত করে চলে গেলে, অচিরেই আমি তোমার এ দর্প চূর্ণ করব ;—অক্ষরে অক্ষরে ইহার প্রতিশোধ দিব !"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০::*::০—

পথ নির্দ্দেশ।

আবুল ফজল চলিয়া গেলে কমলা নিরাশা, অপমান, অভিমান ও প্রতিহিংসার দাবদাহে জ্বলিতে জ্বলিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সারা-রাত্রি অনিদ্রাবস্থায় স্বীয় কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন। কমলা ভাবিলেন, হৃদয়ে যখন বাসনা ও কামনার হোমানল জ্বালাইয়াছি, তখন এ আগুনে ভোগের ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেই হইবে। অন্য কোন নিষ্কাম সাধনার দ্বারা এ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার শক্তি আমার আর নাই। যে পথে পা দিয়াছি, এ পথ হইতে যখন ফিরিতে পারিব না, তখন অবশ্যই আমাকে গন্তব্য-পথের মধ্য হইতে সুপথ বাছিয়া লইতে হইবে। এ কামনাপূর্ণ চিত্তবৃত্তি আর কিছুতেই প্রশমিত হইবে না। কিন্তু আমি কি করিব? কোন্ পথে পা বাড়াইব? আমি যোগ্য পাত্রজ্ঞানে লজ্জা-সরম পরিত্যাগ করিয়া আবুল ফজলকে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিলাম; কিন্তু সে আমাকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যানপুর্ব্বক পদদলিত করিয়া গেল। সে এখন আমার পরম শত্রু। তাহাকে অপমানের প্রতিশোধ দেওয়া আমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে শচীন্দ্র দত্ত ও আফসারউদ্দিন খোন্দকার আমাকে চায়। শচীন্দ্র বিবাহিত এবং সে হিন্দু হইলেও আমার অপেক্ষা হীন বর্ণ; যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত হইলেও আমাদের সমাজে উহা চলে নাই, ভবিষ্যতে চলিবে

উপপত্নীরূপে উপভোগ করিতে চায়; কিন্তু আমি সতী মায়ের মেয়ে হইয়া কিরূপে এই কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইব? কিরূপে আমার বংশের মুখে পাপের কালিমা মাখিয়া দিব? আর নারী কি কেবল পশুবৃত্তিপরায়ণ পুরুষের উপভোগের সামগ্রী মাত্র? সে কি সংসারে তাহার কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারে না? আমার বিশ্বাস, ইচ্ছা থাকিলে,—উদ্যম থাকিলে,—সাহসের সহিত অগ্রসর হইলে অবশ্য পারে। আফসারউদ্দিন আমাকে চায়; অবশ্য কি ভাবে চায়, তাহা আমি জানি না; সে নিজে যেটুকু আভাস দিয়াছে, তাহাতে যে তাঁহার মনে কোনরূপ দুরভিসন্ধি আছে, এরূপ ত বুঝায় না। আফসারউদ্দিন সদ্‌বংশজ মোসলমান; তিনি যদি আমাকে বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন, তাহা কি আমার সৌভাগ্য নহে? আমার বর্ত্তমান সাধনা ও লক্ষ্য পথের উহাই ত চরম সিদ্ধি। কিন্তু কথা এই যে, আমাকে মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু মোসলমান ধর্ম্ম কি হেয়? দাদাকেও ত বলিতে শুনিয়াছি যে, অতি অল্প দিনের মধ্যে যে মহাধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের উপর স্বীয় বিজয় নিশান উড়াইয়াছে; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুলতান এবং অসংখ্য রাজা-মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দীনদুঃখিগণ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্মের পুণ্যপ্রদীপ্ত শান্তি-পতাকা তলে আশ্রয় লইয়াছে, মহা মহাপণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া নিরক্ষর মূর্খগণ পর্য্যন্ত যে পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছে এবং কিঞ্চিৎ অধিক সহস্র বর্ষ অতীত হইতে না হইতেই জগতের এক চতুর্থাংশ—প্রায় চল্লিশ কোটী নরনারী যে পবিত্র ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছে, সেই মহাধর্ম্ম ইস্‌লাম কখনই হীন ধর্ম্ম হইতে পারে না। বরং প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই ইস্‌লাম ধর্ম্মকে সত্যসনাতন শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। একটী ধর্ম্মের ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব ও

মাহাত্ম্যের উচ্চ নিদর্শন ও উচ্চ প্রশংসা আর কি হইতে পারে? আমিও ত বুঝি, শত শত পীর-পয়গম্বর যে ধর্ম্মের মধ্যে জন্মিয়াছেন; এখনও যাঁহাদের ভক্তি করিয়া—যাঁহাদের পুণ্য নামের গুণে বিধাতার নিকট জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেরই মনস্কামনা পূর্ণ হয়,—যে ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে এখনও আবুল ফজলের ন্যায় চরিত্রবান যুবক জন্মে! সে ধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহা না হইলে এক একটী পীর-ফকিরের নামে শত শত হিন্দু-মোসলমান মাথা নোয়াইবে কেন? দেব-সন্ন্যাসীর নামে ত কেহ ওরূপ ভক্তি করে না;—বরং জুয়াচোর বা ভণ্ড বলিয়া সন্দেহ করতঃ সকলেই তাহাদিগের নিকট ভয়ে ভয়ে যাওয়া আসা করে। আবুল ফজল একদা দাদার সহিত তর্ক করিতে করিতে বলিয়াছিল,—"জগতে ইস্‌লামই একমাত্র সাম্য বা মুক্তির ধর্ম্ম; কারণ একজন হীনজাতীয় লোক খ্রীষ্টান হইলে সে উচ্চশ্রেণীর খ্রীষ্টানদের সহিত সমান হওয়া ত দূরের কথা, তাঁহাদের সহিত একত্রে ভগবানের আরাধনাও করিতে পারিবে না! সে তাহার সম জাতীয় লোকের সঙ্গেই থাকিতে বাধ্য হইবে। কেহ যদি ব্রাহ্ম হয়, অথচ তাহার বিষয়-সম্পদ, রূপ-যৌবন ও টাকা-পয়সা না থাকে, তবে সে সমাজে মিশিতেই পারিবে না! অন্যান্য ধর্ম্মগুলির কথা না বলাই ভাল। কিন্তু কেহ মোসলমান হইলে সে তখন জগতের চল্লিশ কোটী মোসলমানের একজন; সে তখন জগতের শ্রেষ্ঠ সুলতান ও ধর্ম্মশীল মহাপণ্ডিতের সহিত একত্রে উপাসনা ও আহার-বিহার করিবার অধিকারী! অন্যধর্ম্মে কেহ অন্ততঃ পার্থিবজীবন সম্বন্ধেও এমন মুক্তি এবং এমন সাম্য দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে কি?" দাদা ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। উত্তর কি দিবেন? ইহা যে বর্ণে বর্ণে সত্য! এমন সাম্যের—এমন মুক্তির—এমন প্রীতির ধর্ম্ম জগতে আর নাই। অতএব আমি আমার বৈধব্যজীবনের দুর্ব্বহ ভার অপনোদনের জন্য,

আমার উদ্দেশ্যহীন শুষ্ক জীবন মায়া-মমতার ফল-পুষ্পে সুশোভিত করিয়া আশালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য এই ধর্ম্মই গ্রহণ করিব ; ইহা ভিন্ন আমার আর গতি নাই। কমলা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

পরদিন কমলা দৃঢ়ভাবে সতীশকে বলিলেন,—"দাদা তুমি পিতৃশত্রু আবুল ফজলদের সাতে বন্ধুত্ব কর্‌ছ কেন? যদি তুমি পিতার স্বর্গীয় আত্মার পরিতৃপ্তি চাও, তবে তাদের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ কর!"

সতীশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কমলা! তোমার পাগ্‌লামী কি আর যা'বে না? আবুল ফজলরা কখনও পিতার শত্রু ছিলেন না। পিতাই বৃথা তাঁহাদিগকে শত্রু করে তুলেছিলেন।"

কমলা। সে যাই হোক ; আমি সে সব কথা শুন্‌তে চাই না ; পিতৃশত্রুর সাতে তুমি পিতার ভিটার উপর বসে বন্ধুত্ব পাতাবে ; তা আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।

সতীশ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"কমলা তোমার স্বভাবজাত প্রতিহিংসা একটুও কমে নাই—বোধ হয় কখনও কম্‌বে না। তুমি অনর্থক আমাদিগকে পিতার চক্ষুশূল ক'রে আমার যথেষ্ট অনিষ্ট করেছ ; সহোদরা ভগ্নী হয়েও নীচ প্রতিহিংসা ও স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে ভ্রাতাকে সর্ব্বস্বহীন করেছ। কিন্তু দেখ্‌ছি, তাতেও তোমার তৃপ্তি হয় নাই। সংসারের প্রথানুযায়ী হয়ত তুমিই আমার আশ্রিতা হইতে, কিন্তু ভাগ্যবশে তাহার পরিবর্ত্তে আমিই তোমার আশ্রিত হয়েছি। পিতার বিষয়-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা সমস্তই তুমি আত্মসাৎ করেছ। আমি পিতার একমাত্র পুত্র হ'য়েও কেবল বাড়ীতে থাক্‌বার অধিকারটুকুমাত্র পেয়েছি ; কিন্তু তাও যদি তোমার সহ্য না হয়, বেশ আমি বাড়ী পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছি, তথাপি তোমার একগুয়েমীর বশীভূত হ'য়ে আমার বন্ধুবান্ধবগণকে শত্রু ক'রে তুল্‌তে পারব না।"

কমলা তখন ইহার আর কোন উত্তর করিলেন না। সতীশও ক্রোধবশে কথাগুলি বলিয়া তখনই স্কুলে রওয়ানা হইয়া গেলেন। ভাব-গতিক দেখিয়া নলিনীর মুখেও বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না।

কমলা ইহার পর দুইদিন পর্য্যন্ত নলিনীর সহিত কথা বলিলেন না। নলিনী কতরূপে ছলনা করিয়া কথা বলিতে গেলেন, কতরূপে তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল। এইরূপে সপ্তাহ অতীত হইল; সতীশ শনিবারে বাড়ী আসিলেন। কিন্তু ভ্রাতা-ভগিনীতে কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে না দেখিয়া নলিনী ক্ষুণ্ণ হইলেন? তিনি নানারূপ বুঝাইয়া ও জিদ করিয়া সতীশের দ্বারাই প্রথমে কথা বলাইলেন; বাধ্য হইয়া কমলাও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত দুই একটী কথার উত্তর দিলেন মাত্র। কিন্তু সতীশ বাড়ী হইতে যাইবার সময়ে আবুল ফজলের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন,—"আমি একখানি বাড়ী তৈয়ার কর্‌ব; একটী ভাল জমি দেখে দাও।" কারণ বুঝিতে আবুল ফজলের বাকী থাকিল না। তিনি বলিলেন,—"কমলাকে একা ফেলে পৃথক্ বাড়ী কর্‌বে, আমি ইহার পক্ষপাতী নহি।" সতীশ বলিলেন,—"পক্ষপাতী না হ'লেও আমাকে ইহা কর্‌তেই হবে! যদি বন্দোবস্ত করে না দাও, শেষে মন্দ বল্‌তে পার্‌বে না।" আবুল ফজল তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা দেখা যাইবে।"

এদিকে কমলা ক্রমে নলিনীর সহিত দুই একটী কথা বলিতে লাগিলেন। দুই তিন পরে পাড়ার একটী নববধূর সাধভক্ষণ উপলক্ষে রায়বাড়ী নিমন্ত্রণ আসিল। সে বাড়ীটি রায়বাড়ী হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থিত। কমলা নলিনীকে যাইবার জন্য বলিলেন। নলিনী বলিলেন,—"ঠাকুরঝি' আমি যেতে পার্‌ব না; তুমি যাও।"

কমলা। না গেলে চল্‌বে কেন? তাদের বেলায় তুমি না গেলে তোমার বেলায় তারা আস্‌বে কেন?

নলিনী। না আসুক ক্ষতি নাই। কিন্তু আমি পাড়াশুদ্ধ লোকের মুখের উপর দিয়ে অতদূর যেতে পার্‌ব না।

কমলা। বৌদি, তোমার সব কথাই সৃষ্টিছাড়া! পাড়াশুদ্ধ লোক তোমাকে খেয়ে ফেল্‌বে নাকি? আমরা ত চিরকালই যাই; আমাদের ত কেউ খেয়েও ফেলে না বা মানও লুটিয়া লয় না।

নলিনী। তোমাদের অভ্যাস আছে, তোমরা যাও; কিন্তু যাওয়া উচিত নয়; কারণ মান লুটে নিতে বড় বেশীক্ষণ লাগে না।

কমলা সরোষে বলিলেন, "কার বাবার সাধ্য! এত আর কলিকাতা নয় যে, এ ওকে ধরে নিবে, সে তাকে লুটে নিবে; কিংবা আধ কাঠা জমির ঘরও নয় যে, বাড়ীর বার হলেই পরের জায়গা মাড়াতে হ'বে। আমাদের বাপ-পিতামহের জমির উপর দিয়া আমরা যা'ব, তাতে কারও কিছু বল্‌বার সাধ্য নাই।

নলিনী। বাপ-পিতামহের জমি জমিদারী দেশ-দেশান্তর, দূর-দূরান্তর, এমন কি হাটে-শহরেও থাকৃতে পারে। তাই বলে মেয়ে মানুষে তার সব জাগায়ই যে বেড়িয়ে বেড়াবে, তার কোন মানে নাই। তারপর জমিজমা যারই হোক্, আমি পাড়ার লোকের মধ্য দিয়া যেতে পার্‌ব না।

কমলা। পাড়ার লোক কি বাঘ না কুমীর যে, তাদের সাম্‌নে গেলেই খেয়ে ফেলবে!"

নলিনী। বাঘ কুমীর না হোক; খেয়ে না ফেলুক; তারা অপরিচিত পরপুরুষ; মন্দ লোকও ত তাদের মধ্যে থাকৃতে পারে?

পুরুষে দেখ্‌লেই মান যা'বে; কিন্তু ভিন্ন জাতি পুরুষের সাতে ঘরে ব'সে হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব কর্‌লেও কিছু হয় না!"

নলিনী। ঠাকুরঝি, তুমি অন্যায় কথা বল্‌লে আমি নাচার। আমি কোন্ ভিন্ন জাতি পুরুষের সাতে হাসি-ঠাট্টা গল্প করি? কচিৎ আবুল ফজলের সাতে দুই একটী কথা বলি, সেও তোমার দাদার সাম্‌নে। বিশেষ তিনি তোমার দাদার সঙ্গেই ত আসেন; তোমার দাদা বাড়ী না থাক্‌লে তিনি কখনও আসেন না। আর তাঁর সঙ্গে ত তুমিও কথা বল।

কমলা। আমি ত অনেকের সঙ্গেই কথা বলি; ঘাটেও যাই; পাড়ায়ও বেড়াই; তাতে ত আমার মান যায় না; কিন্তু তোমার ত তাতে বিষম আপত্তি।

নলিনী। ঠাকুরঝি, বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নয়। কেউর সঙ্গে কথা বলি বলে কি সকলের সঙ্গেই বলা উচিত? ঘাটে যাই বলে কি পাড়া বেড়ান ভাল? যা না হ'লে চলে না, তা সকলেই বাধ্য হইয়া করে; কিন্তু যা নইলে চলে—অথচ মন্দ কাজ, তা' ত্যাগ করাই উচিত। মনে কর, তুমি বিধবা; পাড়ায় গেলে, কেহ খেয়ে না ফেলুক, মন্দ লোক হঠাৎ দুটো মন্দ কথাও ত বলে ফেল্‌তে পারে। তাতে কি মর্য্যাদার হানি হয় না?

কমলা। সক্রোধে,—"যাদের বিধবা মা-বোন্‌কে লোকে মর্য্যাদাহীন করেছে, তারাই ঐরূপ কথা বলে"—বলিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ইহার দুইদিন পরেই কমলা নলিনীকে বলিলেন,—"বৌদি! দাদা বাড়ী এলে তা'কে শীঘ্র পৃথক্ বাড়ী বানা'তে বোলো। এ বাড়ীতে থেকে নানা জাতির সঙ্গে বন্ধুতা করা চল্‌বে না।"

নলিনী। কেন ঠাকুরঝি! তিনি আবার পৃথক্ বাড়ী বানা'বেন

কমলা। সে ত পূর্ব্বেই বলেছি।

নলিনী। আমরা পৃথক্ বাড়ী গেলে তুমি একেলা থাক্‌বে কিরূপে?

কমলা। আমার চিন্তা তোমাদিগকে কর্‌তে হবে না।

নলিনী কমলার মন বুঝিবার জন্য বলিলেন,—"যদি আমরা না যাই? এ বাড়ীখান ত আমাদেরও।"

কমলা সহসা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"তা আর নয় কেন? এ যে তোমার বাবার বাড়ী!"

নলিনী। ঠাকুরঝি, তোমার মুখে কিছুই আটকায় না। স্বামীর বাড়ী যদি বাবার বাড়ী হয়, তবে ত সকলেরই হতে পারে!

আজ নলিনীকে তিরস্কার করাই কমলার উদ্দেশ্য; সুতরাং তিনি এক কথার অন্য অর্থ ধরিয়া সরোষে বলিতে লাগিলেন,—"এমন অপূর্ব্ব স্বামীর দাবীও দেখি নাই; এমন বেহায়া স্ত্রীও দেখি নাই! বিবাহের পর দুদিন যেতে না যেতে—সন্তানাদি হ'তে না হ'তেই সকলের শত্রু ক'রে স্বামীকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে নেওয়া কেবল কলকাতার বেহায়া স্ত্রীলোকদেরই সাজে! পিতা-মাতা নাই, শ্বশুর-শাশুড়ী নাই, ভাই-বোন্ নাই, দেবর-ননদ নাই, পাড়া-প্রতিবাসী নাই, আত্মীয়-স্বজন নাই, কেবল স্বামী—আর স্বামী! এমন স্বামীপানার বালাই লয়ে মর্‌তে হয়। এমন বেহায়া মেয়ে কোন সৎ পিতামাতার ঘরে সম্ভবে না। আমরা এমন হইলে বোধ হয় পিতামাতা গলায় নূন দিয়ে বধ কর্‌তেন। শহরে সবই সম্ভবে!

পিতামাতাকে গালি দেওয়ায় নলিনীও উত্তেজিতা হইয়া উঠিলেন; তিনি বলিলেন,—"যার যেমন বুদ্ধি, সে সেইরূপই বুঝে; স্বামীকে সন্তুষ্ট করা, স্বামীর অনুগত থাকা—সেত মন্দকাজ হ'বেই! কিন্তু ভাল কাজ হ'তেছে। স্বামীকে অসন্তুষ্ট ক'রে অপরের তুষ্টি সম্পাদন করা! আর ভাল কাজ হ'তেছে, বেহায়াপনার ঘোমটা মুখে দিয়া পাড়া-

প্রতিবেশীর বাড়ী বাড়ী ঘুরে স্বামীর সহিত পিতামাতার কুল উজ্জ্বল করা! আর সব চেয়ে ভাল কাজ হচ্ছে, স্বামীর মনে অশান্তির আগুন জ্বালায়ে—তাহার অভিশাপের বোঝা মাথায় লয়ে পিতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে জ্বালাতন করা!! এমন গ্রাম্য রুচির বালাই লয়ে মর্‌তে ইচ্ছা হয় না কি?

নিজের উপর তীব্র আঘাত লাগায় কমলা জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি শত সহস্র অযথা অপবাদের বোঝা চাপাইয়া নলিনীর চৌদ্দ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করিলেন এবং সেই সঙ্গে নলিনীর অভিমান ও গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাঁহার সম্ভ্রম চূর্ণ করিবার জন্য কমলা কঠোর প্রতিজ্ঞা করিলেন। নলিনী অকারণে তিরস্কৃত হইয়া গৃহে গিয়া দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রোধ উপশম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নলিনী কমলার নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কমলার চিত্ত বিচলিত হইল না। ক্রমে সতীশ ও নলিনীর সহিত কমলার অসদ্ভাব কঠোর রূপে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল।

উত্তেজিতা কমলা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আফসারউদ্দিনের নিকট পত্র লিখিলেন। নির্জ্জনে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। আফসারউদ্দিন কমলাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। সমবয়স্কা যুবক-যুবতীর মধ্যে মুহূর্ত্তের দর্শনেই আসক্তি প্রবলতর হইয়া উঠিল। উভয়ের সহিত উভয়ে চিত্ত বিনিময় করিলেন। ভবিষ্যৎ সমাজ-বিপ্লব ও গোলযোগ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কার্য্য-পদ্ধতি ঠিক হইল এবং সেই সঙ্গে কমলা নলিনীর চির-সর্ব্বনাশ-সাধনের এক ভীষণ ষড়যন্ত্র আঁটিলেন। আফসারউদ্দিন অনেক অসম্মতির পর কমলার আগ্রহাতিশয্যে ও প্রলোভনের মোহে সেই ভীষণ কার্য্যে সম্মত হইলেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থে বড় মিঞাকে অবলম্বন ও শচীন্দ্র দত্তকে বাহুস্বরূপ গ্রহণ করিবার যুক্তি স্থির হইল। সতীশ ও নলিনীর ভাগ্যাকাশের সুখচন্দ্রমা আচ্ছাদনার্থে কমলার ষড়যন্ত্ররূপ এক দারুণ তমসা সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—0::*::0—

ভীষণ বিপ্লব।

মধুর মগরব* ; গোধূলির স্বর্ণ-রাগরঞ্জিত গগন-বিচুম্বী দিগন্ত-কোলে ম্লানরবি ডুবিয়া গিয়াছে। ধূসরবরণা সন্ধ্যাসুন্দরী ধীরে ধীরে আপনার কৃষ্ণাভ অঞ্চলখানি শান্ত অবনীর অঙ্গে ছড়াইয়া দিতেছে—অনভ্যাস্থা অল্পবয়সী জননী যেমন কলহাস্যমুখরিত ক্রীড়াশ্রান্ত নিদ্রালস শিশুকে কোলে করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করেন। ক্রমে বঙ্গপল্লীর একপ্রান্তে সন্ধ্যার মধুর আরতি বাজিয়া উঠিল এবং অপরপ্রান্তে সান্ধ্য নামাজের সুমধুর আজান-ধ্বনি বায়ুভরে দিগ্‌দিগন্তে ভাসিয়া ভাসিয়া সংসারাসক্ত কর্ম্মক্লান্ত নরনারীর মনে ঈশ-প্রেরণা জাগাইয়া দিল। গৃহে গৃহে প্রদীপ জ্বলিল ; আকাশের প্রান্তে প্রান্তে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ফুটিল ;—মূষলধারা তীব্রবর্ষী বৃষ্টি-সম্পাতে প্রশান্ত সরসীবক্ষে জল-বুদ্‌বুদ্ যেমন ফুটিয়া উঠে! দেখিতে দেখিতে পল্লী-সুন্দরী স্বর্ণ-বিখচিত নিলাম্বরী-বিভূষিতা বাসরগামিনী নব-যুবতীর ন্যায় মোহিনীসাজে সজ্জিতা হইয়া মধুর শোভায় দিক্ আমোদিত করিয়া তুলিল। ক্রমে সন্ধ্যার শান্তিরাজ্যে রজনীর গভীরতা আধিপত্য বিস্তার লাভ করিল।

মগরেবের নামাজ অন্তে বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিনের বহির্ব্বাটীতে খোন্দকার আফসারউদ্দিন, মাসুদ, তুফানুল্লা ও শচীন্দ্র দত্ত প্রভৃতি পনর যোল জন লোক একত্রিত হইয়া কোন গুরুতর বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ও পরামর্শ করিল ; প্রায় দুই ঘণ্টা বাদানুবাদের পর বড় মিঞা সাহেব সম্মতি দিলে তাহারা চলিয়া গেল। আজিজা বাড়ীর মধ্য হইতে এই গোল-

* মগরব—সন্ধ্যা।

যোগের আভাস পাইলেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন না। সকলে চলিয়া গেলে আজিজার বৈমাত্র ভ্রাতা মতিয়র রহমান বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র আজিজা তাহাকে ডাকিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। মতিয়র রহমান আজিজাকে স্বীয় মাতা হইতেও সম্মান ও ভক্তি করিতেন এবং আজিজাও তাহাকে সহোদর ভ্রাতা হইতেও অধিক ভালবাসিতেন ও স্নেহ করিতেন। সুতরাং মতিয়র রহমান প্রথমে আজিজার নিকট বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু আজিজার আগ্রহাতিশয্যে শেষে বাধ্য হইয়া বলিল,—"বুবুজান্, বড় বিষম কথা! আপনি শুন্‌লে মনে কষ্ট পাবেন বলেই আমি বল্‌তে চাই নাই। আজ আমাদের পাড়ার লোকেরা সতীশ বাবুর বোন ও তাঁর স্ত্রীকে ধরে আন্‌বে। ইহারা সেই পরামর্শ কর্‌তে এসেছিল।"

আজিজা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে মতিয়র রহমানের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মতি! একি সত্য কথা? বাবাজান কি এই সর্ব্বনেশে অধর্ম্মের কথায় সায় দিলেন?"

মতি। তিনি প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন; কিন্তু সকলে অনেক-রূপ বুঝানের পর শেষে স্বীকার করেছেন।

আজিজা। সকলে কি বুঝাইল, আর তাহাদিগকে এনেই বা কি করা হবে?

মতি। সকলে বুঝাইল যে, মিঞা বাড়ীর ভাইজানদের সাতে যে সকল মামলা মোকদ্দমা আছে, তাতে সতীশ বাবুই আগাগোড়া সাহায্য করে আসছেন। গত বারে তাঁরা যে ডিক্রির টাকা দিয়েছিলেন, সতীশ বাবু ও তাঁর স্ত্রীই নাকি ভাইজানকে সে টাকা দেন। তারপরে এখনও তারা টাকা-পয়সা দিয়া সাহায্য কর্‌ছে। তাই সকলে বল্‌ল যে, এদিকে আবুল ফজল বি-এ, পাস করে সকলের প্রধান

হয়েছে ; দুদিন পরেই সে হয় ত হাকিম কি উকিল হয়ে যাবে ; তখন তাদের সাতে কিছুতেই পারা যাবে না। কাজে কাজে এই সুযোগেই তা'দিগকে জব্দ করা দরকার। সতীশ বাবুর বোন্ বিধবা ; সে এদের পক্ষে আছে। আফসার খোন্দকার তাকে মোসলমান করে বিয়া কর্‌বে। সতীশ বাবুর স্ত্রীকে কি কর্‌বে, তা এখনও ঠিক হয় নাই। তাদের উভয়কেই এনে আজ আমাদের বাড়ীতে রাখ্‌বে।

কথাগুলি শুনিয়া আজিজার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি পিতার শোচনীয় অধঃপতন ও নীচ প্রতিহিংসা সাধন-প্রবৃত্তির কথা ভাবিয়া যার-পর নাই মর্ম্মাহত হইলেন। স্বর্গীয় জননীর কথা মনে হওয়ায় তাঁহার হৃদয় আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আজিজা ভাবিলেন, হায় আজ যদি মা বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে কি বাবাজান এমন জঘন্য কার্য্যে মত দিতে পারিতেন ? আবার ভাবিলেন, তিনি নিজে পিতার পায় ধরিয়া এ কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবেন ; কিন্তু পরক্ষণেই আবুল ফজল ইহাতে জড়িত থাকার জন্য তিনি এক অব্যক্ত সঙ্কোচে সঙ্কুচিত হইলেন। তিনি একবার ভাবিলেন, বিমাতা দেলজানকে দিয়া বলাইবেন ; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন যে, এ সমস্ত বিষয়ে পিতার নিকট দেলজানের কথার কোনই মূল্য নাই। অথচ দুইটী নিঃসহায়া রমণীকে এই আকস্মিক বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার স্বভাবকোমল নারীচিত্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি তখনই গোপনে মতিকে পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে সতর্ক করিতে ইচ্ছুক হইলেন ; কিন্তু পিতার কার্য্যের বিরুদ্ধে তরুণবয়স্ক পুত্রকে নিযুক্ত করা তাঁহার সঙ্গত বোধ হইল না। এমন সময়ে মতিয়র রহমান বলিল,—"বুজান ! এ বিপদ্ হ'তে কি তাঁদেরে কোনরূপে রক্ষা করা যায় না ?"

আজিজা গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"রক্ষা খোদার হাতে।"

মতি পুনরায় বলিল,—"সতীশ বাবুর বোন্ ত সব জানেই; কিন্তু তাঁর স্ত্রীর বড় বিপদ্; সে ডরাইয়া না মরে!"

আজিজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, সতীশ বাবু বাড়ী নাই?"

মতি। না; তিনি স্কুলে থাকেন এবং রোজ শনিবারে বাড়ী আসেন। পরশু বাড়ী হ'তে গেছেন কেবল।

আজিজা শুনিয়া আরও বিচলিত হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আবুল ফজলদের নিকট সংবাদ দেওয়া একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাঁহার নামে একখান পত্র লিখিতে বসিলেন। কিন্তু অন্তরের নিভৃত প্রদেশস্থিত এক সঙ্কোচ ও ভাবাবেগ তাঁহার হস্ত অবশ ও অন্তর সঙ্কুচিত করিয়া তুলিল। তিনি সে কাগজখানি ফেলিয়া অন্য একখানিতে আবুল ফজলের মাতার নিকট নিম্নোক্ত পত্রখানি লিখিলেন।

পত্র।

মহামান্য চাচিজান সাহেবা!

চির স্নেহপাত্রী কন্যার শতকোটী ভক্তিপূর্ণ আদাব* গ্রহণ করুন। আজ একান্ত বাধ্য হইয়াই আপনার খেদমতে † এক গুরুতর আরজ ‡ করিতেছি। বোধ হয়, আপনাদের জন্যই আজ সতীশ বাবুর উপর মহাবিপদ্ উপস্থিত হইতেছে। এ পাড়ার দুর্দান্ত লোকেরা অদ্য রাত্রেই তাঁহার স্ত্রী ও ভগ্নীকে হরণ করিয়া আনিবার পরামর্শ করিয়াছে। ইস্লাম-ধর্ম্মের নির্দ্দেশানুযায়ী প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য § স্মরণ করিয়া

---

* আদাব—সম্মান, নমস্কার। † খেদ্মত শব্দের অর্থ সেবা; কিন্তু মর্ম্মার্থে সন্নিকটে বা সকাশে বুঝিতে হইবে। ‡ আরজ—আবেদন, নিবেদন।

§ পবিত্র ইস্লামের ধর্ম্মবিধান-অনুযায়ী বিধর্ম্মী প্রতিবেশীর প্রতি মোসলমানের যে সমস্ত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে, তন্মধ্যে তাহাদের অনিষ্ট না করা এবং বিপদ্-আপদে সাধ্যপক্ষে তাহাদিগকে সাহায্য ও রক্ষা করা অন্যতম।—কোরান।

এ কথা আপনাদিগকে জানান আবশ্যক বোধ করিলাম। আশা করি, আপনারাও খোদার ওয়াস্তে * স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিবেন। মহামান্য চাচাজান, ভাইজান ও ভগিনীদিগকে আমার শত শত আদাব ও দোয়া নিবেদন করিবেন।

এই পত্র বিশেষ গোপনীয়। যাহাতে কাহারও উপর কোনরূপ বিপদ্ না ঘটে, সে বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

আপনার চির স্নেহের
আজিজা।

আজিজা পত্র লিখিয়া খামে বন্ধ করিলেন এবং সেই দিন তাঁহাদের বাড়ীতে নিকটবর্ত্তী গ্রামের জনৈক বিধবা ভিক্ষুক নারী রাত্রিবাসের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাকে নগদ দুইটী টাকা দিয়া মিঞা-বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। বিধবা বুড়ী অপ্রত্যাশিত ভাবে দুইটী টাকা পাইয়া আনন্দের সহিত আজিজাকে দোয়া করিতে করিতে মিঞাবাড়ী রওয়ানা হইল এবং অল্পক্ষণ পরেই মিঞাবাড়ী উপস্থিত হইয়া গোপন ভাবে চিঠিখান আবুল ফজলের মাতাকে প্রদান করিল।

আবুল ফজলের মাতা যখন চিঠি পাইলেন, তখন আফতাব-উদ্দিন মিঞা আহার করিতেছিলেন এবং আবুল ফজল অন্য গৃহে পুস্তক দেখিতে-ছিলেন। এমন সময়ে বিবি সাহেবা বড়মিঞার হাতে পত্রখানি দিলে তিনি আবুল ফজলকে ডাকিলেন। আবুল ফজল পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে পত্র পড়িতে বলিলেন। আবুল ফজল ক্ষিপ্রহস্তে পত্র খুলিয়া নীচে আজিজার সাক্ষর দেখিতেই তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী এক অব্যক্ত বৈদ্যুতিক স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল—চিত্তে এক বিষম বেসুর বাজিয়া উঠিল। কিন্তু পত্র পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হৃদয়ভাব

(*) ওয়াস্তে—উদ্দেশ্যে।

পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আফতাব-উদ্দিন মিঞারও মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি সামান্য কিছু আহার করিয়াই উঠিয়া বসিলেন এবং আবুল ফজলকে অতি শীঘ্র এব্রাহিমকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। আবুল ফজল চলিয়া গেলে তিনি বিবি সাহেবাকে বলিলেন,—"যেমন মা, তেমনি মেয়ে; কিন্তু বড় মিঞার খামখেয়ালিতে মেয়েটী সুখী হ'তে পারে নাই।"

বিবি সাহেবা। পিতার সহিত মেয়ের বেহেস্ত-দোজখের * পার্থক্য! আচ্ছা বড়মিঞা সাহেবের এমন মতিচ্ছন্ন হইল কেন?

আফতাব মিঞা। তাঁর মতিগতি আজিজার মার সাতে সবই কবরে গেছে; নইলে পাড়া-প্রতিবেশীকে বৃথা এরূপে জ্বালাতন ক'রে মারে!

বিবি সাহেবা। এতে তাঁর সুখ কি?

আফতাব মিঞা। সুখের মধ্যে নিজে জ্বলে-পুড়ে মরা; আর অপরকে জ্বালায়ে দগ্ধ করা!

এমন সময়ে আবুল ফজল এব্রাহিমকে লইয়া উপস্থিত হইলে আফতাব-মিঞা তাহাকে নিজের ঘোড়াটী দিয়া তৎক্ষণাৎ সতীশের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—"এখন রাত এক প্রহর; এই ঘোড়ায় দেড় বা পৌণে দুই প্রহরের মধ্যে সতীশের বাড়ী পৌঁছান চাই। তুমি সেখানে থাকিয়া সকালে আস্‌বে।"

এব্রাহিম রওয়ানা হইলে আফতাব-উদ্দিন মিঞা আবুল ফজলকে বলিলেন,—"তুমি রায়বাড়ী যাও; আমি দুই চার জন লোক লয়ে আস্‌ছি।" পিতার আদেশে আবুল ফজল তখনি রওয়ানা হইলেন।

আবুল ফজল সতীশদের বাড়ী প্রবেশ করিবেন, এমন সময়ে শচীন্দ্র সেই বাড়ীর সদর দ্বারের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া যেন আবুল ফজলকে দেখিয়াই বলিল,—"সতীশ বাবু বাড়ী নাই।"

---

* বেহেস্ত-দোজখ—স্বর্গ-নরক।

"তা জানি"—বলিয়া আবুল ফজল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর মধ্যে তখন উভয় গৃহেই প্রদীপ জ্বলিতেছিল। কমলা গৃহের মধ্যে বসিয়া আকাশ-পাতাল কল্পনা করিতেছিলেন। তাঁহার চোখে মুখে অশান্তি, ভীতি ও চাঞ্চল্যের তীব্র জ্বালাময়ী ছায়া একত্রে প্রতিফলিত ও বিলীন হইতেছিল। অন্য গৃহে প্রভাত-নলিনী আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক ঝির সহিত নানা কথা বলিয়া নিদ্রার অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহসা আবুল ফজল অপ্রত্যাশিত ভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কথা বলায় সকলেই একটু চমকিত ও বিস্মিত হইলেন। কমলা ব্যস্ততার সহিত বারান্দায় আসিয়া চঞ্চলকণ্ঠেই আবুল ফজলকে বলিলেন, "দাদা বাড়ী নাই; আপনাদের এরূপ যখন তখন আসা—"

আবুল ফজল কমলার মুখের কথা মুখে থাকিতেই স্বীয় উজ্জ্বল চক্ষের দৃষ্টি তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"কেন কমলা! আমার দ্বারা কি তোমার কোন রূপ সন্দেহ হয়?"

লজ্জা, সঙ্কোচ ও পূর্ব্ব ঘটনার স্মৃতিতে কমলার মুখখানি নীচু হইয়া পড়িল। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া রোষ-ভরে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

আবুল ফজল সতীশের গৃহের বারান্দায় উঠিলেন। ঝি তাড়াতাড়ি বসিবার জন্য গৃহেরমধ্য হইতে একটী বাঁশের মোড়া প্রদান করিল। আবুল ফজল উপবিষ্ট হইলে গৃহমধ্য হইতে নলিনী মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত রাত্রে কি মনে করে?"

আবুল ফজল। কেন, আপনারও কোন সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

নলিনী। সন্দেহ হয় বৈ কি; ব্যাপার কি খুলেই বলুন না।

আবুল ফজল গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন,—"ব্যাপার গুরুতর!" বলিয়াই তিনি মৃদুস্বরে সংক্ষেপে নলিনীকে ঘটনাটী বুঝাইয়া দিলেন। শ্রবণ

মাত্র নলিনীর মুখখানি আতঙ্কে শুকাইয়া গেল। তিনি দুই তিন দিন হইতেই কমলার বিষম ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন ; গত পূর্ব্ব দিনও দুই তিনটী অপরিচিত যুবকের সহিত কমলাকে কি পরামর্শ করিতে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং নলিনী ভয়বিহ্বল ভাবে বলিলেন, "এখন উপায় কি ?"

আবুল ফজল তাঁহাকে ভরসা দিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই ; উপায় ঈশ্বরের হাতে। সতীশ বাবুকে আনার জন্য লোক পাঠান হয়েছে।"

নলিনী। যদি তাঁর আস্‌তে দেরী হয় ?

আবুল ফজল। তিনি যতক্ষণ না আস্‌ছেন, ততক্ষণ আমরাই এখানে থাক্‌ব। বাবাজানও কয়েকটী লোক লয়ে আস্‌ছেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ; আমাদের জীবন থাক্‌তে কেহ আপনাদিগের ছায়াও স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

নলিনীর সহিত কথা শেষ করিতে না করিতেই শচীন্দ্র এবং হিন্দু পাড়ার আরও দুই তিনটী যুবক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আবুল ফজলের উপর তীব্র কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া বলিল,—"আপনারা ভদ্রলোক ; লেখাপড়া শিখেছেন ; কিন্তু এই কি তার ফল ? পুরুষমানুষ কেউ বাড়ীতে নাই ; এ অবস্থায় সন্ধ্যায়, রাতে—সময়ে, অসময়ে ভদ্রলোকের পরিবারে যাতায়াত করা কি উচিত ?"

আবুল ফজল সহজ ভাবে বলিলেন,—"উচিত কি অনুচিত তা আমিও একটু বুঝি। যদি এর কোনরূপ কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক হয়, তবে যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাতায়াত করি, তাকেই দিব ; কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্য কি ?"

শচীন্দ্র। যাঁর বাড়ী তার জাত, ধর্ম্ম, সমাজ ও সম্ভ্রম সম্বন্ধে কোন বোধ না থাকলেও পাড়ার লোকেত বোধশূন্য হ'তে পারে না। আমরা

এসব ভাল বুঝি না, তাই নিষেধ কর্‌তে আসাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আবুল ফজল। বেশ, ভবিষ্যতে আপনাদের উদ্দেশ্য যাতে ব্যর্থ না হয়, তাই করা যাবে।

অন্য যুবক বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল,—"আর আজকার মত খানিকটা মনের সাধ মিটায়ে লওয়া যাক্‌!"

আবুল ফজল রুষ্ট ভাবে বলিলেন,—"দেখুন আপনারা না ভদ্র লোক বলে দাবী করেন? সঙ্কীর্ণচেতা ছোট লোকের ন্যায় এরূপ অসভ্যতা আপনাদের পক্ষে শোভা পায় কি?"

শচীন্দ্র। থাক সাহেব; ও সব ইংরেজী সভ্যতা পাড়াগায়ে চল্‌বে না। এখন ভাল চাও ত মানে মানে সরে পড়।

আবুল ফজল। তোমার হুকুমে?

শচীন্দ্র। অবশ্যই।

আবুল ফজল। যদি তোমার হুকুমটা না মানি?

শচীন্দ্র। যাতে মান তাই কর্‌ব।

আবুল ফজল। বেশ, চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পার।

"সুরে দা আয়ত, বেটার তেড়ামী ভেঙ্গে দেই"—বলিয়াই শচীন্দ্র বারান্দায় উঠিবার চেষ্টা করিল। আবুল ফজল তদ্দর্শনে দণ্ডায়মান হইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"খবরদার! বারান্দায় পা বাড়াইলে ভাল হইবে না!" কিন্তু শচীন্দ্র তাহা না শুনিয়া বারান্দায় উঠিয়া আবুল ফজলের দিকে অগ্রসর হইলে আবুল ফজল ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার গলা ধরিয়া ধাক্কা দিলেন। ধাক্কার চোট্‌ সামলাইতে না পারিয়া শচীন্দ্র বারান্দা হইতে মুখ থুবড়িয়া নীচে পড়িয়া গেল; তাহার নাকে মুখে আঘাত লাগায় নাক দিয়া অবিশ্রান্ত রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আবুল ফজল বারান্দা হইতে নামিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন,—এমন সময়ে সুরেশ

আবুল ফজলকে প্রহার করিবার জন্য লাঠি উত্তোলন করিল। আবুল ফজল ক্রতহস্তে লাঠি কাড়িয়া লইয়া সুরেশের মুখে ভীষণ মুষ্টি প্রহার করিলেন। সুরেশ শরাহত কপোতের ন্যায় ঘুরিয়া ভূমে পড়িয়া গেল। তৃতীয় যুবক দৌড়িয়া বাহিরে গিয়া সজোরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই মাসুদ, আফসার খোন্দকার, রোস্তম খাঁ ও তুফাগুল্লা সরদার প্রভৃতি তিন চারিজন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আবুল ফজল তাহাদিগকে দেখিয়া একটু আতঙ্কিত ভাবে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিবামাত্র মাসুদ অশ্রাব্য গালাগালির সহিত এক খণ্ড বংশের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিল। আঘাত বক্ষের পরিবর্ত্তে বাম বাহুতে লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া গেল; আবুল ফজল যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বাহুর দিকে চাহিবামাত্র মাসুদ তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার বংশ উত্তোলন করিল। আবুল ফজল আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ততার সহিত সুরেশের নিকট হইতে অপহৃত লাঠি দ্বারা তাঁহার গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া মাসুদের উপর ভীষণ আঘাত করিলেন। মাসুদও ক্ষিপ্রতার সহিত হাতের বাঁশের আড় ধরিয়া সেই আঘাত ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিল। ভীষণ প্রহারে বংশখণ্ড ভাঙ্গিয়া বাঁকা হইয়া পড়িল এবং সেই আঘাত মাসুদের বংশবেষ্টিত আঙ্গুলের উপর পতিত হওয়ায় তাহার দুইটী অঙ্গুলি ছেঁচিয়া উহার হাড় চূর্ণ হইয়া গেল। মাসুদ হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িল এবং আবুল ফজল চকিতে বারান্দায় উঠিয়া পড়িলেন। নলিনীর ঝি তাঁহাকে টানিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া দ্বারের কপাট রুদ্ধ করিয়া দিল। মাসুদের সঙ্গের লোকেরা আবুল ফজলকে আক্রমণ করার সময়ও পাইল না। তাহারা আক্রোশে গৃহ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কমলা ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া আবুল ফজলের মুণ্ড কাটিতে ও নলিনীকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন।

এবং ইহাতে যত টাকা লাগে, তাহা তিনিই দিবেন ;—কমলা এ কথা বলিতেও ভুলিলেন না।

আবুল ফজল গৃহে গিয়া দেখিলেন, প্রভাত-নলিনী গৃহের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া আতঙ্কে বাত্যাহত লতিকার ন্যায় থর থর করিয়া কম্পিত হইতেছে। তিনি ঘরের বেড়া হইতে সতীশদের বলির খড়্গ হাতে লইয়া নলিনীকে সাহস দিয়া বলিলেন,—"আপনি একটুও ভয় কর্‌বেন না; যে পাপাত্মা ঘরের কাছে আস্‌বে, এই খড়্গে নিশ্চয় তার মাথা কাট্‌ব।"

আবুল ফজলের সদর্প উক্তি শ্রবণে সকলেই একটু ভীত হইয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আফতাব-উদ্দিন মিঞা দশ পনর জন লোক লইয়া রায়বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার সাড়া পাইয়া সকলেই সরিয়া পড়িল। কমলা নিজের টাকা, পয়সা, অলঙ্কার ও দলিলাদি সমস্তই আফসার খোন্দকারের হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। অন্যান্য জিনিস হাতের মাথায় যে যাহা পাইল, লুটিয়া লইয়া গেল।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই আবুল ফজল বাহির হইয়া পিতার নিকট সকল কথা বলিলেন। আফতাব-উদ্দিন মিঞা বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন। সকলেই আফসোস* করিতে লাগিল। ক্রমে হিন্দুপাড়ার অন্যান্য লোকেরা উপস্থিত হইল। তাঁহারা সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কেহ শচীন্দ্রকে তখনই ধরিয়া আনিয়া শাস্তি দিবার জন্য অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ তখনই থানায় সংবাদ দিবার মতলব জ্ঞাপন করিল; কিন্তু ফলে অগ্রগামী হইয়া কেহই কিছু করিল না। ইহার ঘণ্টা দুই পরে প্রায় রাত্রি আড়াই প্রহরের সময়ে সতীশ উন্মত্তবৎ বাড়ী উপস্থিত হইলেন। তিনি

* আফসোস—পরিতাপ।

"কে আমার সর্ব্বনাশ করিল"—বলিয়া আফতাব-উদ্দিন মিঞার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন। প্রভাত-নলিনী ও ঝি এই আকস্মিক বিপদে সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। আফতাব-উদ্দিন মিঞা সকলকে সান্ত্বনা করিয়া শেষরাত্রে বাড়ী ফিরিলেন। পরামর্শ করিয়া সকালে যাহা হয় করা যাইবে, ইহাই ঠিক হইল। সতীশ আবুল ফজলকে থাকিতে বলিলেন; কিন্তু হাতের যন্ত্রণায় অস্থিরতা হেতু—'সকালে আসিব' বলিয়া আবুল ফজলও বাড়ী চলিয়া গেলেন।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা ও আবুল ফজল চলিয়া গেলেও সতীশ গৃহে প্রবেশ করিলেন না। অপমানে, ক্ষোভে, দুঃখে প্রাণসমা পত্নীর সম্মুখে যাইতেও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। হায়! আজ তিনি কেমন করিয়া নলিনীকে মুখ দেখাইবেন? নলিনীও লজ্জা, সঙ্কোচ ও ভীতিজনিত মর্ম্মন্তুদ বেদনায় সতীশের সম্মুখে আসিলেন না। যেন এক আকস্মিক অভিশম্পাতে তাঁহাদের সুখের মন্দির দগ্ধ হইয়া গিয়াছে!

ক্রমে সতীশের স্বজাতীয় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুগণ উপস্থিত হইলেন; তাঁহারা এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। সতীশও তাঁহাদের উত্তেজনায় সর্ব্বস্ব পণ করিয়া প্রতিহিংসা ব্রত অবলম্বন করিলেন। সেই রাত্রেই চণ্ডালজাতীয় লাঠিয়াল ও সর্দ্দার আনিবার জন্য লোক পাঠান হইল। এতদ্ভিন্ন যে যাহার প্রজা, খাতক ও অনুগত লোক জোগাড়ের ভার লইলেন।

রাত্রি থাকিতে থাকিতেই সতীশ বড়মিঞা গিয়াসুদ্দিনের নিকট লোক পাঠাইয়া কমলাকে তাঁহার সঙ্গের জিনিস-পত্র সহ প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। নচেৎ বিষম গোলযোগ হইবে, এ আভাসও দেওয়া হইল। বড় মিঞা অবহেলার সহিত "আচ্ছা

দেখা যাইবে”—এইরূপ অসংলগ্ন উত্তর দিলেন ; সুতরাং বিবাদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। সকালে আবুল ফজল বাহুর বেদনায় জ্বরাক্রান্ত হইয়া সতীশদের বাড়ী যাইতে পারিলেন না ; কিন্তু আফতাব-উদ্দিন মিঞা যাইয়া সমস্ত জানিয়া চিন্তিত হইলেন এবং সতীশকে বুঝাইয়া নরম করিয়া কমলাকে সমর্পণ করিবার জন্য বড় মিঞার নিকট আবার অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। বড় মিঞা গ্রাহ্য করিলেন না। ক্রমে সতীশদের লোক জন জুটিতে লাগিল। বেলা এক প্রহরের সময়ে একশত লাঠিয়াল ও প্রায় দুইশত বাজে লোক সমবেত হইল। তখন সতীশ বড় মিঞাকে স্পষ্ট বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি বড় মিঞা এই মুহূর্ত্তে কমলাকে সমর্পণ না করেন, তবে কমলাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া ত লওয়া হইবেই, অধিকন্তু উপযুক্ত প্রতিফল দিতেও ক্রটী করা হইবে না। বড় মিঞা বালক সতীশের দম্ভের কথা শুনিয়া জ্বলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রসুপ্ত দানবীয় স্বভাব জাগরিত হইল ; শরীরের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। তিনি সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—“কে আছিসরে, তারিণী রায়ের বেটার বৌটাকে এখনি ধরে আন্।”

বড় মিঞা গিয়াসউদ্দিনের সরোষগর্জ্জনে আলিনগর তোলপাড় হইয়া উঠিল ;—পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ কাঁপিয়া উঠিল। চারিদিক্ হইতে লোক জুটিয়া বড় মিঞার বাড়ী একত্রিত হইতে লাগিল।

আবুল ফজলের প্রচণ্ড আঘাতে মামুদের একখানা হাত সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তথাপি প্রতিশোধস্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া সে একহাতে শূকরমারা বর্ষা লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল।

তুফানউল্লা সরদার ধানের জমি নিড়াইতেছিল। বড় মিঞার ডাকে সে সেইখান হইতেই কোমর বাঁধিয়া বাড়ী উপস্থিত হইল এবং লাঠি লইয়া তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইল। তাহার স্ত্রী ধান ভানিতেছিল ;

সে স্বামীর উদ্দেশ্য বুঝিয়া তখনই ধানভানা ত্যাগ করিল এবং ছুটিয়া গিয়া তুফানউল্লার লাঠি ধরিয়া বলিল,—"তোমার আল্লার কিরে* ; আর তুমি কেউর মাথায় বাড়ি দিতে যাইও না ; কিছু ভালমন্দ হইলে আমার নাবালক তুইডার কোনই উপায় নাই।" তুফান তাহার আবদার দেখিয়া মহা বিরক্ত হইল, এবং "থাম্ মাগি"—বলিয়া এক ধাক্কায় তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া সবেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। তুফান-পত্নী মাথায় বিষম আঘাত পাইয়া স্বামীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "আল্লায় যেন ওর গুওরের জোর থাকৃতি আর ফিরাইয়া না আনে!"

নাজেম শেখ মাঠে যাইবার জন্য নাস্তা খাইতে বসিয়াছিল। বড় মিঞার আহ্বানে সে নাস্তা থুইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তাহার মা বলিলেন, "বাবা! সাম্নের ভাত থুইয়া কোঁথাও যাইতে নাই ; আর তোর খোদার কসম †,—আমার মাথা খাস, যদি তুই আর পরের ছেলের মাথায় বাড়ি দিস্।" নাজেম মাতৃস্নেহের প্রতিদানস্বরূপ থালা উপুড় করিয়া ভাতগুলি ফেলিয়া দিয়া সবেগে লাঠি লইয়া গমন করিল। তাহার মাতা ছড়ান ভাতগুলি তুলিতে তুলিতে বলিলেন,—"খোদা তোর কেস্মত ‡ তুলে নিছে, আমি কি কর্‌ব!"

রোস্তম খাঁ 'গোসল' § করিবার জন্য ঘাটে যাইতেছিল ; বড় মিঞার ডাকে সে পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া লাঠি তালাস করিতে লাগিল। তাহার বোন্ তাড়াতাড়ি গোপনে লাঠিখানা লইয়া আদাড়ে ফেলিয়া দিল। ভ্রাতা লাঠি না পাইয়া বোনকে স্ত্রীর প্রতিও অব্যবহার্য্য ভাষায় গালাগালি দিয়া মাছমারা কোচ ¶ লইয়া যাত্রা করিল। অশ্লীল ভাষায়

---

* কিরে—শপথ। † কসম—শপথ। ‡ কেসমত—ভাগ্য।

§ গোসল—স্নান।

¶ কোচ—বাঁশনির্ম্মিত একরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র।

তিরস্কৃতা বোন্ মনে মনে বলিল,—"খোদায় যেন তোর মুখের শাস্তি দেয়।"

কেহ গরু বাঁধিতে যাইতেছিল, সে গরু আল্গা দিয়াই যাত্রা করিল; কেহ অন্য কাজের জন্য বাঁশ কাটিতে গিয়াছিল, সে সেই কাঁচা বাঁশ লইয়াই ধাবিত হইল; কেহ মাছ মারিবার যোগাড় করিতেছিল, সে সে কথা ভুলিয়া তখনই ছুটিল। এইরূপে অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রায় পাড়ার সমস্ত লোক একত্রিত হইল। যথাবিধি লাঠি, শোটা যোগাড় হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই তাহারা ভীষণ শব্দে মাটি কাঁপাইয়া রায়পাড়ার দিকে ধাবিত হইল। রায়পাড়ার লোকেরাও প্রস্তুত ছিল; সতীশ অনেকের নিষেধ ও পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া উত্তেজনাবশে গৃহস্থপাড়া আক্রমণের আদেশ দিলেন। আদেশ পাওয়া মাত্র সর্দ্দারের দল ঢাল, সড়কি ও লাঠিতে সজ্জিত হইয়া সুশৃঙ্খল রেখাকারে অগ্রসর হইতে লাগিল। সর্দ্দার ও লাঠিয়ালের দল দেখিয়া বড় মিঞার লোকেরা একটু ভীত হইল; সুতরাং তাহারা আর অধিক অগ্রসর না হইয়া একখণ্ড চাষকরা জমি সম্মুখে করিয়া দণ্ডায়মান হইল; উদ্দেশ্যে নিকটবর্ত্তী হইলে ঢিল ছুড়িয়া মারিবে। সর্দ্দারের দল তাহা বুঝিয়াই যেন অপেক্ষাকৃত দূরে ব্যূহবিন্যাস করিল এবং কয়েকখণ্ড "গুলুল বাঁশ" * হইতে বড় মিঞার লোকদিগের উপর অজস্র মাটির গুলি চালাইতে লাগিল। চোখে মুখে গুলি লাগায় অস্থির হইয়া গৃহস্থপাড়ার লোকেরা পশ্চাৎপদ হইল। পশ্চাৎপদ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সতীশের সর্দ্দারেরা অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে সড়কি ও লাঠি দ্বারা বিদ্ধ ও প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা ক্রমেই পিছাইয়া চলিল; এমন কি অনেকে দৌড়িয়া পলাইবার উপক্রম করিল। এমন

---

* গুলুল বাঁশ—একরূপ ধনুক; ইহাদ্বারা তীরের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকানির্ম্মিত গুলি ছোড়া হয়।

সময়ে পশ্চাৎ হইতে রোস্তম, তুফানুল্লা, নাজেম প্রভৃতি দুর্বৃত্তের দল, পল্লী হইতে কয়েক ছালা ছাই যোগাড় করিয়া আনিল এবং একটু কায়দার * সহিত ঘুরিয়া গিয়া অনুকূল বায়ুর সাহায্যে সতীশের সর্দ্দার দলের উপর রাশি রাশি ছাই উড়াইয়া দিতে লাগিল। তীব্র বাতাসে নিক্ষিপ্ত ছাই আসিয়া চোখ মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় সর্দ্দারের দল অন্ধের মত হইয়া পড়িল। তাহারা ঢাল সড়কি ফেলিয়া হস্তদ্বারা চোখ মুখ বন্ধ করিতে লাগিল এবং সেই সুযোগে তুফানুল্লা, রোস্তম খাঁ প্রভৃতি বড় মিঞার দুর্দ্ধর্ষ লাঠিয়ালগণ বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হইয়া সর্দ্দারদিগকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিল। সর্দ্দারদল অস্থির হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে দৌড় দিল। বাজে লোকেরা যে যে দিকে পারিল পলাইতে লাগিল। তুফানউল্লার ভীষণ লাঠির আঘাতে বিনয় নামক সতীশের জনৈক প্রতিবেশী ভূতলশায়ী হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। লোকব্যূহ ক্রমশঃ রায়বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল †। সতীশ বাড়ী আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে চৌকিদারের মুখে সংবাদ পাইয়া পুঁটীখোলা হইতে সুসজ্জিত পুলিসের দল আসিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। পুলিস দেখিয়া সকলেই উন্মত্তের মত চারিদিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। পুলিস রঙ্গভূমিতেই কতকগুলি ঢাল, সড়কি অধিকার ও বড় মিঞার পক্ষীয় কয়েকজনকে গেরেফ্‌তার করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রাম ঘোর নিস্তব্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিল।

---

* কায়দা—কৌশল। † দেশী লোকের এইরূপ মারামারি ও রণকৌশল আমরা একাধিকবার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—0-:0:-0—

কমলার পরিণাম।

এত দিনের পরে এইবার আলিনগরের ভাগ্য-গগনে বিপদের মেঘ ভয়ানক ভাবে ঘনীভূত হইয়া উঠিল। শত্রুতা ও বিপ্লবের ভীষণ ঝঞ্ঝায় সমস্ত গ্রাম বিকম্পিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষের লোকেরাই সর্ব্বস্ব পণ করিয়া প্রতিহিংসা সাধনে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষের বহুকালের সঞ্চিত মনের আক্রোশ মিটাইবার যেন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইল।

সতীশের আবাসবাটী লুণ্ঠন ও বিনয়ের হত্যাব্যাপারে দুই নম্বর ফৌজদারী মোকদ্দমা স্থাপিত হইল। বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিন সাহেব উভয় মোকদ্দমারই আদেশদাতা আসামী স্বরূপ অভিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পক্ষীয় লোকদের প্রায় পঞ্চাশ জন মূল মোকদ্দমার আসামী স্বরূপ ধৃত হইল। আলিনগরের গৃহস্থপাড়ায় হাহাকার রব উঠিল। সতীশ আফতাব-উদ্দিন মিঞা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সহায়তায় কয়েক শত টাকা কর্জ্জ করিয়া আসামীদিগকে শাস্তি প্রদানের জন্য বিশেষরূপ তদ্‌বীর* করিতে লাগিলেন। মোকদ্দমা সেশনে সোপর্দ্দ হইল। বড় মিঞা স্বপক্ষীয় আসামীগণের সহিত কয়েক সহস্র টাকার জামিনে মুক্তি পাইলেন। বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া উকিল ও ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন। ফলতঃ মোকদ্দমার সুবিধার জন্য তিনি মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইলেন না।

---

* তদ্‌বীর—চেষ্টা, যোগাড়।

কিন্তু মোকদ্দমার অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া দাঁড়াইল; মোকদ্দমায় খালাস * পাওয়া সম্বন্ধে সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িলেন। ইহার বিশেষ কারণ এই যে বড় মিঞার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত আফতাব-উদ্দিন মিঞা যে সমস্ত মোকদ্দমা পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কৃত্রিমতা বা মিথ্যার সংস্পর্শ আদৌ ছিল না। সুতরাং আধুনিক ধর্ম্মাধিকরণের অত্যাবশ্যক প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রমাণ-প্রণালীর সন্দেহশূন্যতার অভাবে উহার অনেক সত্য মোকদ্দমাও সহজেই ফাঁসিয়া গিয়াছে। আফতাব-উদ্দিন মিঞাকে কূটবুদ্ধি উকিলের কূটজেরায় জড়ীভূত করিয়া মামলা জিতিতে বড় মিঞাকে একটুও বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান মোকদ্দমার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভিন্নমুখী হইয়া দাঁড়াইল। কারণ সতীশ, আবুল ফজল ও আফতাব-উদ্দিন মিঞা এই মোকদ্দমার মূল পরিচালক হইলেও প্রকৃত পক্ষে সতীশের মোকদ্দমাবাজ হিন্দু আত্মীয়বর্গই মোকদ্দমা পরিচালন করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহারা মোকদ্দমাটী দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে উহার যেখানে যেরূপ সাজান দরকার এবং যে ক্ষেত্রে যাহা আবশ্যক, তাহা সম্পাদনে সত্য-মিথ্যার প্রতি একটুও লক্ষ্য করিলেন না। ফলতঃ তাঁহারা বড় মিঞাকে চিরতরে জব্দ করিবার জন্য সত্য মোকদ্দমাটীকে সম্পূর্ণ মিথ্যা উপকরণে সজ্জিত করিলেন। আফতাব-উদ্দিন মিঞা ও আবুল ফজল ইহাতে সম্মতি প্রদান না করিলেও অনেক ভাবিয়া কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না।

যাহা হউক, যখন হিন্দুগণের শিক্ষায় সুশিক্ষিত সাক্ষ্যগণের প্রমাণ গৃহীত হইতে লাগিল; তখন মোকদ্দমার পরিণাম ভাবিয়া সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলেই বুঝিল, এবার বড় মিঞা ও তাঁহার দলের প্রধান আসামীগণের নিস্তার নাই।

* খালাস—মুক্তি।

এদিকে গৃহত্যাগিনী কমলা আফসারের সমভিব্যাহারে বড় মিঞার বাটীতে আশ্রয় লইলেন। আফসার কমলার টাকা-পয়সা ও অলঙ্কারাদি সমস্তই বড় মিঞার নিকট জমা রাখিলেন। ফলাফল কি হয় না হয়, না দেখিয়া কমলাকে কিংবা তাহার জিনিস-পত্র গৃহে লইতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

কমলা প্রথমে উত্তেজনার মুখে বাড়ীর বাহির হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হতভাগিনী চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিলেন; অনুতাপে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। কমলা ভাবিতে লাগিলেন, হায় আমি কি করিলাম; পিতার পবিত্র কুলে চির কালিমা রাখিয়া আসিলাম; ভ্রাতার সর্ব্বনাশ করিয়া দেশের মধ্যে তাঁহার মুখ নীচু করিলাম। সে বাড়ী আসিয়া কি মনে করিবে? অপরাধহীনা নলিনী আমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিল? ভগবান্ না করুন, সে যদি এই ঘটনায় স্বামী বা সমাজ কর্ত্তৃক বিন্দুমাত্রও বিড়ম্বিত হয়, বুঝি নরকেও আমার স্থান হইবে না। কমল এইরূপ চিন্তায় সারারাত্রি জর্জ্জরিত হইলেন; শান্তিদায়িনী নিদ্রা অভিশপ্তা কমলার চক্ষু ভ্রমেও স্পর্শ করিল না।

পরদিন সকালে যখন সতীশ কমলাকে প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তখন কমলার ইচ্ছা হইল, তিনি নিজেই ছুটিয়া গিয়া ভ্রাতার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ করেন। কিন্তু রমণী আবার ভাবিলেন, আমি কোন্ মুখে ভ্রাতার সম্মুখে যাইব?—আর আমি কি স্বাধীন? অনন্তর যখন উভয় পক্ষীয় উত্তেজিত লোক সকলের ভীষণ চীৎকার ও তর্জ্জন-গর্জ্জনে পল্লীসমূহ তোলপাড় করিয়া তুলিল, যখন রমণী, বালক ও আহতদিগের আর্ত্তনাদে গ্রাম হাহাকারে মুখরিত হইয়া উঠিল, যখন পুলিশের প্রবল প্রতাপে, মহামারীর প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় ঘরে

ঘরে বিভীষিকা নৃত্য করিতে লাগিল, তখন অন্তর্দাহিনী চিন্তায় কমলা উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পাপেই এই ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়াছে, একথা কমলার মনে স্পষ্ট ভাবে জাগিয়া উঠিতে লাগিল; পাপের আগুন যেন চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে ঘিরিয়া লইল; বিপন্ন নরনারীর জ্বলন্ত অভিশাপ যেন বিকট মূর্ত্তি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিল! অভাগিনী সমস্ত দিবা-রজনীর মধ্যে মনের যাতনায় জলটুকুও স্পর্শ করিলেন না।

আজিজা ঘৃণায় তাঁহার সহিত প্রথমে কথা কহিলেন না; এমন কি একবার যাইয়া তাঁহাকে চক্ষেও দেখিলেন না। কিন্তু রাত্রে যখন বড় মিঞা বলিলেন,—"আজিজা! সর্ব্বনাশ যতদূর হবার তা ত হয়েছে। শেষ কালে তক্‌দিরে * কি আছে, তা খোদাই জানেন। তুমি পরের মেয়েটার খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে একটু তত্ত্ব লইও।"

পিতার বাক্যে আজিজা দাসীর নিকট কমলার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; দাসী বলিল—"তিনি সারা রাত-দিনের মধ্যে একটু জলও স্পর্শ করেন নাই।" আজিজা শুনিয়া ব্যথিত ভাবে তাঁহার নিকট গমন করিলেন; দেখিলেন, অভাগিনা কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছে; এক দিনের নিদারুণ চিন্তায়ই তাঁহার দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কমলার অবস্থা দেখিয়া আজিজার হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। তিনি সস্নেহে বলিলেন,—"ভগ্নি! এরূপ করে কি প্রাণ বাঁচে; কিছু আহার কর।"

আজিজার স্নেহসম্ভাষণে কমলা ব্যাকুল ভাবে কাঁদিয়া তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,—"দিদি! আপনার অনেক গুণ-গরিমার কথা শুনেছি, এ অভাগিনী কি আপনাকে স্পর্শ কর্‌বার যোগ্য?"

* তক্‌দির—অদৃষ্ট।

আজিজা। ভগিনি! মানুষের পদস্খলন কিছু বেশী কথা নহে; তবে উহা যে মহাপাপ, তাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভবিষ্যৎ পরিণাম না ভেবে চিন্তে কেন এরূপ দুষ্কার্য্যের কল্পনা করেছিলে? ইহাতে যে তোমার পিতৃকুলে কলঙ্ক পড়্‌বে, ভ্রাতা-ভ্রাতৃবধূর মুখ ছোট হ'বে, আত্মীয়-স্বজন মর্ম্মবেদনা ভোগ কর্‌বে, তা কি একটুও মনে পড়ে নাই?

কমলা। দিদি এখন সব কথাই বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু একদিন আগে আমি উন্মত্ত ছিলাম। যাহা ক'রে ফেলেছি, এখন যদি তার কোন প্রতিকার থাকে, তাই বলুন?

আজিজা। প্রভাতেও যদি এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌তে,—বোধ হয় কোন সদুপায় কর্‌তে পার্‌তেম; এখন অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। আচ্ছা তুমি কিছু আহার কর; পাক কর্‌বার বন্দোবস্ত করে দিব কি?

কমলা। দিদি আমি কিছুই খা'ব না; আমার একটুও ক্ষুদা নাই।

"সেকি হয়, না খেয়ে কি মানুষ বাঁচে?"—বলিয়া আজিজা স্বয়ং উঠিয়া গেলেন এবং পিতলের থালায় করিয়া কয়েকটী ফল, মিষ্টান্ন ও দুধ আনিয়া দিলেন। কমলা প্রথমে খাইতে অস্বীকার করিলেও আজিজার অনুরোধে দুধটুকু পান করিলেন। তাঁহার শোক-চিন্তা-কাতর ক্ষুৎ-পিপাসাতুর প্রাণ একটু প্রকৃতিস্থ হইল?

পরদিন প্রভাতে আজিজা কমলাকে পৃথক্ পাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া রন্ধন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কমলা অনেক ভাবিয়া বলিলেন,—"পৃথক্ জঞ্জালের আবশ্যক কি?"

আজিজা ধীর ভাবে বলিলেন,—"কমলা স্থির মনে চিন্তা করে দেখ; ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে যদি তোমাকে পুনরায় আত্মীয়-স্বজনের

সাতে মিশ্‌তে হয়, তবে সমাজের নিকট যাতে তোমাকে লাঞ্ছিত হ'তে হ'বে, এমন কাজ স্বেচ্ছায় কর্‌বে কেন ?”

কমলা। দিদি আপনি বোধ হয়, হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার জানেন না। ওরূপ সঙ্কীর্ণতা ও হিংসা-বিদ্বেষের লীলাভূমি ভূ-ভারতের আর কোথাও নাই। সমাজের গণ্ডির মধ্যে থেকে কেহ শত সহস্র অনাচার-ব্যভিচারে লিপ্ত হোক, তাহার শত খুন মাফ; কিন্তু শত নিরপরাধ হই, তথাপি যে আপনাদের সাতে মিশেছি, এই অপরাধে সমাজে আমার স্থান নাই। আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতির দ্বার এখন আমার পক্ষে চিরতরে রুদ্ধ হয়েছে। সমাজে ফিরে গেলে সহস্র লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ত আছেই, তা ছাড়া আমার মান-সম্ভ্রম, এমন কি জীবন পর্য্যন্তও নিরাপদ নহে।

আজিজা। এগুলি ধর্ম্মবিধান নাও হ'তে পারে; হয় ত উহা সামাজিক সংস্কার মাত্র। সমাজ এখন পূর্ব্বতন কুসংস্কারের বাঁধন ধীরে ধীরে শিথিল কর্‌ছে; সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় ওগুলির ধরা-বাঁধা ভবিষ্যতে হয় ত মোটেই থাক্‌বে না।

কমলা। পল্লীসমাজে উহা দুরাশা! বৌদির কাছে শুনেছি, শহরের শিক্ষিত সমাজে এ গুলি তত মানে না।

আজিজা। তোমার দাদা ত উচ্চশিক্ষিত; তিনি হয় ত ওগুলি না মেনে তোমাকে গ্রহণ কর্‌লেও কর্‌তে পারেন।

কমলা। দিদি, আপনি গ্রামের হিন্দুদের ভিতরের অবস্থা জানেন না। এখানকার হিন্দুরা দায় পড়ে মোসলমানদের সাতে মৌখিক সদ্ভাব রাখে, সাম্‌নে মিষ্ট কথা বলে; কিন্তু চখের আড়াল হ'লেই নাক সিঁট্‌কাইয়া মুখ বাঁকাইয়া মন্দ কথা বলে,—গালি দেয়। দাদা দেবচরিত্র আবুল ফজলের সাতে আন্তরিক ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা মেশা করেন ব'লে

অনেকে অনেক কিছু বলে থাকে ; এমন কি আমিও তাঁকে কত মন্দ বলেছি। বাবা ত এজন্য দাদাকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌তেন না।

আজিজা। তবুও ভবিষ্যৎ ভেবে সামাজিক আচার ব্যবহার মেনে চলাই মানুষের উচিত।

কমলা। তা ঠিক ; কিন্তু আমার অবস্থা আমি বেশ বুঝ্‌তেছি। দাদা স্নেহবশে আমাকে গ্রহণ কর্‌তে পারেন ; বৌদি যেরূপ উদার, তাতে সেও আমার সহিত অসদ্ব্যবহার কর্‌বে না, কিন্তু ইহার ফলে তা'দিগকে সমাজচ্যুত হ'তে হ'বে—অথবা আমাকে কাশী প্রভৃতি স্থানে শত পাপিষ্ঠের করাল কবলে বিসর্জ্জন দিয়ে সম্ভ্রম রক্ষা কর্‌তে হবে। তা ছাড়া গ্রাম্য রিপুগুলির কোপদৃষ্টি ত আমার উপর আছেই। আমি অনেক বিপদে পড়েই এই অসম্ভব ইচ্ছার বশীভূত হয়েছিলেম। এখন আপনারা যদি আশ্রয় না দেন, তবে হয় আমাকে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে পথে পথে বেড়াতে হবে, অথবা—বলিতে বলিতে কমলার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

আজিজা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"ভগ্নি! তুমি কেন, পবিত্র ইস্‌লাম মহাপাপের সর্ব্বনিম্নস্তরে নিপতিত এবং জাতি-বর্ণানুযায়ী সর্ব্বাপেক্ষা অধম ব্যক্তিকেও ধর্ম্মজগতে এবং সমাজ-সংসারে তুল্য আসন ও তুল্য মর্য্যাদা প্রদান করে ; তুমি ত উচ্চবর্ণসম্ভবা ও সুশিক্ষিতা মহিলা। কিন্তু আমি দেশ ও সমাজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেই তোমাকে চিন্তা কর্‌তে বল্‌ছি। কোন কার্য্য ক'রে অনুতপ্ত হওয়া অপেক্ষা পূর্ব্বে ভেবে করাই উত্তম।

কমলা। আমি যথেষ্ট ভেবেছি। অনেক ভেবেই এ কার্য্যে ব্রতী হয়েছিলুম।

আজিজা। ভগ্নি! ইস্‌লামের ধর্ম্মজীবন—বিশেষতঃ রমণী-জীবন বড়ই কঠিন সংযমশৃঙ্খলে আবদ্ধ। ইহাতে আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য অনেক

বাধ্য-বাধকতায় আবদ্ধ এবং বহু সংযম ও ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত হ'তে হয়। অনেক নরনারী মনে করেন যে মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন কর্‌লেই তা'র সাত খুন মাফ, কিন্তু সে বড়ই ভুল। ইস্‌লামের ধর্ম্ম-জীবনের সিদ্ধি সুনিশ্চিত, কিন্তু সাধনা বড়ই কঠিন।

কমলা। দিদি, আপনি কি আমাকে ভয় দিচ্ছেন? আমি শুনেছি দাদার সহিত তর্ক কালে মিঞাবাড়ীর ফজলু দা বলেছেন,—'ইস্‌লামের ন্যায় উদার, সরল, সহজ ও সর্ব্বলোক হিতকর ধর্ম্ম জগতে আর নাই।' সে কথা কি তবে ঠিক নহে?

আজিজা। উহা বর্ণে বর্ণে সত্য! কিন্তু ধর্ম্মকে ধর্ম্মের দিক্ দিয়া দেখ্‌তে হবে। ভোগের বা উচ্ছৃঙ্খলতার দিক্ দিয়া দেখ্‌লে চল্‌বে কেন? যাক, একথা অন্য সময়ে বুঝাইয়া দিব; তুমি খাওয়া দাওয়ার কি বন্দোবস্ত কর্‌বে তাই বল।

কমলা। আপনি যদি আমাকে ঘৃণা না করেন, তবে আমি আপনার হাতেই খেতে প্রস্তুত আছি।

আজিজা। আমরা কাহাকেও ঘৃণা করি না। মানুষকে ঘৃণা করার শিক্ষা আমাদের ধর্ম্মে নাই। কিন্তু অভ্যাসের অভাব হেতু তোমার মনেও ত বৈষম্য বোধ হ'তে পারে? মানুষ অভ্যাসের দাস।

কমলা। অভ্যাস যদি আপনার মত দেবীচরিত্রা স্বাধ্বীর নিকট হ'তেও দূরে রাখ্‌তে চায়, তবে উহা অবশ্যই বর্জ্জনীয়।

আজিজা আর কিছু বলিলেন না। কমলা আজিজার হাতেই আহারাদি করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে কমলা যথাবিধানে 'কলেমা' * পড়িয়া ইস্‌লামি ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইলেন। আজিজার নিকট থাকিয়া কমলার স্বভাব সম্পূর্ণ

* কলেমা—ইস্‌লামের ধর্ম্মবিশ্বাস-সংবলিত মূল-মন্ত্র।

পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহার মনের সঙ্কীর্ণতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও কুসংস্কার প্রভৃতি দূরীভূত হইল; মায়া, মমতা, কোমলতা ও শিষ্টতায় তাঁহার স্বভাব সুশোভিত হইল; তিনি যেন নরকের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে স্বর্গের কুসুমে পরিবর্ত্তিত হইলেন।

এদিকে মোকদ্দমার অবস্থায় বড়মিঞা বিষম চিন্তিত হইলেন; পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহার মন অবসন্ন ও দেহ ক্ষীণ হইতে লাগিল। কমলা কোন প্রকারে হাতছাড়া হইলে বিপদ্ আরও বাড়িতে পারে ভাবিয়া তিনি মোকদ্দমার অগ্রেই কমলার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইলেন। আফসারের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিলে কমলা ভাবিয়া চিন্তিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। নির্দ্ধারিত শুভদিনে উভয়ের বিবাহ হইল। বিবাহের কাবিন রেজিষ্ট্রী কালে কমলার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া নূরন্-নেসা রাখা হইল। আজিজা কমলাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু বিবাহে কাহারও মনে তেমন আনন্দ হইল না; কারণ মোকদ্দমার চিন্তায় সকলেই বিষাদিত; বিশেষতঃ আফসার একজন প্রধান আসামী।

সতীশ প্রথমে কমলাকেও মোকদ্দমার মধ্যে জড়ীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আবুল ফজল ও নলিনীর নিকট তাঁহার প্রকৃত স্বভাব অবগত হইয়া বিজ্ঞলোকদের নিষেধে তাঁহাকে আর মোকদ্দমায় জড়ীভূত করিলেন না। ইহাতে সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——:০:——

বিপ্লবের অবসান।

বড়মিঞা কমলার টাকা পয়সা ও অলঙ্কারাদি সমস্তই তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কমলা প্রথম পতিকে অবহেলা করিয়া যে মনস্তাপ ও অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিকারের জন্যই যেন আফসারকে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভক্তির সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করার জন্য নিজের সমস্ত সম্পত্তি, টাকা-পয়সা, এমন কি গায়ের অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত সতীশকে প্রদান করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য বড়মিঞার দ্বারা অনুরোধ করিলেন। সতীশ সঘৃণায় সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন,—"বড়মিঞাকে আমি তুল্যরূপে প্রতিশোধ দিব; আর আফসারের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া মনের ক্ষোভ মিটা'ব।" বড়মিঞা, আফসার ও কমলা শুনিয়া জ্বলিয়া গেলেন; সতীশকে জব্দ ও বশীভূত করার জন্য বড়মিঞা কমলার পৈত্রিক সম্পত্তি নিজ নামে লিখিয়া লইলেন। কথা থাকিল, সতীশ নিষ্পত্তি করিলে সম্পত্তি তাঁহাকেই প্রদান করা হইবে।

ক্রমে মোকদ্দমার দিন নিকটবর্ত্তী হইল; সমস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। সাক্ষীর জেরার জন্য সহস্র টাকা দৈনিক দিয়া কলিকাতা হইতে জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আনা হইল। সতীশও সাক্ষীদিগকে জেরার শিক্ষা প্রদানের জন্য পাঁচশত টাকা রোজ দিয়া কলিকাতার

জনৈক প্রসিদ্ধ উকিল আনিলেন। সাক্ষী শেষ হইলে সাতদিন পরে জেরার তারিখ পড়িল। বড়মিঞা ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী আসিলেন।

বড়মিঞার আর সে শরীর নাই; চিন্তায় শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাঁহার প্রবল ব্যক্তিত্বের সম্মুখে প্রদীপ্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তিরও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত না; অতি বড় সাহসীও যাঁহার চোখের দিকে চাহিতে পারিত না; তিনি আজ নিজের পুত্র-কন্যার সাতেও ভাল করিয়া কথা বলিতে পারেন না! একটী বালকের দিকেও চোখ তুলিয়া চাহিতে পারেন না। শেষকালে ভাগ্যে কি ঘটিবে, এই চিন্তায় তিনি জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছেন। যাহারা তাঁহার তোষামোদ করিয়া কৃতার্থ হইত, আজ সেই পনর টাকার কেরাণী শ্রেণীর হিন্দুগণ তাঁহার প্রবল শত্রু। যাহাদিগকে তিনি হিসাবের মধ্যেই আনিতেন না, তাহারাই আজ তাঁহার ধ্বংস সাধন করিতে উদ্যত। শিশু সতীশ আজ কথায় কথায় তাঁহাকে শাসাইতেছে। বাল্য-সুহৃদ্ আফতাব-উদ্দিন, পুত্র-সম আবুলফজল আজ তাঁহার পরম শত্রু! অদৃষ্ট!!

বড়মিঞা সাহেব বাড়ী আসিয়াই জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। আজিজা যেরূপ প্রাণপণে পিতার সেবা শুশ্রূষা করিতেন, সেইরূপ প্রত্যেক নামাজের সময়ে যোড়করে পিতার মুক্তির জন্য খোদাতালার করুণা ভিক্ষা করিতেন।

মোকদ্দমার আর চারিদিন মাত্র বাকী; বড়মিঞা ঔষধ খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আজিজা পার্শ্বে বসিয়া পিতার কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। এমন সময়ে বড়মিঞা স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তিনি এক কর্দ্দমাক্ত কণ্টকবনে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বিচরণ করিতেছেন; কণ্টকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত; এমন সময়ে পার্শ্বস্থ উচ্চভূমির পুষ্পকুঞ্জ হইতে জনৈক মহীয়সী মহিলা মধুর কণ্ঠে তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। রমণীর কি অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-দীপ্তি! তাঁহার দেহকান্তি হইতে যেন শত স্বর্গের

কনকপ্রভা ছুটিয়া বাগান উদ্ভাসিত হইতেছে! বড়মিঞা সাহেব রমণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, রমণী তাঁহারই প্রথমা পত্নী,—আজিজার জননী। বড়মিঞা সাহেব "তুমি এখানে?"—বলিয়াই তাঁহার হাত ধরিলেন; সেই পবিত্র হস্তস্পর্শে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! তাঁহার অঙ্গের কর্দ্দম ও কণ্টকরেখা মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ পত্নীর সহিত উদ্যানভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উদ্যানের পার্শ্বেই এক বিস্তৃত নদী প্রবাহিত হইতেছে; নদীর পরপারে তাঁহাদের আবাসবাটী। উভয়েই তথায় যাইবার জন্য নদী-কূলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পারের তরণী অতি ক্ষুদ্র; একজনের বেশী ধরে না। নদীর ধারে আর একটী রমণী ও দুইটী বালক-বালিকা উপবিষ্ট। রমণী বলিলেন, আপনি ইহাদের সহিত গল্প করুন; আমি আগে পার হইয়া যাই; পরে তরণী আসিলে আপনি যাইবেন। বড়মিঞা সম্মত হইলেন এবং উপবিষ্টা রমণীর নিকট বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী পার হইয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু বহুক্ষণেও তরণী ফিরিয়া আসিল না; তরণীর কথা তাঁহাদের মনেও থাকিল না। তাঁহারা গল্পেই মশ্‌গুল* রহিলেন; ইতিমধ্যে নদীর স্রোতে তাঁহারা যে স্থানে বসিয়াছিলেন, বহুদূর ব্যাপিয়া ঐ স্থান ভাঙ্গিয়া পড়িল। বড়মিঞা, রমণী এবং শিশুদ্বয়ও জল-স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন! কেহই কূল পাইতে সমর্থ হইলেন না! বড় মিঞা ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন; এমন সময়ে এক দুরন্ত কুম্ভীর বিকট বদন ব্যাদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি দেখিয়া ভয়ে অধীর হইয়া পড়িলেন, আতঙ্কে তাঁহার আত্মা শিহরিয়া উঠিল, ত্রাসে কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল। তিনি সভয়ে কূলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন, তাঁহার মহীয়সী প্রথমা পত্নী

* মশ্‌গুল—মত্ত।

কূলে দাঁড়াইয়া সভয় সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছেন। বড়মিঞা আকুল ভাবে পত্নীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি করুণ স্বরে বলিলেন,—"আপনি জীবনের লক্ষ্য ভুলিয়া অসতর্ক অবস্থায় বৃথা গল্প-গুজবে ও খেয়ালের ঝোঁকে মজিয়াই এই বিপদে পড়িয়াছেন। সাবধান! আর কখনও অনর্থক খেয়ালের বশে অসতর্ক হইবেন না। এখন এই দুরন্ত কুম্ভীরের হাতে যদি বাঁচিতে চান, তবে শীঘ্র ঐ পার্শ্বস্থ নৌকাখানিতে উঠিয়া পড়ুন।" বড়মিঞা সাহেব এই কথা শুনিবামাত্র পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, পরিকুমারীতুল্য একটী অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা একখানি ক্ষুদ্র তরণীর উপর সুন্দর পাল তুলিয়া তাঁহার নিকট দিয়া গমন করিতেছে। বালিকার শুভ্র অঙ্গাবরণের উপর চঞ্চল-কৃষ্ণ কেশদাম বায়ুভরে নাচিয়া নাচিয়া তটিনীবক্ষে এক অনুপম স্বর্গীয় মাধুরী ছড়াইয়া দিতেছে। তিনি সাহায্য চাহিতেই বালিকা হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে তরণীতে তুলিলেন; তদ্দর্শনে কুমীরটীও আস্তে আস্তে ডুবিয়া গেল। বড়মিঞা নৌকায় উঠিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বোক্ত ভাসমান বালক এবং রমণীও সেই নৌকায় অবস্থান করিতেছে। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা আর কেহ নহে; তাঁহারই প্রাণোপম কন্যা আজিজা! তখন বড়মিঞা সাহেব আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"মা! তোমার জননীর পুণ্যফলে তুমিই আজ আমাকে এক দুরন্ত কুমীরের গ্রাস হ'তে রক্ষা করেছ?"

আজিজা সহসা পিতা কর্ত্তৃক এইরূপে সম্বোধিত হইয়া বলিলেন, "বাবাজান! আপনি কি স্বপ্নে কিছু দেখিয়াছেন?"

বড়মিঞা সাহেব চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া স্বপ্নের কথা কন্যার নিকট বলিলেন। জননীর প্রসঙ্গে আজিজার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল;

বড়মিঞা সাহেবও কাঁদিলেন! অনন্তর চক্ষু মুছিয়া আজিজা বলিলেন, "বাবাজান! আমার বিশ্বাস, এ স্বপ্ন শুভ; আপনি যদি বলেন, একবার চাচাজানদিগকে ব'লে নিষ্পত্তির চেষ্টা ক'রে দেখি।"

বড়মিঞা সাহেব বলিলেন,—"তাঁ'দের উপর কত অন্যায় অত্যাচার করেছি, এখন কি তাঁরা শুন্‌বেন? তোমার মনে বলে ত একবার ব'লে দেখ; অদৃষ্টে যা থাকে তা ত হবেই।"

পিতার সম্মতি লইয়া আজিজা গৃহান্তরে গমন করিলেন এবং কালি-কলম লইয়া মিঞাবাড়ী একখানি চিঠি লিখিতে বসিলেন। আবুল ফজলের নিকট লিখিলেই ফল হইবার অধিক সম্ভাবনা মনে করিয়া আজিজা হৃদয় হইতে সবলে সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারই নিকট পত্র লিখিলেন।

পত্র।

আলি জনাব * ভাইজান!

আশৈশব স্নেহের ভগিনীর ভক্তিপূর্ণ আদাব গ্রহণ করুন। ভাইজান, আজ বড় আশা করিয়া আপনার নিকট একটী আকুল প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি। আশা করি, অবোধ ভগিনীর প্রার্থনা অন্যায় হইলেও স্নেহশীল হৃদয়বান্ ভ্রাতার নিকট ব্যর্থ ও উপেক্ষিত হইবে না।

ভাইজান, জানি না খোদাতালা কি উদ্দেশ্যে বাবাজান ও চাচাজানের হৃদয়ে চির সৌহার্দ্দের পরিবর্ত্তে চির শত্রুতা-বীজ নিক্ষেপ করিয়াছেন। জানি ইহার ফলে আপনি ও চাচাজান কত জ্বালাতন হইয়াছেন, কত কঠোর বিপদে পড়িয়াছেন; কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার ত আর কোন প্রতিকার নাই। এইবার বাবাজান বিপদের মুখে নিপতিত; ভীষণ বিপদ্ চারি দিক্ হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া লইয়াছে;

* আলি জনাব—পরম ভক্তিভাজন।

রক্ষা পাইবার কোনই উপায় দেখিতেছি না। তাঁহার শরীর ও স্বাস্থ্য নিদারুণ রূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মনে সাহস, স্থিরতা ও ধৈর্য্য একটুও নাই। তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

এ অবস্থায় আল্লার ওয়াস্তে গত কথা ভুলিয়া আপনি যদি সহায়তা না করেন, তবে কোনই উপায় দেখিতেছি না। শেষ কালে যদি বাবাজানের কোনরূপ দুর্গতি হয়, আমাদের দুঃখ ও কষ্টের সীমা থাকিবে না। আপনার মনেও কি কষ্ট হইবে না? কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীকে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি সুখী হইতে পারেন?

সতীশ বাবুর দোষ দেই না; বর্ত্তমান অবস্থায় দৃঢ়তা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক! কিন্তু নির্দ্দয় প্রতিশোধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ ও পৌরুষ প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব স্ফুরিত হয় কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি ধরিয়া বসিলে নিষ্পত্তি করিতে সতীশ বাবুও অসম্মত হইবেন না। যাহাতে সব দিক্ রক্ষা পায়, আপনি দয়া করিয়া তজ্জন্য সাধ্যপক্ষে চেষ্টা করিলেই কৃতার্থ হইব; ভবিষ্যৎ ফলাফল আল্লার হাতে। আরজ ইতি—

আমার স্নেহের ভগিনী

আজিজা।

আজিজা পত্র লিখিয়া মতিয়র রহমানের দ্বারা আবুল ফজলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মতিয়র রহমান যখন পত্র লইয়া মিঞাবাড়ী উপস্থিত হইল, তখন আবুল ফজল বাহির বাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। মতিয়র রহমান আবুল ফজলের নিকটবর্ত্তী হইয়া সালাম করিলেন; আবুল ফজল সালামের জওয়াবের সহিত চক্ষু তুলিয়া মতিয়র রহমানকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন,

এবং সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মতি, খবর কি? বাড়ীর সকলে ভাল? চাচাজান কেমন আছেন?"

"বাপ্‌জানের* অত্যন্ত অসুখ"—বলিয়া মতিয়র রহমান আজিজার পত্র খানি আবুল ফজলের হাতে প্রদান করিল। আবুল ফজল কৌতূহলের সহিত পত্র খুলিলেন, কিন্তু পত্রের দুই একটী পদ পড়িতেই তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি অধীর ভাবে পত্র পড়িলেন। ক্ষুদ্র পত্র খানি যেন শত উপন্যাসের সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণী লইয়া তাঁহার চক্ষু ও হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল; পত্রের প্রত্যেক শব্দের—প্রত্যেক বর্ণ-বিন্যাসের ভাব-মোহে তাঁহার আত্মাকে বিষম অভিভূত করিল। আবুল ফজল পত্র হইতে চক্ষু তুলিয়া মতিয়র রহমানের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সৌন্দর্য্য-বিমণ্ডিত কিশোর বালক আগ্রহভরা ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে। আবুল ফজল বলিলেন,—"মতি! বাড়ীর মধ্যে চল; একটু পরেই নাস্তা খাইয়া বাড়ী যাইবে।"

মতি। না ভাইজান! আজ মাফ করুন; আর এক দিন আস্‌ব।

আবুল ফজল আর কিছু বলিলেন না,—বলিতে পারিলেন না। আজিজার পত্রের উত্তর তিনি লিখিয়া দেওয়াই নিরাপদ্ মনে করিলেন এবং এক খণ্ড কাগজ লইয়া তখনই পত্র লিখিলেন:—

পত্র।

প্রিয় আজিজা!

দীন ভ্রাতার শত শত স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করি, খোদা তোমাদিগকে সুখ-শান্তিতে রাখুন। আজিজা! ভ্রাতার নিকট প্রার্থনা

---

* বঙ্গীয় মুসলমানগণ পিতাকে 'বাবাজান', 'বাপ্‌জান,' এবং স্থানবিশেষে 'বাপ্‌জী' বলিয়াও সম্বোধন করিয়া থাকেন। কোন কোন আরবি-ভাষাপ্রিয় সম্ভ্রান্ত পরিবারে 'আব্বা' শব্দও প্রচলিত আছে।

বা দাবী করিতে ভগিনীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে ; সে দাবি বা আবেদন ব্যর্থ হইবে কেন ? কিন্তু আজিজা, তুমি আমাকে এক গুরুতর পরীক্ষার মুখে নিক্ষেপ করিলে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব কি ? খোদা ভরসা ; তিনিই শক্তিপ্রদাতা।

আজিজা ! আজ যদি স্বর্গীয় চাচীজান বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে অনর্থক সাময়িক মনান্তর এইরূপ চির বদ্ধমূল হইতে পারিত কি ? কিন্তু যাক, গত কথা তুমি ভুল নাই, আমিও ভুলিতে চাহি না। যাহার যাহা অদৃষ্ট ছিল, ঘটিয়া গিয়াছে।

সতীশ বাবুরা যেরূপ উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা এখন আমাদের কথা শুনিবেন কি না, চিন্তার বিষয়। অবশ্য আমি সাধ্য-পক্ষে বুঝাইতে বা শুনাইতে চেষ্টার ত্রুটী করিব না। যদি না শুনেন, খোদা ভরসা। ভ্রাতা দরিদ্র বটে, কিন্তু খোদা না করিলে, তাহার নিকট ভগিনীর প্রার্থনা উপেক্ষিত হওয়া ত দূরের কথা, অপূর্ণ থাকিবে না। ইতি—

তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা—
আবুল ফজল।

মতিয়র রহমান সালাম করিয়া পত্র সহ চলিয়া গেলে আবুল ফজল সেই স্থানে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত সতীশদের বাড়ী রওয়ানা হইলেন। সতীশ তখন প্রিয় পত্নী প্রভাত-নলিনীর সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। বেশীর ভাগ কমলার সম্বন্ধেই উভয়ের হাস্য-পরিহাস চলিতেছিল। স্বামি-স্ত্রীর সেই রহস্য-শরবর্ষণের মধ্যে অনুপস্থিত আবুল ফজলও মাঝে মাঝে বিদ্ধ হইতেছিলেন।

এমন সময়ে আবুল ফজল তথায় উপস্থিত হইলে উভয়েই সানন্দে তাঁহাকে আহবান করিলেন। কিন্তু আবুল ফজল সেই আনন্দ

আহ্বানে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার মুখমণ্ডল চিন্তাচ্ছন্ন; নয়নে আশঙ্কা ও উদ্বেগের ভাব স্পষ্ট পরিস্ফুট। তিনি গম্ভীর ভাবে বারান্দায় উঠিয়া বসিলেন। সতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন;—'তোমাকে এরূপ চিন্তাকুল দেখ্‌ছি কেন? ব্যাপার কি?"

আবুল ফজল। ব্যাপার বিশেষ গুরুতর না হলেও সামান্য নহে। আমার একটী অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তে হবে। বল রাখ্‌বে কি না?

সতীশ। ছাই বলেই ফেল না। আগে শুনি ত; তার পর রাখা না রাখা বুঝা যাবে।

আবুল ফজল। তবে শুন; বড় মিঞাদের সাতে এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতে হবে।

সতীশ গম্ভীর হইলেন; তাঁহার মুখে চিন্তারেখা স্পষ্ট প্রতিভাত হইল। তিনি ধীর ভাবে বলিলেন, "আবুল ফজল, তোমার ঘাড়ে এ পাগ্‌লামী চাপ্‌ল কেন? যিনি আমার এবং তোমাদেরও যতদূর সম্ভব সর্ব্বনাশ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং সাধ্যপক্ষে করেছেনও, যিনি প্রতিবেশী হয়েও অম্লান বদনে আমার কুলে কালি দিয়েছেন; সমাজে আমার মুখ নীচু করেছেন; তাঁর সাতে আবার নিষ্পত্তি কি? আশা করি, তুমি এরূপ অনুরোধ আর কখনও কর্‌বে না; যদি কর, বোধ হয় আমি রাখ্‌তে পার্‌ব না।"

সতীশের দৃঢ়তায় আবুল ফজল স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ভাই সতীশ! তিনি আমাদের এবং তোমার যতদূর অনিষ্ট কর্‌বার করেছেন, তাত সবই জানি; ধর্ম্মই তার প্রকৃত বিচার কর্‌বে। কিন্তু এখন তিনি বিপদাপন্ন; বিপুল ধন-সম্পদ, জনবল ও অদম্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েও এখন অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে তিনি স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ কর্‌তে বসেছেন। তিনি প্রকারান্তরে এখন আমাদের

মুঠার ভিতর; তাঁহার মান-সম্ভ্রম আমাদের করুণার উপর নির্ভর কর্‌ছে। আমরা এখন সহজেই প্রতিহিংসা সাধন কর্‌তে পারি; কিন্তু প্রতিহিংসা ত পশুতেও সাধন করে। মানুষেও যদি সর্ব্বদাই তাই করে, তবে পশুর সহিত তাহার পার্থক্য কি? তাহার শিক্ষা সভ্যতার মূল্য কি? তাই আমার বিনীত অনুরোধ,—ক্ষমতা ত দেখিয়েছ, এখন ক্ষমা করে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখাও; সমাজকে উন্নত আদর্শ শিক্ষা দাও।”

সতীশ। আবুল ফজল, ওসব বক্তৃতা আমিও ত একটু একটু জানি। আগে উহা খুব ভালই মনে কর্‌তেম। কিন্তু এখন বুঝেছি, উহা অসার বাগাড়ম্বর মাত্র। “এক গালে চড় মারিলে, অন্য গাল ফিরাইয়া দিবে”* ইহা ধর্ম্মপ্রচারকের ভুঁয়া কথা। যাঁহারা ইহা প্রচার করেন, কাজের বেলায় তাঁহারাই “সূচের খোঁচা দিলে শূলে চড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।” কিন্তু এরূপ না হইলে সংসার চলে না, আমি তা এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি; তোমরা নিজেও ত অনেক ভুগেছ। ঠেকেও যদি না শিখে থাক, তবে আর কি কর্‌ব। “যে যেরূপ ব্যবহার কর্‌বে, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার কর†”—ইহাই সংসারী মানুষের পক্ষে খাটি উপদেশ। আমারও এখন ইহাই ব্রত। আদর্শ দেখান-টেখান, ও সব আমার দ্বারা আপাততঃ হ’য়ে উঠ্‌বে না।

আবুল ফজল। সতীশ ভেবে দেখ, নিতান্ত অসঙ্গত কথা হ’লে আমি অনুরোধ কর্‌তেম না। মনে কর আমাদেরও দেশে থাক্‌তে হবে; বসবাসও কর্‌তে হবে; আজ যারা শত্রু আছে, কাল তারা মিত্রও হ’তে পারে। বড় মিঞা আমাদের অপেক্ষা কত প্রবল তাও ত

---

* বাইবেলের উক্তি; বাইবেল ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই এরূপ অস্বাভাবিক উক্তি নাই। † পবিত্র কোরানের উক্তির মর্ম্ম; অবশ্য ‘তুল্য ব্যবহার করা সিদ্ধ’ বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে—‘ক্ষমা করাই উত্তম ও প্রশংসিত’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বুঝ; মামলা-মোকদ্দমা ফাঁসিয়াও যাইতে পারে। এ অবস্থায় নিষ্পত্তি করা আমার মতে সকলের পক্ষেই ভাল।

সতীশ। আবুল ফজল ওসব কথা রাখ; বড়মিঞা যে বাগে পেলে আমাদিগকে ভালমানুষের মত ছেড়ে দিবেন, তা আমিও বুঝি, তুমিও বুঝ। সে যা হউক, তোমার অনুরোধের প্রকৃত কারণ কি, তাই স্পষ্ট করে বল ত?

আবুল ফজল তখন সরল ভাবে সব কথা বলিলেন; বড়মিঞার আশঙ্কা ও অসুখের কথা, আজিজার পত্র ও মতিয়র রহমানের নিকট আবুল ফজলের প্রদত্ত উত্তরের কথা—সব কথাই সতীশকে খুলিয়া বলিলেন।

সতীশ তখন বিদ্রূপের সহিত আবুল ফজলকে বলিলেন,—"তোমার এ ক্ষণভঙ্গুর মতের কথা আমি বরাবরই জানি। সামান্য একটা স্ত্রীলোকের কথায় যে এইরূপ অন্যায় ভাবে মত পরিবর্ত্তন কর্‌তে পারে, সে সংসারের খুবই জ্ঞান রাখে।"

আবুল ফজল কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"সতীশ, আত্মবিস্মৃত হইও না। আজ তুমি যাঁকে সামান্য স্ত্রীলোক মনে করে উপেক্ষার কথা বল্‌ছ, একদিন তাঁরই অনুগ্রহে অনেক অনিষ্ট হয়েও তোমার সম্ভ্রম রক্ষা পেয়েছিল?"

সতীশ উত্তেজনার সহিত বলিলেন,—"কিই বা আর রক্ষা হয়েছে; যদি কমলা অপহৃত না হ'ত, তবে না হয় বুঝা যেত।"

আবুল ফজল। কমলার অপহরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দোষ তাদের ঘাড়ে চাপা'লে চল্‌বে কেন? কমলার নিজেরও ত দোষ ছিল।

সতীশ স্পষ্ট বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"থাক ভাই, যথেষ্ট হয়েছে; আমার মনের কষ্ট তুমি বুঝ্‌বে না। কমলার ন্যায় তোমার বোন্ যদি

তোমাদের কুলে কালি দিয়ে তোমার চক্ষের উপর এইরূপ অবস্থায় অবস্থান কর্‌ত, তবে বুঝ্‌তে পার্‌তে।”

আবুল ফজল ধীর ভাবেই বলিলেন, —“তা ঠিক, কিন্তু এর ত কোন উপায় নাই; থাক্‌লে না হয় বুঝ্‌তেম।”

সতীশ কঠোর ভাবে বলিলেন,—“উপায় নাই কেন? অবশ্যই আছে। যাহারা আমার বোন্‌কে কুলের বাহির ক’রে আমার মুখ ছোট করেছে, আমিও সর্ব্বস্ব পণ করে তাদের কুলের স্ত্রী-কন্যা বাহির করে দশজনের মধ্যে পথে পথে হাঁটিয়ে ইহার প্রতিশোধ তুল্‌ব; তাতে—”

এইবার আবুল ফজলের ধৈর্য্যচ্যুত হইল। তিনি সক্রোধে বলিলেন, “বেশ সতীশ, তোমার যা অভিরুচি, তাই কর; আমি তোমার সাতে এ সম্বন্ধে আর কোনই বাদানুবাদ কর্‌তে চাই না। অধিক কি, তোমার সাতে আর কথা বল্‌তেও আমার ঘৃণা হচ্ছে! এত হেয় তুমি! এত নীচ তোমার প্রবৃত্তি! আমি তোমাকে ভুল বুঝ্‌তেম।” কথাগুলি বলিয়াই আবুল ফজল সবেগে বারান্দা হইতে নামিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সে বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।”

সতীশ বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন; ভাব দেখিয়া নলিনীর মুখেও কথা ফুটিল না। তাঁহার প্রদত্ত পান কয়টী সুমার্জ্জিত পানদানে পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকাইতে লাগিল। আবুল ফজল চলিয়া গেলে সতীশ বা নলিনী কেহই তাহা স্পর্শ করিলেন না।

সেদিন গত হইল; সন্ধ্যার পরে সতীশ আহার না করিয়াই শয়ন করিতে গেলেন দেখিয়া নলিনী বলিলেন,—“এ কি তুমি আহার কর্‌বে না?” সতীশ উত্তর দিলেন—“না।” আবুল ফজলকে চটানের জন্য আজ আশৈশব বন্ধুত্বের স্মৃতি তাঁহার মাথার মধ্যে একে একে জাগরিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সৌহার্দ্দ্য কি এতই ক্ষীণ

সূত্রে গ্রথিত? মতান্তরের সামান্য আঘাতে এত সহজেই কি উহা ছিন্ন হইয়া যায়? যদি তাই হয়, তবে কেন আমরা পরস্পরের জন্য এত স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছি? কেন একের জন্য অপরে যাবতীয় বিপদ্ আপদ্, এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছি? এমন সময়ে নলিনী তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন,—"খাইতে চল?"

সতীশ। আমার ক্ষুধা নাই, তুমি খাওগে।

নলিনী। মাথা একটু ঠাণ্ডা কর্‌লেই ক্ষুধা হ'বে; এস এখন।

সতীশ। গরম দেখ্‌লে কিসে?

নলিনী। একজন শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোক যাঁর কাছে এসে ঐরূপ গরম হয়ে যায়, তাঁর গরম আবার দেখার আবশ্যক হয় কি?

সতীশ। আচ্ছা, আবুল ফজল কি ভাল ব্যবহার করেছে?

নলিনী। আগে নিজের ব্যবহার সম্বন্ধে ভেবে দেখ। মনে কর একজন তোমার বোন্ বা স্ত্রীকে অপমান কর্‌ল এবং তার প্রতিশোধস্বরূপ তুমিও তার স্ত্রী-কন্যা-মাতাকে অপমান কর্‌লে; এ অবস্থায় জিজ্ঞাসা করি, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কতদূর এবং শ্রেষ্ঠই বা কে? আজকাল তোমাদের নব্যশিক্ষিত দল নারীজাতির মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য ত খুব আস্ফালন করে থাকেন; কিন্তু মর্য্যাদাবোধের পরিমাণের প্রাচুর্য্য দেখ্‌লে স্তম্ভিত হ'তে হয় না কি?

সতীশ এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝিলেন; বলিলেন,—"আচ্ছা আমি না হয় একটা অন্যায় কথাই বলে ফেলেছিলুম, কিন্তু তজ্জন্য আমার প্রতি ঐ রূপ কঠোর উক্তি বর্ষণ করা কি তার ঠিক হয়েছে?"

নলিনী। সে তর্ক আমার সাতে না করে তাঁর সাতে কর্‌লেই ভাল হয়; তবে আমার বিশ্বাস, তাঁর অনুরোধ ঐরূপ ভাবে

প্রত্যাখ্যান করে তুমি পূর্ব্ব হ'তেই তাঁকে বিরক্ত ও উত্তেজিত করে তুলেছিলে।

সতীশ। কিন্তু তাঁর এ অনুরোধ করা কি সঙ্গত? এরূপে অপমান হয়ে মীমাংসা কর্‌লে লোকে কি বল্‌বে?

নলিনী। সঙ্গত কি অসঙ্গত এবং লোকে কি বল্‌বে না বল্‌বে, তা আমি স্ত্রীলোক কি বুঝি। তবে কমলাকে যখন ফিরে পাওয়ার বা পেলেও গ্রহণ কর্‌বার উপায় নাই এবং কলঙ্কও যখন একেবারে কিছুতেই ধুয়ে ফেলা যাবে না, তখন বৃথা শত্রুতা বাড়ায়ে কি ফল? তারপর লোকের কিছু বলা না বলার প্রতি লক্ষ্য করার চেয়ে আবুল ফজলের বন্ধুত্ব যে তোমার পক্ষে খুবই মূল্যবান্, তার বোধ হয় কোনই সন্দেহ নাই।

সতীশ আর কিছু বলিলেন না; নলিনীর হাত এড়াইতে না পারিয়া তিনি আহার করিয়া শয়ন করিলেন এবং পর দিন প্রভাতে উঠিয়া একটু পরেই আবুল ফজলদের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। আবুল ফজল তখন বাড়ীর মধ্যে পড়ার ঘরে বসিয়া পড়িতেছিলেন। সতীশ চাকরের দ্বারা বাড়ীর মধ্যে আবুল ফজলের নিকট সংবাদ দিলে আবুল ফজল সতীশের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"তুই যেয়ে বল যে, এখন তিনি কাজে আছেন, বাইরে আস্‌তে পারবেন না।" চাকর সতীশকে যাইয়া সেইরূপ বলিলে সতীশ বলিলেন,—"কেনরে! তোদের মৌলবী সাহেব ডেপুটী হয়েছেন নাকি? ধর তবে একখানা কার্ড নিয়ে যা।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"তুই চাচিজানকে সংবাদ দিয়ে আয়, আমি বাড়ীর মধ্যে যাব।" চাকর যাইয়া বিবি সাহেবাকে খবর দিল; তিনি কন্যাদের সহিত মধ্যবাড়ীর অন্তরালে গেলে সতীশ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবুল ফজল যে গৃহে ছিলেন, সেই গৃহে উপস্থিত

হইলেন। আবুল ফজল এক খানি চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছিলেন। সম্মুখে ক্ষুদ্র একখানি টেবিলের উপর অনেকগুলি পুস্তক সাজান ছিল; পুস্তকের ভারে টেবিল যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। আবুল ফজল সতীশকে দেখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং বিছানার উপর বসিলেন। সতীশ না বসিয়া বলিলেন,—"খবর দিলেম বা'র হ'লে না কেন? জজ হয়েছ নাকি?"

আবুল ফজল সহাস্যে বলিলেন, —"না তা নয়; কাল তোমাকে কড়া কথা বলে এসেছি, সুতরাং সহসা বা'র হলে কি জানি, যদি লোকের মধ্যে তার প্রতিশোধ দাও, তাই বা'র হই নাই। ইচ্ছা হয় এখন দিয়ে যাও, কেউ দেখ্‌বে না।"

সতীশ। সে অপরাধ বোধ হয়, আমারই বেশী; যাক্ তুমি একবার চল এখন।

আবুল ফজল। আমি? আমি এখন কিছুতেই যেতে পার্‌ব না। আমার হাতে অনেক কাজ আছে।

সতীশ আইনের বহিগুলি দেখাইয়া বলিলেন,—"এই গুলি দেখা কাজ ত? তা উভয় পক্ষ হ'তে অনেকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ করে যে উকীল ব্যারিষ্টার দেওয়া হয়েছে, আপাততঃ তাঁরাই একাজ চালায়ে নিতে পার্‌বে?"

আবুল ফজল আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, —"এক রাত্রির মধ্যে এতটা তত্বজ্ঞান কোথা হইতে গজায়ে উঠ্‌ল! ওরূপ স্থূল মাথার মধ্যে প্রবোধ বাবুর বোন্ বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সঞ্চারিত করেন নাই ত?"

সতীশ। কেবল তাই নহে; তোমার উপদেশের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং তিরস্কার-ষ্টীম-মেশিনের সাহায্যেও অনেকটা ফল হয়েছে; তুমি চল এখন।

আবুল ফজল। আমি কিছুতেই যেতে পার্‌ব না; তিনি কি মনে কর্‌বেন?

সতীশ। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' দুইজনে অপরাধ করে মনে করানটা একজনকে ভোগ করান কি উচিত?

এমন সময়ে চাকর পান দিয়া গেল; সতীশ পান লইয়া বলিলেন, "কালকার পানগুলি বোধ হয় সেইখানেই কেঁদে মর্‌ছে।"

আবুল ফজল সহাস্যে বলিলেন,—"দুই দুইজন লোক; পান গুলাকে একটু সান্ত্বনাও দিতে পার্‌লে না! অগত্যা আমাকে ডাক্‌লেই হ'ত।"

সতীশ। আচ্ছা, ডাকাটা না হয় একটু পরেই হ'ল। চল এখন।

আবুল ফজল সতীশের সহিত যাইতে বাধ্য হইলেন। নলিনী উভয়কে পুনর্ম্মিলিত দেখিয়া অতীব আনন্দিতা হইলেন, কিন্তু রহস্যবাক্যে বিদ্ধ করিতে কাহাকেও ছাড়িলেন না।

সতীশ ও আবুল ফজল অনেক তর্কবিতর্কের পর মীমাংসার শর্ত্ত ঠিক করিলেন। আবুল ফজল কমলার নিকট হইতে সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু অভিমানদৃপ্ত সতীশ বসতবাটী ভিন্ন আর কিছুই লইতে সম্মত হইলেন না। তবে তিনি মোকদ্দমার সমস্ত ব্যয় এবং বড় মিঞার পক্ষ হইতে আফতাব-উদ্দিন মিঞা ও গ্রামের অন্যান্য লোকের উপর যে সমস্ত মোকদ্দমা চাপান ছিল, তাহা তুলিয়া ঐ সমস্ত বিবাদ সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য বিশেষরূপে 'জিদ' ধরিলেন। বড় মিঞা সম্মত নাও হইতে পারে ভাবিয়া আবুল ফজল প্রথমে একটু আপত্তি করিলেন, কিন্তু সতীশ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "তা'হলে আর নিষ্পত্তি হ'ল কি?"

অগত্যা আবুল ফজল স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ঐ সমস্ত বিষয় বড় মিঞার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন; তিনি সানন্দে অন্যান্য সমস্ত প্রস্তাব স্বীকার

করিলেন, কিন্তু মোকদ্দমার খরচ মাত্র অর্দ্ধেক দিতে স্বীকৃত হইলেন। আবুল ফজল তাহাতেই সতীশকে সম্মত করিলেন।

বহুদিন পরে ধীরে ধীরে আলিনগরে শান্তিবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সকলে মিলিয়া মিশিয়া জেরার মুখে সাক্ষী প্রমাণ ওলট-পালট করিয়া দিলেন; সন্দেহে খুনের মোকদ্দমা 'ডিস্‌মিস্‌' হইল। পুলিসের প্রমাণিত লুণ্ঠন ও হাঙ্গামার অপরাধে তুফানুল্লা, রোস্তম মাম্মুদ, শচীন্দ্র ও সুরেশ প্রভৃতি কয়েকজনের এক হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ হইল। অন্যান্য কয়েকজনের দুই তিন মাসের শাস্তি হইল। বড়মিঞা গিয়াসুদ্দিন প্রমাণাভাবে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ মুক্ত হইলেন। সতীশ ও আবুল ফজলের আন্তরিক সহানুভূতিমূলক চেষ্টায় আফসার-উদ্দিন খোন্দকার ও অন্যান্য সৎলোকেরা প্রায় সকলেই মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার পরে অন্যান্য মোকদ্দমাগুলি তুলিয়া লওয়া হইল। লোকে ক্রমশঃ শত্রুভাব ভুলিতে লাগিল। একতা ও ভ্রাতৃভাব ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভীষণ বিপ্লবের জ্বলন্তবহ্নি এইরূপ ভাবে নির্ব্বাপিত হওয়ায় আবুল ফজল, সতীশ, আজিজা ও প্রভাত-নলিনী প্রভৃতি উচ্চান্তঃকরণবিশিষ্ট নরনারীগণ সকলেই অন্তরে বিমল শান্তি অনুভব করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

———:0:——

ধর্ম্ম-সভা।

পুঁটীখোলা হইতে ফরিদপুরের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত ভূমি নিম্ন-সমতল। জেলার এই অংশ প্রায় ছয় মাস বর্ষার জলে ডুবিয়া থাকে। এখানে সম্ভ্রান্ত হিন্দু-মোসলমানের বসবাস খুব কম। নমঃশূদ্র প্রভৃতি নীচ জাতীয় হিন্দু এবং অশিক্ষিত কৃষিজীবী মোসলমানেরাই বেশীর ভাগ এখানে বাস করিয়া থাকে। উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া নমঃশূদ্রগণ একবার ঘোর সমাজদ্রোহ প্রচারে বদ্ধপরিকর হয়। তাহারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া সামাজিক সম্মান লাভের জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ভীতি প্রদর্শন করে। উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের সাহায্য করিতে গিয়া নিম্নশ্রেণীর মোসলমানেরাও নমঃশূদ্রদিগের বিরাগভাজন হইয়া পড়ে। ফলে উভয় পক্ষে শত্রুতা ও বিবাদ চলিতে থাকে। এই সুযোগে দুই দল খ্রীষ্টান প্রচারক তথায় উপস্থিত হইয়া নমঃশূদ্রদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টিত হন। মোসলমানেরা নিজের দোষে নমঃশূদ্রদিগের বিরাগভাজন হওয়ায় নমঃশূদ্রেরা সহজেই খ্রীষ্টানদিগের অনুগত হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টানদিগের প্রচারকার্য্য বেশ সাফল্যের সহিত চলিতে থাকে।

এ পর্য্যন্ত অন্যান্য স্থানের মোসলমানেরা উক্ত ব্যাপারকে তদ্রূপ গ্রাহ্য-যোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই; কিন্তু যখন আস্তে আস্তে দুই চারিটী হিন্দু নরনারী নানা কারণে খ্রীষ্ট-পতাকাতলে আশ্রয় লইতে লাগিল, ক্রমে যখন খ্রীষ্টানদিগের স্থায়ী মিশন ও ধর্ম্মশিক্ষার স্থায়ী বিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত

হইতে লাগিল, তখন তাঁহাদের ঘুম একটু ভাঙ্গিল। তাঁহারা ভাবিলেন, আমাদের প্রতিবেশী একদল বৃহৎ লোক ভিন্ন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে; আর আমরা নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইয়া রহিয়াছি। ঐ ধর্ম্ম অপেক্ষা আমাদের ধর্ম্ম কত উচ্চ—কত পবিত্র এবং আমাদের আদর্শ উক্ত ধর্ম্মাবলম্বিগণের আদর্শ অপেক্ষা কত পবিত্র, কত উন্নত ও কত উদার! আমরা যদি আমাদের ধর্ম্মের পবিত্রতা ও সত্যতা এবং আমাদের সামাজিক আদর্শের উচ্চতা ও উদারতা উহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি, তবে কেন উহারা আমাদের পূর্ণ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত ভিন্ন জাতির অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? এই চিন্তা ও উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া মোসলমানদিগের মধ্য হইতেও ধীরে ধীরে কয়েক দল প্রচারক ধর্ম্মপ্রচারার্থ ফরিদপুরের ঐ অংশে উপস্থিত হইলেন। ঐ সমস্ত প্রচারক সুন্নী * সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু প্রচারকার্য্যে তাঁহারা দক্ষ ছিলেন না; সুতরাং খ্রীষ্টান প্রচারক-দিগের সহিত সংঘর্ষে তাঁহারা জয়ী হইতে কিংবা তদ্রূপ সুফল লাভ করিতে পারিলেন না। কারণ খ্রীষ্টানগণ ইঁহাদের সম্মুখে অম্লানবদনে বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদের উপর অযথা অপবাদ প্রয়োগ করিয়া এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠনবী হজরত ইসার অস্বাভাবিক 'গুণ-গরিমা বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাকে জীবন্ত খোদা বানাইয়া অতি সহজেই পার পাইতে লাগিলেন। সুন্নী প্রচারকগণ ইহার শাস্ত্রসম্মত প্রতিবাদ ও খ্রীষ্টানদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। তাঁহারা খ্রীষ্টানদিগকে কোন প্রকার তীব্র আক্রমণ করিতে পারিতেন না। কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস মতে কোন নবী-রসুল † বা পীর-বোজর্গকে ‡ গালি দেওয়া অমার্জ্জনীয়

* সুন্নী—হজরত মোহাম্মদের 'সুন্নত' অর্থাৎ আদর্শের অনুসরণকারী।

† নবি ও রসুল—আল্লাহতালার প্রেরিত সংবাদবাহক ও প্রতিনিধি।

‡ পীর-বোজর্গ—সম্মানাস্পদ সাধু ব্যক্তি।

মহাপাপ। সুন্নী মোসলমানগণ কেবল খ্রীষ্টানদিগকে জব্দ করিবার জন্য এরূপ গুরুতর মহাপাপে লিপ্ত হইতে সাহসী নহেন। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ তাঁহাদিগের সহিত সংঘর্ষে উত্তেজিত হইয়া মোসলমানদিগকেও খ্রীষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উপর অন্য অস্ত্র কার্য্যকরী হইবে না মনে করিয়া খ্রীষ্টদূতগণ নীচ জাতীয় হিন্দুদিগের বাল-বিধবাগণকে মিশনে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিলাস-বিজড়িত শিক্ষা এবং আপাতমধুর কামগন্ধী সম্মোহিনী হাব-ভাবে দীক্ষিতা করিয়া প্রচারানুরোধে অবরোধের বাহিরে আনিলেন। তাহাদিগকে যোগ্যপাত্রে সমর্পণ করিবার ছুঁতা ধরিয়া উচ্চশিক্ষিত সদ্‌বংশজ যুবক-দিগকে খ্রীষ্টমন্দিরে আহ্বান করা হইল। বিলাস-লাস্য-বিজড়িত হাবভাব-মুগ্ধা নবযৌবনোন্মেষিতা বঙ্গযুবতীর স্বর্ণরেখাশোভিত মুক্ত বাহুসঞ্চালনে, অর্দ্ধোন্মুক্ত বক্ষ-বিলম্বিত সূক্ষ্ম স্বর্ণহার-বিশোভিত গ্রীবার মধুর ভঙ্গিমায়, কমনীয় কুঞ্চিতকেশবিচুম্বী কর্ণসংলগ্ন কর্ণাভরণ—চুনীর দুলের মধুর দোলায়, নানাবর্ণ সেমীজের উপর শত সঙ্কোচযুক্ত ভঙ্গিমা-বিন্যস্ত সুরঞ্জিত সাড়ীর সহিত ক্রীড়াশীল বায়ুর মধুর নৃত্যে এবং সর্ব্বোপরি বিমুক্ত বা চশ্‌মাশোভিত চঞ্চল চক্ষুর বিল্লোল চাহনী ও পাউডারমাখা ব্রীড়াবনত মুখের মৃদুহাস্য-বিজড়িত খ্রীষ্টমন্ত্রের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় অনেকের সহিত কতিপয় ধর্ম্মজ্ঞানহীন, ধর্ম্মশিক্ষাশূন্য ইংরেজীশিক্ষিত মোসলমান বালকের মাথাও ঘুরিয়া গেল। তাঁহারা কুলে কালি দিয়া—ধর্ম্ম ও জাতির মুখে অপমানের মসী মাখিয়া রূপজ মোহের আকর্ষণে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

এই ব্যাপারে মোস্‌লেম-সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সাময়িক পত্রিকাগুলিতে ইহার প্রতিকারকল্পে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইল। নানাস্থান হইতে নানা সম্প্রদায়ের মোসলমান প্রচারক ফরিদপুরে ধাবিত হইলেন; প্রচারদক্ষ সুন্নী সম্প্রদায়ের কতিপয় মুন্‌শীর আগমনেই খ্রীষ্টান

প্রচারকবৃন্দ আতঙ্কিত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে খ্রীষ্টানের যম কাদিয়ানী* ও নেচারী† সম্প্রদায়ের দুই দল প্রচারক উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খ্রীষ্টমন্ত্রের উপাসকগণ চোখে সর্ষেফুল দেখিতে লাগিলেন। পাঠক, কাদিয়ানী ও নেচারীগণ সুন্নীদিগের ন্যায় খ্রীষ্টানদিগের বা খ্রীষ্টানগুরু হজরত ইসা নবীর সম্বন্ধে সংযতভাবে কথা বলার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। খ্রীষ্টানগণ হজরত মোহাম্মদের সম্বন্ধে কাল্পনিক ইতিহাস হইতে একটী অপবাদ প্রয়োগ করিলে, কাদিয়ানীগণ তৎক্ষণাৎ বাইবেল হইতে হজরত ইসা সম্বন্ধে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া শত শত অপবাদ দেখাইয়া দেন। বিশ্বনিন্দুক খ্রীষ্টান পাদরীগণ অন্য নবীদিগকে গোণাগার বা পাপী বলিলে নেচারী ও কাদিয়ানীগণ তাহার উত্তরে বাইবেলের প্রমাণ দিয়া হজরত ইসা নবীকে পাপী ত বলেনই, তা ছাড়া ক্রোধী, অসংযমী, জীবহত্যাকারী, স্ত্রীজাতিবিদ্বেষী ও অকৃতজ্ঞ, এমন কি ভণ্ডনবী ‡ বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। সুন্নী মোসলমানগণ এ সমস্ত ঘোর আপত্তিজনক এবং গুরুতর পাপ মনে করিলেও খ্রীষ্টানের সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে তাঁহারা নেচারীদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না; বরং সে ক্ষেত্রে সকলে একযোগেই প্রচার করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, খ্রীষ্টানগণ যখন ধর্ম্মবিচারে পরাস্ত ও হতমান হইয়া প্রচারক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন, মোসলমান প্রচারকগণের সমবেত শক্তিপ্রতাপে যখন তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র মিশনমন্দির ও স্কুল-গৃহেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল, তখন মোসলমানেরা ইচ্ছা করিলে হিন্দুদিগকে সহজেই স্বধর্ম্মে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য

---

* কাদিয়ানী—পঞ্জাবের গোলাম আহমদ কাদিয়ানের মতানুসরণকারী সম্প্রদায়।

† নেচারী—জড়োপাসক ও স্বভাবপূজক সম্প্রদায়। ‡ যীশু কি নিষ্পাপ ?—দ্রষ্টব্য।

বশতঃ এই সময়ে তাঁহাদের নির্ব্বাপিত ও ভস্মাচ্ছাদিত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিল। সুন্নীগণ কাদিয়ানীগণের নবী-নিন্দা, নেচারীগণের অস্বাভাবিক উদারতা ও মোহাম্মদীগণের * মজহাব-বিদ্বেষের উপর বিষম বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উক্ত সম্প্রদায়ত্রয়ও সুন্নীদিগের সুদৃঢ় বিশ্বাস-পদ্ধতি এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ধর্ম্ম-সাধন-রীতির উপর দোষারোপ ও বিরক্তিপ্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার ফলে তাঁহাদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি "কাফের, মরদুদ, মোরতেদ, শয়তান, বেদীন ও নাস্তিক" † প্রভৃতি তীব্র বিশেষণ-সংবলিত ফৎওয়া ‡ জারি করিতে লাগিলেন। ইস্‌লামের অধঃপতনের নিদারুণ ছবি লোকলোচনের সমক্ষে আবার স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিল। খ্রীষ্টানদিগের পরাজয়ে যে সমস্ত ভিন্ন ধর্ম্মালম্বী ইস্‌লামের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মৌলবীগণের আত্মকলহ দর্শনে তাঁহারাও তখন—"ও সব ধর্ম্মমতের কিছু ঠিক নাই, যার যা আছে, তার তাই ভাল; ভগবানের নিকট সব ধর্ম্মই সমান" বলিয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম ঘসিয়া মাজিয়া ঠিক করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইল। মোসলমান জনসাধারণও—"মৌলবীরাই যত নষ্টের মূল"—বলিয়া আর তাঁহাদের সহিত তদ্রূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না। এই সমস্ত গোলযোগে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পথ রুদ্ধ হইলেও বঙ্গভূমির দুরদৃষ্টবশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারের পথ আর পুনর্মুক্ত হইল না!

---

* 'মোহাম্মদী' আখ্যাধারী নানা সম্প্রদায় আছে। তন্মধ্যে নজ্‌দ-নিবাসী আবদুল ওহাবের পুত্র মোহাম্মদের মতানুসরণকারী সম্প্রদায়ই আমাদের লক্ষ্যস্থল। ইহারা ঘোর ধর্ম্মদ্রোহী।—সায়েকাতুল-মোস্‌লেমীন দ্রষ্টব্য।

† কাফের—বিধর্ম্মী; মরদুদ—বহিস্কৃত; মোর্‌তেদ—ধর্ম্মদ্রোহী; বেদীন—ধর্ম্মহীন।

‡ ফৎওয়া—ব্যবস্থা, বিধান।

এই আত্মকলহ ক্রমে বদ্ধমূল ও বহুব্যাপী হইবার উপক্রম হইলে এতৎপ্রতি সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কতিপয় জমিদার ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া এক সাধারণ সভা আহ্বানপূর্ব্বক উক্ত আত্মকলহ মীমাংসা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রথমতঃ পুলিসের তত্ত্বাবধানে সদর জেলা বা কোন মহকুমার উপর সভা করিবার প্রস্তাব হইল; কিন্তু সরকারী তত্ত্বাবধানে মূল বিষয়ের আলোচনায় অনেক অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে মনে করিয়া কোন বিশিষ্ট পল্লীগ্রামেই সভা আহ্বান করা সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায় সকলের মতে কুসুমপুরেই স্থান নির্দ্ধারিত হইল।

সভার নির্দ্দিষ্ট দিনে কুসুমপুর জনস্রোতে ভাসিতে লাগিল। জমিদার-দিগের বহির্ব্বাটীতে অবস্থিত "নূর মঞ্জিলে"র পার্শ্বস্থ সরোবরের দক্ষিণের উন্মুক্ত প্রান্তরেই সভার স্থান হইয়াছিল। প্রায় পঁচিশ তিরিশ হাজার লোক সমবেত হইয়া বিস্তৃত প্রান্তরখানি একেবারেই ভরিয়া গেল। প্রান্তরের উত্তর পার্শ্বে সুবৃহৎ সামিয়ানার তলে আলেমদিগের * জন্য বিস্তৃত ফরাশ † করিয়া স্থান নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল। তথায় সমস্ত সম্প্রদায়ের আলেমগণ উপবেশন করিলেন। আলেমগণের বিছানার উপরেই সভাপতির আসন। সভাপতির আসনের পার্শ্বে প্রায় একশত চেয়ার; চেয়ারগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপাত্র আলেম এবং সম্ভ্রান্ত জমিদার ও শিক্ষিত লোকদিগের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। সভাপতির আসনের প্রায় পঞ্চাশ হাত পশ্চাতে এক অস্থায়ী তাঁবু। তাঁবুর তিন-দিক্ দৃঢ়ভাবে আবৃত; উত্তরে দরওয়াজা; দক্ষীণে ঘন চিকের আড়ালে লাল, নীল রঙ্গে রঞ্জিত পুরু পর্দ্দা। তাঁবুর অভ্যন্তরে জমিদার বাটীর ও সমাগত সুশিক্ষিত মহিলাবৃন্দের বসিবার স্থান।

* আলেম—ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান। † ফরাশ—বিছানা।

যথাসময়ে সভা আরম্ভ হইল। প্রথমে কোন প্রসিদ্ধ আলেমকেই সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য জমিদার আনোয়ার আলি সাহেব প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু এক সম্প্রদায়ের আলেম সভাপতি হইলে অন্য সম্প্রদায়ের অসুবিধা হইবে বলিয়া মতভেদ ও বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হওয়ায় অবশেষে মওলানা নজির হোসেন সাহেবের প্রস্তাবে চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেবই সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। জনৈক ক্বারী * পবিত্র কোরানের সুমধুর আয়ত † যোগে সভার উদ্বোধন করিলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

সভাপতির আদেশে সুন্নী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিন্দুস্থানী প্রচারক মওলানা আবদুর-রব সাহেব ও কলিকাতা কলেজের স্বনামধন্য আরব্য অধ্যাপক মোহাদ্দেস ‡ মওলানা নজির হোসেন সাহেব, মোহাম্মদীগণের মুখপাত্র মওলানা আবদুন্নূর সাহেব, নেচারীগণের মুখপাত্র মৌলবী মিঃ ফজ্‌লে আলম বি-এ সাহেব এবং কাদিয়ানীগণের মুখপাত্র মৌলবী খাজা নুরদ্দিন এম-এ সাহেব পর পর উঠিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। প্রত্যেকেই নিজ সম্প্রদায়ের সত্যতা ও অন্য সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি সম্বন্ধে সাধ্যপক্ষে যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণ প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় সকলেই নামাজ পড়িতে প্রস্তুত হইলেন। সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

পর দিন প্রভাতেই সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। লোক-সমাগম পূর্ব্বদিন অপেক্ষাও অধিক হইল। আজও চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। পুলিস ও জমিদারী সেরেস্তার প্রায় দুই শত লোক অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শান্তি রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইল।

---

* ক্বারী—বিশুদ্ধ কোরানপাঠক। † আয়ত—শ্লোক। ‡ মোহাদ্দেস—হাদিস-শাস্ত্রজ্ঞ।

আবুল ফজল এই মহাধর্ম্মসভায় যোগদানের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি নবীন মওলানা খোন্দকার আতাওর রহমান সাহেবের সহিত কুসুমপুরে গমন করিলেন। পাঠক বোধ হয় ভুলিয়া যান নাই যে, আতাওর রহমান খোন্দকার পীর-মহম্মদ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি এই বৎসরেই হিন্দুস্থান হইতে হাদিস ও তফসীরের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'ফাজেল' ও 'মোহাদ্দেস' উপাধি লাভ করিয়া দেশে আসিয়াছেন। তবে বয়স ও দূরদর্শিতার অভাবে সমাজে এখনও তাঁহার নাম তেমন ফুটিয়া বাহির হয় নাই।

আবুল ফজল ও আতাওর রহমান প্রথম দিন সাধারণ আলেমদিগের সহিত ফরাশে বসিয়াই ওয়াজ * ও বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। সমাগত মুখপাত্র আলেমদিগের মধ্যে তিনি কেবল মাত্র মওলানা নজির হোসেন সাহেবকেই চিনিতেন। তিনি আরবিতে এম-এ দিবার আশায় কলিকাতা থাকাকালীন উক্ত প্রসিদ্ধ মওলানা সাহেবের নিকটেই প্রাইভেট আরবি পড়িতেন। মওলানা সাহেব অসাধারণ প্রতিভাশালী ছাত্র পাইয়া অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে আরবি সাহিত্যের সহিত কোরান, হাদিস, তফসীর, ফেকা, আকায়েদ, অসুল, মোনাজেরা ও ফালাছাপা † সম্বন্ধেও শিক্ষপ্রদান করিয়াছিলেন। আবুল ফজল অল্পদিনের চেষ্টায়ই ঐ সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য মওলানা সাহেব তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। আবুল ফজল বি-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া মওলানা সাহেবের সহিত দেখা করিলে তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাকে আরবিতে এম-এ দিবার জন্য

* ওয়াজ—ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতা। † ফেকা—বিধান শাস্ত্র; আকায়েদ—বিশ্বাস শাস্ত্র, অসুল—সূত্র শাস্ত্র; মোনাজেরা—তর্ক ও বিচার শাস্ত্র; ফালাছাপা—বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র।

উত্তেজিত করিয়াছিলেন। প্রথমে আবুল ফজলের ইতিহাসে এম-এ দেওয়াই ইচ্ছা ছিল; পরে মওলানা সাহেবের উৎসাহে তিনি আরবিতে এম-এ দিবার জন্য আগ্রহান্বিত হন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি বাড়ী আসিয়া যে সব কারণে আর কলিকাতা যাইতে পারেন নাই, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, আবুল ফজল প্রথম দিনের সভা ভঙ্গের পর বিদেশ হইতে সমাগত অন্যান্য আলেমদিগের সহিত 'নূর-মঞ্জিলে' অবস্থান করিলেন। সেইখানেই মওলানা সাহেবের সহিত তাঁহার দেখা হইল। মওলানা সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন,—"বাবা, তুমি এখানে থেকে আমার সাতে দেখা কর নাই কেন? আমি ভাল ইংরেজী জানি না, কাজেই কাদিয়ানী ও নেচারীদিগের নিকট কোন কোন বিষয়ে আমাকে বড়ই অপ্রস্তুত হতে হয়। যাহা হউক, তুমি কাল অবশ্য আমার নিকট থাকিও; অনেক আবশ্যক হতে পারে।" মওলানা সাহেবের বাক্যে আবুল ফজল অসম্মত হইলেন না। পরদিন যথাসময়ে আবুল ফজল ও আতাওর রহমান মওলানা নজীর হোসেন সাহেবের সম্মুখে বিছানার উপর বসিলেন।

আজ সর্ব্বপ্রথমে সকলকে তীব্র ভাবে আক্রমণপূর্ব্বক কাদিয়ানী মৌলবী সাহেব এক বক্তৃতা করিলেন। সে বক্তৃতায় তিনি পঞ্জাবের গোলাম আহমদ কাদিয়ান সাহেবকে দৃঢ়তার সহিত 'প্রতিশ্রুত মেহদী বা পুনরাগত ইসা মসীহ'* বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তৎপরে মহম্মদী মওলানা

* ধর্ম্মের অবনতির সময়ে মহাত্মা এমাম মেহদী আবির্ভূত ও মহাপুরুষ ইসা-মসীহ অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-সংস্কার করিবেন, ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে। কাদিয়ানীগণ গোলাম-আহমদ কাদিয়ানকেই উক্ত মেহ্দী ও মসীহ বলিয়া ঘোষণা করেন; কিন্তু মোসলমান বা খ্রীষ্টান কেহই তাহা স্বীকার করে না।

সাহেব কাদিয়ানী ও নেচারীদিগকে স্পষ্ট প্রমাণের সহিত কাফের বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক সুন্নত জামাত—হানিফী, শাফিয়ী * প্রভৃতি সর্ব্বজনমান্য মজহাব-চতুষ্টয়কে আক্রমণ করিলেন। অবশ্য ইহাদিগকে তিনি ইসলামের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া না দিলেও বেদাতী,† এমন কি মোশরেক ‡ পর্য্যন্ত বলিতে ক্ষান্ত হইলেন না। তৎপরে নেচারী মৌলবী সাহেব উঠিয়া অস্বাভাবিক উদারতার সহিত সকলকেই প্রকৃত মোসলমান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি পরস্পর দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতিকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস নামে অভিহিত করিয়া সগর্ব্বে বলিলেন,—"যাহারা নিজেকে মোসলমান বলে ও কলেমা পড়ে, তাহারা শিয়া হৌক, সুন্নী হৌক, আস্তিক হৌক, নাস্তিক হৌক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না; তাহারা সকলেই মোসলমান।" সুন্নী সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মনেতা এমাম-আজম মহাত্মা আবু-হানিফা মহোদয়ও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ "আহলে-কেব্‌লা' কাহাকেও কাফের বলা যাইবে না §।" এই কথাই ঠিক "মোসলমান মাত্রই ভাই ভাই, একের সহিত অপরের কোনই ভেদ নাই" ¶ ইত্যাদি। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের কল্পিত সিদ্ধান্ত, নানা বিক্ষিপ্ত মতের চর্ব্বিত চর্ব্বণ এবং ভ্রান্ত বিবেকবাদের বিশৃঙ্খল যুক্তি-তর্কই তাঁহার বক্তৃতার ভিত্তি।

উল্লিখিত বক্তৃতাসমূহ শেষ হইলে মওলানা নজীর হোসেন সাহেব উঠিয়া বলিলেন, "আজ আমি আমার একজন প্রিয় ছাত্রকে সকলের কথার উত্তর দিবার জন্য উপস্থিত করিব।" এই কথা বলিয়া তিনি সভাপতি

---

* অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী মোস্‌লেম-গৌরব মহাত্মা এমাম-আজম আবু-হানিফা এবং বিদ্বানকুল-শিরোভূষণ মহাত্মা এমাম শাফিয়ী মহোদয়ের মতানুসরণকারিগণ।

† বেদাতী—অভিনব কার্য্যকারী। ‡ মোশ্‌রেক—অংশীবাদী।

§ হেদায়া। ¶ কোরান ও হাদিসের শিক্ষার মর্ম্ম।

মহোদয়ের আদেশ প্রার্থনা করিলেন। চৌধুরী সাহেব গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে আপনার এমন ছাত্র?" মওলানা সাহেব "এইখানেই আছেন" বলিয়া আবুল ফজলকে নিকটে ডাকিলেন। আবুল ফজল দণ্ডায়মান হইলে চৌধুরী সাহেব ও অন্যান্য সকলেই অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত সেই তরুণবয়স্ক যুবকের প্রতিভাপ্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিলেন। চৌধুরী সাহেব অনুচ্চ স্বরে মওলনার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার বাড়ী কোথায়? এত অল্পবয়স্ক বালক, এরূপ গুরুতর বিষয়ের উত্তর দিতে পারবে কি?"

মওলানা সাহেব। গ্রাম আমি ঠিক বল্‌তে পার্‌ব না; তবে আপনাদের এই জেলায়ই ইঁহার বাড়ী। ইঁনিই গত বৎসর বি-এ পরিক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। আপনি এঁকে জানেন না?

চৌধুরী সাহেব। ও! আলিনগরের আফতাব-উদ্দিন মিঞার পুত্র; নাম শুনেছি, কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। চৌধুরী সাহেব অনিমেষ নয়নে সেই স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যমণ্ডিত তেজোদৃপ্ত যুবকের প্রফুল্ল চেহারা দেখিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্য হইতে—"এত ছোট বালক কি বলিবে"—বলিয়া একটা আপত্তি-কোলাহল উত্থিত হইল। তচ্ছ্রবণে মওলানা নজীর হোসেন সাহেব বলিলেন,—"আপনাদের উত্তর হওয়া আবশ্যক! ছোট-বড় বা যুবক-বৃদ্ধ দেখিবার আবশ্যক কি?"

"আবশ্যক আছে বৈ কি? শেষে বালকের কথা বলে একটা ওজর তুল্‌বেন।"

"বেশ আমরা কোনই ওজর তুল্‌ব না। বালকের কথায় ভুল হয়, আমরাই হার মান্‌ব। আর সম্ভব হইলে আপনারাও বালকের দ্বারা উত্তর দিতে চেষ্টা কর্‌বেন। তাতেও আমরা কোন আপত্তি করব না।"

কেহ আর কোন আপত্তি করিলেন না। আবুল ফজল সভাপতি চৌধুরী সাহেব ও মওলানা সাহেবের আদেশে অতিমাত্র সাহসে ভর দিয়া বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইলেন। নিস্তব্ধ জনমণ্ডলীর কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি একলক্ষ্যে তাঁহার উপর পতিত হইল; আতঙ্ক ও সঙ্কোচে তাঁহার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত নম্রতার সহিত সকলকে সম্বোধন করিয়া—"ইসলামই আল্লাহ্‌তালার মনোনীত ধর্ম্ম" কোরানের এই পবিত্র আয়ত-যোগে মধুর স্বরে বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তাঁহার অনুচ্চ স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল; বক্তব্য বিষয় থামিয়া থামিয়া বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং যুক্তিতর্ক জড়িত হইয়া যাইতে লাগিল। সভাপতি মহোদয় ও সমবেত জনমণ্ডলী, এমন কি মওলানা নজীর হোসেন সাহেবও কথঞ্চিৎ নিরাশ হইলেন; কোথায় আবুল ফজলের সেই প্রতিভাস্ফুরিত বক্তৃতা ও তর্কশক্তি? সকলের মুখেই চিন্তার অস্পষ্ট ছায়া প্রতিফলিত হইল; আবুল ফজল কেন এরূপ দুঃসাহস করিয়া ছিলেন?

কিন্তু কয়েক মিনিট অতীত হইতে না হইতেই আবুল ফজলের সঙ্কোচ ও আতঙ্ক দূরীভূত হইল। তাঁহার কণ্ঠস্বরও ক্রমে উচ্চ ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তখন সকলের মুখেই আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আবুল ফজল ধীরে ধীরে পূর্ব্বতন বক্তাগণের বক্তৃতার সারাংশ লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। সূক্ষ্ম সমালোচনা প্রভাবে তাঁহাদের মতামতের ভিত্তিগুলি বিচক্ষণতার সহিত ধরিয়া দৃঢ়তা সহকারে তাঁহার প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি এইবার তীব্র পঞ্চমে উঠিল; তাঁহার তেজঃপ্রদীপ্ত রক্তাভ ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্য হইতে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। তাঁহার জ্বলন্ত ভাষা সভাস্থলে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ ঢালিয়া দিল। সমবেত জনমণ্ডলী তাঁহার বক্তৃতার

বাঁধুনি, ভাষার তেজ, শব্দবিন্যাসের চাতুর্য্য, যুক্তির জোর ও তর্কের তাৎপর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সকলেই নির্ব্বাক নিস্তব্ধ ভাবে তাঁহার অনলোদ্‌গারিণী বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন; তাঁহার বিদ্যুদ্‌বর্ষী বর্ণনার মোহমদিরা পানে সকলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। মুহুর্মুহুঃ 'মারহাবা' * ধ্বনিতে সভাস্থল কম্পিত ও মুখরিত হইতে লাগিল!

আবুল ফজল কোরান-হাদিসের অকাট্য প্রমাণের সহিত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সংযোগ করিয়া দৃঢ়তার সহিত প্রত্যেকের মতসমূহ খণ্ডন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মতামতগুলির ভ্রান্তি-প্রদর্শনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সভাস্থল প্রকম্পিত করিয়া বলিলেন,—"আমি যাহা বলিলাম, যদি ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকে কিংবা এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, প্রতিবাদ বা প্রশ্ন করুন; আমি উহার যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে এবং ঐ সম্বন্ধে সঙ্গত বাদ-প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত আছি।"

সভাপতির আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমে কাদিয়ানীর এম-এ, মৌলবী সাহেব উঠিয়া তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে অনর্গল ইংরেজী বকিয়া আবুল ফজলকে স্তব্ধ করিতে চেষ্টিত হইলেন; সুতরাং তিনি কোরান-হাদিসের বিক্ষিপ্ত ইংরেজী অনুবাদাংশ প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার প্রত্যুত্তরে আবুল ফজলের উন্নত ধরণের বিশুদ্ধ ইংরেজী প্রতিবাদ শুনিয়া কাদিয়ানী সাহেবের চক্ষু স্থির হইল। অল্পক্ষণের তর্ক-বিতর্কেই কাদিয়ানী সাহেবের কার্দ্দানি† চূর্ণ হইয়া গেল! মসীহ সম্বন্ধে তর্ক তুলিয়া আবুল ফজল তাঁহাকে অতি সহজেই নিরুত্তর করিয়া দিলেন। কাদিয়ানীগণের প্রচারিত আজগবী

---

* মার্‌হাবা—অভ্যর্থনা, ধন্যবাদ ও প্রশংসাজ্ঞাপক আনন্দধ্বনি।

† কার্দ্দানি—[illegible]

কেরামত * ও অদ্ভুত মতসমূহ তিনি অধিকাংশই অস্বীকার করিলেন ; কিন্তু আবুল ফজল চোখে আঙ্গুল দিয়া কোরান-হাদিস ও ইসলাম সম্বন্ধে কাদিয়ানীগণের কুমত ও ইতিহাসবিরুদ্ধ কথাগুলি দেখাইয়া দিলে কাদিয়ানী মৌলবী সাহেব বিষম লজ্জিত হইলেন। তাঁহাদের খ্রীষ্টান বিজয়ের অস্ত্রগুলি সুন্নী মোসলমানের কাছে একেবারেই অকর্ম্মণ্য ও ব্যর্থ হইল দেখিয়া তিনি নিরাশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন।

এইবার নেচারী মৌলবী সাহেব উঠিলেন ; কিন্তু তাঁহার মুখখানি বড়ই শুষ্ক! আবুল ফজলের ইংরেজী শুনিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বেই ইংরেজী বলার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি সহজ ভাবেই স্বীয় উদারতারু বহরগুলি পেশ করিতে লাগিলেন ; তিনি বলিলেন,—"মুসলমানগণ পরস্পর ভ্রাতা ; তাঁহারা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করিবে কেন ? সমাজে মতভেদ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে ; কিন্তু তার জন্য আত্মকলহ ঝগড়া বিবাদ করা কখনও মোস্লেম-যোগ্য কাজ বা উদার ইস্লামের অনুমোদিত বিধি হইতে পারে না। এমাম সাহেব বলিয়াছেন,—'আহলে-কেব্লাগণ সকলেই মোসলমান।' হাদিসেও আছে, 'মোসলমানের পক্ষে মোসলমানের ক্ষতি করা উচিত নহে ; কারণ উহা মহাপাপ।' এ অবস্থায় আমাদের মতে "যিনি যেমন আছেন, তিনি তেমনি থাকুন এবং পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া সমাজের উন্নতি করুন।"

আবুল ফজল প্রথমে নেচারী মৌলবী সাহেবের নিকট তাঁহার কথার শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাহিলেন ; কিন্তু তিনি ঠিক ভাবে কোন প্রমাণ দিতে না পারিয়া এলোমেলো বকিতেছেন দেখিয়া আবুল ফজল বলিলেন,—"জনাব, আপনার কথার একটুও মূল্য নাই ; উহা ভ্রান্ত বিবেকবাদের অস্পৃশ্য

---

* কেরামত—অলৌকিক নিদর্শন। কাদিয়ানীরা গোলাম আহমদ-সাহেবের অনেক হাস্যকর কেরামত বয়ান করিয়া থাকে,—যেমন জলাতঙ্ক আরোগ্য করা প্রভৃতি।

উদ্গার ও অনর্থক বাক্য মাত্র!" 'যে যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিবে' ইস্‌লাম এমন ছেলেখেলার ধর্ম্ম নহে! আপনার এ সব কথা সত্য হইলে কোরান-হাদিসের আবশ্যক কি? কিন্তু কোরান-হাদিস ছাড়া যে ধর্ম্ম কিছুই নহে, একথা কে না বুঝে? 'মোসলমান ভাই ভাই; মত-ভেদ পূর্ব্বেও ছিল এবং এখনও আছে', একথা আমিও মানি। কিন্তু সে মতভেদেরও একটা সীমা আছে। যে ইস্‌লামের গণ্ডি ছাড়িয়া গিয়াছে, সে কি মোসলমান? যে 'ফরজ' প্রত্যাখ্যান করে, সে কি মোসলমান? যে খোদা-রসুলকে মানে না, ইস্‌লামী ধর্ম্মবিশ্বাস মানে না, অথচ নিজকে 'আহলে-কেব্‌লা' * বলে, সে কি মোসলমান? সকলেই বলিবেন, সে মোসলমান ত নহেই, বরং কাফের, মোশ্‌রেক বা মোর্‌তেদ প্রভৃতি। ঐ অবস্থায় যে মোসলমানই নহে, সে মোসলমানের ভাই হইবে কেমন করিয়া? সুতরাং আপনার "ভাই ভাইয়ের" অজুহাত ব্যর্থ ও নিষ্ফল। মতভেদ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, অতি ঠিক কথা; কিন্তু সে মতভেদ ধর্ম্ম-বিশ্বাসে নহে—ক্রিয়া-কলাপে মাত্র; উহাতে বিশেষ কিছুই আসে-যায় না। কিন্তু যদি ধর্ম্ম-বিশ্বাসে মতভেদ হয়, তবেত ধর্ম্মই থাকিল না। সেরূপ মতভেদ কি উপেক্ষণীয়? নিশ্চয়ই নহে। কেহ যদি রসুলকে রসুল, রোজা নামাজ প্রভৃতি ফরজকে ফরজ বলিয়া না মানে, তবে ত ধর্ম্মের মূলই উড়িয়া গেল; এরূপ মতভেদ কখনই মার্জ্জনীয় নহে। এরূপ মতভেদের স্থলেও যদি বিবাদ করা মোসলমানোচিত কার্য্য না হয়; তবে মোসলেম কুলশিরোমণি হজরত আবুবকর, হজরত ওমর ও জগদ্‌বিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিতগণ কেহই ত মোসলমানোচিত কার্য্য করেন নাই। কারণ প্রথম মহাত্মাগণ নামাজ প্রত্যাখ্যানকারী ও জাকাৎ † অস্বীকারকারী মোসলমান নামধারীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত মহাত্মা-

* আহলে-কেব্‌লা—এক লক্ষ্যগামী, এক কেন্দ্র-অবলম্বী। † জাকাৎ—দানবিশেষ।

গণ ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা লইয়া সমধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত ঘোর বাদানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। আপনি কি বলিতে চান, তাঁহারা মোসলমানোচিত কার্য্য করেন নাই? এরূপ বলা ত দূরের কথা, যে মনে করে, সে পাগল ভিন্ন আর কিছুই নহে। "যে যেমন আছে, সে তেমন থাক"—ইহা এক উন্মত্ত প্রলাপোক্তি! কারণ তাহা হইলে কোরান-হাদিসের দরকার কি? ধর্ম্মশাস্ত্রের আবশ্যক কি? লেখাপড়া শিক্ষা করারই বা স্বার্থকতা কি? এবং এরূপ হইলে হিন্দুকেই বা মোসলমান করার চেষ্টা কেন? খ্রীষ্টানের সঙ্গেই বা বিবাদ করা কেন? ফলতঃ আপনাদের এই সমস্ত ভিত্তিহীন মত নাস্তিকতার নামান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে।" সকলে 'মার্‌হাবা' ধ্বনিতে সভা কম্পিত করিয়া তুলিল; শুষ্ককণ্ঠ নেচারী মৌলবী সাহেব হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

এইবার বিরাট্‌ পাগড়ী-শোভিত মহম্মদী মওলানা সাহেব উঠিলেন। তিনি আবুল ফজলকে বলিলেন,—"আপনি কাদিয়ানী কাফের ও নেচারী নাস্তিকদিগের বিষদাঁত যেরূপে চূর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। কিন্তু আপনাদের সহিত আমাদের কয়েকটী বিষয়ে মতভেদ আছে, আমি তাহাই এক এক করিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

আবুল ফজল। বেশ আপনি এক এক করিয়াই জিজ্ঞাসা করুন।

মহম্মদী মওলানা। ইস্‌লাম এক; ইস্‌লামের খোদা এক, রসুল এক; এক কোরান ও এক হাদিস। এই ইস্‌লাম কি দুই হইতে পারে?

আঃ ফজল। নিশ্চয়ই না; ইস্‌লাম কখনও দুই হইতে পারে না।

মঃ মওলানা! তবে আপনারা এক ইস্‌লামকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া চারি মজ্‌হাব* গঠন করিয়াছেন কেন?

আঃ ফজল। আপনাদের ঐটীই ভুল ধারণা। আমরা ইস্‌লামকে চারি ভাগে বিভক্ত করি নাই। চারি মজ্‌হাব প্রকৃতপক্ষে ইস্‌লামের একই সুন্নী সম্প্রদায়ের চারিটী শাখা।

মঃ মওলানা। তথাপি চারিটী মজ্‌হাব ত? কিন্তু ইস্‌লাম একই মজহাব; উহা একাধিক বা চারি মজহাবে বিভক্ত হইতে পারে না। যেমন আল্লাহ্‌তালা কোরান শরীফে বলিয়াছেন,—'তোমরা একত্রে আল্লার রজ্জু ধারণ কর; কদাচ দলে দলে বিভক্ত হইও না।"—কিন্তু আপনারা যে চারি দলে বিভক্ত হইয়াছেন!

আঃ ফজল। পুর্ব্বেই বলিয়াছি, উহা আপনাদের বুঝিবার ভুল। উক্ত আয়তের "আল্লার রজ্জু" অর্থ 'ইস্‌লাম'। আল্লাহতালা সকলকে একত্রে ইস্‌লামের অনুসরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন। 'দলে দলে বিচ্ছিন্ন হইও না' অর্থ ইস্‌লামকে খণ্ড খণ্ড করিও না; কিংবা ইস্‌লামের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করিও না। একতায় আবদ্ধ হওয়াও ঐ আয়তের অন্যতম অর্থ। শরিয়তের ফরুয়াত * রীতি-নীতিতে বিভিন্ন মতাবলম্বন করা ঐ আয়তে নিষিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে জগতের সমস্ত মোসলমানই ঐ আয়তের লঙ্ঘনকারী বলিয়া গণ্য হইবে; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ হজরতের সহচরগণ হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের সমস্ত মোসলমানই কোন না কোন রীতিনীতিতে বিভিন্ন মতাবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা বিভিন্ন মতাবলম্বী বা বিভিন্ন দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কারণ এ বিভিন্ন মতের প্রমাণ কোরান শরীফেও আছে, যেমন—"তোমাদের জন্য আমি মুক্তির বহু পথ নির্দ্ধারণ করিয়াছি।" অন্যত্র "রসুল, নবী, সিদ্দিক ও শহিদ-গণের পথাবলম্বনের" আদেশ আছে। কোরান শরীফের প্রথম সুরায়

* অর্থাৎ [illegible]

"আল্লার করুণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পথ প্রদর্শনের জন্য" প্রার্থনা করিবার কথা আছে। সুতরাং আমাদের চারি মজ্‌হাবে কোন কোন রীতি নীতিতে মতভেদ থাকিলেও ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আমরা একমতাবলম্বী এবং এক সুন্নী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন চারিটী শাখাস্বরূপ একই ইস্‌লামের অনুসরণকারী। বিশেষতঃ যে জগদ্বিখ্যাত চারি মহাত্মার মতানুসারে ইস্‌লামের এই চারি মজ্‌হাব গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা যে খোদাতালার করুণাপ্রাপ্ত মহাপুরুষ, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই।

মঃ মওলানা। আচ্ছা, আপনার কথা যদি সত্য হয়, তবে চারি মজ্‌হাব ভিন্ন আরওত সত্যপথাবলম্বী মজ্‌হাব হইতে পারে? কেবল চারি মজ্‌হাবই সত্যপথ এবং নির্দ্দিষ্ট চারি এমাম সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে কেন? খোদার করুণাপ্রাপ্ত মহাপুরুষ ও এমাম ত আরও আছে।

আঃ ফজল। আছে সত্য! কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে চারি এমামের শ্রেষ্ঠত্ব কেন হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে অসমর্থ। জগতের সমস্ত নবীর মধ্যে চারিজন নবীকে, সমস্ত সাহাবার মধ্যে চারি জন সাহাবাকে, সমস্ত নারী জাতির মধ্যে চারিজন রমণীকে এবং সমস্ত কেতাবের মধ্যে চারিটী কেতাবকে যিনি শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন। সত্যপথাবলম্বী মজ্‌হাব আরও হইতে পারে, তাহাও সত্য; কিন্তু হয় নাই কেন? এবং জগতের প্রায় সমস্ত ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ ও সাধারণ মোসলমান এই মজ্‌হাব চতুষ্টয়েরই অনুসরণ করিলেন কেন, তাহার হেতু আপনিই বুঝিয়া দেখুন। মওলানা সাহেব, বলুন ত, এই চারি মজ্‌হাব ভিন্ন জগতে আর কোন পরিপূর্ণ মজ্‌হাব আছে কি?

মঃ মওলানা। সে কথা পরে বলিব; কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট মজ্‌হাবে আবদ্ধ হইতেই হইবে, কোন এমামের মত মানিতেই হইবে, ইলাম তথা কোরান-হাদিসে ইহার কোন বিধান আছে কি?

আঃ ফজল। নিশ্চয় আছে; কোন সামান্য বিষয়ও যখন শৃঙ্খলা ব্যতীত চলিতে পারে না, তখন ধর্ম্মের মত গুরুতর বিষয় মজ্‌হাব অনুযায়ী বিধিবদ্ধ নিয়মাধীন না হইয়া চলিতে পারে কি? এমাম বা নেতার মত গ্রহণ করার বিধান কোরানেও আছে, যেমন,—“তোমরা আল্লা, রসুল ও আদেশদাতা—এমামগণের অধীনতা স্বীকার করিবে” এবং “যদি তোমরা না জান, আহলে-জেকের অর্থাৎ অভিজ্ঞ এমামগণের নিকট জিজ্ঞাসা কর।”

মঃ মওলানা। কিন্তু উহার মতভেদ স্থলে কোরান হাদিস-সম্মত মীমাংসার বিধান আছে। অতএব আমরা নানা দল, নানা মজ্‌হাবের বাঁধাবাঁধি পরিত্যাগ করিয়া একদল, এক মহম্মদী হইয়া যাই না কেন? বৃথা ব্যক্তিবিশেষের মতানুসরণ করিব কেন?

আঃ ফজল। আপনার প্রস্তাব অসঙ্গত ও অসম্ভব! কারণ জগতের প্রত্যেক লোক ব্যক্তিবিশেষের মতানুসরণ ত্যাগ করিয়া কখনও স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব মত গঠন করিতে পারে না। বিশেষতঃ কোরান-হাদিস হইতে বিধিব্যবস্থা বাছিয়া বা নির্দ্ধারিত করিয়া লওয়া সাধারণতঃ এক দুরূহ ব্যাপার। অল্পজ্ঞানীরা ঐরূপ করিতে গেলে প্রত্যেকেই এক এক রূপ বুঝিয়া এক একটা পৃথক মত গঠন করিয়া লইবে। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তিবিশেষের মতানুসরণ করা অপেক্ষা নিরাপদ ও সঙ্গত ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? সকলে মিলিয়া এক দল হইতে পারিলে তার অপেক্ষা আর কল্যাণের কথা কিছুই নাই; কিন্তু তাহা হইবার নহে। চারি দল ভাঙ্গিয়া এক দল করিতে গেলে অন্ততঃপক্ষে চল্লিশটী দল হইয়া পড়িবে। উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। আপনি বলেন, আমরা এক হইতে চাই, ভাল কথা; কিন্তু আপনারা স্ব স্ব মতবাদসহ যে প্রণালীতে এক হইবার দাবী করেন, উহা কখনই সম্ভবপর নহে। এই

দেখুন, আপনারা সামান্য একদল লোক অল্প দিনের মধ্যে একশত মতের স্থষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের মতানুসরণ করা ব্যতীত উপায় নাই এবং ব্যক্তিবিশেষের মতালম্বন করিতে হইলেই চারি মজ্‌হাবের এক মজ্‌হাবের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। কারণ তাঁহাদের মত সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তি জগতে কে আছেন? তৎপর আপনাদের মহম্মদী প্রভৃতি উপাধির কথা; ঐ সমস্ত উপাধী মন্দ নহে; কিন্তু উপাধিগুলি আপনাদেরই মনগড়ান। কারণ আল্লা ও রসুল আমাদিগকে ইস্‌লাম, মোসলেম ও মোমেন ভিন্ন ঐ সমস্ত উপাধি দেন নাই। আহলে-হাদিস, মহম্মদী প্রভৃতি উপাধি গৌরবজনক এবং উহার অর্থও ভাল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি ভাল উপাধি হইলেই তাহা গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে আহমদী, আহলে-কোরান, আহলে-ইস্‌লাম ওহাবী, বাবী প্রভৃতি উপাধির অপরাধ কি?

মঃ মওলানা। আপনার কথা অনুসারে তবে এক হইবার কোনই উপায় নাই?

আবুল ফজল। থাকিবে না কেন? আপনারা মহম্মদী দলের কয়েক সহস্র লোক একতার জন্য পিপাসী হইয়াছেন। আর আমরা চারি মজ্‌হাবভুক্ত সুন্নী সম্প্রদায়ের প্রায় চল্লিশ কোটী মোসলমান বহু-কাল হইতে একতার অনুসরণ করিতেছি। সুতরাং এক হইতে হইলে আপনাদেরও আমাদের সহিত মিলিত হওয়া উচিত।

মঃ মওলানা। আপনার মতে তাহা হইলে বড় দল দেখিয়াই কি তাহার অনুসরণ করা আবশ্যক?

আঃ ফজল। নিশ্চয়ই। হজরত বলিয়াছেন,—"আমার ভক্তগণ কখনও ভ্রান্তিতে মণ্ডলীবদ্ধ হইবে না।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "তোমরা মতভেদের স্থলে সর্ব্ববৃহৎ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করিবে।"

মঃ মওলানা। সর্ব্ববৃহৎ সম্প্রদায় অর্থ সাহাবার * সম্প্রদায় নহে কি ?

আঃ ফজল। আশ্চর্য্য! সাহাবার সম্প্রদায় কে বা কাহারা নহে ? কিন্তু 'সাহাবার' সহিত 'সর্ব্ববৃহৎ' শব্দের সম্বন্ধ কি ? আপনার কথা-মত সর্ব্ববৃহৎ শহর অর্থ সাহাবার শহর, সর্ব্ববৃহৎ গৃহ অর্থ সাহাবার গৃহ এবং সর্ব্ববৃহৎ গাছ ও মাছ অর্থ সাহাবার গাছ ও মাছ বুঝিতে হইবে কি ? আপনার মত আলেমের মুখে এ সব কথা শুনিলে হাসি পায়!

মঃ মওলানা। কেবল বৃহৎ দল ছাড়া কোন বিশেষ লক্ষণও ত থাকা চাই।

আঃ ফজল। নিশ্চয় আছে ;—মক্কা, মদীনা ও শিরিয়া দেশের মোসলমানের আদর্শ গ্রহণ করুন ; কারণ হজরত বলিয়াছেন,—"সর্প যেমন নিজ গর্ত্তে অবস্থান করে, ইস্‌লামও সেইরূপ মক্কা ও মদীনায় অবস্থান করিবে †।" "শিরিয়াদেশের উপর খোদার রহমত অবতীর্ণ হউক" ‡ মওলানা সাহেব কত শুনিবেন ; ঐ সমস্ত পবিত্র স্থানে এই চারি মজ্‌হাবই সুপ্রতিষ্ঠিত।

মঃ মওলানা। সাপ ত গর্ত্ত ছাড়িয়া অন্যত্রও ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে! মক্কা, মদীনা এবং শিরিয়া দেশে মন্দলোকও ত আছে। কিন্তু—

আবুল ফজল বাধা দিয়া বলিলেন,—"মৌলবী সাহেব! এ সব অজ্ঞোচিত যুক্তি ও বালকোচিত বাক্‌চাতুরি রাখুন। আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি ?

সাম্প্রদায়িক প্রধান প্রধান অস্ত্রগুলি ব্যর্থ হইল দেখিয়া মোহাম্মদী মৌলবী সাহেব ক্ষুণ্ণ হইলেন ; তিনি অন্যান্য যে সমস্ত তর্ক করিলেন, আবুল ফজল অতি সহজেই তাহা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। § অনন্তর আবুল

---

* সাহাবা—হজরতের সহচর। † বোখারী ও মোস্‌লেম। ‡ মেশকাত।

§ যাহারা ইস্‌লামের সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা মওলানা রুহোল আমিন সাহেবের মজহাব-বিষয়ক গ্রন্থমালা পাঠ করুন।

ফজল হাদিস, তফসীর, এজ্‌মা ও কেয়াস সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া এবং সেই সঙ্গে উক্ত মজহাবের ত্রুটী ও রহস্যসমূহ ব্যক্ত করিয়া মওলানা আবদুন্নূর সাহেবকে ঘোর ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। মওলানা সাহেব কোন বিষয়েরই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না। অনন্তর "মজ্‌হাব সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিব"—বলিয়াই তিনি ক্ষোভে অভিমানে মাথা হেট করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সুন্নী মোসলমানগণের "মারহাবা! মারহাবা!" প্রভৃতি গগনস্পর্শী উল্লাসধ্বনিতে কুসুমপুর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। চৌধুরী সাহেব, মওলানা নজীর হোসেন সাহেব, মৌলবী অবদুর রব সাহেব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আলেমগণ আবুল ফজলকে আন্তরিকতার সহিত গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বিরুদ্ধবাদী আলেমগণও ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন। কেবল কাদিয়ানী ও নেচারী সাহেব এই গোলযোগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। খানিকক্ষণ আনন্দ-উল্লাসে অতিবাহিত হইল। তখনও বেলা ছিল; তাই সকলে এক-যোগে আবুল ফজলকে ইস্‌লাম ও ভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলেন। সকলের অনুরোধে আবুল ফজল অন্যান্য ধর্ম্মের অসারতা এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের সত্যতা ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে মোহিত করিলেন। অনন্তর সান্ধ্য প্রার্থনার সময় আগত হওয়ায় সভা ভঙ্গ হইল। জনপ্রবাহ আবুল ফজলের যশে দেশ মুখরিত করিয়া চারিদিকে প্রধাবিত হইল। কয়েকদিন লোকের মুখে কেবল এই কথা ভিন্ন আর কথা ছিল না।

আবুল ফজল খাস আলমেগণের সহিত নুরমঞ্জিলে অভ্যর্থিত হইলেন; চৌধুরী আনোয়ার আলি মহাসমাদরে সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। পরদিন আবুল ফজল বিদায় হইয়া আতাওর রহমানের সহিত বাটী রওয়ানা হইলেন। পথে আতাওর রহমান বিস্মিত ভাবে বলিলেন,

"ইংরেজী পড়েও এত ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করা যায়! আমিত স্তম্ভিত হয়েছি।" আবুল্ ফজল বলিলেন,—"চেষ্টা থাক্‌লে আবশ্যকমত একটু একটু শিক্ষা করা যায় বৈকি।"

আঃ রহমান। কিন্তু একি আর একটু একটু? এযে মওলানার ওস্তাদী শিক্ষা!

আবুল ফজল। আপনি ত হিন্দুস্থান হইতে মওলানাগীরি পাস করে এসেছেন; এইবার তবে আলিনগরী পাস্‌টা করে নিন।

আফসার। যাই বলুন, আপনি যেরূপ সূক্ষ্ম আলোচনার দ্বারা বিরুদ্ধাচারীদের মত খণ্ডন করেছেন, আমার বিশ্বাস, মওলানা নজীর-হোসেন সাহেবও ওরূপ পার্‌তেন না। কিন্তু আমি বুঝতে পার্‌ছি না, কিরূপে এবং কোথায় আপনি ধর্ম্মের এরূপ বিভিন্ন বিভাগের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইলেন?

আঃ ফজল। আপনার বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। আমি প্রধানতঃ মওলানা নজীর হোসেন সাহেবের নিকটেই এগুলি শিক্ষা করেছি; অন্যান্য বিষয়গুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাদপ্রতিবাদ-বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকা পাঠেই অবগত হয়েছি।

অতঃপর উভয়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিতে করিতে বাড়ী উপস্থিত হইলেন। আফতাব-উদ্দিন-মিঞা অন্যান্য লোকমুখে আবুল ফজলের ধর্ম্মবিষয়ক অভিজ্ঞতা অবগত হইয়া যারপরনাই আনন্দ ও শান্তি ভোগ করিলেন।

চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব আবুল ফজলের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যমণ্ডিত প্রতিভা-প্রদীপ্ত চেহারা দেখিয়া এবং তাঁহার অতুলনীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া পূর্ব্বেই তৎপ্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তদুপরি সভাক্ষেত্রে স্বচক্ষে তাঁহার অসীম সাহস, অভূতপূর্ব্ব গুণগরিমা ও অসাধারণ অভিজ্ঞতা

দেখিয়া এবং সকর্ণে তাঁহার জ্বলন্ত ভাষা ও বিচক্ষণতাপূর্ণ বিদ্যুৎবর্ষী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন। তিনি রাত্রে যখন বিবি সাহেবার সহিত আবুল ফজলের বিদ্যাবত্তা, প্রতিভা ও গুণগরিমার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে সহসা কন্যা সালেমা সৌন্দর্য্যে গৃহ উদ্ভাষিত করিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং স্বহস্তে প্রস্তুত কতিপয় উৎকৃষ্ট ফলের মোরব্বা নাস্তা করিবার জন্য পিতার নিকট সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আব্বা! আজ শেষে যে মৌলবী সাহেব বক্তৃতা কর্‌লেন, উনি কে?"

চৌধুরী সাহেব। সকলের শেষে যে অল্পবয়স্ক মৌলবী সাহেব বক্তৃতা কর্‌ছিলেন?

সালেমা। হাঁ! তাঁর কথাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

চৌধুরী সাহেব। তাঁর নাম মৌলবী আবুল ফজল। বাড়ী পুঁটী-খোলার নিকট আলিনগরে।

সালেমা। তিনি বোধ হয় কেবল মৌলবীই নহেন, ইংরেজীও সম্ভব খুব ভাল জানেন?

চৌধুরী সাহেব। ইংরেজী যে কেবল ভালই জানেন তা নয়; তিনিই গত বৎসর বি-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন।

সালেমা। তাই ত! নইলে কি ঐরূপ অনর্গল ইংরেজী বল্‌তে পারা যায়। মৌলবী সাহেবের ঐরূপ ইংরেজী বলা শুনে আমি ত অবাক্!

ইতিমধ্যে বিবি সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি ইংরেজী পড়ে আবার অত ধর্ম্মবিষয় শিখ্‌লেন কিরূপে?"

সালেমা। বাস্তবিক, প্রথমে যখন তাঁর আরবি পড়া শুন্‌লাম, তখন আমরা মনে কর্‌লাম যে, একজন পাকা মওলানা।

চৌধুরী সাহেব মোরব্বার খণ্ড মুখে দিতে দিতে বলিলেন,—"প্রকৃতই তাঁর অভিজ্ঞতা দেখে আমিও অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। তোমরা বোধ হয় দেখ নাই, তিনি অতি অল্পবয়স্ক যুবক মাত্র!

সালেমা। আমি একবার দেখ্‌ছিলাম;—খালা-আম্মা * যখন তাঁর বক্তৃতায় উত্তেজিত হয়ে চিকের পার্শ্বস্থ পর্দ্দা তুলে ফেলেছিলেন,—তখন।

বিবি সাহেবা। আমিও সেই সময়ে একবার দেখেছিলাম। খুব কম বয়স; বোধ হয়, পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের বেশী হইবে না।

চৌঃ সাহেব। আচ্ছা তাঁর বক্তৃতা তোমাদের কাছে কেমন লাগ্‌ল?

বিবি সাহেবা। খুব সুন্দর বক্তৃতা! বক্তৃতার সময়ে উত্তেজিত হয়ে মেয়েরা অনেকেই এ উহার ঘাড়ে ঝুকে পড়্‌ছিল!

সালেমা। সকলের চেয়ে তাঁর বক্তৃতাই খুব ভাল হয়েছিল।

বিবি সাহেবা। তাঁর সঙ্গে অন্যের তুলনাই হয় না; চেহারাও খুব সুন্দর; বোধ হয় আমাদের আশরফের চেয়েও উজ্জ্বল চেহারা!

চৌধুরী সাহেব। তা মিথ্যা নয়। মুখমণ্ডলের দীপ্তি ও চোখ দুটি এত উজ্জ্বল যে, আমি এরূপ আর কেউকে দেখ্‌ছি বলে মনে পড়ে না।

পিতা-মাতা এক অপরিচিত যুবকের রূপগুণ বর্ণনা করিতেছেন এবং তিনি তাহার সহিত যোগ দিয়াছেন, সহসা এই কথা মনে হওয়ায় এবং বিবি সাহেবা আশরফের সহিত আবুল ফজলের তুলনা করায় সালেমা একটু লজ্জিত হইলেন; এক অব্যক্ত ভাবের আভা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি ফিল্টার হইতে পানি ঢালিয়া পিতার সম্মুখে সংরক্ষণপূর্ব্বক ঈষৎ সলজ্জ ভাবে স্থির সৌন্দর্য্য-প্রতিমার মত ধীর গতিতে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

---

* খালা-আম্মা—মাসি-মা; ফুফু-আম্মা—পিসি-মা।

নবম পরিচ্ছেদ।

শুভ পরিণয়।

ফুল্ল ফজর * ; ঊষার শুভ্র হাসি বহুক্ষণ হইল গগনপ্রান্তে মিশিয়া গিয়াছে ; প্রভাতের শান্ত বাতাস এখনও ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। নবীন সূর্য্যের কনক আভা গাছের আগায়, লতায়-পাতায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পল্লী-কৃষকেরা গরু-বাছুর মাঠে লইয়া আনন্দের সহিত অরুণ-রাগ-রঞ্জিত সতেজ তৃণদল দেখিয়া দেখিয়া বাঁধিয়া দিতেছে। নদী, ঝিল ও পুকুরের ঘাটে পল্লী-নরনারীবৃন্দ নব প্রভাতের নবীন আনন্দ লইয়া হাত মুখ ধুইতেছে। কেহ স্নান করিতেছে, কেহ কলসী ভরিয়া জল লইতেছে ; কেহবা অন্যরূপ কাজে নিরত। কিন্তু সকলের প্রাণেই নব জাগরণের নবীন চেতনা ; সকলের মুখেই নব প্রভাতের নবীন স্ফূর্ত্তি। তমসামুক্ত ধরণী যেন নব প্রভাতের স্নিগ্ধ স্ফূর্ত্তিমাখা উজ্জ্বল আলোকস্পর্শে আনন্দে হাস্য করিতেছে ! আকাশে বেলা দুই দণ্ডের অধিক নহে।

এমন সময়ে আলিনগরের মিঞাবাড়ীর বৈঠকখানার সম্মুখে সুসজ্জিত বেশ-ভূষাবিভূষিত জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে একটী মাত্র চাকর। তিনি যখন বৈঠকখানার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন আফতাব-উদ্দিন মিঞা উহার এক পার্শ্বে বসিয়া 'অজিফা' পড়িতেছিলেন। তিনি সচরাচর একাকী এবং আবুল ফজল বাড়ী থাকিলে তাঁহার সহিত একত্রে ফজরের নামাজ পড়িতেন। তৎ-

* ফজর—প্রভাত।

পর বেলা চারি দণ্ড পর্য্যন্ত 'অজিফা' পাঠের পর দুই রেকাত 'এশ্‌রাকের' নামাজ পড়িয়া গাত্রোত্থান করা তাঁহার বহুদিনের অভ্যাস। ইহার পরে তিনি বাড়ীর মধ্যে গিয়া বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত কন্যাদ্বয়কে কোরান শরিফ, শরিয়তের কেতাব ও একটু একটু বাঙ্গলা পড়াইতেন। অনন্তর নাস্তা করিয়া অন্যান্য কাজকর্ম্ম দেখিতেন। কিন্তু আবুল ফজল বাড়ী থাকিলে তিনি প্রায় বেলা একপ্রহর পর্য্যন্তই অজিফা পড়িতেন। কারণ আবুল ফজলই ভগিনীদ্বয়কে পড়াইয়া দিতেন। তাঁহারাও পিতা অপেক্ষা ভ্রাতার নিকটে পড়িতেই অধিক আনন্দ অনুভব করিতেন।

কিন্তু অদ্য আগন্তককে দেখিবামাত্র আফতাবউদ্দিন মিঞা অসম্পূর্ণ অজিফা রাখিয়া দিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং আগন্তুক ব্যক্তি সালাম করিলে তিনি সসম্ভ্রমে সালামের জওয়াব দিয়া তাঁহার সহিত 'মোসাফাহ্‌' * করিলেন। অনন্তর তাঁহার হাত ধরিয়া সযত্নে একখানি চেয়ারের উপর বসাইলেন এবং আবুল ফজলকে ডাকিয়া সত্বর বিছানা আনিতে আদেশ করিলেন।

আবুল ফজল তখন ভগিনীদ্বয়কে পড়া বলিয়া দিতেছিলেন। 'মসলার'† কেতাবের 'রোজার' ‡ অধ্যায়ের খানিকটা পড়িয়া করিমন উঠিয়া মাতাকে সাহায্য করিবার জন্য রন্ধনগৃহে চলিয়া গেলেন। হাস্যানন্দময়ী সমীরন আরও খানিকক্ষণ পড়িবার জন্য উক্ত কেতাব রাখিয়া কয়েকজন প্রসিদ্ধ মোসলমান নরনারীর জীবনী-সংবলিত একখণ্ড বাঙ্গলা পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলে, আবুল ফজল কথায় কথায় পুস্তক-লিখিত মনস্বী নর-নারীগণের জীবন সম্বন্ধে পুস্তকের লেখা হইতেও অনেক অতিরিক্ত বিষয় তাঁহাকে শিখাইয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপ শিখিতে সমীরনেরও বড় আনন্দ হইত। সমীরন ভ্রাতারই ন্যায় প্রতিভাশালী, বুদ্ধিমতী ও সুচতুরা।

* মোসাফাহ—করমর্দ্দন। † মসলা—ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পদ্ধতি। ‡ রোজা—উপবাস।

আবুল ফজল সমীরনের নিকট ধর্ম্ম-প্রাণতার পুণ্য ছবি জননী খোদেজা, অতুলনীয় স্মৃতি ও ধীশক্তি-সম্পন্না জননী আয়েশা, পিতৃভক্তি ও পতিপ্রাণতার আঁধার-স্বরূপিণী স্বর্গরাণী ফাতেমা, মহাতপস্বিনী রাবেয়া, বীরাঙ্গণাকুলগৌরব মহাশক্তিসম্পন্না খাওলা ও চাঁদ সুল্তানা, সৌন্দর্য্য ও প্রতিভার প্রতিমূর্ত্তি নূরজাহান ও রিজিয়া, অনুপম দানশীলা সম্রাজ্ঞী জোবেদা এবং বিদুষীকুলভূষণা ফখরন্-নেসা, জেবুন্নিসা প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত মোস্‌লেম মহিলাবৃন্দের বিবরণ বিবৃত করিতেছিলেন, এমন সময়ে পিতা কর্ত্তৃক বহির্ব্বাটীতে বিছানা লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি বিছানা সহ বহির্ব্বাটীতে গিয়া দেখিলেন, কুসুমপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব চেয়ারে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং আফতাব-উদ্দিন মিঞা পার্শ্বস্থ তক্তপোষের উপর বসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতেছেন। আবুল ফজল চৌধুরী সাহেবকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সালাম ও আদাব করিলেন। চৌধুরী সাহেবও প্রফুল্ল মুখে সালামের উত্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া সস্নেহে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আবুল ফজল সংক্ষেপে নিজ কুশল বলিয়া তক্ত-পোষের উপর বিছানা করিতে লাগিলেন। বিছানা করা হইলে তদুপরি তাকিয়া ও বালিস প্রভৃতি পাতিয়া আবুল ফজল বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন। আফতাব-উদ্দিন মিঞার অনুরোধে চৌধুরী সাহেব বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেম এবং কিরূপে পূর্ব্বদিবস অসময়ে বাটী হইতে রওয়ানা হইয়া নৌকাপথে ঘুরিয়া পূর্ব্বরাত্রে অনেক কষ্টে আলমডাঙ্গার ঝিলে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে সকালেই যেরূপ নামিয়া আসিয়াছেন, তদ্বিষয় গল্প করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এরূপ অপ্রত্যাশিত আগমনের উদ্দেশ্য কি? তাহা তিনিও ব্যক্ত করিলেন না এবং ভদ্রতার অনুরোধে আফতাব-উদ্দিন মিঞাও জিজ্ঞাসা করিলেন

না। সে বিষয় প্রত্যেকেই মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই আবুল ফজল চৌধুরী সাহেবের নাস্তার জন্য শরবত, মোরব্বা, পরেটা, হালুয়া এবং ডিমের কাবাব, কোপ্তা ও ভাজি প্রভৃতি উপস্থিত করিলেন। তদ্দর্শনে চৌধুরী সাহেব সহাস্যে বলিলেন,—“একি! আপনারা আমার আসার সংবাদ পেয়ে এ সমস্ত পূর্ব্ব হতেই তৈয়ার করে রেখেছিলেন নাকি?” প্রত্যুত এতগুলি জিনিস কি করিয়া এত শীঘ্র প্রস্তুত হওয়া সম্ভব এবং এগুলি প্রস্তুত করিতে কুলমহিলাগণের একাধিক নিপুণ হস্ত কিরূপ কার্য্যকরী হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চৌধুরী সাহেবের ধারণা খুব কমই ছিল। কারণ সাধারণতঃ জমিদার বাড়ীর এক একটী হুকুম কত বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করিয়া শেষে উহা তামিল হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় বড় লোকদের বন্ধুবান্ধবদিগকে বলিয়া দেওয়া একান্তই অনাবশ্যক।

যাহা হউক, শিষ্টতাসম্মত উত্তর দিয়া আফতাব-উদ্দিন মিঞা চৌধুরী সাহেবকে নাস্তা খাইতে অনুরোধ করিলেন। চৌধুরী সাহেব এবং তাঁহার অনুরোধে আফতাব-উদ্দিন মিঞা—উভয়েই একত্রে নাস্তা খাইতে লাগিলেন। নাস্তা নিঃশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটী গল্পও নিঃশেষিত হইল।

নাস্তা খাওয়া হইলে চাকর রেকাবী-পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া গেল। আবুল ফজল পান আনিয়া দিয়া স্বয়ং নাস্তা খাইবার জন্য বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন। পান চর্ব্বণ করিতে করিতে চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব আফতাব-উদ্দিন মিঞাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ভাই সাহেব, আমি এক বিষয়ে বিশেষ আশা করে নিজেই আপনার কাছে এসেছি। যদি আপনি ভরসা দেন, তবে উহা জিজ্ঞাসা করতে পারি।”

আফতাব-উদ্দিন মিঞা বলিলেন,—"চৌধুরী সাহেব! আপনারা দেশের সর্ব্বজনমান্য জমিদার। খোদার ফজলে ধন, সম্পদ, যশ ও মান-সম্ভ্রম আপনাদের চির সহায়। যাহা বলিবার থাকে, হুকুম করুন; সাধ্যপক্ষে এ গরীবের দ্বারা উহা পালনে কোন ত্রুটি হইবে না।"

চৌধুরী সাহেব বলিলেন,—"ভাই সাহেব! আপনি যাহা বলিলেন, খোদার ফজলে তাহা একেবারে অসত্য নহে। কিন্তু আমাদের সমস্ত সম্পদ হতেও আপনি একটী বহু মূল্যবান্ সম্পদের অধিকারী। আপনার সেই অমূল্য সম্পদে আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও একটী ভাগ বসা'তে চাই; তাতে আপনি অসম্মত হইবেন না ত?"

আফতাব-উদ্দিন মিঞা বুঝিতে পারিয়া আনন্দোৎফুল্ল মুখে বলিলেন, "গরীবের এমন কি সম্পদ আছে, যাহা দেশের মুকুটমণিস্বরূপ জমিদার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ!"

চৌধুরী সাহেব বলিলেন,—"আপনি কি বুঝ্‌ছেন না? আমার একমাত্র কন্যাসন্তানের পরিবর্ত্তে আপনার খোদাদত্ত অমূল্য সম্পদ পুত্রটীকেই আমি চাই। বলুন ইহাতে আপনার সম্মতি আছে কি না?"

দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার লক্ষপতি চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী একমাত্র কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য আবুল ফজলকে প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার পিতার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হওয়া ত স্বাভাবিক। তিনি হর্ষোৎফুল্ল মুখে বলিলেন,—"চৌধুরী সাহেব! আমরা গরীব, গরীবের পক্ষে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী জমিদারের সহিত আত্মীয়তা করা কি সঙ্গত? সে আত্মীয়তা কি স্থায়ী হইবে? আর আমরা কোন্ সাহসে আপনাদের সহিত সম্বন্ধ করিতে অগ্রসর হইব? পূর্ব্বগৌরবের কথা ছাড়িয়া দিন্; কিন্তু এখন আমাদের কি আছে? আবুল ফজল যা কিছু সামান্য লেখা

পড়া শিখেছে, তা যদি সে নিজে যোগাড় করে নিতে না পার্‌ত, তবে আমার দ্বারা হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এরূপ অবস্থায় আপনাদের মত লোকের সঙ্গে 'নসব' * করা আমাদের পক্ষে কতদূর সঙ্গত ও সম্ভবপর, তাহা আপনিই ভাবিয়া বলুন।"

চৌধুরী সাহেব বলিলেন,—"আপনি যা বল্‌ছেন, তা একেবারে মিথ্যা নয়! অবস্থা-বৈষম্যে আত্মীয়তা অনেক স্থলেই অশান্তিতে পরিণত হয়, তাহাও সত্য। কিন্তু ইহা সমাজের পক্ষে শুভ নহে। ধন-জন ও ঐশ্বর্য্য-সম্পদ সমস্তই খোদাতালা দান করেন; তিনি ইচ্ছা করিলে ইহা নিয়েও যেতে পারেন। কিন্তু ধনবানেরা ধনের গর্ব্বে অন্ধ হয়ে যদি সমাজের গুণবানদের গুণের আদর না করেন এবং গুণবান্ ব্যক্তিরাও যদি কেবল নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সমশ্রেণী ভিন্ন উচ্চ ও নীচ শ্রেণীতে স্বীয় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা না করিয়া, তাদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকেন, তবে সমাজের কল্যাণের কোনই আশা নাই। বিশেষতঃ সম্বন্ধাদি কেবল নিজ ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, বরং খোদাতালার মর্‌জির + উপরও অনেকটা নির্ভর করে। অন্য আপত্তি যা' বল্‌ছেন, তার কোনই অর্থ নাই; কারণ আমি যখন নিজে ইচ্ছা করেই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হচ্ছি, তখন ইহার সমস্ত ভারই আমি বহন কর্‌ব। আপনার কেবল সন্তুষ্টির সহিত সম্মতি চাই; তাই দিচ্ছেন কিনা বলুন?"

আফতাব-উদ্দিন মিঞা সানন্দে বলিলেন,—"আপনার অমায়িক সহানুভূতিপূর্ণ প্রস্তাবে আমি কৃতার্থ হইলাম; খোদার মরজি, এ কাজ হ'লে আমি খুব সুখীই হ'ব। তবে নিজ সম্মতি জ্ঞাপনের পূর্ব্বে আমি স্বীয় পরিজন ও আত্মীয়গণের মত জানা আবশ্যক বোধ করি। যদি আপনি

---

* নসব—সম্বন্ধ। + মর্‌জি—ইচ্ছা।

অসন্তুষ্ট না হন, কয়েক দিন পরে আমি আপনাকে সংবাদ দেওয়াই ভাল মনে করি।”

চৌধুরী সাহেব। এত খুব ভাল কথা; আত্মীয়-স্বজন ও পরিজনবর্গের মতামত গ্রহণ না করে স্ব-ইচ্ছায় সকল কাজ করা আমিও ভাল মনে করি না। আমি পনর দিন পরে আপনাকে আত্মীয়স্বজনসহ নিমন্ত্রণ করে যাচ্ছি। সকলের মত হ'লে আপনি নির্দ্ধারিত তারিখে অবশ্য গরীবখানায় পদার্পণ কর্‌বেন; কারণ মেয়ে দেখাও ত আবশ্যক। আর যদি কিছু মনে না করেন, তবে আপনি আবুল ফজলকেও সঙ্গে নিবেন। আবুল ফজলও যদি মেয়ে দেখ্‌তে চায়, তাতেও আমার আপত্তি নাই; বরং আমি ইহাতে সন্তুষ্টই হব। কারণ ইস্‌লামের লুপ্ত সামাজিক সুপ্রথাগুলিকে ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত করা একান্ত দরকার। আর যদি আপনাদের মত না হয়, আমাকে নির্দ্ধারিত দিনের অন্ততঃ চারি পাঁচ দিন পূর্ব্বে সংবাদ দিবেন।

চৌধুরী সাহেবের কথায় আফতাব-উদ্দিন মিঞা সানন্দে সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন চলিতে লাগিল। আফতাব-উদ্দিন মিঞার আদেশ ও নির্দ্দেশ মত আবুল ফজলের মাতা পুত্র ও কন্যাদ্বয়ের সহায়তায় অল্পক্ষণের মধ্যে কোর্মা, পোলাও, জরদা ও ফির্‌ণী প্রভৃতি অনেকগুলি মূল্যবান্ সুখাদ্য প্রস্তুত করিলেন। যথাসময়ে বিস্ময় ও পরিতৃপ্তির সহিত আহারাদি সমাপন করিয়া চৌধুরী সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চৌধুরী সাহেবের বিদায়ের পর আফতাব-উদ্দিন মিঞা বাটীর মধ্যে গমনপূর্ব্বক চৌধুরী সাহেবের প্রস্তাব বিবৃত করিয়া বিবি সাহেবার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। বিবি সাহেবা সানন্দে স্বীয় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। উচ্চ ঘরে—বিশেষতঃ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদারের

কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ হইবে, ইহাতে কোন্ জননীর প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত না হয়। আবুল ফজলের ভগিনীদ্বয়ও এ সংবাদে যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু স্বয়ং আবুল ফজল এ প্রসঙ্গে তদ্রূপ আনন্দ বা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না; তিনি বরং মাতার নিকট সলজ্জ বিনীতভাবে ঐরূপ অসম অবস্থাপন্ন বড়লোকের সহিত সম্বন্ধ করার কতিপয় অসুবিধা ও কুফল দেখাইয়া প্রকারান্তরে স্বীয় অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বিবি সাহেবা পুত্রের সঙ্গত বাক্যে একটু চিন্তা করিয়া স্বামীর নিকট পুত্রের মতামত জ্ঞাপন করিলেন। আফতাব-উদ্দিন মিঞা পুত্রের অসম্মতি শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার অন্তরও একটু কাঁপিয়া উঠিল! তবে কি আবুল ফজল এখনও আজিজাকে ভুলিতে পারে নাই এবং সেই জন্যই কি বিবাহে অনিচ্ছা? তিনি ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আবুল ফজল কেন অসম্মত, তাহা বলেছে কি?"

বিবি সাহেবা বলিলেন,—"সে বলে যে, ঐরূপ বড় ঘরে বিয়া করলে আত্মীয়তা স্থায়ী হওয়া অসম্ভব। কারণ ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে তাঁরা আমাদের উপর একটু প্রভাব বিস্তার করবেনই; সেই প্রভাবটুকু মেনে তাঁদের আনুগত্য স্বীকার না করলেই অসদ্ভাবের সূত্রপাত হবে। অথচ ঐরূপ আনুগত্য স্বীকার করতে গেলে নিশ্চয়ই আমাকে জীবনের অনেক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হতে হবে। এমনও হতে পারে যে, উপযুক্ত খেদমতের অভাবে আপনারাও আমার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন না।"

আফতাব-উদ্দিন মিঞা তৎ-শ্রবণে সহাস্যে বলিলেন,—"এরই জন্য আপত্তি! আবুল ফজলের মত পুত্রের দ্বারাও যদি এইরূপ সন্দেহের আশঙ্কা থাকে, তবে সংসারে পুত্র-কন্যা না হওয়াই ভাল। সে যাই হোক, তুমি আবুল ফজলকে বল, সে এই বিবাহ করলেই আমরা সুখী

হব ; ভবিষ্যতে সে যদি আমাদিগকে ভুলে, আমাদের খেদমত না করে থাক্‌তে পারে, আমরা অসুখী হ'ব না।”

বিবি সাহেবা আবুল ফজলকে সব কথা বলিলেন। পিতা মাতার আগ্রহ দর্শনে আবুল ফজল আর আপত্তি করিলেন না।

আবুল ফজলদের আত্মীয়-স্বজন সকলেই এ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সকলেই আফতাব-উদ্দিন মিঞাকে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন।

নির্দ্ধারিত দিবস আফতাব-উদ্দিন মিঞা আত্মীয়-স্বজন সমভিব্যাহারে কুসুমপুর যাত্রা করিলেন। দেশাচার বশতঃ লজ্জাবশে আবুল ফজল পিতার সহগামী হইতে সম্মত হইলেন না!

চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব মহা আড়ম্বর ও ধূমধামের সহিত আত্মীয়স্বজন সহ আফতাব-উদ্দিন মিঞাকে অভ্যর্থনা করিলেন। চৌধুরী সাহেবের আদর-আপ্যায়নে তাঁহারা একেবারে মুগ্ধ হইলেন। দুইদিন মহা আমোদ-আহ্লাদে অতিবাহিত হইল। অনন্তর যথানিয়মে আফতাব-উদ্দিন মিঞা অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক সালেমাকে দর্শন * করিয়া কতিপয় সুবর্ণ মোহর প্রদান করিলেন। সালেমার পক্ষ হইতে উক্ত মোহরগুলি চারিগুণ করিয়া সালামী স্বরূপ প্রদান করা হইল। আফতাব-উদ্দিন মিঞা সালেমাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্যান্য পরিজন-

---

* পশ্চিম বাঙ্গালার মোসলমান ভ্রাতৃগণ কি মনে করিবেন, কে জানে? কারণ তাঁহাদের দেশে কোন কোন স্থলেই বোধ হয়, বাড়ীর মেয়েরা পাত্রীর বাড়ী গমনপূর্ব্বক ক'নে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশ—পূর্ব্ব বাঙ্গলায় যতদূর জানি, তাহাতে কোন স্থানেই অপরের বাড়ীতে স্ত্রীলোক পাঠাইয়া ক'নে দেখিবার রীতি প্রচলিত নাই। বরং স্থানবিশেষে পিতা-পিতৃব্য প্রভৃতি গুরুজনেরাই মেয়ে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু শরিয়তের সহিত উক্ত প্রথা দুইটীর কোনটীরই তেমন সদ্ভাব নাই।

দিগের সহিত আলাপ পরিচয় করণান্তর বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন। আলেম-ফাজেলগণ পরামর্শ করিয়া ঐ সময়ের দুই মাস অন্তে—নববসন্তের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম তারিখে বিবাহ সম্পাদনের দিন স্থির করিলেন। দিন স্থির হওয়ার পরে আফতাব মিঞা বিদায় হইয়া বাটী রওয়ানা হইলেন। যাত্রাকালে অন্যান্য বাজে খরচের জন্য চৌধুরী সাহেব তাঁহার হস্তে সহস্র টাকার একখণ্ড নোট প্রদান করিলেন।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা বাড়ী গিয়া দ্রুততার সহিত বাড়ী-ঘর সংস্কার করিলেন। দেখিতে দেখিতে দুই মাস অতীত হইয়া গেল। বিবাহের দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। আর তিন দিন মাত্র বাকী।

নব বসন্তের স্বপ্নস্পর্শে হাস্যময়ী ধরিত্রীর সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত; নব আনন্দের নবীন চেতনায় বিশ্ববাসী উৎফুল্ল; নব পত্র-বিভূষিত বৃক্ষলতা নবীনস্ফূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত; নব প্রস্ফুটিত কুসুমগন্ধে নব প্রবাহিত মলয়বায়ু বিভোর; নবাগত বিহঙ্গের সঙ্গীতের মধুর ছন্দে নব সজ্জাপরিহিত বনকুঞ্জ মুখরিত! নবীনতার নব উল্লাসে বিশ্ব-জগৎ মাতোয়ারা! এহেন শুভলগ্নে আবুল ফজল ও সালেমার বিবাহের ফুল ফুটিল; নবদম্পতির শুভ সম্মিলন উৎসবে যোগদানের জন্যই যেন আলিনগর ও কুসুমপুর নবীন সজ্জা পরিধান করিয়া আনন্দে, আবেগে, হর্ষে-উচ্ছ্বাসে উন্মাদিত হইয়া উঠিল।

আলিনগর ও কুসুমপুরের দূরত্ব পাঠক জানেন। কিন্তু নিত্য যাতায়াতে পল্লীদ্বয় যেন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিল। কুসুমপুর হইতে নিত্য নানাবিধ রাশি রাশি দ্রব্য আলিনগরে আনীত হইতে লাগিল।

শুভ যাত্রার দিবস আফতাব-উদ্দিন মিঞা আত্মীয়স্বজন সহ সমগ্র আলিনগরবাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন

করাইলেন। লজ্জা সঙ্কোচ ও মানসিক অশান্তির জন্য বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন না। আফতাবউদ্দিন মিঞা স্বয়ং তাঁহাকে ডাকিতে গেলেন; কিন্তু তিনি নানা ওজর করিয়া নিজে না আসিয়া পুত্র মতিয়র রহমান ও বাটীর অন্যান্য সকলকে পাঠাইয়া দিলেন এবং আবুল ফজলের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ মতিয়র রহমানকে বরযাত্রী হইতেও আদেশ করিলেন। তাঁহারা সকলেই আসিয়া সানন্দে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। বিবাহের দিন আবুল ফজল স্বেচ্ছামত খরচপত্র করিবার জন্য চৌধুরী সাহেবের নিকট হইতে স্বতন্ত্রভাবে পাঁচশত টাকা উপহার পাইলেন। তিনি টাকাগুলির সদ্ব্যবহারের জন্য মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন এবং বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গৃহস্থপাড়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আজ যত লোক তাঁহার চক্ষে পড়িতে লাগিল, সকলেই তৎপ্রতি আন্তরিক প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। আজ দেশের গৌরবস্বরূপ এই যুবকের উপর পাড়ার সমস্ত লোকের প্রাণভরা স্নেহ আশীর্ব্বাদ যেন সহস্র ধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি প্রথমে স্বীয় পাড়ার দরিদ্র ও বিধবাগণকে সাহায্য করিয়া পরে গৃহস্থপাড়ায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমে তুফানউল্লার বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার স্ত্রী ভিখারিণীর ন্যায় জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছে এবং একজনেরও অনুপযোগী অল্প বাসি ভাত লইয়া তুফানউল্লার পুত্রদ্বয় কলহ ও ক্রন্দন করিতেছে। আবুল ফজল তাহাদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তুফানউল্লার স্ত্রী কাঁদিয়া বলিল,—"বাবা! অবস্থা আর কি জানাব? সেই মারামারির পর ঘরে যা ধান টান ছিল, তা সেই মোকদ্দমার সোমায়ই সব খরচ হইয়া যায়; তারপর তানি * জেলে গেলে নিরুপায় অইয়া বড় মিঞার আশ্রয় নেলাম। তানি কিছুদিন সাহায্যও করলেন; কিন্তু নিত্য কে

* তানি—তিনির অপ উচ্চারণ।

কারে সাহাযিয় করে? জমিজাতি যা ছিল, তা বিনা চাষে খিল অইয়া গেছে। এতদিন ভিক্ষায় বাইর অইতি অইত; কেবল বড় মিঞার মেয়ে আজিজার দয়ায় কোন রকম বাঁইচা আছি। তাও মতির মার ভয়ে রোজ যাইতি পারি না। কি যে করব, কিছু ঠিক পাইতেছি না। একবার ইচ্ছা হয়, ভিক্ষায় যাই; ওদের কষ্ট আর দেখ্‌তি পারি না। আবার ভাবি, যে জালেম *! বাড়ী আইসা যদি শোনে যে, পাড়ায় পাড়ায় গেছি, তা অইলি কি আর রক্ষা আছে।"—বলিয়া তুফানের স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল। আবুল ফজল তাহাকে পঞ্চাশটী টাকা দিয়া বলিলেন,—"যখন একান্ত ঠেক, আমাকে খবর দিও।" কৃতজ্ঞ তুফানের স্ত্রী আশীর্ব্বাদ করিল,—"বাবা কেবল জমিদারের মেয়ে বিয়ে নয়, আল্লা যেনি তোমারে জমিদার বানায়।"

অনন্তর আবুল ফজল নাজেমের বাড়ী গেলেন। নাজেম জেলে যাওয়ার পর তাহার স্ত্রী নিজ বাপের দেশের একটা লোকের সহিত বাহির হইয়া গিয়া 'নিকা' বসিয়াছে। তাঁহার মাতা এখন ভিক্ষা করিয়া খায়। আজিজাও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। আবুল ফজল তাহাকে পঁচিশটী টাকা প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা আবুল ফজলকে "হাকিম হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অতঃপর আবুল ফজল রোস্তম খাঁর বাড়ী গিয়া জানিলেন,—তাহার স্ত্রী বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে; বিমাতা জমাজমি ও আসবাব পত্রের কতকাংশ বিক্রয় করিয়া তাঁহার জামাতার বাড়ী আশ্রয় লইয়াছে। কেবল তাহার বোন্‌টীই একাকিনী একটী কন্যা সন্তান লইয়া বাড়ীতে আছে। তাহারও দিনপাত করা কষ্টকর। আবুল ফজল তাঁহাকেও কিছু অর্থ দান করিলেন।

* জালেম—অত্যাচারী।

এইরূপে আবুল ফজল গ্রামের বিপন্ন ও দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিয়া স্বীয় প্রাপ্য অর্থগুলির অধিকাংশই ব্যয় করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন বেলা বেশী ছিল না; নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহারাদিও শেষ হইয়া গিয়াছে। আত্মীয়স্বজনগণ নানারূপ বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া ফুল্ল মুখে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই সময়ে কুসুমপুর হইতে আবুল ফজলের বিবাহ-সজ্জা ও কতিপয় মূল্যবান্ উপহার লইয়া কয়েকজন লোক আলিনগরে উপস্থিত হইল। সকলে সেই পরিচ্ছদাদি দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আবুল ফজল বিশুদ্ধ রেশম ও স্বর্ণের কোন জিনিস ব্যবহার করিবেন না * বলিয়া প্রকাশ করায় চৌধুরী সাহেব স্বয়ং কলিকাতা হইতে এক তার রেশমের সর্ব্বোচ্চ মূল্যের বস্ত্র ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা আবুল ফজলের বিবাহ-সজ্জা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। টুপী, অঙ্গুরী, ঘড়ি, চেইন প্রভৃতি শরিয়ত রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্ম্মিত ও খচিত না হইলেও সেগুলি স্বর্ণের বহুগুণ মূল্যের হীরক ও প্রস্তরাদিতে খচিত ও ভূষিত হইয়াছিল। আবুল ফজলদের আত্মীয়স্বজনগণ বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে সেই দৃষ্টিঘাতী বহুমূল্য সাজসজ্জা ও আভরণাদি নিরীক্ষণ করিয়া প্রশংসা করিতেছিলেন। এমন সময় মগরেবের নামাজের সুমধুর আজানধ্বনি সকলের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের অলীক সংসারাসক্তি ও মানসিক মোহ সম্পূর্ণরূপে অপনোদন করিল। সকলে নামাজ পড়িতে গমন করিলেন। নামাজান্তে আত্মীয়গণ সেই সমস্ত সাজসজ্জা ও আভরণে আবুল ফজলকে সজ্জিত ও ভূষিত করিলেন। বিবাহ-সজ্জায় সুসজ্জিত আবুল ফজল "দরবারযাত্রী শাহানশাহের" মত শোভা পাইতে লাগিলেন। মনোরম সজ্জাগুণে

---

* পুরুষের পক্ষে স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করা হারাম।—হাদিস।

তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও কমনীয় মুখদীপ্তি শতগুণ প্রভান্বিত হইয়া উঠিল।

যথাবিধি বরযাত্রী রওয়ানা হইল। আবুল ফজল কুসুমপুর হইতে প্রেরিত জরির বস্ত্রাবৃত খাস পালকীতে এবং অনুসঙ্গী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও আলেমগণ পাল্‌কী, অশ্ব ও পদব্রজে গমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরম্য আলোকসজ্জা পল্লী-প্রান্তর আলোকিত করিয়া যাইতে লাগিল। অনুমান চারি ঘণ্টা পথ চলিয়া সকলে কুসুমপুরে উপস্থিত হইলেন।

কুসুমপুরের শোভা কি মনোহর! সমস্ত গ্রাম যেন আনন্দে ভাসিতেছে। জমিদারবাটী অপরূপ আলোক-সজ্জা পরিধান করিয়া উৎসবময়ী মহানগরীর ন্যায় হাস্য করিতেছে! ফুল্ল যামিনী সৌন্দর্য্যের ভারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গগনপটে সৌন্দর্য্যময়ী তারকাপুঞ্জ লজ্জায় মলিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

যথাবিধি আদর, অভ্যর্থনা ও সামাজিক শ্লেষ-রহস্যের সহিত বর-যাত্রিগণকে নূরমঞ্জিলে লওয়া হইল। নূরমঞ্জিলের সাজসজ্জা, জমিদার বাটীর ধুমধাম ও উদ্যোগ আয়োজনের বাহুল্যে পল্লীবাসী বরযাত্রিগণ বিস্ময়বিমুগ্ধ ও ত্রাসসঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

পান-শরবত প্রদান ও আহারাদি সমাপনেই রজনী অতিবাহিত হইল। প্রভাতে জমিদারগণের নিমন্ত্রিত প্রজা ও আত্মীয়স্বজনগণের আহারাদির জন্য তুমুল আয়োজন চলিল। সহস্র সহস্র লোকের আহারাদি সম্পন্ন করিতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল। চারিটার পরে জমিদারদিগের খাস আত্মীয়গণ বরের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে আসিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই বিবাহের বিরোধী ছিলেন। কারণ সামান্য অবস্থার একজন লোক কেবল লেখা-পড়ার জোরে

বিপুল সম্পত্তিশালী জমিদারের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সমশ্রেণী ও আত্মীয় বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা তাঁহাদের অনেকেরই অসহ্য। ইঁহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতেরও অভাব ছিল না। তাঁহারা জমিদার সাহেবের ভুল ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে আবুল ফজলকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আবুল ফজল সামাজিকতার অনুরোধে লজ্জা ও সঙ্কোচবশতঃ বিশেষ কোন কথাই বলিলেন না। খোন্দকার পীর মহম্মদ সাহেবের পুত্র মওলানা আতাওর রহমান ও আবুল ফজলের কয়েকটী নিমন্ত্রিত উচ্চশিক্ষিত বন্ধুই জমিদার-কুটুম্বগণের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইহাতে যাঁহারা আবুল ফজলের তেজঃপূর্ণ উজ্জ্বল চেহারা দেখিয়াই আতঙ্কিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও আবুল ফজলকে ভীত মনে করিয়া তৎপ্রতি কটাক্ষ বর্ষণপূর্ব্বক বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ চৌধুরী সাহেব অলক্ষ্যে আত্মীয়গণের এই ধৃষ্টতা বুঝিয়া তাঁহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য আতাওর রহমানকে ডাকিয়া তাঁহার দ্বারা আবুল ফজলকে বাক্যালাপের আদেশ দিলেন, এবং স্বয়ং আফতাব-উদ্দিন মিঞার সহিত স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। তখন আবুল ফজল নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। আবুল ফজলের সহিত তাঁহারা স্ব স্ব পার্থক্য বুঝিয়া সহজেই শিষ্টতা ও ভদ্রতার গণ্ডীর মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর যথাবিধি পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা মোহরের কাবিন রেজেষ্টারী হইল। সালেমার পিতা ও মামা উকিল হইয়া তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আবুল ফজল স্বয়ং আল্লার উপর নির্ভর করিয়া বিবাহের শর্ত্তসমূহে স্বীকৃতি প্রদান করিলেন। স্বীকৃতি প্রদানের পর মওলানা আতাওর রহমান সাহেব আল্লাহ ও রসুলের করুণা ও প্রশংসা এবং

নবদম্পতির কল্যাণকামনাসূচক সুমধুর 'খোৎবা' পাঠ করিলেন। খোৎবা পাঠান্তে প্রচুর মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইল। অজস্র গোলাপজল বর্ষণে জমিদারবাটী সহস্র পুষ্পোদ্যানের সৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিল। শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল।

বিবাহান্তে আবুল ফজল পত্নী-সন্দর্শনার্থ অন্তঃপুরে গমন করিলেন। অন্তঃপুরে কুল-ললনাগণ পর্দ্দার আড়াল হইতে নব জামাতাকে আদর অভ্যর্থনা করিলেন। আবুল ফজল সকলকে যথাবিধি সালাম ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক সকলের আশীর্ব্বাদ ও কল্যাণবাণীবিমণ্ডিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রেরিত হইলেন।

বহুমূল্য সাজ-সজ্জা-সমালঙ্কৃত বিস্তৃত দ্বিতল কক্ষ আলোক ও পুষ্প-মালার ভারে যেন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কক্ষমধ্যে মখমলাবৃত রৌপ্য খাটিয়া, মর্ম্মর টেবিল ও চেয়ারসমূহ সুসজ্জিত। পুষ্পশোভিত মখমলাবৃত দেওয়ালগাত্রে বহুমূল্য ফ্রেমমণ্ডিত দৃশ্যপট, দর্পণ ও বস্ত্রাদি রাখিবার স্বর্ণ আলনাসমূহ সংস্থাপিত। খাটিয়ার পার্শ্বে অতুলনীয়া সৌন্দর্য্য-প্রতিমার মত ভুবনমোহিনী সালেমা উপবিষ্টা। নিকটে একটী সুসজ্জিতা সমবয়স্কা দাসী স্মিতমুখে দণ্ডায়মানা। আবুল ফজল কম্পিত-বক্ষে ধীরপদে কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সালেমা সৌন্দর্য্যে কক্ষ তরঙ্গায়িত করিয়া স্বামীর সম্মানার্থ উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার দেহ-মন মৃদু সমীরণাহত স্বর্ণলতিকার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। দাসী সসম্ভ্রমে সালাম জ্ঞাপনপূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল। আবুল ফজল মুহূর্ত্তের জন্য সালেমার লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্যের মধুর মাধুরী দর্শন করিলেন; তাঁহার নয়ন এক অনির্ব্বচনীয় আবেশে মুগ্ধ হইয়া গেল। রমণীর এত রূপ! কল্পনায় এত সৌন্দর্য্য অঙ্কন করিতে পারে কি? অলঙ্কারের চিত্তহারিণী প্রভা এবং স্বর্ণখচিত সুরঞ্জিত বিবাহ-

সজ্জার উজ্জ্বল আবরণ ভেদ করিয়াও যেন সালেমার অঙ্গের কনককান্তি ও সৌন্দর্য্যদীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আবুল ফজল উদ্‌ভ্রান্তভাবে অগ্রসর হইয়া সালেমার সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করপদ্ম গ্রহণ করিলেন। সালেমাও স্থির ছিলেন না। উভয়ের অঙ্গস্পর্শে উভয়েই মজিলেন। সালেমা দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থ হইয়া শাহান্‌শাহ তুল্য পতির বক্ষে আত্মনির্ভর করিলেন। সেই অনুপম আবেশ বিহ্বল সৌন্দর্য্য-লতিকা বক্ষে ধরিয়া আবুল ফজলও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সালেমার সৌন্দর্য্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন। তাঁহার হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা-উদ্যম, জ্ঞান-প্রতিভা, প্রেম-ভক্তি, মায়া-মমতা ও প্রীতি-স্নেহ, এমন কি চিন্তা ও চেতনা পর্য্যন্ত সালেমাতে বিলীন হইয়া গেল। এক স্বর্গীয় আনন্দের স্বপ্নময় সুখময় মোহে নব দম্পতির শুভ রজনী ভোর হইল।

বিবাহের পরদিন সালেমা আলিনগরে নীতা হইলেন। সালেমার সহিত খাট, পালঙ্গ, চেয়ার ও টেবিল প্রভৃতি বহু জিনিসপত্র উপহার প্রেরিত হইল। সালেমা তিন দিন শ্বশুর-শাশুড়ী ও ননদদ্বয়ের স্নেহ যত্নে ভাসমানা হইয়া আলিনগরে অবস্থান করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু সহসা কক্ষচ্যুত ধরাতললুণ্ঠিত তারকার ন্যায় দ্বিতল কক্ষ হইতে পল্লীর চালা-গৃহে আসিয়া সালেমা আদৌ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। কখন তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া পিত্রালয় যাইবেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অবশ্য পরিজনগণের স্নেহ-প্রীতি ও স্বামীর ভালবাসা তাঁহার অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী হইলেও এরূপ ক্ষুদ্র বাটীর ক্ষুদ্র গৃহে অবস্থান করিয়া সে সমস্ত সম্ভোগ করিতে তাঁহার চিত্ত কিছুতেই সম্মত হইল না। যাহা হউক, তিন দিনের পর চতুর্থ দিবসে সালেমা স্বামী সহ পিত্রালয়ে গমন করিলেন। তিনি যেন কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া প্রমোদোদ্যানে আসিলেন।

মতিয়র রহমান আবুল ফজলের বিবাহে বরযাত্রী হইয়াছিলেন; বিবাহান্তে সকলে আলিনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে আবুল ফজলের মাতা সযত্নে মতীকে লইয়া সালেমাকে দেখাইলেন। মতিয়র রহমান বৌ দেখিয়া আনন্দমনে বাড়ী চলিয়া গেল।

মতিয়র রহমান যখন বাড়ী গেল, তখন বেলা প্রায় চারিটা। আজিজা বাড়ীর মধ্যে একখানি গৃহের বারান্দায় বসিয়া বিমাতা দেলজানের চুল বাঁধিয়া দিতেছিলেন। মতিয়র রহমান উপস্থিত হইবা মাত্র দেলজান মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরে মতি! বৌ কেমন?"

মতি। খুব ভাল বৌ মা!

দেলজান। খুব ভাল মানে কি; কার মত?

মতি। আমি তার মত কাউকে দেখি নাই।

দেলজান। (বিরক্তির সহিত) মানুষের মত কি আর মানুষ হয়! গায়ের রং কেমন? আমার মত, না তোর বুজানের মত?

মতি। তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল; আমি হিন্দু পাড়ায়ও অমন বৌ দেখি নাই। মিঞা বাড়ীর ছোট বুজী (সমীরন) আর সতীশ বাবুর বৌকে দেখ্‌ছ ত? তাদের চেয়েও ভাল।

দেলজান পুত্রমুখে স্বীয় হীনতা শুনিয়া বিরক্তির সহিত বলিলেন, "নে, থাম তুই; আচমানের হুরপরী কি না? বিয়ার সময় কাপড় গয়না পর্‌লে সকলকেই ঐরূপ দেখায়।"

আজিজা সালেমার রূপ-গরিমা শ্রবণ করিয়া অলক্ষ্যে একটু চিত্ত-চাঞ্চল্য অনুভব করিলেন; কিন্তু দেলজানের বিদ্বেষ দেখিয়া ফুল্লমুখে বলিলেন,—"মতি, যাও তুমি কাপড় চোপড় ছাড়গে।"

মতি গৃহে যাইয়া কাপড় খুলিতে লাগিল।

সালেমা যাওয়ার পূর্ব্বদিন প্রভাত-নলিনী সতীশের সম্মতি লইয়া

সালেমাকে দেখিবার জন্ম পাল্কী করিয়া মিঞাবাড়ী গমন করিলেন। সতীশ বন্ধু-পত্নীকে উপহার প্রদানার্থে একগাছি মূল্যবান্ স্বর্ণ-হার নলিনীর হস্তে প্রদান করিলেন। আবুল ফজলের মাতা কন্যাসম যত্নের সহিত নলিনীকে গ্রহণ করিয়া সালেমাকে দেখাইলেন। হাস্যাননা রহস্যময়ী সমীরন উভয়ের মধ্যে পরিচয় করাইয়া দিলেন। সুশিক্ষিতা যুবতীদ্বয় অল্প আলাপেই পরস্পরকে বুঝিয়া লইলেন।

প্রভাত-নলিনী তখনই যাইতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু সমীরন তাঁহাকে দুই তিন ঘণ্টা রাখিয়া দুগ্ধ, মিষ্টান্ন ও ফলাদি আহার না করাইয়া কিছুতেই ছাড়িলেন না।

প্রভাত-নলিনী বাড়ী আসিলে সতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আবুল ফজলের স্ত্রী কেমন?"

নলিনী। খুব খারাপ! অমন বিবাহও লোকে করে,—ছি!

সতীশ। মিথ্যা কথা! দুষ্টামী ত্যাগ করে সত্য কথা বল।

নলিনী। আমাকে মিথ্যাবাদী বল্‌লে? তবে আমি বল্‌ব না।

সতীশ তাঁহার কর ধারণপূর্ব্বক নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "না তুমি ঘোর সত্যবাদী; একবার সত্য কথা বল।"

নলিনী। তবে খুব সুন্দরী! পরমা সুন্দরী!! অপূর্ব্ব—

সতীশ বাধা দিয়া বলিলেন,—"তোমার চেয়েও?"

নলিনী। তুমি কি মনে কর?

সতীশ। আমার বিশ্বাস, তোমার চেয়ে সুন্দরী মোসলমান ত দূরের কথা, ব্রাহ্ম-পার্শী সমাজেও নাই।

নলিনী। কলিকাতার মেড়ুনি আর চাষা মোসলমান স্ত্রীলোক-গুলোকে দেখেই বোধ হয়, তোমার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা জন্মেছে! জিজ্ঞাসা করি, ভদ্র মোসলমান মেয়ে কখন চক্ষে দেখেছ?

সতীশ। না দেখ্‌ছি; বেশ তুমি ত দেখেছ! তোমার অভিজ্ঞতাটাই আগে শুনি।

নলিনী। তবে শুন; আমার চেয়ে সুন্দরী যদি তুমি ব্রাহ্ম বা পার্শী সমাজে না দেখে থাক, সে তোমার পক্ষপাতিতা ও একচোখোমী! তারপর রূপ-দেখানে হাওয়াখোর ব্রাহ্ম-পার্শী সুন্দরীদের অপেক্ষা অনেক পরমাসুন্দরী যে পর্দ্দানশীন হিন্দু-মোসলমানের অন্তঃপুরে আছে, এ অভিজ্ঞতা তোমার না থাক্‌লেও আমাদের একটু একটু আছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আবুল ফজলের স্ত্রী ত দূরের কথা, তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী—আবুল ফজলের ছোট বোনটীরও তুলনা—যে কোন সমাজেই বিরল!

সতীশ। ও সমীরন! ছোট বেলায় দেখেছি বটে; তবে ত আবুল ফজল খুব ভাগ্যবান্!

নলিনী তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটী স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলিলেন,—"আর তুমি বুঝি খুব দুর্ভাগ্য?"

সতীশ নলিনীর কপোলে প্রেমচিহ্ন মুদ্রাঙ্কণপূর্ব্বক বলিলেন,—"রাগ করো না; আমি হিংসা করি নাই।"

স্বামীর বাহুবদ্ধা নলিনী প্রেম-বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন,—"হিংসা ক'রেই বা ফল কি? দরিদ্রের সম্বল—কপর্দ্দকই সার! ধনীর ধনে দুরাশা বিড়ম্বনা মাত্র।" সতীশ মুগ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—"পৃথিবীর সকলেই যেন আমার মত দরিদ্র হইয়া এইরূপ কপর্দ্দক লাভ করে।"

নলিনী। সকলে তেমন বোকা নয়!

সতীশ। আমায় বোকা বল্‌লে?

নলিনী। না তুমি ঘোর চালাক! চতুরতার ভাণ্ডার!

সতীশ তাঁহার মুখ টিপিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সতীর প্রভাব।

মতিয়র রহমান আজিজাকে আলিনগরে লইয়া আসিলে দেলজান এবার আজিজার একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িলেন। কারণ আজিজার অনুপস্থিতি কালে দেলজান সংসার লইয়া যারপর নাই জ্বালাতন হইতেছিলেন। বেচারী রাত দিন খাটিয়াও এই বৃহৎ সংসারের শৃঙ্খলা সাধনে সমর্থ হন নাই। তাহার উপর ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট, অশান্তি-উপদ্রব ত লাগিয়াই ছিল। কিন্তু আজিজা আসিয়া অবলীলাক্রমে সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া ফেলিলেন। সংসারের কাজকর্ম্ম যেন যন্ত্রযোগে নিয়মিতরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। বিশৃঙ্খলা, ঝগড়া, অশান্তি যেন কোন্ বিস্মৃতির রাজ্যে উড়িয়া গেল। দেলজান আজিজার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া আরাম উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার কাজের মধ্যে থাকিল, কেবল বড় মিঞা সাহেবের ওজু-গোসল ও বিছানা-পত্রের তত্ত্বাবধান করা এবং অবসর মত সময়ে সময়ে আজিজার শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি বিরুদ্ধ পক্ষের লোকদিগের কুৎসা ও দুর্ণাম গাওয়া।

পাঠক-পাঠিকাগণ বোধ হয় ভুলিয়া যান নাই যে, আমাদের পুণ্যবতী আজিজা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিনি পিত্রালয়ে আসিয়া যথাসময়ে একটী সুদর্শন পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শনে তাঁহার মহৎ হৃদয় মাতৃস্নেহে অভিভূত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর কথা মনে হওয়ায় তাঁহার হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল; অলক্ষ্যে চক্ষু হইতে

দরবিগলিত ধারে অশ্রু নির্গত হইয়া গণ্ড ও বক্ষ সিক্ত হইয়া গেল। হায়! আজ এ আনন্দে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইবেন, যাঁহার সহিত এ আনন্দ বিনিময় করিয়া আজিজার নারীজীবন ধন্য হইবে, আজ তিনি কোথায়? আজিজা উদ্দেশে খোদাতালার নিকট স্বীয় হৃদয়-বেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিলেন।

আজিজার পুত্রসন্তান হওয়ায় বড় মিঞা দেলজান ও মতিয়র রহমান সকলেই মহা আনন্দিত হইলেন। বড়মিঞা সাহেব মহা ধুম-ধামের সহিত বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দৌহিত্রের 'আকিকা' সম্পন্ন করিলেন। শিশুর নাম রাখা হইল—সৈয়দ আবদুল আজিজ। সৈয়দ সাহেব এবং আবদুল হকও নিমন্ত্রিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই আসিলেন না। স্বামী ও স্বামিকুলের আত্মীয়গণের অনুপস্থিতিতে আজিজার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি অধীরতা প্রকাশ না করিয়া খোদার নামে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন।

শিশু আবদুল আজিজ মাতুলালয়ে মহাদরে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। বড়মিঞা, মতিয়র রহমান ও দেলজান তাঁহাকে এত ভাল-বাসিতেন যে, আজিজা অতি অল্প সময়ই তাহাকে নিজের নিকট রাখিতে পারিতেন।

এইরূপে পিত্রালয়ে আজিজার দিন কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ তিনটী বৎসর অতীতের কোলে মিলাইয়া গেল। ইহার মধ্যে আলিনগরে যে সমস্ত সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইবার আমরা সৈয়দ সাহেব ও আবদুল হকের অবস্থার অনুসন্ধান করিব?

আবদুল হক বাড়ী হইতে রাগ করিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলে সৈয়দ সাহেব মহা বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। আজিজার অভাবে তাঁহার

আহার-বিহারজনিত শারীরিক কষ্ট চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। তদুপরি অর্থাভাব ও উত্তমর্ণগণের তাড়না তাঁহাকে দিনে দিনে শোষণ করিতে লাগিল। আবদুল হক চাকুরী গ্রহণ করিয়াও পিতা-মাতাকে বিশেষ কোন সাহায্য করিলেন না। সম্পত্তিগুলি একে একে নীলাম হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে বসতবাড়ীও যাইবার উপক্রম হইল। আবদুল হককে পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিতে লিখিতে তিনি যে দশ পাঁচ টাকা পাঠাইতেন, তাহা বাজে খরচেই চলিয়া যাইত।

ইতিমধ্যে সৈয়দ সাহেবের স্ত্রী পীড়িতা হইয়া পড়িলেন। জোবেদাকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার স্বামী মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলেন। ইহার প্রতিশোধ প্রদানের জন্য সৈয়দ সাহেবও মেয়ের খোরাকী এবং মোহ-রের নালিশ দিবার জন্য টাকা যোগাড় করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুই যোগাড় হইল না। আবদুল হকের নিকট লিখিয়াও কোন ফল হইল না। সুতরাং বিপন্ন সৈয়দ সাহেব একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে আজিজাকে আনিবার জন্য বড়মিঞার নিকট এক পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু বড় মিঞা আর মেয়ে পাঠাইবেন না বলিয়া কঠোর ভাবে উত্তর দেন। অনন্তর সৈয়দ সাহেব অনেক ভাবিয়া আজিজার নিকট একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে নিজের দুঃখ কষ্ট জানাইয়া শেষে লিখিলেন,—“মা! আমি সর্ব্বস্বহীন হইয়া পড়িয়াছি, তোমার শাশুড়ী শয্যাগত, জোবেদাকে কখন পাঠাইতে হইবে, ঠিক নাই। আবদুল হক ত আমাদিগকে ভুলিয়াই গিয়াছে; এক্ষণে তুমিও যদি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া ভুলিয়া থাক, বোধ হয় আমরা আর বাঁচিব না। সব কথা তোমাকে জানাইলাম, যাহা মনে লয় করিও।”

আজিজা সৈয়দ সাহেবের পত্র পাইয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি পিতার ক্রোধ অপনোদনের জন্য লিখিলেন,—“হুজুর! আপনি

দয়া করিয়া যদি একবার এখানে আসেন, আমি যেরূপে পারি বাবা-জানকে বলিয়া আপনার সঙ্গে যাইব।"

পত্র পাইয়া সৈয়দ সাহেব আলিনগরে উপস্থিত হইয়া বড় মিঞার নিকট, সকল অবস্থা জানাইলেন। বড় মিঞা সৈয়দ সাহেবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আজিজার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। আজিজা পিতাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করায় বড় মিঞা সাহেব আজিজাকে পাঠাইয়া দিলেন।

আজিজা তিন বৎসর পরে শ্বশুরালয়ে আসিলেন। এবার শাশুড়ী ও জোবেদা সহজেই তাঁহার বশীভূত হইল। আজিজা পত্র লিখিয়া জোবেদার স্বামীকে আনাইয়া মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়াইলেন এবং তাঁহাকে জোবেদার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য নানারূপে অনুরোধ করিয়া জোবেদাকে স্বামীর সহিত পাঠাইয়া দিলেন। জোবেদা অশ্রুমুখে পিতামাতা ও ভ্রাতৃবধুর পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক স্বামীর সহিত গমন করিলেন এবং আজিজার উপদেশ ও আদর্শ অনুসরণপূর্ব্বক অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্বামীর ভালবাসা ও স্নেহ আকর্ষণ করিয়া জীবনে সুখী হইলেন। ইহার পর জোবেদা যত বার পিত্রালয়ে আসিয়াছেন, প্রত্যেক বারেই পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত মনে আজিজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। জোবেদা এখন হইতে আজিজাকে এরূপ ভক্তির চক্ষে দেখিতেন যে, আজিজা তাঁহাকে কোনরূপ শ্লেষ-রহস্যে বিদ্ধ করিলেও তিনি সম্ভ্রম করিয়া তাহার উত্তর দিতেন না।

আজিজার যত্ন ও সুশ্রূষায় তাঁহার শাশুড়ী একটু সুস্থ হইলেন, কিন্তু একেবারে আরোগ্যলাভ করিলেন না। সৈয়দ সাহেব আজিজার সেবা-গুণে অনেকটা সুখসচ্ছন্দে জীবনপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহাদের বসতবাড়ীখানি ঋণের দায়ে নিলাম হইবার উপক্রম

হওয়ায় সৈয়দ সাহেব আজিজার নিকট সব কথা জানাইলেন—উদ্দেশ্য বড় মিঞার নিকট সাহায্য লওয়া। কারণ বড় মিঞা ও মতিয়র রহমান আজিজার পুত্র আবদুল আজিজকে দেখিবার জন্য প্রায়ই কমলাবতীতে আসিতেন। কিন্তু আজিজা পিতাকে এ সম্বন্ধে ত্যক্ত করা অসঙ্গত ভাবিয়া স্বীয় অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া এবং বাকী কিছু টাকা জোবেদার নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়া বসতবাড়ী রক্ষা করিলেন। সৈয়দ সাহেব এই ব্যাপারে আজিজার হৃদয়-মহত্বে আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"মা তুমি যেরূপে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়ে আমার সম্ভ্রম রক্ষা করলে, আল্লাতালাই যেন তোমাকে ইহার পুরস্কার দেন; তোমার কোন প্রার্থনাই যেন অপূর্ণ না থাকে।" বলিয়া প্রাচীন হাত তুলিয়া খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিলেন। এইরূপ সুখে দুঃখে আজিজার দিন কাটিতে লাগিল।

পাঠক! চলুন একবার ইস্‌লামের সংস্কারকামী আবদুল হক এবং সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার সুরভিত পুষ্প সোফিয়ার সংবাদ লইয়া আসি। আবদুল হক পুলিস সব-ইন্‌স্পেক্টরী গ্রহণপূর্ব্বক পত্নী সহ মফঃস্বলে যান, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চাকরীস্থলে নব অনুরাগদীপ্ত স্ফীতযৌবন দম্পতির জীবন প্রথম প্রথম বেশ সুখেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহারা যেন সংসার ও সমাজের বিবিধ বাধা-বিঘ্ন এবং কুসংস্কার ও অনাচার-অবিচারের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া সুখ-শান্তি ও স্বাধীনতার রম্যকুঞ্জে উপনীত হইলেন। আবদুল হক চমৎকার ইংরাজী জানিতেন; সুতরাং সাহেবদিগের নিকট প্রভাব-প্রতিপত্তির সহিত চাকুরীতেও তাঁহার যথেষ্ট সুনাম হইল।

কিন্তু দিন যত যাইতে লাগিল, ততই যেন সুখ, শান্তি ও আনন্দের পরিবর্ত্তে অসুখ, অশান্তি ও নিরানন্দ একটু একটু করিয়া তাঁহাদের

মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। আবদুল হক এত দিন সোফিয়ার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য, সুমার্জ্জিত হাব-ভাব ও আন্তরিকতাশূন্য মধুর বাক্যসমষ্টি ভোগেই উন্মত্ত ছিলেন। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, হিত, অহিত, সংসার ও সমাজ এবং জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি বিষয়ে তাঁহার একটুও খেয়াল ছিল না; কিন্তু এক্ষণে সেই দুর্দ্দমনীয় ভোগতৃষ্ণা কথঞ্চিৎ উপশমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অতৃপ্তি ও বিরক্তি ধীরে ধীরে তাঁহার চিত্তে আসন গাড়িতে লাগিল। ক্রমে সোফিয়ার বিলাসিতা, অপব্যয়িতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অবাধ্যতা আবদুল হককে বিরক্ত ও বিচলিত করিয়া তুলিল। আবদুল হক যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই সোফিয়ার নিত্য নূতন সাজ-সজ্জা, বস্ত্রালঙ্কার, নবাবিষ্কৃত দ্রব্যসম্ভার, কেক্-বিস্কুট, সিরাপ-মেডিসীন ও নাটক-নভেলের পার্শ্বেল গ্রহণেই ব্যয়িত হইত। অবশিষ্ট যাহা থাকিত, তাহাতে কোনরূপে বাসাখরচ চলিত। এইজন্য আবদুল হক অর্থের জন্য পিতার বহু করুণ প্রার্থনা—আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু অর্থের অনাটন বশতঃ তিনি অনেক সময়ে পুলিসের চিরপ্রসিদ্ধ ঘোর অবৈধ উপায়-গুলিও অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন।

বিশেষতঃ সোফিয়ার কল্যাণে আবদুল হকের বাসায় অবরোধপ্রথার শিথিলতা, মুক্ত গবাক্ষপার্শ্বে ইজি চেয়ারে দেহ ঢালিয়া সোফিয়ার উপন্যাস পাঠ করা এবং তথা হইতে পথগামী লোকের সকাম দৃষ্টিতে জর্জ্জরীভূত হওয়া, বাসার মধ্য হইতে সময় অসময়ে হারমোনিয়ম ও সেতারের বাদ্যে এবং গ্রামোফনের মধুর সঙ্গীতে চারি পার্শ্বস্থ লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করায় সমাজে অনুদিন তাঁহার দুর্ণাম ও অপযশ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আবদুল হক এজন্য সোফিয়াকে সংযত ও সতর্ক হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে অনুরোধ ব্যর্থ হইয়া অপেক্ষাকৃত

কঠোর আদেশ ও শাসন পর্য্যন্ত হেলায় উপেক্ষিত হইল। ফলে পতি-পত্নী উভয়েই উভয়ের প্রতি এক প্রকার অস্পষ্ট বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, চাকুরী পাওয়ার তিন বৎসর পরে আবদুল হক একটী ডাকাতি মোকদ্দমা তদন্তের জন্য এক বিপজ্জনক স্থানে বদলী হইলেন। সুতরাং সোফিয়া বাধ্য হইয়া পিতার নিকট গমন করিলেন। সঞ্চিত টাকা পয়সা ও জিনিসপত্র সমস্তই আবদুল হক সোফিয়ার সহিত পাঠাইলেন। কারণ তিনি সম্প্রতি যে স্থানে বদলী হইলেন, তথায় থাকিবার বিশেষ কোনই বন্দোবস্ত ছিল না।

আবদুল হক সোফিয়ার নিকট হইতে স্থানান্তরে গিয়া যেন এক কঠোর উপদ্রবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। সোফিয়ার বিলাসিতা ও উপদ্রবের যে দুর্ব্বহ ভার তাঁহার উপর চাপিয়াছিল, সেই ভার অপসৃত হওয়ায় তিনি আপনাকে একান্ত হাল্‌কা বোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং পতিপ্রাণা আজিজার পূত স্মৃতিও তাঁহার অন্তরে জাগরূক হইতে লাগিল।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে গিয়াও আবদুল হক সোফিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। অভিনব প্রেম-প্লাবিত, কঠোর বিচ্ছেদ-পরিজ্ঞাপক হা-হুতাশ পত্রে পত্রে সোফিয়া আবদুল হককে ব্যতিব্যস্ত ও জ্বালাতন করিয়া তুলিলেন। তিনি অবশেষে লিখিতে বাধ্য হইলেন যে, শীঘ্রই বাসাবাড়ী ঠিক করিয়া তোমাকে নিকটে লইয়া আসিব।

এইরূপে পাঁচ ছয় মাস গত হইল। আবদুল হকের কঠোর অনুসন্ধানের ফলে সেই মোকদ্দমায় কতিপয় ধনসম্পদ্‌শালী হিন্দু তালুকদার জড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা প্রথমে আবদুল হককে অর্থ দানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আবদুল হক পদোন্নতির আশায়

সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অগত্যা তাঁহারা আবদুল হককে জব্দ করিবার জন্য তাঁহার উপর এক প্রবল ঘুসের মোকদ্দমা চাপাইলেন। উক্ত তালুকদারগণের আত্মীয়—কতিপয় হিন্দু উকিলের তত্ত্বাবধানে মোকদ্দমা নিখুঁত ভাবে পরিচালিত হওয়ায় আবদুল হক মহা বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। পদোন্নতির পরিবর্ত্তে তাঁহার জেলে যাওয়ার আশঙ্কা অনুদিন প্রবলতর হইয়া উঠিল। আবদুল হক্ চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। নিজের যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও মোকদ্দমা হইতে উদ্ধারের কোনই উপায় দেখিলেন না। প্রথমে বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে ধার করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। যখন ধার পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকিল না, তখন তিনি সোফিয়ার নিকট সমস্ত অবস্থা লিখিলেন, কিন্তু সোফিয়ার নিকট হইতে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ আসিল মাত্র। আবদুল হক্ পুনঃ পুনঃ টাকার জন্য পত্র লিখিলেন, কিন্তু সোফিয়া তৎসম্পর্কে কোনই সন্তোষজনক উত্তর দিলেন না। আবদুল হক্ সোফিয়ার এই ব্যবহারে একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন। সোফিয়া তখন পিতার নিকট কলিকাতায় ছিলেন। তিনি আবদুল হকের জন্য মৌখিক যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু টাকা সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। তখন আবদুল হক্ স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—"সোফিয়া, আমি কিরূপ ভয়ানক বিপদে পড়েছি; দুঃখের বিষয়, তুমি তা একটুও বুঝ্‌ছ না। মনে করে দেখ, তোমার কোন্ ইচ্ছা আমি প্রাণপণে পূরণ করি নাই। যদি আমি নিরাপদে মুক্তি পাই, ভবিষ্যতে তোমাকে যথেষ্ট অর্থ দিতে পারব। আজ আমার মাথার উপর ভয়ানক বিপদ? বিপদের ভীষণ ষড়যন্ত্রে আমি আচ্ছন্ন, প্রবল উকিল-ব্যারিষ্টার আমার বিপক্ষে, এ অবস্থায় হাজার দুই টাকা খরচ করে একজন ভাল ব্যারিষ্টার দিতে না পারলে উদ্ধারের কোনই

আশা নাই। তুমি যেরূপেই হউক, আমাকে এই টাকাটা সংগ্রহ করে দাও।"

সোফিয়া কপট দুঃখের সহিত বলিলেন,—"দুঃখের বিষয়, তুমি আমাকে সুধু ভুল বুঝ্‌ছ না বরং অবিশ্বাস কর্‌ছ; টাকা থাক্‌লে আমি অনেক পূর্ব্বেই পাঠিয়ে দিতুম। টাকা পয়সা সমস্তই তোমার; তোমার জিনিস তোমার বিপদে তোমাকে দিব, তাতে কি আমার অসাধ? নাই বলেই, আমি লজ্জায় কিছু বল্‌তে পার্‌ছি না।"

আবদুল হক আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বলিলেন,—"কেন সোফিয়া, তুমি এখানে আসার সময়ে ত প্রায় আড়াই হাজার টাকা নগদ ছিল। সে টাকাটা কি সবই খরচ হয়ে গেছে?"

সোফিয়া। দুই হাজার টাকার সামান্য বেশী যা ছিল, তাত আসার সময়েই খরচ হয়ে যায়। এক হাজার টাকা বিশেষ দায় পড়ে পিতা হাওলাত নিয়েছেন। আর হাজারখানেক টাকা যা ছিল, তা এই ছয় সাত মাসের বাসা খরচ, ডাক্তারের খরচ এবং পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে যাতায়াতে অনেক পূর্ব্বেই খরচ হয়ে গেছে। তোমার বিপদের কথা শুনেই এ পর্য্যন্ত টাকার কথা লিখি নাই।

আবদুল হক ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন,—"তবে পিতার নিকট হতেই হাজার দুই টাকা নিয়ে দাও। আমি যত শীঘ্র পারি, শোধ কর্‌ব।"

সোফিয়া। তিনি অত টাকা কোথায় পাবেন? তাঁর টাকা থাক্‌লে কি আর আমার কাছে হাওলাত করেন! তাঁর কাছে যা সঞ্চিত ছিল, তাই এবং আমার কাছ থেকে হাওলাত করে তিন হাজার টাকায় এই বাড়ীখানার অর্দ্ধাংশ কিনেছেন, এখন তাঁর কাছে কিছুই নাই।

আবদুল হক। সোফিয়া, আমি জেলে গেলে কি তোমাদের একটুও দুঃখ হবে না?

সোফিয়া। তুমি আমাদিগকে পর মনে কর বলেই এরূপ বল্‌ছ।

আবদুল হক। তবে উপায় কি?

সোফিয়া। উপায় খোদাতালা? তাঁর উপর নির্ভর কর। তিনিই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর্‌বেন। বৃথা টাকা খরচ করে লাভ কি?

আবদুল হক দুঃখকাতর স্বরে বলিলেন,—"সোফিয়া তুমি না আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাস; এই কি তার পরিচয়? আমার বিপদে কি তোমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই?"

সোফিয়া? ভালবাসি কি না, তুমি যদি এতদিনেও না বুঝে থাক, আমার অদৃষ্ট! তুমিই বল, আমি তোমার জন্য কি কোর্‌তে পারি?

আবদুল হক করুণ ভাবে বলিলেন,—"অন্য কিছুই কর্‌তে হবে না। টাকা নাই, তাও বুঝ্‌লাম; এখন যদি আমাকে বিপদ্ হতে উদ্ধার কর্‌তে তোমার একটুও ইচ্ছা থাকে, তবে তোমার অলঙ্কারগুলি আমাকে দাও; উহা বন্ধক রাখিয়া আমি আপাততঃ টাকাটা সংগ্রহ করি। তারপর যেরূপে পারি, মোকদ্দমার পরেই তোমার অলঙ্কার খালাস করে দিব।"

সোফিয়া বিস্মিত হইলেন; স্বামী যে বন্ধক দিবার জন্য স্ত্রীর গহনা চাহিতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণার সম্পূর্ণ অতীত। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"অলঙ্কারগুলি পিতার কাছে রেখেছি; তিনি আফিস হইতে বাড়ী আসুন।"

আবদুল হক সোফিয়ার দুরভিসন্ধি বুঝিলেন। কারণ তিনি সোফিয়ার অনুপস্থিতিতে ইতিপূর্ব্বেই বাক্স খুলিয়া তাঁহার অলঙ্কারগুলি দেখিয়াছেন; তিনি আর কোন কথা বলিলেন না; স্তম্ভিতভাবে বসিয়া বসিয়া সোফিয়ার কপটতা ও প্রবঞ্চনার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন; সোফিয়াও কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া দূরে দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে আটটা বাজিয়া গেল। সোফিয়া আসিয়া আবহুল হক্‌কে আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন। ইলিয়াস ইহার অনেক পূর্ব্বেই বাড়ী আসিয়াছিলেন।

আবহুলহক বলিলেন;—"সোফিয়া, খাওয়া পরে হ'বে। আমার কথার কি?

সোফিয়া কপট দুঃখের ভাণে বলিলেন,—"পিতা সে গুলি তাঁর এক লৌহ-সিন্দুকে রেখেছেন; এবং দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি সে বাক্সের চাবি মধুপুরে ফেলে এসেছেন। তাই এতক্ষণ ভাবছিলুম, কি করা যায়!

আবহুল হকের আর সহ্য হইল না। তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ধিক্ সোফিয়া! এত কপটতা তোমার অন্তরে? তোমরাই না উদারতা ও প্রেমের তুমুল ঢাক বাজাইয়া থাক? শত ধিক্ তোমাদের প্রাণশূন্য শব্দসমষ্টিতে! মার্জ্জিত রুচি ও শুভ্র সভ্যতার আবরণের ভিতর এত গরল! স্বামী হইতেও অর্থ-অলঙ্কার এত প্রিয় তোমাদের নিকট? আমি উন্মত্ত হয়ে যেমন কর্ম্ম করেছিলাম, আজ তার উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম। তোমার মত হীনপ্রকৃতি রাক্ষসীর জন্য পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন এবং পতিপ্রাণা সতী-সাধ্বী স্ত্রীরত্নকে বিস্মৃত হয়ে যে অমার্জ্জনীয় মহাপাপ করেছিলাম, তার প্রতিফল ভোগ কর্‌তেই হবে। ভাগ্যে যাই থাক সোফিয়া, কিন্তু ঠিক জানিও, আজ তোমার নিকট আমারই প্রদত্ত অর্থালঙ্কার থাকা সত্ত্বেও আমার সহিত যেরূপ প্রবঞ্চনা কর্‌লে, তার প্রতিফল একদিন ভোগ কর্‌তেই হবে।" কথাগুলি বলিয়াই আবহুল হক স্বীয় জুতা পরিতে লাগিলেন। সোফিয়া ভীত ভাবে "শুন"—বলিয়া আবহুল হকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, আবহুল হক তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া—"খোদা করুন, আর যেন তোমার মত শয়তানির কথা শ্রবণ ও তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শন করিতে না হয়।" বলিয়াই

সবেগে বাহির হইয়া গেলেন। "স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্ব্বাক্য! ঘোর অসভ্যতা!" প্রভৃতি বলিয়া ইলিয়াস কক্ষান্তরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু আবদুল হক তাহাতে একটুও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

আবদুল হক সোফিয়ার গৃহ হইতে বাহির হইয়া সরাসর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পক্ষে জেলে যাওয়াই মঙ্গল মনে করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে রঙ্গপুর যাত্রা করিলেন। অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক, এই ভাবিয়া তিনি মোকদ্দমার 'তদ্‌বীর' সম্বন্ধে যাবতীয় চিন্তা মন হইতে মুছিয়া ফেলিলেন।

আবদুল হক রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়াই এক খণ্ড রেজিষ্ট্রী চিঠি পাইলেন। চিরপরিচিত হস্তাক্ষর দৃষ্টে তাঁহার হৃদয় উদ্বেগ-চাঞ্চল্যে অধীর হইয়া উঠিল। তিনি পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

পত্র।

জীবনসর্ব্বস্ব!

অপরাধিনী জ্ঞানহীনা দাসীর শত সহস্র আদাব গ্রহণ করুন। বহুদিন আপনার কোন সংবাদ নাই। ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াও তাহার কোন উত্তর না পাইয়া মনে করিয়াছিলাম, আর বৃথা পত্র লিখিয়া আপনাকে বিরক্ত করিব না। তাই গত দুই বৎসর পত্রাদি লিখি নাই; আশা করি, চিরানুগতা দাসীর অন্যান্য অপরাধের সহিত সে অপরাধও ক্ষমা করিবেন।

রঙ্গপুরের জনৈক উকিলের পত্রে আপনার বিপদের কথায় বাড়ীর সকলে যারপরনাই অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। হজরত সাহেব ভাল থাকিলে এতদিন নিশ্চয় আপনার নিকট যাইতেন। কিন্তু তাঁহার শরীর ভাল নহে। আম্মাজানও অত্যন্ত কাতর; বাঁচিবার আশা খুব কম;

আপনার বিপদ্ সংবাদে তিনি নিদ্রাহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনাকে একবার দেখিবার জন্য অহঃরহ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের আদেশেই এই পত্র লিখিলাম।

প্রিয়তম! সকলের অনুরোধে একবার অবশ্য বাড়ীতে আসুন। পদাশ্রিতা দাসী যদি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কোন অপরাধ করিয়া থাকে, স্বীয় উদারতাগুণে ক্ষমা করিয়া একবার চোখের দেখা দেখিয়া যান; আমি আপনার সুখের বিঘ্ন হইব না। প্রিয়তম! একবার আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য আপনার প্রাণসর্ব্বস্ব শিশুর মধুর সম্বোধনের উত্তর দিয়া যান। নিষ্ঠুর! অলক্ষ্যেও কি একটু স্নেহ আপনার প্রাণে সঞ্চারিত হয় নাই?

পত্রপাঠ অবশ্য একবার বাড়ী আসিবেন; যদি না আসেন, বুঝিব আপনি চিরজীবনের জন্য আমাদিগকে বিস্মৃতির অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আর হজরত সাহেব ও আম্মাজান কি মনে করিবেন, তাহা আপনিই ভাবিয়া দেখুন।

আপনার চিরানুগতা দাসী—
আজিজা।

এই প্রাণভরা সহানুভূতি ও আন্তরিক আগ্রহপূর্ণ সমবেদনা প্রকাশক পত্র পড়িয়া আবদুল হকের চিত্ত বিচলিত হইল। আজ তিনি পতিপ্রাণা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর সহিত স্বার্থপরায়ণা বিলাসিনী সহশায়িনীর পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন। আবদুল হক আজ বুঝিলেন, আজিজা স্বর্গ, সোফিয়া নরক; আজিজা সুখময়ী শান্তিকুঞ্জ, সোফিয়া মরীচিকাময়ী মরুভূমি! আজিজা শান্ত সমীরণ, সোফিয়া অশান্ত ঝটিকা। এতদিন পরে আবদুল হক বুঝিলেন যে, তিনি সুধাভ্রমে কেবল গরল পান এবং দেবীকে বিসর্জ্জন দিয়া এক দানবীর অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। আজ পিতা-মাতার স্নেহ, আত্মীয়-স্বজনের প্রীতি ও

পত্নীর অপার্থিব প্রেমসংবলিত কৈশোর ও প্রথম যৌবনের মধুময় পূত স্মৃতি তাঁহার মনে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। তিনি তাঁহাদের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং সেই দিনই টিকিট করিয়া স্বদেশযাত্রা করিলেন। মোকদ্দমা উঠিতে তখনও দুই সপ্তাহ বাকি ছিল।

আবদুল হক বাড়ী গিয়া মহা অপরাধীর মত জনক-জননীর চরণ চুম্বন করিলেন। বহুদিন পরে পতি-পত্নীর মিলন হইল। আবদুল হক আজিজার কর ধারণ করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পতি-প্রাণা সতী আজিজা একটুও দ্বিধা প্রকাশ না করিয়া অতি শান্ত ভাবে স্বামীকে আহ্বান করিলেন। তিনি এমন সহজ ও সরল ভাবে স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করিলেন যে, তদ্দর্শনে আবদুল হক একেবারেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। আজিজার ব্যবহারে অভিমান ও মনস্তাপের ক্ষীণ আভাসও সূচিত হইল না। আবদুল হক পারিজাত পুষ্পস্তবকতুল্য শিশুপুত্র আবদুল আজিজকে বক্ষে ধারণ করিয়া এক স্বপ্নময় স্নেহরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। বালকের আধ আধ মধুর সম্বোধনে তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন। আড়ম্বর পূর্ণ চাকুরী জীবন তাঁহার নিকট অতি অসার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

পর দিবস আবদুল হক পিতা মাতা ও পত্নীর নিকট মোকদ্দমার সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলিলেন। সোফিয়ার ব্যবহার কেবল আজিজার নিকটেই বলিলেন। অবস্থা শ্রবণান্তর সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া ঘণীভূত হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নির্দ্ধারণে কেহই সমর্থ হইলেন না।

সৈয়দ সাহেব অনেক চিন্তা করিয়া আজিজাকে বলিলেন,—"মা! এত টাকার যোগাড় করা আমার অসাধ্য; তোমার বাপ যদি সাহায্য না করেন, তবে আর কোনই উপায় নাই। আমার বিবেচনায় আবদুল হককে সঙ্গে করিয়া তুমি যদি আলিনগরে গিয়া বড়মিঞা সাহেবকে

ধরিয়া বস, তিনি কিছুতেই সাহায্য না করিয়া পারিবেন না। তিনি রাগী বটে, কিন্তু রাগী লোকের দয়াও বেশী।”

আজিজা অনেক ভাবিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। আবদুল হক লজ্জাবশতঃ প্রথমে আলিনগরে যাইতে সম্মত না হইলেও সৈয়দ সাহেবের আদেশে ও আজিজার অনুরোধে শেষে সম্মত হইলেন। আজিজা বহুদিন পরে পতি-পুত্র সহ আলিনগরে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রথমে সকলেই আনন্দিত হইলেন; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া সে আনন্দ বেশীক্ষণ রহিল না। বড়মিঞা প্রথমে অকৃতজ্ঞ জামাতাকে সাহায্য করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—“মামলা মোকদ্দমায় আমার টাকা-পয়সার অধিকাংশই খরচ হইয়া গিয়াছে। এখন কোনরূপ সাহায্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।” আজিজা দেলজান ও মতির দ্বারা অনেক অনুরোধ করাইলেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল। তখন আজিজা স্বামীর বিপদ্ চিন্তায় অধীর হইয়া লজ্জা-সঙ্কোচ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বয়ং অশ্রুমুখে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“বাপজান! আমার মা নাই; আপনিই আমার সব! আজ যদি মা থাকৃতেন, তবে তাঁর কাছেই কাঁদ্‌তাম। মা নাই বলেই আপনার কাছে কাঁদ্‌ছি। মতি আর আমি ছাড়া ত আপনার আর কেউ নাই। আমাকে সাহায্য না করেন, ভবিষ্যতে আমাকে যা দিবেন, তা আজই দিন; আর যা থাকিল, সবই মতির।”

আজিজার করুণ অনুরোধে এবং স্বর্গীয় পত্নীর স্মৃতি মনে উদিত হওয়ায় বড় মিঞার চিত্ত বিগলিত হইল। তিনি আজিজার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন,—“মা! আর কাঁদিয়া আমার প্রাণ জ্বালাইওনা। আবদুল হক আমার মনে বড়ই কষ্ট দিয়াছে, তোমার জন্য তাকেও ক্ষমা করিলাম।”—এই বলিয়া তিনি আবদুল হক ও মতীয়র রহমানকে

ডাকিয়া গৃহে আনিলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে লোহার সিন্ধুকের চাবি আজিজার হাতে দিয়া বলিলেন,—"আমার যা কিছু আছে, সবই তোমার আর মতির। তোমার বিবাহের সময়ে বলিয়াছিলাম, তুমি যাতে সুখী হও, আমি তাহা করিব। সে কথা আমি ভুলিয়া যাই নাই। ঐ সিন্ধুকে টাকা আছে; মতির জন্য রাখিয়া আর যা দরকার, তোমরা লইয়া যাও।"

এই অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তায় আবদুল হক কাঁদিয়া ফেলিলেন; সকলের চক্ষেই অশ্রু দেখা দিল। তখন আর সিন্ধুক খোলা হইল না।

দুই তিনদিন পরে আজিজা পিতার নিকট হইতে পুনঃ চাবি লইয়া সিন্ধুক খুলিলেন। সিন্ধুকের মধ্যে অলঙ্কারাদি ব্যতীত প্রায় দশ হাজার টাকা নগদ ছিল। আজিজা তন্মধ্য হইতে মতির দ্বারা তিন হাজার টাকা গণাইয়া তুলিলেন এবং সিন্ধুক বন্ধ করিয়া চাবি পিতার নিকট প্রদান করিলেন। আবদুল হক টাকা লইয়া যাত্রা করিলেন এবং তাহার দুই তিন দিন পর আজিজা পুনঃ শশুরালয়ে চলিয়া গেলেন।

আবদুল হক এক হাজার টাকা দিয়া ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন। আনুসাঙ্গিক আরও হাজার টাকা ব্যয় হইল। তিনি মোকদ্দমায় খালাস হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চাকুরী গেল। অগত্যা তিনি ক্ষুণ্ণ মনে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। আবদুল হক খালাস পাওয়াতেই সকলে আনন্দিত হইলেন; চাকুরীর জন্য কেহ তত গ্রাহ্য করিলেন না। বাকী টাকা আবদুল হক বড়মিঞাকে ফেরৎ দিতে চাহিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না।

আবদুল হক বাড়ী আসার প্রায় একমাস পরে তদীয় জননী বিপদাপন্ন পুত্রকে বিপন্মুক্ত দেখিয়া শান্তমনে পরলোকগমন করিলেন। যথারীতি তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণকর ক্রিয়াকলাপাদি সম্পন্ন হইল।

অনন্তর আজিজা স্বামীর সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সতীত্বপ্রভাবে পতির অনাবিল প্রেম লাভ করিয়া সতীর জীবন ধন্য হইল। সৈয়দ সাহেব পত্নীবিয়োগে একান্ত শোকার্ত্ত হইলেও স্নেহময়ী পুত্রবধূর আন্তরিক যত্নপ্রভাবে পরমসুখে বিবিধ ধর্ম্মাচারের সহিত জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আবদুল হকের জীবনও ধর্ম্মশীলা পত্নীর সহবাসগুণে ক্রমে ধর্ম্মভাবপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আবদুল হক প্রথমে সোফিয়াকে 'তালাক'* দিতেই ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; কিন্তু 'তালাক' অর্থাৎ—"পত্নীত্যাগ বৈধ হইলেও উহা অতি মন্দকার্য্য" এবং "সামান্য বা বিনা অপরাধে পত্নীত্যাগ ঘোর অধর্ম্ম;" † আজিজার এই উপদেশে তিনি তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন।

---

* তালাক—স্ত্রী-বর্জ্জন। স্ত্রী-বর্জ্জন সমাজের এক অনিষ্টকর কুপ্রথা হইলেও উহার আবশ্যকতা যেরূপ অপরিহার্য্য, উপকারিতাও সেইরূপ অসাধারণ। যখন স্বামি-স্ত্রীর ধর্ম্ম-স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহার পরস্পর বিরোধী হওয়া বশতঃ হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-কলহ ও বিবাদ-বিসম্বাদের দ্বারা নর-নারীর জীবন নিরানন্দময়, অভিশপ্ত ও ভারাক্রান্ত হইয়া সংসারে অশান্তির আগুণ জ্বলিয়া উঠে, তখন একমাত্র স্ত্রী-বর্জ্জন প্রথাই সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ; তদ্ভিন্ন আর কোনই উপায় নাই। এইজন্য জগতে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মেই স্ত্রী-ত্যাগের বিধান রহিয়াছে। কিন্তু সমস্ত ধর্ম্মের স্ত্রী-বর্জ্জন বিধি একরূপ নহে। কোন ধর্ম্মের বিধান অত্যন্ত কঠোর; আবার কোন ধর্ম্মের বিধান অতি সহজ। কিন্তু ইস্‌লাম ভিন্ন আর সমস্ত ধর্ম্মের স্ত্রী-বর্জ্জন বিধিই অযৌক্তিক ও অসম্পূর্ণ। খ্রীষ্টান ধর্ম্মে একমাত্র অমার্জ্জনীয় অপরাধ ব্যভিচার ভিন্ন স্ত্রীত্যাগ করিবার আর কোনই উপায় নাই; এইজন্য স্ত্রীবর্জ্জন ব্যাপারে খৃষ্টীয় সমাজে কতই বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় হইয়া থাকে। আবার হিন্দু ধর্ম্মে অতি সামান্য, এমন কি একটু অপ্রিয় ভাষার জন্য স্ত্রী-ত্যাগের বিধান থাকা হেতু সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হইবার আশঙ্কায় হিন্দু-সমাজ ঐ প্রথা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছেন। ইহুদী, বৌদ্ধ প্রভৃতি সমাজের স্ত্রীবর্জ্জন ত স্বেচ্ছাচারের নামান্তর মাত্র! কিন্তু পবিত্র ইস্‌লামের স্ত্রী-বর্জ্জন প্রথা এমন সুশৃঙ্খল ও এমন যুক্তিপূর্ণ যে, একমাত্র এই প্রথাটা বিশ্লেষণ করিয়াই ইস্‌লামকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর ও লোক-হিতকর ধর্ম্ম বলিয়া সগর্ব্বে ঘোষণা করা যাইতে পারে।

† শরেহ-বেকায়া—কেতাব-তালাক দ্রষ্টব্য।

কিন্তু আজিজার অনুরোধ সত্ত্বেও ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্য্যন্ত সোফিয়াকে আনিতে আবদুল হক কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

এদিকে সহসা ইলিয়াসের মৃত্যু হওয়ায় সোফিয়া বিষম বিপন্না হইয়া পড়িলেন; টাকা পয়সাগুলি কোথা হইতে যে কি হইয়া গেল, সোফিয়া তাহা আদৌ ঠিক করিতে পারিলেন না। স্বামীর অভিসাম্পত, পিতার মৃত্যু প্রভৃতি যুগপৎ বিপদ্‌পাতে তাঁহার একটু চেতনাও হইল। তিনি এগুলিকে বিধাতার অভিসম্পাত স্বরূপ মনে করিয়া ভীত হইলেন। যে অলঙ্কারের জন্য স্বামীর অভিসম্পাত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিক্রয় করিতেও সোফিয়ার সাহস হইল না। নানা দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। অর্থাভাবে দাস-দাসীগণের খরচ চালান তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। সুতরাং সোফিয়া নিরুপায় হইয়া স্বীয় কৃতকার্য্যের জন্য একান্ত পরিতাপের সহিত ক্ষমাপ্রার্থনাপুর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আবদুল হক ও আজিজার নিকট পত্র লিখিলেন। আজিজার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আবদুল হক তাঁহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন। এবার সোফিয়া স্বামী, সপত্নী ও শ্বশুর প্রভৃতি সকলের নিকটেই মহা অপরাধিনীর মত অবস্থান করিতে লাগিলেন। আজিজা কিন্তু তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। ক্রমে সোফিয়ারও আমূল পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহার দর্প অভিমান ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি আজিজার একান্ত অনুগত হইয়া উঠিলেন। পুণ্যবতী আজিজার সংসর্গগুণে সোফিয়ার চিত্তেও ধর্ম্মভাব সংক্রামিত হইয়া তাঁহার জীবনের বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন করিয়া দিল।

সংসারের খরচ বৃদ্ধি হওয়ায় আবদুল হক চল্লিশ টাকা বেতনে নিকটবর্ত্তী একটী হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদে কার্য্য করিতে লাগিলেন। আজিজার সুবন্দোবস্তের গুণে সেই অল্প টাকাতেই তাহাদের জীবনযাত্রা একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দেই নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—•:::*:::•—

বিচ্ছেদ।

বিবাহের পর আবুল ফজল শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। কারণ দাস-দাসী সহ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী জমিদার-কন্যা সালেমাকে লইয়া স্বগৃহে বসবাস করিবার মত অবস্থা ও বাড়ীঘর তাঁহাদের ছিল না। এই জন্য আবুল ফজলের পিতাও পুত্রবধূকে গৃহে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হন নাই। পক্ষান্তরে আবুল ফজল কোন সময় বাড়ী আসিয়া থাকিলে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য জমিদার বাড়ী হইতে নিত্য লোকের উপর লোক আসিয়া জ্বালাতন করিত। সুতরাং ঘন ঘন যাতায়াতে পড়াশুনার ক্ষতি হইবে মনে করিয়া আপাততঃ তিনি শ্বশুরবাড়ী থাকাই শ্রেয় মনে করিলেন। এই সময়ে তিনি আরবি ও ইতিহাসে এম-এ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

কিন্তু আবুল ফজল ভবিষ্যতে পত্নীসহ অতঃপর বাড়ী আসিয়া থাকিবেন কিংবা স্থায়ীভাবে শ্বশুরবাড়ীতেই বসবাস করিবেন, এ বিষয় পূর্ব্বে কেহ কিছু ভাবিয়া না দেখিলেও বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা সকলের পক্ষেই চিন্তা ও সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। আফতাব-উদ্দিন মিঞা পুত্রের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকা হেতু এ সম্বন্ধে একটুও দ্বিধা বোধ না করিয়া তিনি বরং আবুল ফজল যাহাতে শ্বশুরের প্রিয়পাত্র হন, তজ্জন্য পড়াশুনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে সেই স্থানেই থাকিতে বলিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনগণ, এমন কি সতীশ নলিনী ও আবুল

ফজলের ভগিনীদ্বয় পর্য্যন্ত তাঁহার ভবিষৎ বাসস্থান সম্বন্ধে মনে মনে সন্দেহ পোষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেব এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা না বলা সত্ত্বেও তাঁহাদের আত্মীয়, কর্ম্মচারী ও প্রজাপুঞ্জ, এমন কি স্বয়ং সালেমা পর্য্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি স্বামীসহ আজীবন এই বাড়ীতেই অবস্থান করিবেন। এই প্রাসাদতুল্য বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পল্লীর ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া সংসার পাতাইতে হইবে, এ কথা ভ্রমেও তাঁহার মনে উদয় হইত না। পক্ষান্তরে আবুল ফজল আপাততঃ শ্বশুরালয় অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেও, তিনি যে পিতা-মাতাকে ত্যাগ করিয়া চিরদিনই তথায় এই ভাবে অবস্থান করিবেন, এই কল্পনাকে ভ্রমেও মনে স্থান দিতেন না। তবে সকলের ভাবে ও ব্যবহারে বুঝিবা পত্নীর জন্য এইরূপে গৃহজামাতার ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, এইরূপ একটা আশঙ্কা সময়ে সময়ে অলক্ষ্যে তদীয় হৃদয়ে প্রতিভাত হইত; কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না।

আবুল ফজল অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সকলের স্নেহ-যত্নে এবং অতুলনীয় রূপলাবণ্যবতী পত্নীর সাহচর্য্যে থাকিয়া যে জীবনে সুখী ও মুগ্ধ হন নাই, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। কিন্তু মুগ্ধ হইলেও তিনি সেই সুখের আশায় ও ঐশ্বর্য্যের মোহে জীবনের কর্ত্তব্য ও আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হন নাই। আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী ও কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহাকে ভবিষ্যৎ প্রভুর মতই সম্মান করিত বটে, কিন্তু সেই সম্মানের মধ্যে যেন তিনি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন,—এইরূপ ভাবের অতি অস্পষ্ট একটা আভা তাঁহার আত্মমর্য্যাদার উপর বড়ই আঘাত করিত। শ্বশুর-শাশুড়ী তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, কিন্তু সে স্নেহ যেন পিতা-মাতার অনাবিল স্নেহ হইতে কেমন একটু স্বতন্ত্র রকমের ছিল; তাহা সম্ভোগেও কেমন একটু অস্পষ্ট সঙ্কোচ বোধ হইত।

সালেমা স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন এবং যথেষ্ট ভক্তি-যত্নও করিতেন, কিন্তু সে ভক্তি-যত্ন করুণা ও প্রভুত্বব্যঞ্জক। ফলতঃ সালেমা স্বামীকে ভালবাসিলেও স্বামীর প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতেন না। তিনি ভাবিতেন, আমাদের সামান্য একজন প্রজার সমানও যিনি নহেন, তিনি যে আমাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার পরম সৌভাগ্য! এ সৌভাগ্যে কৃতার্থ হইয়া কৃতজ্ঞ থাকা তাঁহারই উচিত। আমি আবার ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য স্বীকার করিতে যাইব কেন? প্রত্যুত সালেমা স্বামীর আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকারের আবশ্যকতা আদৌ বুঝিতেন না; তিনি সেরূপ শিক্ষাও পান নাই। চিরকাল যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি বিবাহ ও স্বামীসংসর্গকে জীবনের এক সুখময় উপাদান স্বরূপই মনে করিয়া লইলেন।

পক্ষান্তরে অল্পদিনের মধ্যেই পত্নীর প্রভুত্ব ও আনুগত্যহীনতা তেজস্বী আবুল ফজলের নিকট একান্ত বিসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। তিনি বিবাহের কতিপয় মাস পরে ধীরে ধীরে আদর-যত্ন ও স্নেহ-ভালবাসার সহিত বুঝাইয়া সালেমাকে নিজের মনোমত আদর্শে গঠন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছাচারে চিরাভ্যস্থা সালেমা তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি বরং সে সমস্ত উপদেশ ও অনুরোধ স্বামীর সঙ্কীর্ণ-চিত্ততার পরিচায়ক মনে করিয়া হেলায় উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে একটী বৎসর অতিবাহিত হইল; সালেমা কিছুতেই স্বামীর ইচ্ছা ও আদর্শের বশীভূত হইলেন না। আবুল ফজল সালেমাকে নিয়মিত নামাজ পড়িতে ও রোজা রাখিতে বলিতেন; কিন্তু সালেমা তাহা শুনিয়াও শুনিতেন না। স্বামীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এক 'ওক্ত' নামাজ পড়িলে তিন 'ওক্ত' পরিত্যাগ করিতেন; একদিন রোজা করিলে পরদিন তাঁহার অসুখ হইত। জমিদারবাড়ীতে অপরিচিত: বালক ও স্ত্রীলোকের

প্রবেশাধিকার ছিল না; কিন্তু যুবক ও মধ্যম বয়স্ক দাসগণ অবলীলা ক্রমে সর্ব্বদাই বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করিত। আবুল ফজল ইহা নিতান্ত অন্যায় মনে করিতেন; কিন্তু সকলের উপর তাহার কি অধিকার আছে? তিনি সালেমাকে পর্দ্দার অবমাননা করিয়া দাসদিগের সম্মুখে যাইতে নিষেধ করিতেন; কিন্তু সালেমা তাহা শুনিতেন না। বরং তিনি—"আপনাদের বাড়ী হয়ত দাসদাসী নাই, ওরা না হইলে কি কাজ চলে"—আবুল ফজলকে এই ধরণের কথা বলিয়া সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন। ফলতঃ স্বভাবগুণে কেহ কোন বিষয় নিষেধ করিলে, সেইটী করাই যেন সালেমার আমোদ। আবুল ফজল সালেমার এই স্বভাবে বড়ই বিরক্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে বশীভূত ও অনুগত করিবার কোনই উপায় দেখিলেন না। তিনি কতদিন নিজের অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করিলেন, কতদিন মুখ ভার করিয়া কথা বলা বন্ধ করিলেন, কতদিন বা অন্য রকম ভয় দেখাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সে সমস্ত দাম্ভীকা যুবতীর গ্রাহের সীমাও স্পর্শ করিতে পারিল না। আবুল ফজল তখন সেই বিবাহের জন্য অনুতপ্ত হইলেন; তিনি বুঝিলেন গর্ব্বিতা সালেমাকে অনুগত করিবার ক্ষমতা ও প্রভাব তাঁহার নাই। হায়! কেন জমিদারকন্যা বিবাহ করিয়াছিলাম। ইহা অপেক্ষা রূপহীনা দরিদ্রের মেয়ে বিবাহ করিলেও বুঝি ভাল হইত—চিত্তে শান্তি ভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষ বাড়াবাড়ি করিলেন না; খোদা ভাবিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিবাহের বৎসরাধিক পরে আবুল ফজল ইতিহাসে এম-এ দিয়া আসিলেন। তিনি পরীক্ষা প্রদানানন্তর বাড়ী আসিয়া কুসুমপুরে গেলেন এবং পর বৎসরের জন্য আরবিতে এম-এ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে আলিনগরের পরলোকগত খোন্দকার পীর মহম্মদ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র মওলানা আতাওর রহমানের সহিত আবুল ফজলের জ্যেষ্ঠা সহোদরা করিমনের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। বিবাহ সম্পাদনের নির্দ্ধারিত তারিখের কয়েক দিন পূর্ব্বে আফতাব-উদ্দিন মিঞা কুসুমপুরের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া সালেমাকে লইয়া বাড়ী আসিবার জন্ত আবুল ফজলের নিকট পত্র পাঠাইলেন। পত্রসহ লোক এবং পাল্কীও প্রেরিত হইল। যথাসময়ে তাঁহারা কুসুমপুরে উপস্থিত হইয়া পত্র প্রদান করিল।

গ্রীষ্মকাল; বেলা দুই প্রহর। চারিদিকে প্রখর রৌদ্র ঝা ঝা করিতেছে; উত্তপ্ত বায়ু অবনী দগ্ধ করিবার জন্যই যেন ধা ধা করিয়া ধাবিত হইতেছে; আতঙ্কে জগৎ নিস্তব্ধ। পথে, ঘাটে কোথাও জন-প্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। এমন সময়ে আবুল ফজল দ্বিতল কক্ষের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া তোষকবক্ষ খাটিয়ার সূক্ষ্ম পাটীর উপর শুইয়া আরাম করিতেছেন। শয্যাপার্শ্বে সালেমা সৌন্দর্য্য-ঝলকে কক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া ফুল্লাধরে হাসির আনন্দলহরী তুলিয়া কমকণ্ঠে স্বামীর সহিত রহস্যালাপ করিতেছেন। তরল মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় স্বর্ণখচিত নীলাম্বরীর সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার যৌবন-রাগ-রঞ্জিত দেহের কনক কান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। গোলবাহার নাম্নী একটী অল্পবয়স্কা দাসী শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামি-স্ত্রীকে সুরঞ্জিত পাখা দ্বারা বাতাস করিতেছে। নিম্নে অপেক্ষাকৃত দূরে বসিয়া হালিমা নাম্নী আর একটী প্রৌঢ়া দাসী দম্পতির পান সজ্জিত করিয়া রাখিতেছে। হালিমা অত্যন্ত মুখরা। এই বয়সে সে অনেক জমিদারবাড়ী দাসিবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে।

আবুল ফজল কথায় কথায় করিমনের বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন,—“সালেমা! বাপজান তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্ত চিঠি লিখেছেন; কালই যেতে হবে।”

সালেমা। আমি যেতে পার্‌ব না ; আপনি গেলেই হইবে।

আঃ ফজল। তা কি হয়! তুমি না গেলে লোকে বল্‌বে কি ?

সালেমা। যাই বলুক ; আমি ওরূপ বাড়ী যেয়ে থাক্‌তে পার্‌ব না।

আঃ ফজল। সে কি সালেমা! স্বামী যখন গরীব তখন না থেকে উপায় কি ? কষ্টে স্বষ্টে থাক্‌তেই হবে।

সালেমা। গরীব না হন, ধনিই হউন। আমার জন্য ত আর আপনার ধন খরচ কর্‌তে হবে না। কষ্টে স্বষ্টে রাখার জন্যও ভাবতে হবে না।

আঃ ফজল। ভাব্‌তে হবে না কেন ? তুমি কি চিরকালই এই-খানে থাক্‌বে ? বাড়ী যাবে না ?

সালেমা। এখানেই থাক্‌ব বৈ কি ? একি আর বাড়ী নয় ?

আঃ ফজল। বাড়ী বটে—কিন্তু তোমাদের ; আমার নহে।

সালেমা। আপনি যদি এ বাড়ীকে পরের বাড়ী বলে বুঝেন, তবে না হয় নিজেদের বাড়ীতেই থাক্‌বেন।

আঃ ফজল। আর তুমি ?

সালেমা। কেন আমি চিরকালই এই বাড়ী থাক্‌ব। নিজের বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাব ?

আঃ ফজল। আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে ?

সালেমা। কেন—ছেড়ে থাক্‌ব কেন ; আপনি কি একেবারেই এ বাড়ী আস্‌বেন না ?

আঃ ফজল। যদি না আসি ?

সালেমা। না আসেন, যা ভাগ্যে থাকে, তাই হবে!

আঃ ফজল। আচ্ছা বেশ, তখন যা হয় হবে ; এখনকার মত একবার গরীবের বাড়ী গিয়ে দুই তিনদিনের মত একটু কষ্ট করে আস্‌তে হবে।

সালেমা। আমি একদিনের জন্যও যেতে পার্‌ব না। আবুল ফজল

এইরূপ সহজ ভাবে যতবার বলিলেন, সালেমা ততবারই অস্বীকার করিলেন। আবুল ফজল তখন আর বেশী বলা সঙ্গত মনে করিলেন না। কারণ তিনি বেশ জানিতেন যে, এইরূপ হাসিতে হাসিতেই যদি সালেমা কোন বিষয়ে 'গো' ধরিয়া বসে, তখন তাহা হইতে তাঁহাকে বিচলিত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং তিনি এ বিষয় সময়ান্তরে বলিয়া সম্মত করিবেন মনে করিয়া অন্য কথা তুলিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সহসা হালিমা বলিয়া উঠিল,—"সালেমা বল কি? বিয়া-সাদির কামে কি না গেলে চলে? লোকে শুন্‌লে বল্‌বে কি?"

স্বামীর সহিত বাক্যালাপে দাসী মধ্য হইতে তাঁহারই বিপক্ষে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া সালেমা রাগে জ্বলিয়া গেলেন; তিনি ধমক্ দিয়া বলিলেন,—"থাম মাগি! আমি যাই বা না যাই, তাতে তোর কি? তুই কেন কথা বল্‌তে আসিস্?"

হালিমাও মুখরা ছিল; ঝগড়ার কথায় তাহার কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না; তজ্জন্য সে জীবনে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, তবু তাহার 'হোশ' হয় নাই। সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল,—"না আমার আর কি; স্বামীর বাড়ী ছোট বলে তাঁর বাড়ী যাব না, তোমার মত এমন সৃষ্টিছাড়া কথা আমি আল্লার বাগানে আর কারও মুখে শুনি নাই।"

হালিমার বাক্যে সালেমা জ্বলিয়া উঠিলেন। "রাখ্‌ত মাগি, বিনা কামে খেয়ে খেয়ে খুব তেল হয়েছে; তেল কমিয়ে দিচ্ছি"—বলিয়া সালেমা ক্রোধিতা ফণিনীর ন্যায় শয্যা হইতে নামিয়া স্বীয় জুতাদ্বারা হালিমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন,—এমন সময়ে আবুল ফজল বিজলি-গতিতে সালেমার হস্তদ্বয় ধরিয়া ফেলিলেন। উর্দ্ধোত্থিত জুতা হালিমার কপালে না পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। হালিমা গজ্‌গজ্ করিতে করিতে

তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভয়ে পলাইয়া গেল। স্বামীর করধৃতা সালেমা রোষে ক্ষোভে থর্ থর্ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ফুল্লেন্দীবর তুল্য সুন্দর মুখখানি উত্তেজনাজনিত রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল; ধৈর্য্য-হীনতায় চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল। অনন্তর আবুল ফজল হস্ত ত্যাগ করিলেই তিনি অভিমানে কাঁদিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে দুশ্চারিণী হালিমা প্রচার করিয়া দিল, তাহাকে মারিতে আসিয়া সালেমা আবুল ফজলের গায়ে জুতা লাগাইয়াছে। দাসী মহলে কাণাকাণি হইতে হইতে ক্রমে কথাটা বিবি সাহেবা জানিতে পারিলেন। তাঁহার দ্বারা চৌধুরী সাহেবের কাণেও উঠিল। তিনি সালেমাকে ডাকিয়া তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক আবুল ফজলের নিকট তখনই ক্ষমা প্রার্থনা করিতে কঠোর ভাবে আদেশ করিলেন। এই ঘটনায় সালেমা এমন লজ্জা পাইলেন যে, তিনি আলিনগর যাওয়ার ইচ্ছা সম্পুর্ণ ত্যাগ করিলেন। আবুল ফজল কেন ধরিতে আসিলেন, এইজন্য স্বামীর উপরও তাঁহার মহা রাগ হইল। এদিকে সালেমা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে কিনা, চৌধুরী সাহেব দাসীর দ্বারা আবুল ফজলের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। আবুল ফজল হালিমার কাণ্ড শুনিয়া ক্ষুন্ন ও লজ্জিত হইলেন। তিনি সে কথা সম্পুর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সকলের তাহা বিশ্বাস হইল না।

রাত্রে আবুল ফজল সালেমাকে অনেক তোষামোদ করিলেন, অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু অভিমানে সালেমা স্বামীর সহিত কথাও বলিলেন না। প্রভাতে সালেমা দৃঢ় নির্ব্বন্ধের সহিত যাইতে অস্বীকার করিলেন। চৌধুরী সাহেব শুনিয়া যেরূপেই হউক, সালেমাকে পাঠাইয়া দিতে বিবি সাহেবাকে আদেশ করিলেন। সালেমাও জিদ ধরিলেন, আমাকে মারিয়া ফেলিলেও যাইব না।

আবুল ফজল পুনরায় সালেমার নিকট যাইয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সালেমা শুনিলেন না। তখন মহা বিরক্ত হইয়া আবুল ফজল বলিলেন,—"সালেমা! আজ যদি আমাকে অপমান কর, আমার কথা না শুন, তবে আমি এই বাড়ী আর আস্‌ব না।" কিন্তু সালেমা তথাপি বিচলিত হইলেন না। তখন অগত্যা আবুল ফজল একাকী বাড়ী রওয়ানা হইলেন। সালেমার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া চৌধুরী সাহেবও বিবাহে গেলেন না।

আবুল ফজল একাকী বাড়ী উপস্থিত হইলে সকলেই মহা বিস্মিত হইলেন। চৌধুরী সাহেব ও সালেমার না আসার কারণ সম্বন্ধে আবুল ফজল পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। দুঃখে পরিতাপে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সকলে বলিতে লাগিল, বড়লোকের সহিত কুটুম্বিতা করিলে ঐরূপই হয়। কেহ কেহ আবুল-ফজলের প্রতি বধূ আনিতে না পারায় পৌরুষহীনতার বিদ্রূপ করিতেও ক্রুটী করিল না। কিন্তু আবুল ফজল সমস্তই নীরবে সহ্য করিলেন।

যথাসময়ে শুভ লগ্নে আতাওর রহমানের সহিত করিমনের বিবাহ সম্পাদিত হইয়া গেল। আবুল ফজল করিমনের বিবাহের পর বাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি কুসুমপুরে আর যাইবেন না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন; ভাবিলেন, কোনরূপ চাকুরী করিয়া স্বাধীন জীবন-যাপন ও পিতা মাতার দুঃখ দূর করিবেন। তাহাতে জীবনে আশানুরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ না হন, সেও ভাল।

কিন্তু একপক্ষ অতীত হইতে না হইতেই চৌধুরী সাহেব পুনঃ পুনঃ পত্র লেখায় আবুল ফজল পিতার অনুরোধে বাধ্য হইয়া কুসুমপুরে গেলেন। সালেমাকে আর একবার দেখা দিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিবার ইচ্ছাও তাঁহার অন্তরে বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেখানে আর অবস্থান

করিবেন না, এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আবুল ফজল কুসুমপুরে গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করিলেন না। গমনকালে যাহাদের সহিত দেখা হইল, সরল ভাবে তাহাদের কুশলাদি মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন এবং শ্বশুর-শাশুড়ীকে চিরপ্রথানুযায়ী সালাম করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিলেন।

সালেমা তখন গৃহে ছিলেন না; তিনি গৃহান্তরে কতিপয় দাসী লইয়া এক আমোদজনক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। গোলবাহার দ্রুত গিয়া তাঁহাকে আবুল ফজলের আগমনসংবাদ দিলে আনন্দে তাঁহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। কারণ তিনি আবুল ফজলকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার হঠকারিতা বশতঃ আবুল ফজল অসন্তুষ্ট হইয়া বাড়ী যাওয়ায় সালেমা প্রকৃতই প্রাণে বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। তৎপর আবুল ফজলের অনুপস্থিতিবশতঃ তাঁহার অভাবে কয়েকদিন সালেমার জীবন বড়ই শূন্যময় বোধ হইতেছিল। সুতরাং অদ্য সহসা স্বামীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে হর্ষাতিশয্যে তাঁহার প্রাণ কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বের কথা বিস্মৃত হইয়া সকল চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া আকুল ভাবে স্বামিসন্দর্শনে গমন করিলেন; স্ফীতমুখে গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিতেই তাঁহার মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কারণ আবুল ফজল সালেমাকে পূর্ব্বের ন্যায় আদর অভ্যর্থনা বা সাদর সম্ভাষণ করা ত দূরের কথা, তাঁহাকে একটু স্নেহসম্ভাষণ এমন কি, নিকটেও আহ্বান করিলেন না। স্বামীর এইরূপ ভাবান্তর বা প্রত্যাখ্যানে নিদারুণ অভিমানে সালেমার প্রাণ ভরিয়া গেল। তিনি বজ্রাহতার ন্যায় দাঁড়াইয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন এবং গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য মাথা তুলিয়া আবুল ফজলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আবুল ফজল শয়নখাটের পার্শ্ববর্ত্তী টেবিলে

হাত রাখিয়া একখানি চেয়ারের উপর বসিয়াছিলেন; তিনি অনুমানে সালেমার উদ্দেশ্য ও ভাব কতকটা বুঝিয়া লইলেন। কিন্তু তজ্জন্য একটুও বিচলিত হইলেন না। বরং সালেমা তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই আবুল ফজল ঔদাসীন্যের সহিত স্নেহশূন্য নিরস ভাষায় বলিলেন, "সালেমা, শুন একটী কথা আছে।"

বহুদিনান্ত সাক্ষাতের এই কি উপযুক্ত সম্ভাষণ! সালেমা অতি কষ্টে স্বীয় মনের আবেগ দমন করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে আবুল ফজলের দিকে একটু অগ্রসর হইলেন এবং টেবিলের নিকটে দণ্ডায়মানা হইয়া বিরাগ-পূর্ণকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"বলুন কি কথা?"

আবুল ফজল। শুন সালেমা, তোমাকে লাভ করিয়া জীবনে বড়ই সুখের আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন বুঝিলাম, কেবল ধনবতী রূপবতী পত্নী পাইলেই সুখী হওয়া যায় না। রমণীর যে গুণ থাকিলে স্বামী পরিজন সংসারে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারে, সে গুণ যে তোমার নাই, তাহা বলিতেছি না! কিন্তু অস্বাভাবিক অভিমান, অত্যধিক গর্ব্ব ও অপরিমিত ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কারে তোমার সে গুণ আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তুমি যদি ঐশ্বর্য্যশালী জমিদারকন্যা না হইতে, তবে বোধ হয় আমাকে এ দুঃসহ মনস্তাপ ভোগ করিতে হইত না। সালেমা! সময় আছে, তাই বলিলাম; এখনও তুমি নিজ স্বভাব পরিবর্ত্তনের চেষ্টা কর।

আবুল ফজলের নিষ্ঠুর ভর্ৎসনায় ক্ষোভে-দুঃখে সালেমার চিত্ত জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"আমাকে অনর্থক তিরস্কার করাই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। নচেৎ আমি ত এমন কোন অপরাধ করেছি বলে মনে পড়ে না যে, যা'তে আপনার সুখের পথে কাঁটা হয়ে পড়েছি। তারপর কি যে অহঙ্কার

কর্‌লেম, তাও ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমি ধনী জমিদারের কন্যা, এতে আপনার হিংসা হ'তে পারে বটে; কেন না আমার জন্যই আপনি যখন যাহা চান, তখনই তাহা পান; একাধিক দাসদাসী আপনার হুকুমের তাবেদার; শত শত আমলা ও রাইয়ত-প্রজা আপনাকে জমিদারের ন্যায় সম্মান করে; এতগুলি অসুবিধা অসুখ উৎপাদন কর্‌বেইত?"

সালেমার শ্লেষে আবুল ফজল ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া শান্ত ভাবে উত্তর করিলেন,—"শুন সালেমা! কেবল ধন-ঐশ্বর্য্য, জমিদারী, কোঠা-বালাখানা বা দাসদাসী থাক্‌লেই লোক সুখী হয় না। জীবনের সুখের সহিত ওগুলির বিশেষ কোনই সম্বন্ধ নাই। ভেবে দেখ, যদি তুমি আমার সম্পূর্ণ অনুগত হইতে, তবে এ ধন-ঐশ্বর্য্য, দাস-দাসী না থাক্‌লেও কোন ক্ষতি ছিল না। তোমার অবাধ্যতায় তোমাদের এই সমস্ত আদর-অভ্যর্থনা, ধন-সম্পদ ও সুখ-সুবিধা আমার নিকট তীব্র অসুখময় বলে বোধ হচ্ছে। ইহা অপেক্ষা দারিদ্রের সহিত কুটীরে বাস করাও ভাল ছিল।"

সালেমা। বুঝ্‌লাম; আমি যদি দীন-হীন হইতাম, সংসারে আমার কিছু বা কেহ না থাক্‌ত, সকলে আমার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার কর্‌তে পার্‌তেন, তবেই আপনার সাধ পূর্ণ হইত, আপনি সুখী হইতেন!

আবুল ফজল। আমি কিরূপ ব্যবহারে সুখী হইতাম, তাহা তুমি বুঝিবে না; তবে স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা অপেক্ষা বরং তোমার কল্পনাও ভাল।

সালেমা একটু উত্তেজিত ভাবে বলিলেন,—"ভাল তবে সেইরূপ বিবাহ কর্‌লেই পার্‌তেন; আপনার মত মহাত্মার পক্ষে মানবাধম ধনী জমিদারের মেয়েকে বিবাহ না করাই উচিত ছিল।"

আবুল ফজল। দোষ সম্পূর্ণ আমারই বটে; কারণ বিবাহের জন্য উন্মত্ত হইয়া আমিই তোমাদের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া করুণা ভিক্ষা করিয়া-

ছিলাম। যাক, সেজন্য দুঃখ করি না। তক্‌দিরে যা থাকে, তা ঘটেই।

আবুল ফজলের কথায় সালেমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহাকে অপমান করা ও রূঢ় কথা বলাই আজ আবুল ফজলের ইচ্ছা। নচেৎ এতদিন পরে সহসা এ ব্যবহার কেন? সুতরাং তিনি প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—"আমি আপনার কৃপাভিখারী বা গলগ্রহ নহি; আমার প্রতি আপনার এরূপ ব্যবহার শোভা পায় না। নিজের ওজন বুঝে কথা বলাই উচিত।"

আবুল ফজল সালেমার শাসানি গ্রাহ্য না করিয়া স্পষ্ট বলিলেন, "ঐটাই হচ্ছে যত রোগের মূল; সুতরাং ঐ মূলোচ্ছেদ না হইলে কাহারও মঙ্গল হইবে না।"

সালেমা আর কিছু না বলিয়া রোষভরে বাহির হইয়া গেলেন; তিনি জীবনে অদ্যকার মত আর কাহারও নিকট হতমান ও তিরস্কৃত হন নাই। দুঃখে তাঁহার কান্না আসিতে লাগিল। আবুল ফজলও একাকী গৃহের মধ্যে বসিয়া সালেমার ব্যবহারজনিত দুঃখানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

রাত্রে চৌধুরী সাহেব আবুল ফজলকে ডাকিয়া একত্রে আহার করিতে বলিলেন; শ্বশুর-জামাইয়ের অনেক কথা হইল। চৌধুরী সাহেব আবুল ফজলকে পরোক্ষে নানা উপদেশ দিলেন। কিন্তু মানসিক অশান্তিবশতঃ তিনি কোন কথাতেই মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না।

আহারান্তে আবুল ফজল পড়িবার গৃহে প্রবেশ করিয়া যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন এবং নামমাত্র একখানা পুস্তক খুলিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সালেমার স্বেচ্ছাচারিতামূলক ব্যবহারে তাঁহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি জমিদার-বাড়ী ত্যাগ

করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু আর একবার সালেমাকে দেখিয়া যাইতে তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। হায় সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ!

আবুল ফজল পাঠগৃহ ত্যাগ করিয়া যখন শয়নগৃহে চলিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। জীব-জগৎ গভীর সুপ্তিমগ্ন। আকাশ এক খণ্ড গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন; বাতাস রুদ্ধগতি। ঝোপে ঝোপে খদ্যোৎপুঞ্জ জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া যাইতেছিল; গগন-কোলে এক আধটী তারা ভাসিয়া ভাসিয়া ডুবিয়া যাইতেছিল; প্রকৃতি গভীর নীরবতায় আচ্ছন্ন। এমন সময়ে আবুল ফজল গৃহে গিয়া দেখিলেন, সালেমা দুগ্ধ-ধবল শয্যার উপর ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। পার্শ্বে টেবিলের উপর অনুজ্জ্বল আলোক প্রহরী স্বরূপ বিরাজমান।

আবুল ফজল মুগ্ধনেত্রে ঘুমন্ত সালেমার রূপমাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! যেন সৌন্দর্য্যের জীবন্ত প্রতিমা! রূপে কক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। দুগ্ধ-ফেন-নিভ বালিশের উপর সংবিন্যস্ত ঘোর কৃষ্ণ বিকুঞ্চিত কেশদামের কি মনোহর শোভা! নিদ্রালস মাধুরী-মণ্ডিত কমনীয় মুখের উপর আলোকপ্রভা পতিত হওয়ায় যেন কোটী স্বর্গের শোভা প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। চিত্তহারী লাবণ্যোদ্ভাসিত অর্দ্ধ-অনাবৃত দেহসৌষ্ঠবেরই বা কি মধুর দৃশ্য! সম্পদের স্বপ্নরাজ্য যেন তাঁহার যুগল পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেছিল। সেই বিশ্ববিমোহিনী সৌন্দর্য্য-প্রতিমাকে বুকে ধরিবার জন্য আবুল ফজলের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ করিয়া শয্যাপার্শ্বে একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহার রূপমাধুরী দর্শন করিয়া শেষে শান্ত স্বরে ডাকিলেন;—"সালেমা!"

সালেমা স্বামীর কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলে আবুল ফজল বলিলেন,—"সালেমা! তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া কষ্ট দিলাম,

কিছু মনে করিও না। বোধ হয় আমার ন্যায় তুমিও আমার দ্বারা সুখী হইতে পার নাই। কিন্তু দোষ কাহারও নহে; দোষ উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্যের। তুমিও যেমন অত্যধিক স্বাধীনতাপ্রযুক্ত আমার মতানুসরণ করিয়া চলিতে পারিতেছ না, সেইরূপ তোমার মতানুসরণ করিয়া চলা আমারও অসাধ্য।''

সালেমা। বৃথা দোষারোপ কর্‌লে আর কি কর্‌ব; আমি আপনার দ্বারা সুখী হই নাই, বা আপনি আমার মতানুসরণ করিয়া চলুন, এ কথা কখনও আপনাকে বলেছি কি?

আবুল ফজল। মুখে না বল্‌লেও তোমার ব্যবহার তাহা বল্‌ছে; সে যা'হউক, সালেমা আমি আর তোমাদের এ বাড়ীর সহিত সম্বন্ধ রাখ্‌তে পার্‌ব না এবং রাখ্‌ব না। কারণ আমার আত্মসম্মান বড়ই প্রহৃত হইয়াছে। তোমার নিকট আমার শেষ অনুরোধ, সংসারে ধর্ম্ম-ময় জীবন অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করিও; সকলের সহিত সংযত ব্যব-হার করিও; এবং যাহার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য আছে, অহঙ্কার বা উত্তেজনা বশে তাহা বিস্মৃত হইও না।—বলিতে বলিতে আবুল ফজলের হৃদয় ভাঙ্গিয়া কান্না আসিল; দরবিগলিত ধারে তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু বহির্গত হইল; তিনি রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু মুছিলেন।

তদ্দর্শনে সালেমা বলিলেন,—"আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন? আমাদের ব্যবহার আপনার ভাল না বোধ হয়, এ বাড়ী থাক্‌তে আপনার ইচ্ছা না হয়, আপনি যেখানে ইচ্ছা হয় থাকুবেন, যাহা ইচ্ছা হয় কর্‌বেন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই।"

হায় সালেমা, কখনও লোকের হৃদয় পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছ কি? স্বামীর মানসিক জ্বালাময় ক্ষতের উপর সান্ত্বনা-প্রলেপের পরিবর্ত্তে কিরূপ তীব্র হলাহল প্রক্ষেপ করিলে, তাহা বুঝিয়াছ কি?

গর্ব্বিতে! এই মুহূর্ত্তের ব্যাপারে তোমার জীবন চির অভিশপ্ত হইয়া যাইতে পারে, তোমার সুখের প্রদীপ—গর্ব্বের শিখা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইতে পারে, তাহা খেয়াল আছে কি? দাম্ভিকে! একটী মাত্র সহানুভূতিপূর্ণ মিষ্ট কথায় যে বিবাদের দাবানল নিবাইতে পারিতে, একটু মাত্র প্রেমপূর্ণ কোমল ব্যবহারে যে বিপদের ঝঞ্ঝা প্রতিরোধ করিতে পারিতে, তুচ্ছা অহঙ্কার,—নগণ্য স্বেচ্ছাচারের বশীভূত হইয়া কেন তাহা করিলে না? এ পরিতাপ রাখিবার স্থান পাইবে কি? কে বলিতে পারে, আজ অবলীলাক্রমে তুমি যে রত্ন প্রত্যাখ্যান করিলে, কাল তাহারই জন্য তুমি পথের ভিখারিণী হইয়া চারিদিক শূন্যময় দেখিবে না? ঐশ্বর্য্য, গর্ব্ব, তোমাকে ধিক্! তুমি মানবকে এত আত্মবিস্মৃত করিতে পার?

আবুল ফজল আর কিছু বলিলেন না—বলিতে পারিলেন না। সালেমার হৃদয়হীন বাক্যের তাপে তাঁহার চক্ষের জল শুকাইয়া গেল; তিনি দৃঢ়তার সহিত হৃদয় হইতে মায়া-মমতা ও আকর্ষণীর ডোরগুলি সবলে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। আত্মমর্য্যাদা ও কর্ত্তব্যের উপর ভর দিয়া উদাস ভাবে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ধীর পদে গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন এবং হিতাহিত অগ্রপশ্চাৎ ও পরিণাম সম্বন্ধে কিছু মাত্র চিন্তা না করিয়া তন্মুহূর্ত্তে জমিদারবাটী ত্যাগ করিলেন।

আবুল ফজল গৃহত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ভীষণ বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল এবং সেই শ্রুতিবিদারী ভয়াবহ গর্জ্জনে কুসুমপুরের সঙ্গে সঙ্গে সালেমার প্রাণ তীব্র আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

প্রবাসে।

আবুল ফজল যখন সালেমার কক্ষ ত্যাগ করিয়া জমিদারবাড়ীর বাহির হইলেন, তখন আশু বর্ষণোন্মুখ গাঢ় মেঘে ঘন ঘন বিজলি চমকিত হইতেছিল। কিন্তু তিনি তৎপ্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতপদে কুসুমপুর ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তখন রজনী দুই প্রহর; চতুর্দ্দিক স্থচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন; একহস্ত সম্মুখের জিনিসও দৃষ্টিগোচর হইবার সাধ্য ছিল না। আবুল ফজল উত্তেজনাবশে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন; আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত ও হৃদয় মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, তিনি কুসুমপুরের সীমানা অতিক্রম করিতে না করিতেই বৃক্ষলতা তোলপাড় করিয়া ঘোর ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইল; মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আবুল ফজলের পরনে একখানি মাত্র কাপড়, গায়ে একটী মাত্র জামা; পায়ে সাধারণ ব্যবহার্য্য একজোড়া মাত্র জুতা। কিন্তু বৃষ্টিতে তাহাও ভিজিয়া যাইবার উপক্রম হইলে তিনি কোথায় যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া বিপদাপন্ন অবস্থায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষণপ্রভার হাস্যালোকে সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র মস্‌জিদ দৃষ্ট হইল। তিনি দ্রুতপদে মস্‌জিদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মস্‌জিদে প্রবেশ করিবার সময়ে তিনি একবার পশ্চাতে চাহিলেন। বিজলির আলোকে

জমিদারবাটীর দ্বিতল কক্ষ তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। কল্পনালোকে রুদ্ধ গবাক্ষপথেও যেন তিনি একখানি সৌন্দর্য্যমণ্ডিত মুখ নিরীক্ষণ করিলেন!

প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ঝড়-বৃষ্টি হইল। আবুল ফজল ততক্ষণ পর্য্যন্ত সিক্তবস্ত্রে মস্‌জিদের মধ্যে বসিয়া কাটাইয়া দিলেন। স্বীয় অবিবেকতা, সালেমার নিষ্ঠুরতা এবং সঙ্গে তাঁহার উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি কত চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তার গভীরতায় বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। চক্ষে একটু তন্দ্রাও আসিল। সহসা পল্লী-মোরগের "কুক্‌কুরে—কু" বা "কংশরে—সার" কণ্ঠনাদে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি শশব্যস্তে বাহির হইয়া দেখিলেন ও বুঝিলেন, ঝড় বৃষ্টি অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ পক্ষের দশমীর চন্দ্রমাকোলে প্রভাতি নক্ষত্র উজ্জ্বল হাস্য করিতেছে। পূর্ব্বগগনে 'সোবে সাদেক' বা ঊষার শুভ্র হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবুল ফজল মসজিদসংলগ্ন কূপ হইতে পানি তুলিয়া ওজু করিলেন এবং মস্‌জিদের একপার্শ্বে বসিয়া নীরবে কোরানের সুরা-বিশেষ পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে একটী মুসল্লি আসিয়া আজান দিলেন। পবিত্র আজানের প্রভাত-কালীন সংলগ্ন "নিদ্রা হইতে উপাসনা শ্রেষ্ঠতর"—পদরত্নের মধুর আকর্ষণীতে কয়েকটী ধর্ম্মপ্রাণ মোসলমান মস্‌জিদে উপস্থিত হইলেন। 'তক্‌বির' অন্তে যথাবিধি নামাজ আরম্ভ হইল। আবুল ফজল তাঁহাদের সহিত নামাজ পড়িয়া দ্রুতগতি মস্‌জিদ ত্যাগ করিলেন। পরিচিত হইবার ভয়ে কাহার সহিত একটীও কথা বলিলেন না। নামাজ শেষ করিয়া মুসল্লীগণের মধ্যে জনৈক বয়স্ক ব্যক্তি আর একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এই যে আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়ে গেলেন কে? হুজুরের জামাই না?" উত্তরে সে অগ্রাহ্য ভাবে বলিল,—"হাঁ হুজুরের জামাই এইখানে নামাজ পড়্‌তে আস্‌ছেন।"

আবুল ফজল মস্‌জিদ হইতে বাহির হইয়া দ্রুতগতি পূর্ব্বমুখে যাত্রা করিলেন। সে দিকে পথ ভাল ছিল না; বৃষ্টিতে খুব কাদাও হইয়াছিল; সুতরাং তিনি জুতা হাতে করিয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভোর হইয়া আকাশে সূর্য্য উঠিল; আস্তে আস্তে বেলা বাড়িতে লাগিল। সূর্য্যোত্তাপে তাঁহার গাত্রবস্ত্র শুকাইয়া পরিশ্রমজনিত ঘর্ম্মে আবার ভিজিয়া যাইতে লাগিল। আবুল ফজল এইরূপ দুই প্রহর চলিয়া একটী ষ্টীমার-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তিনি তখন অবনী অন্ধকার দেখিতেছিলেন। ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন, এবং বিশ্রামান্তর একটী ডাবের শরবৎ পান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। তৎপর আহারাদির জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই যোগাড় করিতে পারিলেন না। এদিকে তখনই ষ্টীমার ছাড়িয়া দেওয়ায় তিনি ষ্টীমারে উঠিয়া জেলান্তরে গমন করিলেন।

আবুল ফজল যে জিলায় উপস্থিত হইলেন, উহার নাম প্রকাশের কোন সার্থকতা না দেখিয়া আমরা ক্ষান্ত হওয়াই সঙ্গত মনে করিলাম। আবুল ফজল সেই জেলার সদরে গিয়া একটী হোটেলে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে দশ টাকার একখানি নোট ও সাত আটটী টাকা মাত্র ছিল। তাহারও চারি পাঁচ টাকা ষ্টীমারে আসিতে ও আহারাদি করিতে খরচ হইয়া গিয়াছিল। বাকী টাকা কয়টীর মধ্যে দশ টাকা খরচ করিয়া তিনি একপ্রস্ত জাতীয় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিলেন; কারণ তিনি কাপড় চোপড় সবই কুসুমপুরে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। অথচ কাপড়াদি না হইলে ভদ্রলোক বলিয়া লোকের সঙ্গে দেখা করাও লজ্জাকর। যাহা হউক, কাপড়াদি প্রস্তুত করিয়া পরদিন আবুল ফজল স্থানীয় 'আঞ্জমনের' সেক্রেটরী সাহেবের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। মোসল-মানের পক্ষে কোথাও চাকুরী ইত্যাদি করিতে হইলে, তথাকার আঞ্জমনের

সেক্রেটরীর সহিত পরিচিত হওয়া এবং তাহার সার্টিফিকেট ও সোপারিস লওয়া আধুনিক একটা ফ্যাশনের মধ্যে পরিগণিত।

উক্ত জেলার "আঞ্জমনে ইস্‌লামিয়ার" সেক্রেটরী একজন মোসলমান মোখ্‌তার। তাঁহার বয়স চল্লিসের উপর ; চেহারা নীরস, রুগ্ন ও দুর্ব্বল ; স্বভাব খিটখিটে। বিদ্যাবুদ্ধি "চাঁদের মা বুড়ী"র আমলের ছাত্রবৃত্তি পাস! ইংরাজী নলেজ নাম দস্তখত করিতে তিনটী কলম ভাঙ্গা এবং আরবী ফারসী 'লেয়াকতের' মধ্যে মুন্‌শী-মৌলবী প্রভৃতি আলেমগণের নিন্দা করা। মোখ্‌তার সাহেবের ভাগ্যখানা অতি ভাল। অবস্থাও মন্দ নহে। কিন্তু আঙ্গুল ফুলিয়া কলা গাছ হওয়ার মত দুই পুরুষে সমাজ-শৈলের চাষামী গুহা হইতে একলম্ফে বড়মানুষীর উচ্চশিখরে উপস্থিত হওয়ায় অহঙ্কারে মোখ্‌তার সাহেবের আপাদমস্তক জর্জ্জরীভূত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহার বদনমণ্ডল লোকাপবাদ ও বিশ্বনিন্দার অফুরন্ত ভাণ্ডার! চলিতে বলিতে মোখ্‌তার সাহেবের মত মানুষ দেশে আর কে আছে? তাঁহার ঢাকাই বাঙ্গলার ধাক্কায় চাটগাঁ পিছ-পা থায়, উর্দ্দুর উড়োলম্ফে উড়িয়া লজ্জায় পলাইয়া যায় ; তিনি ইংরেজী শব্দও মাঝে মাঝে উচ্চারণ করেন, কিন্তু সে ইংরেজী শব্দের এলোমেলো উচ্চারণের অর্থ বুঝা ইংলিস বাজারের ইউরেশীয় দালালেরও অসাধ্য। তিনি ধর্ম্মকথাও জানিতেন, কিন্তু তাহা "কয় রেকাত রোজার" মত! মোটের উপর মোখ্‌তার সাহেব চালাক ও প্রতিভাবান। নবাব আবদুল-লতিফী আমলের ছাত্রবৃত্তি পড়া মোখ্‌তারী পাশ হইলে কি হয়, ছাত্রবৃত্তি পড়া উকিলও ত তখন ছিল ; তাঁহারাও ত পয়সা রোজগার করিয়া দেশে ও বিদেশে পাকা তেতালা বাড়ী করিত! তবে দুঃখের বিষয় মোখ্‌তার সাহেব মোখ্‌তারীতে পয়সা পাইতেন না। কিন্তু তিনি বেশ নাম করিতে জানিতেন। স্বদেশী হুজুগের নাম কিনিবার শুভ সুযোগে যখন উকিল-মোখ্‌তার ও রাজা-জমিদার গবর্ণ-

মেন্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বুদ্ধিমান মোখ্‌তার সাহেব শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মোসলমানদিগকে পিছে ফেলিয়া কতকগুলি মুহুরী, দপ্তরী ও দালাল-দোকানদার লইয়া একটী আঞ্জমন দাঁড় করিয়া রাজভক্তির ঢাক পিটাইলেন ; দেশময় তাঁহার যশ-অপযশ ও নিন্দা-স্তুতির অশ্ব ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলেই তাঁহার নাম জানিলেন ; গবর্ণমেণ্টের সদয় দৃষ্টি ও কৃপাবৃষ্টি তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। ক্রমে সাহেব সুবারা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহার অপোগণ্ড কুপোষ্য-গুলির ভাল ভাল চাকুরী হইতে লাগিল। তাঁহার অবস্থা ও চেহারার আমুল পরিবর্ত্তন হইল। ইহার পর মোখ্‌তার সাহেব মোসলমান সমাজে সুদ প্রচার প্রভৃতি নানা কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের যারপর নাই প্রীতিভাজন হইলেন। সমাজে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট বাড়িয়া গেল। নিত্য দলে দলে ওমেদার-অনুচর তাঁহার বাসায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। বিরুদ্ধবাদীরাও ক্রমে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে লাগিলেন ; গবর্ণমেণ্ট হইতে মোখ্‌তার সাহেবকে একটী উপাধিও দেওয়া হইল।

আবুল ফজল সেক্রেটরী মোখ্‌তার সাহেবের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেক্রেটরী সাহেব একখানি চেয়ারে দেহ ঢালিয়া নাকে ঘন ঘন নস্য পুরিতেছেন ; সম্মুখে ও পার্শ্বে দশবারজন অনুচর, উপচর ও পার্শ্বচর এবং মাঝে মাঝে দুই চারিজন ওমেদার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছেন এবং তিনি গুরুস্বরূপ তাহাদিগকে মন্ত্রশিষ্যের ন্যায় উপদেশ দিতেছেন। আবুল ফজল সেক্রেটারী সাহেবকে সেলাম করিয়া উপবেশন করিলেন।

সেক্রেটারী সাহেব তৎপ্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নানা কথা আরম্ভ করিলেন। মোসলমানের জাতিনিন্দা, ধর্ম্মনিন্দা, সমাজ-

নিন্দা ও আচার ব্যবহার নিন্দা এবং সর্ব্বোপরি শিক্ষিত অপদার্থ যুবক-গণের নিন্দা তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল বাহির হইতে লাগিল। গল্পের মধ্যেই কেহ কেহ উপদেশ ও সার্টিফিকেট লইয়া বিদায় হইলেন।

তিন চারিজন বিদায় হইবার পর সেক্রেটারী সাহেব আবুল ফজলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মিঞা, তোমার কি আবশ্যক ?"

আবুল ফজল। হুজুরের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি।

সেক্রে। কেবল দেখা কোর্‌তে কেউ আসে না ; দরকার কি ?

আবুল ফজল। কোনরূপ চাকুরী ইত্যাদির যোগাড় করাই উদ্দেশ্য ?

সেক্রে। ওই ত দোষ! লেখাপড়া না শিখেই কেবল চাকুরী চাকুরী! এতেই আমাদের মোসলমান জাতের অধঃপতন! রোজ যত লোক আস্‌বে, কেবল চাকুরী। চাকুরী ত গাছের ফল নয় যে, ছিড়ে ছিড়ে দিব। বাড়ী কোথায় ?

আবুল ফজল তাঁহার অসভ্যতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া বলিলেন,—"বাড়ী ফরিদপুর।"

সেক্রে। ফরিদপুর ছেড়ে এখানে কেন, সেখানে চাকুরী নাই ?

আবুল ফজল। সেখানে বিশেষ চেষ্টা করি নাই।

সেক্রে। নিজ জেলা ছেড়ে পরের দেশে চেষ্টার মানে কি ? পাস-টাস কিছু আছে ?

আবুল ফজল মাথা নীচু করিয়া বলিলেন,—"বি-এ পাশ করে এম-এ দিয়াছি।" সেক্রেটরী সাহেবের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলেই চমকিত ভাবে আবুল ফজলের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সেক্রেটরী সাহেব শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন,—"আপনার শিক্ষার কথা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আপনার চাকুরীর অভাব কি ? আপনি

সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন। আমিও সাহেবের নিকট আপনার জন্য বিশেষ করে বল্‌ব।"

আবুল ফজল সালাম করিয়া বিদায় হইলেন। তিনি সেক্রেটরী সাহেবের নিকট যেরূপ ভদ্র ব্যবহার পাইলেন, তাহাতে তাঁহার নিকট পুনর্ব্বার আসার কল্পনাও আবুল ফজলের মনে উদিত হইল না। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। সাহেব আবুল ফজলকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌শীপের জন্য চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিলেন; –কিন্তু আবুল ফজল স্বীয় অবস্থা জানাইলে তিনি বলিলেন,—"আপাততঃ হেড্ ক্লার্কের পোষ্ট খালি আছে; আপনি দরখাস্ত করুন, আমি আপনার বিষয় বিশেষ বিবেচনা করব।"

আবুল ফজল দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু সে দরখাস্ত শেরেস্তাদারের ফাইল হইতে অদৃশ্য হইল। শেরেস্তাদারের মাসতুত ভ্রাতার শ্যালকের জামাতার ভগ্নীপতির আই-এ ফেইল পুত্র ঐ চাকুরী পাইলেন।

আবুল ফজল ভগ্নমনোরথ হইয়া সাহেবের সহিত পুনঃ দেখা করিলেন। সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"আমি দুঃখিত; কৈ আপনার দরখাস্ত ত পাই নাই। আচ্ছা আপনি জজ সাহেবের কাছে যান; আমি একখান চিঠি লিখিয়া দিতেছি।"

আবুল ফজল মাজিষ্ট্রেটের চিঠি লইয়া জজ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জজ সাহেব বিলাতের এক উচ্চ বংশসম্ভূত ও বড় ভাল লোক ছিলেন। তিনি আবুল ফজলের সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত চেহারা দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "আপাততঃ আমার নিকট কোন কাজই নাই; কিছুদিন পরে হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে আপনার বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। তবে আপনি যদি বিদেশে যাইতে সম্মত হন, আপনাকে একটী সুবিধা-

জনক কার্য্যের জোগাড় করিয়া দিতে পারি। কারণ আমার একজন আত্মীয় রেঙ্গুণে একটী কারবার খুলিতেছেন; তাঁহার সেই কার্য্যের জন্য একজন ম্যানেজিং-এজেণ্টের বিশেষ দরকার।"

আঃ ফ। আপনি যদি সুবিধা হইবে বলেন, আমি যাইতে প্রস্তুত আছি।

জজ সাহেব। সুবিধা হইবে না কেন? আপাততঃ বেতন আড়াই শত টাকা পাইবেন। তৎপর প্রতি বৎসর পঞ্চাশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি হইয়া পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে। অসুবিধার মধ্যে পাঁচ বৎসরের একটী গ্যারাণ্টি দিতে হইবে; ইহার মধ্যে বিদায় লইতে কিম্বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। যদি করেন, দশহাজার টাকা ক্ষতি-পূরণ দিতে হইবে। আপনি ভাবিয়া দেখুন; যদি সম্মত হন, আমাকে পরশু চারিটার সময়ে উত্তর দিবেন।

আবুল ফজল বাসায় আসিয়া অনেক চিন্তা করিলেন। কত কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, দেশের মায়া করিতে গেলে কখনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিব না। হয়ত অবিলম্বেই আবার কুসুমপুরের অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইবে। এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া তিনি চিত্ত স্থির করিলেন; মনে কঠোরতার প্রতিষ্ঠা করিলেন। এদিকে তাঁহার খরচপত্রও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি যথাসময়ে জজ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। জজ সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আপনার মত উদ্যমশীল যুবকের নিশ্চয়ই উন্নতি হইবে।" অনন্তর তিনি স্বীয় বন্ধুকে ডাকিয়া আবুল ফজলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইল। পরদিন আবুল ফজল টাকা পয়সা গ্রহণপূর্ব্বক গ্যারাণ্টি লিখিয়া দিয়া শুভলগ্নে রেঙ্গুণ যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—•⁘•⁘•—

চৌধুরী সাহেবের পরলোক গমন।

সালেমা আবুল ফজলকে—"যেখানে ইচ্ছা হয় থাকিবেন, যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই"—বলিবার পর আবুল ফজল যখন গৃহ হইতে নীরবে বাহির হইয়া গেলেন, তখনও সালেমার চৈতন্য হইল না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, আবুল ফজল মুখে যাহাই বলুন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে কিছুতেই ত্যাগ করিয়া যাইবেন না, যাইতে পারিবেন না এবং সাহসীও হইবেন না। রাগ করিয়া বাহিরে গিয়াছেন, রাগ কমিলে এখনই আসিবেন। কিন্তু আবুল ফজল বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন বজ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তখন কম্পিত হৃদয়ে সালেমা উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আবুল ফজল এখনই আসিবেন—এই এলেন বুঝি, এইরূপ আশায় সালেমা অনেকক্ষণ বসিয়া কাটাইলেন, কিন্তু আবুল ফজল গৃহে প্রবেশ করিলেন না। ক্রমে মুষল ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ক্রুদ্ধ পবন রুদ্ধ জানালা ও মুক্ত দ্বার ভেদ করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিল। সালেমা ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন; তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন; শশব্যস্তে আলোক ধরাইয়া বিপন্নার মত চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃষ্টির বিপুল আরাব তখন সমস্ত শব্দ রুদ্ধ করিয়া দিল; উন্মত্ত পবন ক্রুদ্ধ-দৈত্যের মত গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া দরজা জানালার উপর পুনঃপুনঃ আঘাত করিতে লাগিল।

সালেমা ভাবিলেন, আবুল ফজল পড়িবার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। এতক্ষণ পরে স্বামীর উপর প্রকৃতই তাঁহার রাগ হইল। তিনি ভাবিলেন, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া তিনি গৃহান্তরে অবস্থান করিতেছেন? সালেমা যে দিক হইতে ঝড় আসিতেছিল, কম্পিত হস্তে তাহার বিপরীত দিকের একটী জানালা খুলিয়া আবুল ফজলের পড়ার ঘরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; সে ঘরখানিও ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিদ্যুতের আলোকে দৃষ্ট হইল, উহার দ্বার উন্মুক্ত। এবার সত্যই সালেমার চিত্ত বিচলিত হইল; দেহ কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, তবে সত্যই কি তিনি আমার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন? সালেমা ব্যাকুল ভাবে জানালা রুদ্ধ করিয়া গৃহের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; রৌপ্য-আলনায় আবুল ফজলের আচকান, এজার ও কোট-সার্ট গুলি তেমনই ঝুলিতেছে,—যেমন তিনি দিবসে রাখিয়াছিলেন। স্বর্ণালঙ্কৃত হরিণশৃঙ্গে তাঁহার টুপি, ছাতা ও লাঠি তেমনই সংলগ্ন রহিয়াছে—যেমন বরাবর থাকে। তাঁহার জুতা-গুলিও নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত। সালেমা একটু নিশ্চিন্ত হইলেন। কাপড় চোপড় না লইয়া তিনি যাইবেন কোথায়? এমন অবস্থায় এ হেন দুর্যোগের মুখে কি মানুষ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে? নিশ্চয়ই তিনি নীচের বসিবার ঘরে আছেন। বৃষ্টি থামিতেই সালেমা অধীর ভাবে গৃহ হইতে বাহির হইলেন; সভয়-কম্পিত পদে পড়ার ঘর, বসিবার ঘর ও সমস্ত ঘরের বারান্দা প্রভৃতি সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও আবুল ফজলের দর্শন পাইলেন না। এইবার সালেমা বুঝিলেন, নিশ্চয় তিনি চলিয়া গিয়াছেন। সালেমার প্রাণ আবুল ফজলের জন্য সত্যই হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি ব্যথিত ভাবে গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মুহুর্মুহুঃ তাঁহার মনে জাগরিত হইতে

লাগিল, কেন তাঁহাকে ওরূপ কথা বলিলাম? যখন তিনি আমার প্রতি বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ের করুণ অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া—মমতা-মথিত অশ্রুপূর্ণ নয়নের হৃদয়ভেদী হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তখন কেন আমি তাঁহাকে নিবারণ করিলাম না? কেন স্বীয় কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম না? আমি একটা কথা বলিলে কি তিনি এরূপ উদাস ভাবে সর্ব্বস্বহীনের ন্যায় বাহির হইয়া যাইতেন? হা অদৃষ্ট! তাঁহার জন্য প্রাণ এত কাতর—এমন অধীর হইবে, তিনি নিকটে থাকিতে তাহা বুঝি নাই কেন?

সালেমা বিনা-শয়নে কাঁদিয়া কাঁদিয়া রজনী ভোর করিলেন। প্রভাতে প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া জমিদার-বাড়ী হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই সালেমার দোষ ভাবিয়া তাঁহাকে মন্দ বলিতে লাগিলেন। পরিজনেরা অনেকেই অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করা ভিন্ন সালেমা কাহাকেও কিছু বলিলেন না। চৌধুরী সাহেব সালেমাকে পরিতাপ ও মনস্তাপে জর্জ্জরীভূত দেখিয়া আর তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, কয়েকদিন পরে আবুল-ফজলকে লইয়া আসিলেই চলিবে।

কিন্তু কয়েকদিন ত দূরের কথা, কয়েক মাসেও যখন আবুল ফজলের সন্ধান মিলিল না, তখন কুসুমপুর ও আলিনগরের সকলের চিত্তেই বিষম বিষাদ সঞ্চারিত হইল। এক অমঙ্গল আশঙ্কায় সকলেই বিচলিত হইলেন। এই ব্যাপারে আবুল ফজলের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-গণের মনে সালেমা ও চৌধুরী সাহেবদিগের প্রতি একটা বিজাতীয় বিরাগের সৃষ্টি হইল; সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের সদ্ভাব আর রহিল না। সালেমার কিন্তু এই ঘটনায় আমূল পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহার দর্প, অভিমান, স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি যেন এক যাদুমন্ত্রে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সালেমা এতদিনে বুঝিলেন, স্বামীই রমণী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ! যে গৌরবে তিনি সকলের নিকট গৌরবান্বিত ও উন্নত-মস্তক ছিলেন, সালেমা বুঝিলেন, গুণবান্ স্বামীই তাঁহার সেই গৌরবের মূল। এখন পরিজনগণের প্রায় সকলেই সালেমার উপর প্রভুত্বের ও তিরস্কারের দৃষ্টি প্রতিফলিত করিতে প্রয়াস পায়। তিনি বুঝিলেন, স্বামীর বিরক্তি ও অসন্তুষ্টিই ইহাদিগকে এ সুযোগ দিয়াছে; নচেৎ তিনি যতদিন এখানে ছিলেন, ইহারা স্বপ্নেও এই ব্যবহারের কল্পনা করিতে পারিয়াছে কি? নারীজীবনের এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বামী নিকটে থাকিতে তাঁহার মর্য্যাদা বুঝি নাই; তাঁহার করুণা ও বিরাগদৃষ্টিতে আমার কতদুর মঙ্গলামঙ্গল ঘটিতে পারে, তাহা একটুও বুঝিয়া দেখি নাই; এই চিন্তায় সালেমার চিত্ত অহরহঃ বিচলিত হইয়া উঠিত।

আবুল ফজল প্রায়ই সালেমাকে শান্ত, নম্র হইতে উপদেশ দিতেন; নিয়মিত নামাজ রোজা করিতে সর্ব্বদাই অনুরোধ করিতেন এবং শরিয়তের যে কোন বিধান অবহেলা করিতে সর্ব্বদাই নিষেধ করিতেন। সালেমা পূর্ব্বে এ গুলি কখনই তদ্রূপ গ্রাহ্য বা প্রতিপালন করেন নাই; কিন্তু আবুল ফজল চলিয়া যাওয়ার পর দিবস হইতে সালেমা স্বামীর প্রত্যেক আদেশ, উপদেশ ও নিষেধ পালন করিতে দৃঢ়তার সহিত যত্নবতী হইলেন; সালেমা শরিয়তের নিষিদ্ধ আত্মীয় ও দাসগণের সম্মুখে যাওয়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেন; রোজা নামাজ ও শরিয়তের বিধি-নিষেধ বিশেষ ভাবে পালন করিতে লাগিলেন। স্বামীর অভাবে তাঁহার আদেশ-উপদেশ প্রতিপালন করিয়াও সালেমা প্রাণে অনেকটা শান্তি লাভ করিতেন।

আবুল ফজল সালেমাকে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন; কিন্তু সালেমা অলীক গল্প-উপন্যাসে একান্ত অনুরক্ত থাকায়

সে গুলি স্পর্শও করিতেন না। এক্ষণে মানসিক শান্তির আশ্বাশ তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে গুলি পড়িতে লাগিলেন। ফলে তাঁহার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, নৈতিক, সাংসারিক ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বিশেষরূপে মার্জ্জিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সালেমা বুঝিলেন, পূর্ব্বে এ গুলি পড়িলে কখনই জীবনে এ দুঃসহ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না।

চৌধুরী সাহেব সালেমার এই পরিবর্ত্তনে বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি কন্যার চরিত্রে এই ভাব স্থায়ী করাইবার জন্য কিছুদিন আবুল ফজল সম্বন্ধে কিছু না করাই সঙ্গত বোধ করিলেন।

এইরূপ কয়েকমাস অতীত হইলে আবুল ফজলের পাসের সংবাদ গেজেটে বাহির হইল। তিনি ইতিহাসের এম-এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিলেন; আলিনগরে আবুল ফজলের পিতামাতা এবং কুসুমপুরে জমিদার চৌধুরী সাহেব এই আনন্দসংবাদে পবিত্র মিলাদ সম্পন্ন করিলেন। দীন দরিদ্রদিগকে সাধ্যপক্ষে দান খয়রাত করা হইল। কিন্তু এই আনন্দময় গৌরব-সংবাদে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিবেন, সেই সালেমা অনাবিল পূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার অন্তর মধ্যে এক অব্যক্ত অশান্তি ও নিরানন্দ মুহুর্মুহুঃ প্রতিভাত হইয়া উঠিতে লাগিল।

আবুল ফজল চলিয়া যাওয়ার পর সাত আট মাস অতীত হইলেও যখন তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না; তখন জমিদার-বাড়ীর সকলেই মহা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। সালেমা স্বামীর চিন্তায় দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। নিদারুণ অনুতাপানলে অহর্নিশ তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার স্বভাবের এত পরিবর্ত্তন হইল, তিনি এত দূর শান্ত ও বিনম্র হইয়া পড়িলেন যে, একটী দাসীরও মুখের উপর চক্ষু তুলিয়া কথা বলিতেন না—বলিতে পারিতেন না। তাঁহার

এই পরিবর্ত্তনে সকলেই মহা বিস্মিত হইলেন। চৌধুরী সাহেব সালেমার মর্ম্মযাতনা অনুভব করিয়া ব্যথিত হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইয়া ও নানা স্থানে পত্র লিখিয়া আবুল ফজলের সংবাদ লইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও সন্ধান না পাওয়ায় অগত্যা চৌধুরী সাহেব আবুল ফজলের পিতার নিকট গিয়া জানিলেন, তিনি প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত নানা চেষ্টা করিয়াও তাঁহার প্রকৃত ঠিকানা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তবে আবুল ফজল প্রায় প্রত্যেক মাসেই পিতার নামে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, মাঝে মাঝে কিছু টাকাও পাঠাইয়াছেন, কিন্তু উহার সমস্তই ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত। অবশ্য শেষের দুইখানি পত্রে আবুল ফজল পিতাকে চিঠি লিখিবার জন্য একটী ঠিকানাও দিয়াছেন। উক্ত ঠিকানাটী সদর রেঙ্গুনে অবস্থিত।

চৌধুরী সাহেব পত্রগুলি পাইয়া একে একে উহার সমস্তই পড়িলেন। পত্রগুলিতে তাঁহার হৃদয়ভাবের ছায়া স্পষ্ট প্রতিফলিত ছিল। প্রাথমিক পত্রগুলিতে আবুল ফজল কুসুমপুরের কোনই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই দেখিয়া চৌধুরী সাহেব মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী একখানি পত্রে তাঁহার সে ভাব দূরীভূত হইল। ঐ পত্রে আবুল ফজল পিতাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন—"এ পর্য্যন্ত কুসুম-পুরের কোন সংবাদ পাই নাই; তাঁহাদের সংবাদ জানিলে লিখিবেন এবং আমার কুশল সংবাদ জানাইবেন। আমি এ পর্য্যন্ত লজ্জাবশে হুজুরের (চৌধুরী সাহেবের) নিকট পত্রাদি লিখি নাই। তিনি আমাকে আপনারই ন্যায় স্নেহ করেন। তাঁহার জন্য বড়ই দুঃখ হয়। তিনি হয় ত আমাকে কতই অকৃতজ্ঞ মনে করিতেছেন।"

চৌধুরী সাহেব আফতাব-উদ্দিন মিঞার সহিত তখনই এক যোগে আবুল ফজলকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন এবং বাড়ী যাইয়া

সালেমাকে আবুল ফজলের ঠিকানা প্রদান করিলেন। সালেমা অত্যন্ত বিনয় ও কাতরতার সহিত পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আবুল ফজলের নিকট পত্র লিখিলেন। আবুল ফজল পিতা ও শ্বশুরের পত্রের উত্তর দিলেন। তাহাতে তিনি যে আপাততঃ দেশে আসিতে পারিবেন না, সে কথা স্পষ্ট ভাবে লিখিয়া জানাইলেন! কিন্তু অনেক ভাবিয়া সালেমার পত্রের উত্তর দিলেন না।

অনন্তর চৌধুরী সাহেব আবুল ফজলকে দেশে আনিবার জন্য স্বয়ং রেঙ্গুনে যাইবেন স্থির করিয়া সকলের নিকটেই তাহা প্রকাশ করিলেন। এই সুযোগে রেঙ্গুন দেখিয়া আসিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু হঠাৎ একখণ্ড জমিদারী লইয়া জনৈক হিন্দু জমিদারের সহিত মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায় তিনি কয়েক মাস তাহাতেই ব্যতিব্যস্ত রহিলেন। কয়েক মাস পরে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইল, কিন্তু মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া বাড়ী আসিবার সময়ে সহসা ঠাণ্ডা লাগায় সর্দ্দিজ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি বাড়ী আসিলেন। সেই সামান্য জ্বর ক্রমে প্রবল নিউমোনিয়ায় পরিণত হইল। দেশের খ্যাতনামা ডাক্তার-কবিরাজগণ চৌধুরী সাহেবের চিকিৎসায় নিরত হইল; রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোগ ক্রমে দুরারোগ্য অবস্থায় পরিণত হইল। সকলেই চৌধুরী সাহেবের জীবনাশা পরিত্যাগ করিলেন। বুদ্ধিমান্ চৌধুরী সাহেব স্বীয় অন্তিম অবস্থা বুঝিতে পারিয়া খোদার উপর আত্মসমর্পণ করিলেন এবং সম্পত্তির শৃঙ্খলা স্থাপন জন্য আলিনগরের আফতাব উদ্দিন মিঞা ও অন্যান্য হিতৈষী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু আফতাব উদ্দিন মিঞা সেই সময়ে বাড়ী ছিলেন না, তিনি এক বিবাহ উপলক্ষে যশোহরে গমন করিয়াছিলেন। অগত্যা চৌধুরী সাহেব অন্য কতিপয় আত্মীয় ও ম্যানেজারের সহিত

পরামর্শ করিয়া সমস্ত সম্পত্তি সালেমার নামে 'হেবা' * করিয়া দিলেন; ঐ দলিলে আশরফের জন্ম বাৎসরিক ছয় হাজার টাকা বৃত্তি ও বসত বাটীর অর্দ্ধাংশ, আবুল ফজলের জন্য ছয় হাজার টাকা এবং স্বীয় পত্নী ও ভ্রাতৃবধূ প্রত্যেকের জন্ম তিন হাজার টাকা 'ওসিয়ৎ' † সূত্রে নির্দ্ধারিত হইল। বাকী সমস্ত আধিপত্য ও দায়িত্ব সালেমার প্রতি অর্পিত হইল।

উক্ত দলিল যাহাতে রেজিষ্ট্রী না হয়, তজ্জন্য বিবিধ বাধা বিঘ্ন ও ওজরাপত্তি উপস্থিত হইল। নানা ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। স্বয়ং চৌধুরী সাহেবের পত্নী এই ষড়যন্ত্রে লিপ্তা ছিলেন। কিন্তু চৌধুরী সাহেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কিছুই কার্য্যকরী হইতে পারিল না। যথাবিধি দলিল রেজিষ্ট্রী হইয়া গেল।

সালেমা স্বামীর বিরূপ ব্যবহারে যারপর নাই ম্লান ও কাতরা হইয়া পড়িয়াছিলেন; তদুপরি পিতার অবস্থা দেখিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তিনি নিদ্রাহার পরিত্যাগ করিয়া পিতার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যখন চৌধুরী সাহেবের জীবনাশা নাই, সকলের মুখেই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, তখন সালেমা কাঁদিয়াই আকুল হইলেন। যখন চৌধুরী সাহেব হেবানামা রেজিষ্ট্রী করিবার বন্দোবস্ত করিলেন, তখন সালেমা কাঁদিয়া বলিলেন,—"আব্বাজান! আপনি যদি না বাঁচেন, আমি সম্পত্তি দিয়া কি করব? আমার আর কে আছে, কে আমার মুখের দিকে তাকাইবে?"

চৌধুরী সাহেব নানারূপে সালেমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"মা! কেন বৃথা দুঃখ করিতেছ; মা বাপ কাহারও চিরদিন বাঁচিয়া থাকে না;

---

* হেবা—সম্প্রদান, দানপত্র। † ওসিয়ৎ—অন্তিম আদেশ।

সকলকেই মরিতে হইবে, দুদিন আগে আর পরে। ইচ্ছা ছিল, তোমাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুখী করিয়া যাইব; কিন্তু খোদাতালার মর্জী অন্যরূপ। মা! তুমি চিন্তা করিও না; আমি তোমাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করি নাই; আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার জীবন সুখময় ও ধন্য হইবে। পুত্র আবুল ফজল শুধু তাঁহার পিতা-মাতা বা আমাদের নহে, সে সমস্ত দেশের ও জাতির অমূল্য সম্পদ ও অলঙ্কারস্বরূপ মনে করিয়াই তাঁহার নিকট তোমাকে সমর্পণ করিয়াছিলাম; সেই বিশ্বাস আমার এখনও অটল আছে। তাহাকে দেখিয়া যাইতে পারিলাম না, মনে বড় দুঃখ রহিল। মা তাহাকে আমার অন্তিম আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ জানাইও, এবং তুমি সর্ব্বদা তাহার অনুগত হইয়া চলিও।" অনন্তর চৌধুরী সাহেব সালেমার হস্ত বক্ষে রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিলেন; তৎপরে সালেমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সালেমা! তোমার জন্য আমার একটু ভয় ছিল, কিন্তু খোদার মর্জী, তোমার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে আমার সে ভয় সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে। আশরফের জন্য আমার মনে বড় দুঃখ থাকিল; যদি সে দেশে আসে এবং ভাল ভাবে অবস্থান করে, তোমরা তাহাকে বঞ্চিত করিও না।"

সালেমা পিতার কথায় কেবল কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইলেন, কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না। ইহার দুই দিন পরে দেশপ্রসিদ্ধ চৌধুরী সাহেব ধন-সম্পদ ও পরিজনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে দেশে তুমুল হাহাকার পড়িয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

ষড়যন্ত্র ও স্বদেশ-যাত্রা।

চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর শোক-অশান্তিতে প্রায় এক মাস অতীত হইল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে চৌধুরী সাহেবের আত্মার পারলৌকিক কল্যাণকর ক্রিয়াগুলি একে একে সম্পন্ন হইতে লাগিল।

আশরফ লণ্ডনের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ী অবস্থান করিতেন। আশরফের অবস্থা ও পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহারা আগ্রহের সহিত তাঁহাকে বাটীতে স্থান দিয়াছিলেন। আশরফ সেই বাটী থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ব্যারিষ্টারি পাস করিলেন।

ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাউণ্টেস ফ্লোরা ও লিলি নাম্নী দুইটী কন্যা ছিল। কন্যাদ্বয়ের বয়স যথাক্রমে বাইশ ও বিশ বৎসর। তাঁহারা উভয় ভগ্নীই অবিবাহিতা ছিলেন; উভয় ভগ্নীই সুন্দরী, কিন্তু লিলির অঙ্গসৌষ্ঠব অতি মনোহর ছিল।

ফ্লোরা আশরফকে ভালবাসিতেন; কিন্তু তাঁহার ঢেঙ্গা দেহ, লম্বা গলা, পীত চক্ষু ও শুভ্র বর্ণ আশরফের মনোগত ছিল না। অথচ বিলাতের লোকেরা তাঁহাকেই অপূর্ব্ব সুন্দরী বলিয়া ব্যাখ্যা করিত! আশরফ লিলিকে ভালবাসিতেন; কিন্তু লিলি অন্য একটী ইংরাজ যুবকের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং অনেকবার প্রস্তাব করিয়াও তিনি লিলিকে স্বমতে অনুরক্ত করিতে পারিলেন না। তিনি ব্যারিষ্টারি

পাস করার পরে কেবল লিলিকে ভুলাইবার আশায় বিলাতে বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছিলেন।

এমন সময়ে আশরফ সহসা পিতৃব্যের মৃত্যু ও সম্পত্তির অবস্থা সম্বন্ধে মাতার প্রেরিত টেলিগ্রাম পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন; এবং টেলিগ্রাম পাওয়ার দুই তিন দিন পরেই জাহাজে উঠিয়া দেশে যাত্রা করিলেন।

আশরফ বাড়ী আসিয়া মাতা ও খালার সাহায্যে সম্পত্তি হস্তগত করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। নানা রকম মামলা-মোকদ্দমা করার পরামর্শ হইতে লাগিল। আত্মীয় ও আমলাগণের মধ্যেও অনেকে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, কিন্তু ম্যানেজার ও বিশিষ্ট কর্ম্মচারিবৃন্দ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হওয়ায় উক্ত ষড়যন্ত্র আত্মপ্রকাশ করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে সালেমার বিমাতা, চাচি ও অন্যান্য কতিপয় দুষ্ট লোক এক ভীষণ কল্পনা আটিলেন। তাঁহাদের কল্পনা এই যে, আবুল ফজল সালেমাকে 'তালাক' দিয়া গিয়াছেন, এই কথা প্রচার করিয়া আশরফের সহিত সালেমার বিবাহ দেওয়া হউক; তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তিই আশরফের হইবে; আর কেহই কিছু করিতে পারিবে না।

আশরফ এই ঘৃণিত প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত হইলেন না; তিনি বরং এই হীন কল্পনার জন্য মাতা ও চাচিকে মন্দ বলিলেন। কিন্তু সহসা একদিন অসতর্ক সালেমার অনুপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আশরফের চিত্ত বিচলিত হইল। তিনি ঐ পাপকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার জন্য চেষ্টিত হইলেন। মনে করিলেন, কার্য্যশেষে ছলে, বলে, কৌশলে বা অন্য কোন প্রলোভন-প্ররোচনায় বশীভূত করিয়া আবুল ফজলের দ্বারা তালাক লওয়াইলেই সব দোষ সংশোধিত হইবে।

এই কল্পনানুযায়ী তাঁহারা প্রথমে তালাকের কথা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণা হালিমাই প্রথমে প্রকাশ করিল যে, আবুল ফজল সালেমাকে তালাক দিয়া গিয়াছেন, আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। ক্রমে ঐ পাপ কথা জমিদার-বাড়ীময় হইয়া উঠিল; অনেকে উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাসও করিল। তাহারা বুঝিল, আবুল ফজল দুই বৎসর প্রায় চলিয়া গিয়াছেন, আর আসিতেছেন না কেন? অমন স্ত্রী ফেলিয়া কেউ দুই মাসও কি থাকিতে পারে?—থাক না শত রাগ।"

সালেমা বিশ্বস্ত পরিচারিকা গোলবাহারের মুখে উক্ত পাপ কথার আভাস শুনিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ দাসীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এ কথা যার মুখে শুনিব, গোপনেও যে কাহাকে বলিবে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিব।" কিন্তু আশরফের ও বিবি সাহেবাদ্বয়ের প্রশ্রয়ে দাসীরা ভীত হইল না; তাহাদের মুখও বন্ধ হইল না। ক্রমে কথাটা বাড়ীর বাহির হইল। ম্যানেজার সাহেব প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা শুনিয়া যারপর নাই মর্ম্মাহত হইলেন।

সালেমা পিতার মৃত্যুতে এতদিন শোকার্ত্ত অবস্থাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর, আশরফ ও আবুল ফজলের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হয়, তাহা তিনি জানিতেন। আশরফ বিলাত হইতে বাড়ী আসিয়া সম্পত্তি লাভের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন, অথচ আবুল ফজল এতদিন বাড়ীতেই আসিলেন না; এমন কি, একখান পত্র লিখিয়াও তত্ত্ব লইলেন না, ইহাতে সালেমা বড়ই দুঃখ অনুভব করিলেন। আবুল ফজলের প্রতি স্বভাবতঃই তাঁহার মনে অভিমান সঞ্চিত হইতে লাগিল; সুতরাং তিনিও আর পত্র লিখিলেন না। কিন্তু আজ পরিজন ও দাসীগণের এই দূরভিসন্ধিমূলক অপবাদের কথা শুনিয়া তাঁহার মন বড়ই বিচলিত হইল। তিনি

আবুল ফজলের নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু আশরফের ষড়যন্ত্রে পত্র ডাকবাক্স হইতে অপহৃত হইল।

ইহার কয়েক দিন পরে বিবি সাহেবাদ্বয় ও আশরফ পরামর্শ করিয়া সালেমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। সালেমা তখন ঘরের মধ্যে বসিয়া একখানা পুস্তক পড়িতেছিলেন; জনৈক বাঁদী তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবামাত্র সালেমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সঘৃণায় দাসীর মুখে কঠোর পদাঘাত করিলেন; এবং তাহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক অন্য একটী দাসীর দ্বারা তখনই তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন। কিন্তু সে অন্য পথে আশরফের দ্বারা বাড়ীর মধ্যে নীত হইল!

দাসীকে বাহির করিয়া দিয়া সালেমা সরোষে বিমাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"মা, এ সব কি কথা? আব্বাজান মরার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর মান, ইজ্জত, মনুষ্যত্ব সবই কি গিয়াছে?"

বিবি সাহেবা। আমি কি কর্‌ব বাপু! সকলেই ত বলে।

সালেমা। সকলে—কে কে?

বিবি সাহেবা। হালিমা।

সালেমা হালিমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হালিমা এ কি শুন্‌ছি? তুমিই কি এ সব কথা বলেছ?"

হালিমা নির্ভয়ে উত্তর করিল—"আমি শুনেছি, তাই বলেছি; তাতে আমার কি দোষ?"

সালেমা। মিথ্যাবাদী, শয়তানী; তুই কার সম্মুখে কথা বল্‌ছিস্ জানিস?

হালিমা। তা জানি বৈ কি? উচিত কথায় রাগ কর্‌লে আর কি

সালেমা কঠোর ভাবে বলিলেন,—"শয়তানী, এখনই এ বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা। এক মুহূর্ত্ত দেরি করিলে রক্ষা থাকিবে না।"

হালিমাও ভীতিশূন্য কণ্ঠে উত্তর দিল,—"বাড়ী ত আর তোমার একার নয়; অত বাড়াবাড়ি ভাল নহে।"

সালেমা রোষে অভিমানে অধীরা হইয়া বলিলেন—"মা! তুচ্ছ বাঁদি আপনার সম্মুখে আমাকে অপমান করছে, আর আপনি চুপ করে শুনছেন; কোনই কথা বলছেন না?"

বিবি সাহেবা। আমি কি বলব?

সালেমা দুঃখের সহিত বলিলেন,—"আপনি কি বলিবেন, তাহা আমি বলিয়া দিব; ভাবিয়া দেখুন ত, আব্বাজান বাঁচিয়া থাকিলে কি বলিতেন?"

বিবি সাহেবা কথা বলিলেন না; সালেমা দুঃখে বাহির হইয়া নিজ গৃহে গেলেন এবং পিতার কথা মনে করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, পিতার অভাবে বাড়ীর সকলেই তাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ী ঘর সম্পত্তি সমস্তই ত প্রায় তাঁর; তথাপি সেই বাড়ীতে তাঁহার কেহই নাই। তাঁহার মান-সম্ভ্রম পদে পদে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা। আজ যদি স্বামী কাছে থাকিতেন, কার সাধ্য তাঁহার আদেশ অবহেলা করিত?

সালেমা অনেকক্ষণ ভাবিয়া যতদূর সম্ভব, সব কথা বর্ণনাপূর্ব্বক ম্যানেজারের নিকট এক পত্র লিখিলেন এবং এ বিপদে তিনি কি করিবেন, তদ্বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। গোলবাহারের দ্বারা পত্রখানি পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

প্রবীণ ম্যানেজার অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন,—"মা, আমি সব কথা প্রায় জানি ও শুনিয়াছি; কিন্তু কি করিব? অন্য কেহ হলেই

জুতা মারিয়া তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দিতাম। কিন্তু এ যে সবই আপনারা। দুলা মিঞা * সাহেবের খবর নাই কেন, বুঝিতেছি না। যা হউক, আমার পরামর্শ এই যে, তুমি আপাততঃ এখান হইতে আলি-নগরে চলিয়া যাও। তোমার শ্বশুর খুব ভদ্রলোক, তাঁহাকে সংবাদ দিলেই তিনি আসিয়া লইয়া যাইবেন ?

"মা! তোমাকে কন্যার তুল্য স্নেহ করি বলিয়াই এই পরামর্শ দিতেছি। পরলোকগত চৌধুরী সাহেব এ অধমকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন ; আমার সম্মুখে যদি কেহ তাঁহার প্রাণতুল্য কন্যাকে কোন দুর্ব্বাক্য বলে, তাহা শুনিয়া আমি বোধ হয় বেশী দিন সহ্য করিতে পারিব না। তাই তোমাকে এখান হইতে যাইতে বলিতেছি।

"সম্পত্তির জন্য কিছু ভাবিও না মা! আমি যতদিন আছি, তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি ভিন্ন আমাকে কেহ অপস্থতও করিতে পারিবে না, তাহা ঠিক জানিও।

"এখন আমি যাহা বলিলাম, তাই কর। পরে দুলামিঞা সাহেব বাড়ী আসিলে যাহা ভাল বুঝ করিও।"

ম্যানেজারের পত্র পাইয়া সালেমা ভাবিতে লাগিলেন,—আমি যখন শ্বশুর-শাশুড়ীর সহিত একটী কথাও বলি নাই ; অধিকন্তু ননদের বিবাহে না যাইয়া তাঁহাদের মনে কষ্টই দিয়াছি। তার পর তিনি বিদেশে যাওয়ায় তাঁহারা যে মনস্তাপ ভোগ করিতেছেন, আমিই ত তাহার মূলীভূত কারণ। আজ কেমন করিয়া কোন্ মুখে তাঁহাদের আশ্রয় ভিক্ষা করিব ? তাঁহারা কি মনে করিবেন ? আবার ভাবিলেন, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারাই ত আমার আপন। তাঁহাদের মান-সম্ভ্রমের সহিত আমার

* পূর্ব্ববঙ্গে জামাইগণ সাধারণতঃ প্রায় সকলের নিকটেই 'দুলাহ্ মিঞা' বলিয়া সম্বোধিত হয়। 'দুলাহ্' আরবি 'দুল্হা' অর্থাৎ বর শব্দের অপভ্রংশ।

মান-সম্ভ্রমের অচ্ছেদ্য বন্ধন। তার পর আমি ত প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কখনও তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই; না বুঝিয়া একটা অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহারা মনঃকষ্ট পাইতেছেন; কিন্তু আমি কি সুখে আছি? আমারও কি চরম শাস্তি হইতেছে না? সে জন্য নিজ বিপদ্ তাঁহাদিগকে জানাইতে লজ্জিত হইব কেন? তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করেন, আমার দুর্ভাগ্য! সালেমা ভাবিয়া চিন্তিয়া করিমনের নামে পত্র লিখিলেন।

পত্র

"ভগিনি! বিপদাপন্ন ভ্রাতৃবধূর প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আমি আপনাদের কাছে কত অপরাধে অপরাধিনী, তাই এই পত্র লিখিতে কতই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কিন্তু সঙ্কোচ করিয়া কি করিব; আজ আমি ঘোর বিপদাপন্না। আব্বাজানের মৃত্যুর পর এ বাড়ীর সকলেই আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সকলেই আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে; তাই একান্ত নিরুপায় হইয়াই আপনাদের শরণাপন্ন হইতেছি; প্রকৃত-পক্ষে এখন আপনারা ভিন্ন আমার আর কে আছে?

নিজ বুদ্ধির দোষেই আজ এরূপ সহায়শূন্য অবস্থায় পতিত হইয়াছি। সবই অদৃষ্ট! জানি না ইহার মধ্যে খোদার কি ইচ্ছা নিহিত আছে?

আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়, তাহা জানি। আপনারা আমার জন্য কত মনঃকষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাহা জানি; আমারই দোষে আজ তিনি সুদূরবর্ত্তী দেশান্তরে অবস্থিত, তাহা জানি, সেজন্য আমার উপর আপনাদের রাগ হওয়া একান্তই স্বাভাবিক, তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু ভুলিবেন না, আমি আপনাদেরই কুলবধূ। আমার ইজ্জত-হোরমতের সহিত আপনাদের মান-সম্ভ্রম বিজড়িত, তাহা যেন বিস্মৃত না হন।

মহামাননীয় হজরত সাহেব ও মাননীয়; আম্মাজানের কদমে আমার শত শত ভক্তিপূর্ণ আদাব ও আরজ জ্ঞাপন করিবেন।

পরিশেষে নিবেদন, পত্র পাঠ আমাকে এখান হইতে লইয়া যান; আমার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন। ইতি— স্নেহপ্রার্থিনী—সালেমা।

সালেমা পত্র লিখিয়া ম্যানেজারের নিকট পাঠাইলেন; তিনি যথোচিত বন্দোবস্ত করিয়া পত্র আলিনগরে পাঠাইয়া দিলেন।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা চৌধুরী সাহেবের রোগের সময়ে যশোহরে কোন আত্মীয়ালয়ে গিয়াছিলেন। তিনি প্রায় দশদিন পরে সেখান হইতে বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, চৌধুরী সাহেব পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এ সংবাদে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন এবং কুসুমপুরের অবস্থা ভাবিয়া আবুল ফজলকে শীঘ্র বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। আবুল ফজল ইহার পূর্ব্বে কুসুমপুর হইতে এক টেলিগ্রামও পাইয়াছিলেন। তিনি পিতার নিকট সমস্ত অবস্থা বর্ণনাপূর্ব্বক পাঁচ বৎসরের মধ্যে আসিবার অসমর্থতা জ্ঞাপন করিলেন। এত দীর্ঘ দিন আবুল ফজল বাড়ী আসিতে পারিবেন না জানিয়া সকলের মনই অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল।

চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর আফতাব-উদ্দিন মিঞা কুসুমপুরে একবার যাওয়ার ইচ্ছা সত্ত্বেও গেলেন না। কারণ তিনি পূর্ব্বেও বড় যাইতেন না; সুতরাং এখন গেলে "সম্পত্তির লোভে আসা যাওয়া করিতেছেন" লোকে এমনও ত মনে করিতে পারে। অবশ্য চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর মিলাদ আদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইলে তিনি যাইতেন, কিন্তু চৌধুরী সাহেবের পত্নী ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। তাঁহাদের আশঙ্কা, কি যেন যদি তিনি আসিয়া পুত্রবধূর সম্পত্তি স্বীয় তত্ত্বাবধানে লইতে চেষ্টা করেন?

তারপর সালেমাকে আনিবার কথা তাঁহারা কখন ভ্রমেও মনে করেন নাই। কারণ যে বধূ ননদের বিবাহ উপলক্ষে স্বামীর সহিত আসিয়াও দুই দিন থাকিতে সম্মত হন নাই, তিনি কি আর বসবাস করিবার জন্য এখানে আসিবেন? বিশেষতঃ অত বড় লোকের মেয়ে আনিয়া আমরা প্রতিপোষণ করিবই বা কি প্রকারে এবং তিনিই বা কোন্ সুখে আমাদের এ দরিদ্রের কুটীরে আসিবেন? ফলতঃ জমিদারের বাড়ী পুত্র-বিবাহ দিয়া আবুল ফজলের পিতা-মাতার মনে অলক্ষ্যে একটু অনুতাপের উদয় হইয়াছিল। কারণ পুত্র-পুত্রবধূ লইয়া ঘর-সংসার পাতান দূরের কথা, বধূকে 'বৌমা' বলিয়া একটা ডাক দিবার এবং তাঁহার মুখের একটা কথা শুনিবার সৌভাগ্যও তাঁহাদের হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না।

এই অবস্থায় সালেমার পত্র পাইয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। করিমনের বিবাহে সালেমা আসেন নাই, এই জন্য সালেমার উপর করিমনের আন্তরিক ক্রোধ ছিল। তিনি বলিলেন,—"ভাই যখন বাড়ী নাই, তখন বৌ দিয়া কি কর্‌ব! বড় মানুষের মেয়ে বলে এত গরব, এখন তাতে চল্‌ল না? খুব শাস্তি হোক, এ বাড়ী আনিয়া কাজ নাই।" কিন্তু সমীরন তাঁহার কথার কঠোর প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"বু-জী, ছি! এত সঙ্কীর্ণ মন আপনার? আপনার বিবাহে আসেন নাই, তার জন্য ভাবি সাহেবা* নিজেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়েছেন। আর যদিই বা তিনি ক্ষমা না চাইতেন, তবে ঐরূপ এক আধটী দোষের জন্য কি আপনি কুলের বৌ ফেলে দিতে বলেন? আশ্চর্য্য!" করিমন একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"সমীরন তুমি বুঝ নাই।

* মোসলমান-সমাজে 'বৌদি'র পরিবর্ত্তে 'ভাবি সাহেবা' শব্দ প্রচলিত। সম্ভবতঃ "ভাই-বৌ" হইতেই "ভাবি" শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে।

আমার কথা এই যে, ভাইজান যে বৌকে ভাল দেখ্‌লেন না, তিনি যার জন্য দেশান্তরিত, সে বৌ দিয়া আমরা কি কর্‌ব ?”

সমীরন। ভাইজান ও ভাবি সাহেবার মধ্যে যদি কোন মনোমালিন্য থাকে, তা তাঁরাই বুঝিয়া লইবেন ; আমাদের সে বিচারে কাজ কি ? আমাদের নিকট উভয়েই তুল্য মাননীয় ও সমান ভক্তির পাত্র।”

করিমন। বেশ তোমার ভাল বোধ হয়, তুমি আনাইয়া লও। তিনি ত আসিতে প্রস্তুতই আছেন। তোমরাই এখন এ বাড়ীতে আছ, তোমাদের ভাল হইলেই হইল।

“আচ্ছা বেশ ; কেহ না আনেন, ভাবি সাহেবাকে আমিই আনাইব ।” বলিয়া সমীরন পিতাকে ধরিয়া বসিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া আফতাব-উদ্দিন মিঞা যথোচিত বন্দোবস্ত করিয়া সালেমাকে আনিবার জন্য জামাতা আতাওর রহমানকে প্রেরণ করিলেন।

সালেমা জিনিস-পত্র, অলঙ্কার ও টাকাকড়ি লইয়া আলিনগর যাইতেছেন শুনিয়া আশরফ প্রভৃতি তাঁহাকে বাঁধা দিবার মৎলব করিয়াছিলেন, কিন্তু ম্যানেজার বাবুর কঠোর আদেশে কেহই তাহাতে সাহসী হইলেন না। সালেমা নিরাপদে শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিলেন। ইহাতে আশরফ প্রভৃতির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়িলেন—কিন্তু দমিলেন না। সালেমা ও ম্যানেজারকে জব্দ করিবার জন্য আশরফ হেবানামা ধ্বংস করিয়া জমিদারীতে দখল পাইবার জন্য যথাবিধি মোকদ্দমা দায়ের করিলেন ; এই মোকদ্দমার মধ্যে আশরফের মাতা এবং চাচী ও সামেল ছিলেন।

সালেমা শ্বশুরালয়ে গিয়া সলজ্জ বিনীতভাবে শ্বশুর-শাশুড়ীর পদ বন্দনা করিলেন। ননদদ্বয়ের সহিত গলায় গলায় মিলিলেন। তাঁহার মধুর চরিত্র ও নম্র ব্যবহারে কয়েক দিনের মধ্যে সকলেই মুগ্ধ হইলেন।

সালেমা দাসীগণের মধ্যে একমাত্র গোলবাহারকেই সঙ্গে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে কাপড়াদি ধোয়া প্রভৃতি বাহিরের কাজ ভিন্ন সালেমা আর কোনই কাজ করিতে দিতেন না। রান্না হইতে খাওয়ান—এমন কি, শ্বশুর-শাশুড়ীর বিছানা পর্য্যন্ত সালেমা নিজ হাতে করিয়া দিতেন, নিষেধ করিলেও শুনিতেন না। শ্বশুর-শাশুড়ী অনেক সময়ে নিষেধ করিয়া বলিতেন,—"মা! তুমি এসব কখনও কর নাই; অনভ্যাসের কাজ করলে অসুখ করতে পারে।" সালেমা বলিতেন,—"ছোটকালেই আমার মা মরিয়া গিয়াছেন; বুদ্ধির অভাবে বাপজানেরও কখন ভালমত খেদ্‌মত করিতে পারি নাই, সে দুঃখ আমার মনে চিরকাল থাকিবে। তাই স্বহস্তে আপনাদের খেদ্‌মত করিতে আমার ইচ্ছা হয়; ইহাতে আমার কষ্ট ত হয়ই না, বরং আমি খুব তৃপ্তি অনুভব করি।" তাঁহারা আর কিছু বলিতেন না,—বলিতে পারিতেন না। ভাবিতেন, কি অন্ধ আমরা; এমন সোনার বৌকে অন্তরে মন্দ জানিতাম। ফলতঃ কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহারা সালেমার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন; সালেমা না হইলে যেন কিছুতেই তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না।

আর সমীরন?—সমীরন ত সালেমার সহিত একেবারে মিশিয়া গেলেন। উভয়ের মধ্যে কেহ কাহাকে ছাড়িয়া একদণ্ডও থাকিতে পারিতেন না। করিমন সালেমাকে একটু হিংসার চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তৎপ্রতি সকলের স্নেহাধিক্য দর্শনে ভাবান্তর প্রকাশে সাহসী হইতেন না। সালেমা কিন্তু তাঁহাকেও যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

এইরূপ সুখ-শান্তিতে দুই তিন মাস অতীত হইল। এই সময়ে হঠাৎ এক দিন আফতাব-উদ্দিন মিঞা জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমান্বয়ে প্রবল সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল

সালেমা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া চিকিৎসক আনাইয়া শ্বশুরের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাত দিন জাগিয়া ঔষধপত্র খাওয়াইতে লাগিলেন। বিবি সাহেবা, করিমন, সমীরন ও করিমনের স্বামী প্রভৃতি সকলেই প্রাণপাত পরিশ্রমে সেবা যত্ন করিতে নিরত হইলেন।

ক্রমে দ্বাবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইল; কবিরাজ বলিলেন, "আপাততঃ আশঙ্কা কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু রোগের ভোগ একটু দীর্ঘ হইবে। বোধ হয় পয়তাল্লিশ দিনের কমে অন্নপথ্য দেওয়া যাইবে না।"

কিন্তু পঁচিশ দিনের দিন আফতাব-উদ্দিন মিঞা আবুল ফজলকে দেখিবার জন্য একান্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সালেমা, সমীরন, বিবি সাহেবা এবং পাড়া-প্রতিবেশী যে কেহ তাঁহার নিকট আসিলেন, তিনি তাঁহাকেই ধরিয়া আবুল ফজলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই দিন অতীত হইল, তৃতীয় দিন আফতাব-উদ্দিন মিঞা পথ্য খাইবার সময়ে অধীর ভাবে সালেমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"মা, বল তুমি আমার আবুল ফজলকে আনিয়া দেখাইবে কি না? যদি না বল, তোমার ঐ ঔষধ-পথ্য আমি কিছুই খাইব না।" তিনি সত্যই পথ্য খাওয়া ত্যাগ করিতেছেন দেখিয়া সালেমা লজ্জিত ভাবে অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন, "আপনি পথ্য খান, তাঁহাকে আনিবার বন্দোবস্ত করিতেছি।"

পথ্য খাওয়াইয়া সালেমা গৃহান্তরে গেলেন। এতদিন তিনি লজ্জাবশে আবুল ফজলের কথা কাহারও সমক্ষে উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু আজ তিনি মহাচিন্তায় পড়িলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—তাঁহাকে দেখিবার জন্য আজ দুই তিন দিন হজরত সাহেব অধীরতা প্রকাশ করিতেছেন, তবু কাহারও মুখে তাঁহাকে খবর দেওয়ার বা আনিবার কথা নাই কেন? এত মায়া-মমতার মধ্যে একি ব্যাপার? অনেক চিন্তার পর তিনি সমীরনকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সমীরন বলিলেন,

"ভাবি সাহেবা ! আপনি দেখ্‌ছি কিছুই জানেন না। ভাইজান সেখানে পাঁচ বৎসরের গ্যারান্টি দিয়া চাকুরী লইয়াছেন। ইহার মধ্যে বিদায় লইবার বা কার্য্য ত্যাগ করিবার যো নাই। করিলে দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া আসিতে হইবে। অথচ অত টাকা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে ? তিনি মাসে তিন শত টাকা পান ; কিন্তু এক শত টাকার বেশী বাড়ী পাঠাইতে পারেন না ; কারণ সেখানে খরচ অত্যন্ত বেশী। আর এ পর্য্যন্ত যে টাকা পাঠাইয়াছেন, তাহা মাসে মাসে ঋণ দিতেই খরচ হইয়া গিয়াছে। কারণ বাপজান পুর্ব্বে মামলা-মোকদ্দমায় এবং পরে ভাইজানের বিবাহের সময়ে প্রায় দুই তিন হাজার টাকার দেনা হইয়াছিলেন। এই জন্য নিরুপায় ভাবে খোদাভরসা করিয়া আছি মাত্র।"

সালেমা। ভগ্নি ! আমি ত এসব ব্যাপারের কিছুই জানি না। আচ্ছাএত দিন অন্য কেউ না বলুন, কিন্তু আপনি আমাকে এ কথা বলেন নাই কেন ?

সমীরন। তার কারণ আছে। আপনি আসার মাসখানেক পরে আপনার কাছ থেকে টাকা লইয়া ভাইজানকে আনিবার কথা আমি বাপজানের কাছে বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,—"বৌমার কাছে সম্ভব অত টাকা নাই ; সম্পত্তির যে টাকা ব্যাঙ্কে আছে, আশরফের মোকদ্দমার জন্য তা এখন পাওয়া যাইবে না। এ অবস্থায় বৌমাকে লজ্জা দেওয়া ঠিক নহে। কারণ তাঁর কাছে টাকা থাকিলে তিনি নিজেই টাকা পাঠাইয়া আনিতেন।"

সালেমা। তিনি ঠিক অনুমান করিতে পারেন নাই। আমি এর কিছুই জানিতাম না। জানিলে টাকার জন্য তিনি কখনও বিদেশে থাকিতেন না। সম্পত্তির টাকা পড়িয়া মরুক ; আমার নিজের নামে ফরিদপুরের ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা আছে ; আপনি সেই টাকাটা তুলিয়া কালই পাঠাইবার বন্দোবস্ত করুন।

সমীরন সালেমার কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তখনই আতাওর রহমানকে ডাকাইয়া তাঁহাকে ফরিদপুর পাঠাইলেন। তথা হইতে যোগাড় করিয়া পনর হাজার টাকা তুলিয়া এগার হাজার টাকা টেলিগ্রাম যোগে আবুল ফজলের নিকট পাঠান হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবুল ফজলকে তৎক্ষণাৎ দেশে রওয়ানা হইবার জন্য আবুল ফজলের মাতা, সালেমা ও সমীরনের পক্ষ হইতে আফতাব-উদ্দিন মিঞার ব্যারাম এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতার সংবাদসহ পৃথক্ পৃথক্ তিনখানি আরজেণ্ট টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হইল।

আবুল ফজল আড়াই শত টাকার মাসিক বেতনের চাকুরী পাইয়া রেঙ্গুন যান, তাহা পাঠক অবগত আছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যদি মাসে একশত টাকা খরচ করিয়া অন্ততঃ দেড়শত টাকাও পিতাকে দিতে পারি, তাহা হইলেও তাঁহারা সুখে জীবনাতিবাহিত করিতে পারিবেন। কিন্তু চাকুরীস্থলে যাইয়া তিনি যাহা বুঝিলেন, যেরূপ আড়ম্বর ও ফ্যাশনের সহিত থাকিতে বাধ্য হইলেন, তাহাতে মাসিক খরচের জন্য পূর্ণ বেতন আড়াই শত টাকাও যথেষ্ট নহে। কিন্তু নানাপ্রকারে তিনি খরচ কমাইয়া দেড়শত টাকায় বাসাখরচ চালাইয়া প্রতি মাসে পিতাকে একশত টাকা পাঠাইতেন। চাকুরীর দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহার বেতন তিনশত টাকা নির্দ্ধারিত হইল; তিনি কার্য্যদক্ষতাগুণে যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি উপার্জ্জন করিলেন। কারবারের অধিপতি সাহেব তাঁহাকে অতিমাত্র আদর ও সম্মান করিতেন। সাহেব-মেম একত্রে অনেক সময়ে আসিয়া আবুল ফজলের নিকট প্রাচ্য জগতের ধর্ম্ম ও ঐতিহাসিক বিবরণ শ্রবণ করিতেন। তাঁহার তেজস্বিতা, সচ্চরিত্রতা, সত্যবাদিতা, ধর্ম্মানুরক্তি ও বিচক্ষণতা প্রভাবে সাহেব ও মেম এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহারা আবুল ফজলের সহিত গল্প করিবার ও

তাঁহার নিকট উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। সাহেব ও মেম উভয়েই সুশিক্ষিত ছিলেন; তাঁহাদের মনটীও অতি উদার ও পবিত্র ছিল। সুতরাং আবুল ফজলের সংসর্গ হেতু, তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্মপ্রাণতা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সাহেব-দম্পতি অন্তরে সম্পূর্ণ ইসলামভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। মদ্য, নিষিদ্ধ খাদ্য এবং খৃষ্টান-জীবনের অশ্লীল ও কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের যত্ন, আদর ও সম্মানে আবুল ফজলের দিন একরূপ সুখেই কাটিতে লাগিল।

কিন্তু আবুল ফজল আন্তরিক কখনও পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। দূরবর্ত্তী পিতামাতার কথা প্রায়ই তাঁহার মনে উদয় হইত; আত্মীয়-স্বজনের চিন্তাও তাঁহাকে বিচলিত করিত। সর্ব্বোপরি সালেমা! সালেমাকে আবুল ফজল কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। সময়ে অসময়ে সালেমার সৌন্দর্য্যমণ্ডিত গর্ব্বোজ্জ্বল মুখচ্ছবি মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত; অহরহঃ তাঁহার আচার-ব্যবহার ও আলাপ-আপ্যায়নের কথা তাঁহার অন্তরে জাগরিত হইত। তিনি ভাবি-তেন, সালেমা যেরূপ অভিমানিনী, তাহাতে আমার ব্যবহারে তিনি তাঁহার অভিমানদৃপ্ত হৃদয় লইয়া না জানি কি করিতেছেন—কি ভাবিতেছেন? তাঁহার ধন, সম্মান ও রূপ-যৌবনের গর্ব্ব প্রবলতর বটে, কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যশালী জমিদারের একমাত্র আদরের কন্যার পক্ষে ওটুকুত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক! কে বলিতে পারে, ঐরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িলে আমিই বা ঐরূপ হইতাম কি না? তা ভিন্ন তাঁহার আর ত কোনই দোষ ছিল না। অনেক সময়ে সালেমা তাঁহার গর্ব্বস্ফীত চিত্তের প্রবল উচ্ছ্বাসে চালিত হই-তেন বটে, কিন্তু স্বামীর প্রতি আদর, যত্ন, ভক্তি ও সম্মান প্রকাশ করিতে কখনও ত ত্রুটি করেন নাই। তবে আমি কেন তাঁহার প্রতি

অনর্থক কঠোর ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রভাবাচ্ছন্ন করিতে প্রয়াস পাইতাম? সালেমা কি ক্রমে আপনিই সেরূপ হইতেন না? কেনই বা আমি ওরূপ নির্ম্মম রূঢ় ব্যবহারের সহিত তাঁহাকে ফেলিয়া আসিলাম? আমার এই ব্যবহারে শুধু সালেমা কেন, অন্য সকলেই বা কি মনে করিতেছেন? আবুল ফজল আরও ভাবিতেন,—মতান্তর, ব্যবহারের ব্যতিক্রম কাহার সহিত কাহার না সংঘটিত হয়? কিন্তু তার জন্য কেন সকলকে ত্যাগ করিয়া অসহনীয় কঠোর শর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া দূরদেশে আসিলাম? কিরূপে সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, সকলের সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ বিসর্জ্জন দিয়া দীর্ঘ পাঁচ বৎসর এই বন্ধুবান্ধবহীন দেশে অবস্থান করিব? এই সমস্ত চিন্তায় আবুল ফজল অনেক সময়ে অধীর হইয়া উঠিতেন।

আবুল ফজল পিতার চিঠি প্রায়ই পাইতেন; এক বৎসর পরে সালেমার এবং চৌধুরী আনোয়ার আলি সাহেবেরও চিঠি পাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহার সন্তোষজনক উত্তর দেন নাই। তারপর কয়েকমাস পরে সহসা চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু-সংবাদসংবলিত পত্র পাইয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়েন; কয়েকদিন অনবরত কাঁদিয়া হৃদয়-বেদনা প্রশমিত করেন। কিন্তু পাঠক জানেন, তাঁহার দেশে যাওয়ার সাধ্য ছিল না। তিনি ভাবিলেন, সালেমা যদি পত্র লেখেন, তবে তাঁহাকে সব কথা লিখিয়া জানাইবেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুসংবাদেও যে স্বামী দেশে আসিবেন না, সালেমা ইহা ভ্রমেও মনে করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি কিছুদিন আবুল ফজলের আসিবার অপেক্ষা করিয়া পত্র লিখেন নাই; পরে যখন তাঁহার উপর বিবিধ ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল, তখন তিনি নিজেকে নিতান্ত বিপন্না মনে করিয়া আবুল ফজলের নিকট পত্র লিখিলেন; পাঠক জানেন, সে পত্র আশরফ কর্তৃক বিনষ্ট হয়।

এদিকে চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর আফতাব-উদ্দিন মিঞা আবুল ফজলকে অবিলম্বে দেশে আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। সেই পত্রের উত্তরে এতদিন পরে পিতার নিকট তাঁহার দেশে আসার বিঘ্ন সম্বন্ধে সমস্ত অবস্থা খুলিয়া লিখিলেন। আফতাব-উদ্দিন মিঞা পত্র পাইয়া ভাবিলেন, কুসুমপুর হইতেই হয়ত টাকা পাঠাইয়া তাহাকে দেশে আনা হইবে।

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি।

আবুল ফজল সহসা টাকা ও পিতার অসুখ সংবাদ পাইয়া অস্থির ভাবে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। সাহেব সহানুভূতি-পরবশ হইয়া বলিলেন,—"আমি আপনার নিকট গ্যারান্টির টাকা লইব না। যতদিনের বিদায় চান, আমি দিতেছি; পিতাকে দেখিয়া আবার কিন্তু আসিতে হইবে।"

আবুল ফজল। যদি আমি আর না আসিতে পারি, তবে আপনি যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, তজ্জন্য এই টাকাটা গ্রহণ করুন।

সাহেব। আপনি কি আসিবেন না?

আঃ ফজল। আমি ঠিক বলিতে পারিতেছি না। তবে বোধ হয় আর আসিতে পারিব না; ক্ষমা করিবেন।

সাহেব। আমি বড় দুঃখিত হইলাম—আপনি আর আসিবেন না? যাক, এখন আপনি বিদায় লইয়া যান, পরে দেশে যাইয়া যাহা হয়, লিখিবেন।

আঃ ফজল। অনুগ্রহপূর্ব্বক টাকাটা গ্রহণ করুন।

সাহেব একটু উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—"টাকা আমরা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া থাকি? আপনাকে অংশীদারস্বরূপ গ্রহণ করাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। অতএব আপনাকে ছাড়িতে আমি যে ক্ষতি অনুভব করিতেছি, তুচ্ছ দশ হাজার টাকায় সে ক্ষতির পূরণ হইবে না।

কিন্তু একটা কথা, আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। ভারতবাসীর মধ্যে যিনি অবলীলাক্রমে দশ হাজার টাকা দিতে পারেন, তিনি কি আবার চাকুরী অবলম্বন করেন ? আপনার চাকুরী গ্রহণের উদ্দেশ্য আমার নিকট এক রহস্য বলিয়া বোধ হইতেছে ; আপনি যদি সব কথা প্রকাশ করিয়া বলেন, আমি বড়ই বাধিত হইব ?"

এমন সময়ে মেম সাহেব সেখানে আসিয়া বলিলেন। আবুল ফজলও অকপট ভাবে তাঁহাদের নিকট সমস্ত আভ্যন্তরিক কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহারা উভয়েই আবুল ফজল ও সালেমার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

বলা বাহুল্য, সাহেব-দম্পতি আবুল ফজলের টাকা গ্রহণ করিলেন না। অধিকন্তু তাঁহারা আবুল ফজল ও সালেমাকে ইউরোপ ও ব্রহ্মদেশীয় কতিপয় বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কলিকাতা-যাত্রী জাহাজ ছাড়িতে তিন দিন বিলম্ব ছিল। এই তিন দিন আবুল ফজল সাহেবের বাসায় নিমন্ত্রিত হইয়া অবস্থান করিলেন। তাঁহারা আবুল ফজলের নিকট পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উহার অত্যাবশ্যক ক্রিয়া-কর্ম্ম ও রীতি-নীতিগুলি শিখিয়া লইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আবুল ফজল সমস্ত জিনিসপত্র ও টাকা পয়সা সহ জাহাজে আরোহণ করিলেন। সাহেব-দম্পতি জাহাজ পর্য্যন্ত আসিয়া নিজেদের ব্যয়ে আবুল ফজলের জন্য প্রথম শ্রেণীর একটী কামরা রিজার্ভ করিয়া দিলেন এবং অশ্রুমুখে করমর্দ্দনপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া ক্ষুণ্ণমনে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। আবুল ফজল খোদাতালার নাম স্মরণপূর্ব্বক স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মিলন

আবুল ফজল জিনিসপত্র বহির্ব্বাটীতে ফেলিয়া অধীর ভাবে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহসা তাঁহাকে দেখিয়া বাড়ীর মধ্যে এক বিষাদমিশ্রিত আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। কেহ কাহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না, কাহারও মুখে বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না, সকলেই এক অব্যক্ত শব্দবিহীন ভাষায় হৃদয়ের অভিব্যক্তি জ্ঞাপন করিলেন। সমীরন চাঞ্চল্যের সহিত—"ভাইজান বাড়ী আসিয়াছেন"—বলিতেই আফতাব-উদ্দিন মিঞার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখে উৎসাহের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। তিনি "কৈ আমার আবুল ফজল"—বলিয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। আবুল ফজল পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কর চুম্বন করিলেন। পিতা-পুত্রের মিলন হইল। সকলের চক্ষেই আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল।

আবুল ফজল যখন গৃহে প্রবেশ করেন, তখন সালেমা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আফতাব-উদ্দিন মিঞার ঔষধের অনুপান প্রস্তুত করিতেছিলেন। স্বামীর আগমন-সংবাদে তাঁহার হৃদয়ে যে তুমুল আন্দোলন হইতেছিল,—যে বিপুল ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছিল, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। পরে যখন আবুল ফজল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন এক অবক্তব্য মোহ আসিয়া সালেমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; এক বৈদ্যুতিক

শক্তিসম্পাতে যেন তাঁহার হস্ত-পদ ও দেহ-মন শিথিল ও শক্তিশূন্য হইয়া যাইতে লাগিল; তাঁহার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সালেমা দুই বার অনুপান প্রস্তুত করিতে গিয়া মনোযোগশূন্য বিভ্রান্ত-ভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সুচতুরা সমীরন সালেমার এই দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া অস্পষ্টভাবে বলিলেন,—"ভাবি সাহেবা! আপনি রন্ধনগৃহে যাইয়া দেখুন কি হচ্ছে; আমি অনুপান তৈয়ার করি।" সালেমা ধীরপদে বাহির হইয়া গেলেন।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা আবুল ফজলকে দেখিয়া আশ্চর্য্য ভাবে সুস্থ হইয়া উঠিলেন; যেন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে তাঁহার রোগ কমিয়া যাইতে লাগিল। তিনি আবুল ফজলকে দেখিয়া কয়েক ঘণ্টা পরে উঠিয়া বসিতে এবং ভালরূপ কথা বলিতে সমর্থ হইলেন। বৈকালে চিকিৎসক আসিয়া তাঁহার অবস্থা দর্শনপূর্ব্বক বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—"এরূপ আশাতীত পরিবর্ত্তন কখন ভাবিতেও পারি নাই।" ফলতঃ দুই দিন পরেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া অন্ন পথ্য করিলেন।

যথাসময়ে আবুল ফজল শয়নগৃহে উপস্থিত হইয়া সালেমার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এক অনির্ব্বচনীয় আবেগ-চাঞ্চল্যে তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি একখানি ইজিচেয়ারে দেহ রাখিয়া এক-খণ্ড মাসিক কাগজ পড়িতে লাগিলেন। চক্ষে তিনি পড়িতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মন তাঁহার এক স্বপ্নময় কল্পনার রাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সালেমা শয়নগৃহে যাইবার পূর্ব্বে সমীরন জোর করিয়া তাঁহার চুলগুলি বাঁধিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে পরাইবার জন্য একখানি সুন্দর রেশমী শাড়ী বাহির করিয়া আনিলেন।

সালেমা বাধা দিয়া বলিলেন,—"ভগিনি! এই কাপড়েই চলিবে; আবার একখান পৃথক্ কাপড়ের দরকার কি?"

সমীরন। দরকার না থাক্, আমরা যদি পরাইয়া সুখী হই, তাতে আপনার আপত্তি কি?

সালেমা। আপত্তি কিছু নাই। আপনারা যদি আমাকে ভাল-বাসেন, তবে যেরূপেই থাকি—যে কাপড়ই পরি, তাতেই সুখী হবেন।

সমীরন। ভাবি সাহেবা তা ঠিক; কিন্তু মনে করুন, আজ বহুদিন পরে আপনি ভাইজানের সম্মুখে যাইবেন; তিনি ঐরূপ ময়লা কাপড় দেখ্‌লে কি মনে কর্‌বেন?

সালেমা। সংসারে অনেকের যে ময়লা কাপড়ও নাই; তাঁরা কি তার জন্য কিছু মনে করে?

সমীরন। তা করে কি না জানি না। কিন্তু আপনি জমিদার-কন্যা এবং স্বয়ং জমিদারীর অধিকারিণী। আপনার পক্ষে—

সালেমা বাধা দিয়া বলিলেন,—"থাক্ ভাই, জমিদারীর স্বাদ যথেষ্ট ভোগ করেছি, এখন যাহাতে আপনার মত ননদের ভ্রাতৃবধূ হইয়া ধন্য হইতে পারি, তারই আশীর্ব্বাদ করুন।"

সমীরন। আচ্ছা তাই ভাল; আমার ভ্রাতৃবধূ ময়লা কাপড়ের পরিবর্ত্তে একখান ভাল কাপড় পরিলে তিনি ভ্রাতৃবধূর গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া যাইবেন না।—বলিয়া সমীরন তাঁহাকে কাপড়খানি পরাইয়া দিলেন।

সালেমা যখন গৃহে চলিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়, মন ও দেহে এক অবক্তব্য কম্পন উপস্থিত হইল। তিনি অতি কষ্টে হৃদয়ের উদ্বেগ চাপিয়া কম্পিতপদে গৃহে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ের সঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হইল। বহুদিনের মান অভিমানের রুদ্ধ

আবেগ উভয়ের চিত্তেই উথলিয়া উঠিল। সালেমা অধীর ভাবে আবুল ফজলের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িলেন; কোমল-মৃণাল তুল্য করপদ্মে স্বামীর পদযুগল ধরিয়া—সমস্ত মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া—সমস্ত বেদনা-মনস্তাপ পতিপদে নিবেদন করিয়া আকুল কণ্ঠে বলিলেন,—"প্রিয়তম! আমার অপরাধের শাস্তি কি আজও শেষ হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, আর যাহা বাকি থাকে এখনি প্রদান করুন। কিন্তু ক্ষমা করিয়া দাসীকে পদপ্রান্তে আশ্রয় দিন।"

বিস্ময়ে আবুল ফজলের চিত্ত মথিত হইল; তিনি স্তম্ভিত ভাবে ভাবিলেন,—"এই কি সেই জমিদার-নন্দিনী সালেমা! দীনতা যাহাকে কখন স্পর্শও করিতে পারে নাই; এই কি সেই স্বেচ্ছাচারে অভ্যস্থ অদম্যহৃদয়দর্পী সালেমা! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মান অভিমানে যাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া বাড়ীময় সকলকে আতঙ্কিত করিত, এই কি সেই অভিমানিনী সালেমা! আবুল ফজল মুগ্ধনেত্রে গৌরবদীপ্ত প্রখরা সালেমার দীনতামণ্ডিত করুণমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন এবং আবেগভরে তাঁহার বাহু আকর্ষণপূর্ব্বক তুলিয়া বলিলেন,—"প্রাণের সালেমা! এ আত্মবিস্মৃতি কেন? ওখানে ত তোমার স্থান কোন দিনও ছিল না। তুমি চিরকালই ত তোমার পতির হৃদয়ে অবস্থান করিয়াছ। আজ তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? তোমার স্থান তোমারই জন্য শূন্য পড়িয়া আছে; তুমিই সে স্থান অধিকার কর।" বলিয়াই আবুল ফজল সালেমাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

দীর্ঘকাল পরে স্বামি-স্ত্রীর মিলন হইল। এক সুখময় স্বপ্নের আবেশে দম্পতি মোহপ্রাপ্ত হইলেন। চেতনা কিছুক্ষণের জন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শূন্যরাজ্যে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই আনন্দময় সম্মিলনের পরে সালেমার অপ্রত্যাশিত আলাপ, ব্যবহার ও আচার-অনুষ্ঠানে আবুল ফজল এমন মুগ্ধ হইলেন যে, স্বর্গ-সুখও তাঁহার নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল। সালেমাও পতির অতলস্পর্শ প্রেমের সহিত শ্বশুর-শাশুড়ীর অতুলনীয় স্নেহ ও সমারনের সহোদরাধিক প্রীতি লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হইলেন। তাঁহার আড়ম্বরময় পূর্ব্বজীবনকে তিনি একান্ত তুচ্ছ গণ্য করিলেন। আবুল ফজলের পিতা-মাতাও এই সৌভাগ্যপূর্ণ সম্মিলনে কৃতার্থ চিত্তে অনাবিল শান্তি অনুভব করিলেন।

প্রায় দুই মাস এইরূপ সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হইল। আবুল ফজল একদিন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পুঁটীখোলা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাজার পরিদর্শন করিতেছেন। এই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবই জেলান্তর হইতে তাঁহাকে জজ সাহেবের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। সাহেব আবুল ফজলকে দেখিয়া চিনিলেন, কিন্তু সহসা আলাপ না করিয়া পুলিশ ইন্স্পেক্টরের নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পুলিশ ইন্স্পেক্টর সাহেব আবুল ফজলের একজন সহপাঠী। তিনি আবুল ফজলের সমস্ত অবস্থা জানিতেন। সুতরাং তিনি পরিচয় দেওয়া মাত্র সাহেব আনন্দের সহিত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া করমর্দ্দন করিলেন এবং অনুরোধপূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গ্রাম ও রাস্তা প্রভৃতি পরিদর্শনে বাহির হইলেন। সাহেবের সহিত ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইল। আবুল ফজল বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, সকলেই ঘুমাইয়াছেন; কেবল সালেমা আহারাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জন্য শয়নগৃহে বসিয়া আছেন।

আবুল ফজল গৃহে প্রবেশ করিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"একি সালেমা! এত রাত পর্য্যন্ত জেগে আছ; ঘুম পাচ্ছে না?"

সালেমা। ঘুম পাইলেত ঘুমাইতামই। আপনি কোথায় গিয়াছিলেন ?

আবুল ফজল সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ যদি আমি বাড়ী আস্‌তে না পার্‌তাম, তবে কি সারা রাত্রিই বসে থাক্‌তে ?

সালেমা। আপনি যখন বলে যান নাই, তখন খুব সম্ভব আসার আশায় সারা রাতই বসে থাক্‌তে হ'ত।

আঃ ফজল। কষ্ট হ'ত না ?

সালেমা। তা আপনিই বুঝে দেখুন।

আঃ ফজল। আচ্ছা যে দিন আমাকে ঘর হইতে বা'র করে দিয়াছিলে, সে দিন মনে কষ্ট হয়েছিল না ?

সালেমা আবুল ফজলের প্রতি অভিমানব্যঞ্জক করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি বা'র করে দিয়েছিলুম ? নিষ্ঠুর! সামান্য একটা কথার জন্য আমাকে ঐরূপ অবস্থায় একাকী ফেলে গেলেন; ধন্য আপনার মমতা ?"

আঃ ফজল। কেবল আমার দোষ বুঝি ? তুমি কি একটা কথাও আমাকে বলেছিলে ? তুমি সামান্য একটু অনুরোধ—একটী মাত্র কথা বল্‌লেও বোধ হয়, আমি ওরূপে চলে যেতে পারতেম না।"

সালেমা। আমি যদি জান্‌তাম, আপনি ঐরূপ নিষ্ঠুরের মত আমাকে পদদলিত করে যা'বেন, তাহা হইলে প্রাণ গেলেও আপনাকে ঘরের বা'র হইতে দিতুম না।—বলিতে বলিতে সালেমার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

আবুল ফজল সস্নেহে সালেমার চক্ষু মুছাইয়া—তাঁহার কোমল কপোলে চুম্বন প্রদান করিয়া বলিলেন,—"যাহা হ'বার তা'ত হয়েই গেছে,

তজ্জন্য দুঃখ করে কি হ'বে। আচ্ছা আমি চলে গেলে তুমি কি ভেবেছিলে, কি করেছিলে?"

সালেমা। আপনি যখন বা'র হয়ে গিয়েছিলেন, তখন আমার মনে সামান্য একটু সন্দেহ হয়েছিল; কিন্তু আমার কথনও মনে হয় নাই যে, আপনি আমাকে ঐরূপ পাষাণের মত ত্যাগ করে যাবেন। মাঝে মাঝে ওরূপ রাগ করে যাওয়াত আপনার স্বভাবই ছিল।

আবুল ফজল বাধা দিয়া বলিলেন,—"কেবল আমার! তোমার নয় বুঝি?" সালেমা বলিলেন,—"আমিত আর আপনায় মত সাধু সাজ্‌ছি না! তারপর শুনুন, আপনি বাহির হইলে অনেকক্ষণ আপনার আশায় চাহিয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল, আপনি তখনই আসিবেন, কিন্তু পরে যখন তুমুল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তখন ভয়ে আমি অস্থির হইয়া আপনার উপর রাগ করিতে লাগিলাম।"

আবুল ফজল। আবার রাগ?

সালেমা। সে অপরাধের প্রতিফল* আরও বাকি আছে নাকি? অনন্তর ভাবিলাম, আপনি পড়িবার ঘরে আছেন। থিড়্‌কী খুলিয়া দেখিলাম, সে ঘর ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন; তাহার দুয়ারও উন্মুক্ত। তখনই আমার প্রকৃত সন্দেহ হইল। ক্রমে ঝড় বৃষ্টি থামিল, আমি অধীরভাবে বাহির হইয়া বাড়ীর মধ্যে সম্ভবমত এমন স্থান ছিল না, যেখানে আপনাকে না খুঁজিয়াছিলাম। শেষে না পাইয়া গৃহে গিয়া ছট্‌ফট্ করিয়া রাত্রি কাটাইলাম; আর কর্ম্মফলের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আবুল ফজল। তারপর?

সালেমা। তারপর এমন দিন যায় নাই, যেদিন আপনার জন্য ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া না উঠিয়াছি; এমন রাত যায় নাই,

যে রাত্রির অর্দ্ধেক আপনার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনিদ্রায় অতিবাহিত না করিয়াছি; কিন্তু নিষ্ঠুর আপনি, আপনার মনে কি তাহা স্বপ্নেও প্রতিফলিত হইয়াছে ?

অনন্তর সালেমা অশ্রুমুখে স্বামীর নিকট আদি-অন্ত সব কথা প্রকাশ করিলেন। শুনিতে শুনিতে আবুল ফজলের প্রাণও অধীর হইয়া উঠিল; তাঁহারও চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। তিনিও আনুপূর্ব্বিক আপনার সমস্ত অবস্থা প্রেমময়ী পত্নীর নিকট জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা সালেমা! তুমি আমার নিকট পত্র লিখ নাই কেন ?"

সালেমা। পত্র লিখি নাই ? নিষ্ঠুর! এক বৎসর আপনার কোন খবরই পাইলাম না। তাহার পরে আব্বাজানের নিকট আপনার ঠিকানা পাইয়া পত্র লিখিলাম। কিন্তু এমন করুণাপ্রবণ হৃদয় আপনার যে, তাহার উত্তরও দিলেন না। দেশে যে আসিবেন না, আব্বাজানকে তাহা ত প্রকারান্তরে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। তিনি পত্র লেখা বৃথা ভাবিয়া নিজেই আপনাকে আনিতে যাইবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহা পারিলেন না। কাল আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে চিরতরে লইয়া গেল। আপনার উপর তাঁহার যে কত উচ্চ ধারণা ছিল, এবং তিনি আপনাকে কত স্নেহ করিতেন, তাহা এক খোদাই জানিতেন।—বলিয়া সালেমা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার প্রতি পিতার অন্তিম উক্তিগুলি শুনাইয়া দিলেন। আবুল ফজলও কাঁদিলেন।

অনন্তর সালেমা বলিতে লাগিলেন, "আব্বাজানের মৃত্যুর পর আপনার নিকট টেলিগ্রাম করা হইল; আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আপনি অবশ্যই আসিবেন; তাই পত্র লিখিলাম না। কিন্তু আপনি যে কিরূপ কঠোর শর্ত্তে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা কি আমরা জানিতাম ? তার পর এক মাস অতীত হইলেও যখন আপনি আসিলেন না, তখন আমার মনে

বড়ই দুঃখ হইল। ইচ্ছা হইল, আর কিছু লিখিব না। কিন্তু দায় পড়িয়া সে ইচ্ছাও ত্যাগ করিতে হইল; আপনার নিকট পত্র লিখিলাম। কিন্তু এমন মমতা আপনার, যে তথাপি আপনি নিজ অবস্থা জানাইলেন না বা পত্রের উত্তর দিলেন না!”

আবুল ফজল বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—“না সালেমা, হুজুরের মৃত্যুর পর তোমার কোনই পত্র পাই নাই। তখন আমি অধীর ভাবে নিত্য তোমার পত্রের অপেক্ষা করিতাম। একখানি পত্র পাইলেই সব অবস্থা জানাইতাম; পত্র না পাইয়া লিখিতে—বিশেষতঃ টাকা চাইতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হইত?”

সালেমা। তা হ’বেই ত! আমি যে পর; পরের কাছে কিছু চাওয়া যায়?

আবুল ফজল। পরের কাছেও চাওয়া যায়, কিন্তু—‘যেখানে ইচ্ছা থাকিবেন, যাহা ইচ্ছা করিবেন’ যিনি বলিতে পারেন, তাঁহার নিকট—

সালেমা পদ্মহস্তে স্বামীর মুখ চাপিয়া বলিলেন,—“থাক নিষ্ঠুর! ও পুরাতন ইতিহাস আর শুনিতে চাই না। ওর জন্য আমাকে এত কষ্ট দিয়াও যদি মনের ক্ষোভ না মিটিয়া থাকে, যাতে মিটে তাই করুন।”

“তাই করি”—বলিয়া আবুল ফজল সালেমাকে বাহুবদ্ধ করিয়া তাঁহার কণ্ঠে, কপোলে ও মুখে অজস্র প্রেমচিহ্ন মুদ্রিত করিলেন। সালেমা আনন্দে আবেগে মুগ্ধচিত্তে সে শাস্তি গ্রহণ করিয়া মাঝে মাঝে প্রতিদান দিতেও ভুলিলেন না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—————:*:—————

মীমাংসা।

আফতাব-উদ্দিন মিঞার আদেশে জমিদারীর শৃঙ্খলা সম্পাদন জন্য আবুল ফজল ও সালেমা পরামর্শ করিয়া একযোগে কুসুমপুর যাত্রা করিলেন। ম্যানেজার তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করিলেন। যে আবুল ফজল দুই বৎসর পূর্ব্বে জমিদার-বাড়ীর অনুগৃহীত জামাতা মাত্র ছিলেন এবং জমিদার-নন্দিনীর সামান্য প্রত্যাখ্যানে যিনি নিঃসহায়ের ন্যায় জমিদার-বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজ সেই আবুল ফজল জমিদার-কন্যার হৃদয়-রাজ্যের রাজ্যেশ্বর রূপে, তাঁহার দেহ-মন, মান-সম্ভ্রম ও ধন-সম্পত্তির সর্ব্বময় অধীশ্বর রূপে সগৌরবে জমিদার-বাড়ী প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের আগমনে কুসুমপুরে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। চৌধুরী আনোয়ার আলী সাহেবের মৃত্যুর পর এই প্রথম জমিদার-বাড়ী সম্পদের সাজসজ্জা পরিধান করিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিল।

জমিদার-বাড়ীর সকলেই আবুল ফজল ও সালেমাকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। কেবল আশরফ, তাঁহার মাতা ও চাচি এবং হালিমা প্রভৃতি দাসীগণের মুখ বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

আবুল ফজল সকলের সহিত যথাবিধি সাদর সম্ভাষণ করিলেন। তিনি স্বয়ং আশরফের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাদর

সম্ভাষণ ও আলাপ করিলেন। বিবি সাহেবারা সালেমার প্রতি পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য লজ্জিত ও পরিতপ্ত হইলেন ; কিন্তু সালেমা তাঁহাদিগকে সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। হালিমা প্রভৃতি অপরাধিনী দাসীগণও সালেমার নিকট অনুতপ্ত ও কাতর ভাবে ত্রুটী স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি তাহাদিগকেও ক্ষমা করিলেন।

কয়েকদিন আমোদ-আহ্লাদে অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পত্তি সম্বন্ধে কথা উঠিল। সালেমা দলিল-পত্র সহ সমস্ত ভার স্বামীর উপর অর্পণ করিলেন।

আবুল ফজল আশরফকে মোকদ্দমা তুলিয়া মীমাংসার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু আশরফ বলিলেন, "আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত, পিতৃব্যের সম্পত্তির 'আফসা' এবং ব্যাঙ্কের টাকার অর্দ্ধাংশ প্রদান না করিলে কিছুতেই মীমাংসা করিব না।" আবুল ফজল বলিলেন, "আপনার পিতার সম্পত্তি তিনি স্বয়ংই আপনার পিতৃব্যকে হেবা করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য আমাদের কোনই দায়িত্ব নাই। তৎপর আপনার পিতৃব্য স্বীয় কন্যাকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন, সে দানও আইনবিরুদ্ধ বা অসঙ্গত নহে এবং আপনারও তাহাতে বলিবার কিছু নাই। তিনি আপনার জন্য যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত দলিল অগ্রাহ্য বা বিনষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি তাহার অধিক কিছুই পাইতে পারেন না। তথাপি আপনি যদি মামলা-মোকর্দ্দমা না করিয়া শান্ত ও সদ্‌ভাবে থাকেন, আমাদের সহিত ভাল ব্যবহার করেন, তবে আপনার পিতৃব্যের আন্তরিক ইচ্ছানুযায়ী আমরা সমস্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ আপনাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য আছি।"

আবুল ফজলের কথায় আশরফ নিজেকে অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি একটু উত্তেজিত ভাবে বলিলেন,— 'আপনার প্রস্তাব সঙ্গত বটে!

কিন্তু এরূপ শান্ত থাকার উপদেশ আত্মবোধসম্পন্ন মানুষের পক্ষে অসহ্য! আমার পিতা পিতামহের সম্পত্তি আমি এক চতুর্থাংশ লইয়া শান্ত-শিষ্ট থাকিতে বাধ্য হইব, আর আপনি উড়ে এসে জুড়ে বসে সমস্ত সম্পত্তির আধিপত্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছাচার প্রকাশ করিবেন, এ প্রস্তাব আমি সঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিতেছি।”

আবুল ফজল ধীর ভাবে বলিলেন,—“আপনার ধৈর্য্যহীনতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম! আপনাদের সম্পত্তিতে আমিই উড়ে এসে জুড়ে বসেছি, কি আপনারা বসাইয়াছেন, সে বিচার এখন বৃথা ও অশোভনীয়। সে বিষয় লইয়া আমি আপনার সহিত কোনরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা করা একান্তই নিরর্থক মনে করি। আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত আছেন, কি না; স্পষ্ট ভাবে তাই বলুন।”

আশরফ। তাই বলিব, কিন্তু এখানে নহে; আইনের সাহায্যে কোর্টে ইহার সমুচিত উত্তর দিব।

আবুল ফজল। কিন্তু মনে রাখিবেন, তখন আপনার এ সুবিধাও না থাক্‌তে পারে!

আশরফ সক্রোধে বলিলেন,—“আমি আপনার প্রদত্ত কোন সুবিধা অসুবিধার ভিখারী নহি! আপনি সতর্ক হইয়া কথা বলিবেন।”

আবুল ফজল স্থির ভাবে বলিলেন,—“সতর্কতা অবলম্বন আপনার পক্ষেও বাঞ্ছনীয়। নিজের অবস্থা বিস্মৃত হওয়া অনুচিত।”

আসরফ। হাঁ, আজ আপনি একথা বলিবার যোগ্য বটেন; পিতা ও পিতৃব্যের অনুরোধ (সালেমার বিবাহ সম্বন্ধে) উপেক্ষা করিয়া আমিই আপনাকে এ যোগ্যতা লাভের সুযোগ দিয়াছিলাম। যাই হোক, অবস্থা তুলাদণ্ডে ওজন না করিয়া আর এ সম্বন্ধে আপনার সহিত বাক্যালাপ করা ঘৃণাকর মনে করি।—বলিয়া আসরফ উঠিয়া গেলেন।

"এরূপ আত্মবিস্মৃতি ও প্রলাপের উত্তর অনাবশ্যক"—বলিয়া আবুল ফজলও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সালেমা সমস্ত কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন,—"তাঁহার বৃত্তির টাকা বন্ধ করা হউক; এত দর্প!"

আবুল ফজল সহাস্যে বলিলেন,—"দুরন্ত ভ্রাতাকে বশীভূত করিবার উপযুক্ত উপায় বটে!" তিনি ম্যানেজারকে ডাকিয়া তদ্রূপ আদেশ করিলে বৃদ্ধ ম্যানেজার ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"বাবা! এটা কি সঙ্গত হইবে?"

আবুল ফজল তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আপনি কিছু মনে করিবেন না; আমাদের প্রস্তাবে তাঁহাকে সম্মত কর্‌বার জন্যই এরূপ কর্‌ছি; কোন দুরভিসন্ধির বশীভূত হইয়া নহে।"

ম্যানেজার সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"বাবা! আপনার মত উচ্চ-শিক্ষিত যুবকের দ্বারা কোন অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা ভাবিতেও আমার সঙ্কোচ বোধ হয়।"

আবুল। সেজন্য আপনি ভাবিবেন না। কাহারও প্রতি অন্যায় করিব, খোদা যেন আমাকে এরূপ প্রবৃত্তি না দেন।

অনন্তর আবুল ফজল কয়েকদিন কঠোর পরিশ্রমের সহিত বিষয় সম্পত্তির শৃঙ্খলা ও ভবিষ্যৎ পরিচালন-পদ্ধতি ঠিক করিয়া সালেমার নিকট গিয়া বলিলেন,—"সালেমা! তুমি থাক; আমি কয়েকদিনের জন্য বাড়ী যাই।"

সালেমা। আমিও যাইব।

আবুল ফজল সহাস্যে বলিলেন,—"কেন, এত ব্যস্ততা কিসের? ভয় নাই, এখন আর ভ্রাতৃপ্রবর লুটিয়া লইতে পারিবেন না।"

সালেমা। আমাকে না পারুক; আপনাকে ত লুটিয়া লইতে পারে?

আবুল ফজল। আমাকে আবার কে লুটিয়া লইবে?

সালেমা। কেন, অমন রূপের ডালি বোন্—তার অবিবাহিতা!

আবুল ফজল। পূর্ব্বে গর্ব্বিতা ছিলে, সে বরং ছিল ভাল; এখন দুরন্ত মুখরা হইতেছ—অসহ্য!

"গর্ব্বের শাস্তিত যথেষ্ট দিয়াছেন; এখন না হয় মুখের শাস্তি দিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করুন।"—বলিয়া সালেমা স্বীয় উষাকালীন ফুল্ল কুসুমতুল্য আনন্দোজ্জ্বল প্রফুল্ল মুখখানি স্বামীর নিকট বাড়াইয়া দিলেন। মুগ্ধ আবুল ফজল প্রেমময়ী পত্নীর মুখে শাস্তির পরিবর্ত্তে শান্তিভরা আদরের পুরস্কার প্রদান করিলেন।

পরদিবস আবুল ফজল ও সালেমা একত্র আলিনগর যাত্রা করিলেন।

এদিকে বৃত্তির টাকা বন্ধ হইয়াছে শুনিয়া আশরফ জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ম্যানেজারের নিকট গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আপনি কার আদেশে আমার সহিত এরূপ ব্যবহার কর্‌ছেন?"

ম্যানেজার। আপাততঃ সম্পত্তির মালিক যাঁহারা, তাঁহাদেরই আদেশে; আপনি তাঁহাদের সহিত নিষ্পত্তি কর্‌ছেন না কেন?

আশরফ। সে কথা আপনার সহিত বলা অনাবশ্যক; কিন্তু আপনি মনে রাখ্‌বেন, এখন যাঁহারা, আমার সহিত অসদ্ব্যবহার কর্‌বে, মোকদ্দমার পর আমি নিশ্চয় তাঁহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিব।

ম্যানেজার। বেশ বাবা! তখন আপনার যাহা মনে লয়, করিবেন।

আশরফ। আপনিও দেখ্‌ছি, আইনজ্ঞানহীন আবুল ফজলের মত ভ্রান্ত। আপনি আইনজ্ঞ; মোসলমানী আইনে কি ঐরূপ দান-অসিয়ত সর্ব্বতোভাবে সকল স্থানে গ্রাহ্য হইতে পারে? বিশেষতঃ রোগাক্রান্ত চেতনাহীন অবস্থায় দলিল।

ম্যানেজার। কোর্টে কি হইবে, সে কথা কেহই বল্‌তে পারে না! আমি কি করিয়া বলিব?

"আপনি কি মনে করেন, আমি পৈতৃক সম্পত্তি লাভ কর্‌তে পার্‌ব না ?"

"মনে আমি কিছুই কর্‌তে পারি না। তবে নিষ্পত্তি করা উভয়ের পক্ষেই ভাল।"

আশরফ সক্রোধে চলিয়া গেলেন।

ইহার পরে রীতিমত মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষ হইতেই তুমুল তদ্‌বির চলিল। আশরফ এটর্নীর সাহায্যে বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। আবুল ফজলও অভিজ্ঞ ব্যবহারাজীব নিযুক্ত করিলেন। উভয় পক্ষ হইতেই প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। কিন্তু আশরফের দাবিগুলি রীতিমত প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি মূল মোকদ্দমায় পরাজিত হইলেন। এটর্নীর প্রাপ্য ঋণের ভারে তিনি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন ; হতাশে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মূল মোকদ্দমায় হারিয়া যাওয়ায় একমাত্র বাৎসরিক বৃত্তির টাকার মোকদ্দমাই আশরফের ভরসা থাকিল। কিন্তু সে টাকার দ্বারা এটর্নীর ঋণ শোধ হইতেও অনেক দিনের দরকার। সুতরাং মোকদ্দমা করা নিষ্ফল ভাবিয়া তাঁহার মন দমিয়া গেল। পুনশ্চ মোকদ্দমা চালাইবার আশা তিনি সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া চিন্তিত ভাবে বাসায় ফিরিলেন।

বাসায় আসিয়া আশরফ আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, কেন আবুল ফজলের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। আমার ত কোনই ক্ষতি ছিল না ; মোট সম্পত্তির আয় যদি লক্ষ টাকাও হয়, তবুও ত আমি পঁচিশ হাজার টাকা এবং মাতার পাঁচ-হাজার টাকা—সমস্ত সম্পত্তির প্রায় এক তৃতীয়াংশ নির্ব্বিঘ্নে পাইতে-ছিলাম। তাঁহারা যেমন এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি অধিক পাইতেছিলেন, তেমনি এষ্টেটের সমস্ত দায়িত্বই ত তাঁহাদের ছিল। আমি সম্পত্তির বিষয়

বিশেষ কিছুই ত বুঝি না ; তবে কেন মোকদ্দমা করিয়া অনর্থক ক্ষতি-গ্রস্ত হইলাম ; এ ক্ষতি কোথা হইতে পূরণ করিব ? যদি আবুল ফজল পূর্ব্ব প্রস্তাবে সম্মত হন, তবুও কতক রক্ষা ; নচেৎ কোনই উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু তিনি সম্মত হইলেও এখন প্রস্তাব করিবে কে ? আমার পক্ষে উপযাচক হইয়া প্রস্তাব করা অপেক্ষা হীনতা আর কি হইতে পারে ?

আশরফ একাকী বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে আবুল ফজল সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া সালাম করিলেন। আশরফ অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন ; কিন্তু বিস্ময়াধিক্যে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে চিন্তার তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল। আবুল ফজল তদ্দর্শনে আশরফের চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"কি ভাবছেন ?"

"এমন কিছুই নহে"—বলিয়া আশরফ কি বলিতে যাইবেন, এমন সময়ে আবুল ফজল বাধা দিয়া বলিলেন,—"শুনুন, এই যে অনর্থক মামলা মোকদ্দমা করিলেন, ফল কি হইল ? আমরাই ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম।"

আশরফ। আমি ত সাধ করিয়া মোকদ্দমা করি নাই। আপনারাই আমাকে বাধ্য করিয়া মোকদ্দমা করাইয়াছেন ; ফল হইল না ; সে অদৃষ্ট !

আবুল ফজল। আপনার কথা ঠিক নহে ; আমরা পূর্ব্বেই মীমাংসা করিতে সম্মত ছিলাম। আপনিই ইচ্ছা করিয়া মোকদ্দমা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, গত কথার আলোচনা অনাবশ্যক। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন আপনার মত কি ?

আশরফ। আমার আর মত কি ! আপনাদের ইচ্ছার উপরই এক্ষণে সব নির্ভর করে। আমিত একরূপ বিপদাপন্নই হইয়া পড়িয়াছি। যদি আরও বিপদাপন্ন করিয়া আপনাদের ভাল হয়, তাই করিবেন।

আশরফ আবুল ফজলের উদারতার উপর নির্ভর করিয়া কথা কয়টী বলিয়া ফেলিলেন। আবুল ফজল তাঁহার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! আপনার পিতা-পিতৃব্যের সম্পত্তি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া আমরাই উহা ভোগ করিব, খোদা যেন আমাদিগকে কখনও এরূপ প্রবৃত্তি না দেন। হুজুরও মৃত্যুকালে আপনার ভগ্নীকে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা অনুসারেই আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাব করিয়াছিলাম। দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার সদিচ্ছাগুলি পূর্ণ করার জন্য কিছু সম্পত্তি তিনি আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখিবার ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কারণ দেশ ও জাতির হিতকামনা সম্বন্ধে আপনার রুচি তিনি জানিতেন না, আমরাও তাহা জানিবার সুযোগ পাই নাই। তজ্জন্যই আমি অনুরোধ করি, আপনি আমাদের পূর্ব্ব প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মীমাংসা করুন। তৎপর আপনি যদি স্বীয় পিতৃব্যের সদিচ্ছাগুলি পূর্ণ করিবার অনুকূলে দেশবাসীর অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারেন, তবে আপনার পিতৃঅংশ সমস্তই আপনাকে প্রদান করা হইবে। এ বিষয়ে ভাবিয়া আপনার যাহা অভিমত হয়, প্রকাশ করুন।

আশরফ আবুল ফজলের প্রস্তাবে একান্ত কৃতার্থ হইয়া করুণ ভাবে বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! আমি আপনাকে পূর্ব্বে ভুল বুঝিয়াছিলাম। শত্রুরাই আমাকে ঐরূপ বুঝাইয়াছিল। আজ আমার সে ভ্রান্তি ঘুচিল। আপনার উদারতায় আমি যারপর নাই মুগ্ধ ও বাধিত হইলাম। আপনার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই; কিন্তু তথাপি আলোচ্য শর্ত্তে আমার একটু আপত্তি আছে; যদি আপনি অসন্তুষ্ট না হন, বলিতে পারি।"

আবুল ফজল। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন। কোন বিষয়ে আপনার মনে ক্ষোভ বা অসন্তুষ্টি থাকিলে আমরা কেহই সুখী হইতে পারিব না।

আশরফ। আমি আজ আপনার সহিত আলাপ করিয়া পরলোকগত আব্বাজান ও চাচাজানের আন্তরিক ইচ্ছা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের সে সদিচ্ছা আমার দ্বারা পূর্ণ হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। সে জন্য সম্পত্তির অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ আপনাদের তত্ত্বাবধানে থাকাই উচিত এবং আপনিই তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বাকি দুই তৃতীয়াংশের অর্দ্ধেক সম্পত্তি যদি আমাকে ছাড়িয়া দেন, আমি আন্তরিক অত্যন্ত সুখী হইব।

আবুল ফজল বলিলেন,—"আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে এই সামান্য বিষয়ে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। আপনাকে সমস্ত সম্পত্তির একতৃতীয়াংশই প্রদান করা হইবে।"

আশরফ। মোকদ্দমা উপলক্ষে আমি এটর্ণীর নিকট কতকগুলি টাকার ঋণী হইয়া পড়িয়াছি। সে সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

"তাহা ব্যাঙ্কের টাকা হইতে আমরাই শোধ করিব"—বলিয়া আবুল ফজল উঠিয়া দাঁড়াইলে আশরফ ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া তাঁহার কর ধারণ-পূর্ব্বক বলিলেন, —"ভ্রাত ! আর একটু বসুন ; আমার একটী কথা আছে" বলিয়া আশরফ ডেস্ক হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া আবুল ফজলের হাতে দিয়া বলিলেন,—"আমি আপনার ও ভগ্নী সালেমার প্রতি বড়ই দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি ; আমার হীন কল্পনায় ভগ্নী সালেমা ব্যথিত হইয়া আপনার নিকট যে করুণ প্রার্থনা-জনক পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমি নরাধমের মত তাহাও অপহরণ করিয়াছিলাম। এই সেই পত্র। আপনি যখন স্বীয় উদারতাগুণে এ অধমের সহিত আদর্শ আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন আমার এ অমার্জ্জনীয় অপরাধও ক্ষমা করিতে হইবে এবং ভগ্নী সালেমা যাহাতে ক্ষমা করেন, তাঁহারও প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতে হইবে। নচেৎ আমি জীবনে একটুও শান্তি পাইব না।"

আবুল ফজল পত্রের মর্ম্মন্তুদ ভাষার উপর একবার চক্ষু বুলাইলেন। বিগত সন্তাপপূর্ণ জীবনের এক সন্ধিক্ষণের স্মৃতি মনে উদয় হওয়ায় তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! আপনার অনুতাপই আপনাকে শাস্তি প্রদান করিবে। আমি সর্ব্বতোভাবে ইহা বিস্মৃত হইব। সালেমার হৃদয় অনুদার নহে; আপনার প্রতি তাঁহার সহানুভূতিরও অভাব নাই, সুতরাং তিনি যে আপনাকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।"

আশরফ তখন বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! যখন আমাকে ক্ষমা করিলেন, তখন আর এখান হইতে যাইতে পারিবেন না। অদ্য এই খানেই আহারাদি করিতে হইবে।"

আবুল ফজল অস্বীকার করিলেন না। সেদিন সেখানে থাকিয়া পরদিন মীমাংসা অনুযায়ী দলিল রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য উভয়ে একত্র আলিনগর যাত্রা করিলেন। কারণ সালেমা তখন সেইখানেই ছিলেন।

এই মীমাংসা শ্রবণে দেশের সকলেই পরম আনন্দিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—–:০:—–

সমীরনের বিবাহ।

আশরফ আবুল ফজলের সহিত আলিনগরে আগমন করায় সালেমার সহিত আবুল ফজলের পিতামাতা প্রভৃতি সকলেই আনন্দিত হইলেন। কারণ আত্মীয়তাস্থলে মামলা-মোকদ্দমা ও বিবাদ-অশান্তির জন্য সকলেই আন্তরিক দুঃখিত ছিলেন। সালেমা আবুল ফজলের নিকট আশরফের পূর্ব্বব্যবহারের অজ্ঞাত অংশটুকু অবগত হইয়াও তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন না; বরং তাঁহার বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনে আন্তরিক সুখীই হইলেন।

আশরফ যখন আলিনগরে আগমন করিলেন, তখন কয়েকদিন সব-রেজিষ্ট্রী অফিস বন্ধ থাকায় আশরফ সেইখানেই থাকিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে অবশ্য তাঁহার কোন অসুবিধা হইল না; কেননা বাড়ীতে অধিক সময় একাকী অবস্থান করা অপেক্ষা এখানে অহরহঃ আবুল ফজলের সাহচর্য্য ও মধুর ব্যবহারে এবং সকলের স্নেহযত্নে তিনি অনেকটা সুখশান্তিতেই সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

একদিন বৈকালে আবুল ফজল বাড়ী ছিলেন না। আশরফ বাড়ীর চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাগান দেখিতে বাহির হইলেন এবং নানা শ্রেণীর সজ্জিত ফলবান্ বৃক্ষসমূহ দেখিতে দেখিতে বাটীর পশ্চাদ্দিকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বাগানের সেইদিক হইতে রন্ধনগৃহের আঙ্গিনা ও পাছবাড়ী অতি নিকটবর্ত্তী ছিল এবং বাড়ীর ঐদিকের প্রাচীরও একটু ভগ্ন ছিল। মধ্য আঙ্গিনায় কেহ দাঁড়াইলে ঐ ভগ্নপ্রাচীর পথে তাঁহাকে

বাহির হইতে দেখা যাইত ; একটু উচ্চ জিনিসের উপর দাঁড়াইলে ত কথাই নাই। কিন্তু এদিকে লোকের যাতায়াত ছিল না বলিয়া ঐ ভগ্ন প্রাচীর তত গ্রাহ্য করিয়া মেরামত করা হয় নাই।

আশরফ যখন সেইদিকে উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। নিস্তেজ রবির কনক আভা ধরণীর গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সালেমা তখন রন্ধনগৃহে বসিয়া রন্ধন করিতেছিলেন ; সমীরন তাঁহার সম্মুখের অনাচ্ছাদিত আঙ্গিনার মধ্যস্থিত একটী উচ্চ কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া, সৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া সালেমার সহিত রহস্যালাপ করিতেছিলেন।—পরিধানে তাঁহার একখানি শুভ্র শাড়ী! মাধুর্য্যমণ্ডিত মুখ ও লাবণ্যোচ্ছ্বসিত বাহুদ্বয় তাঁহার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। নিতম্বচুম্বিত অবেণীবদ্ধ কেশদাম মধুর ভঙ্গিমায় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া শুভ্র শাড়ীর উপর চিত্তোন্মাদিনী তরঙ্গ তুলিয়া বিলম্বিত রহিয়াছে। সহসা দেখিলে কাহার সাধ্য, স্বর্গচ্যুত পরীকুমারী ভিন্ন সাধারণ মানব যুবতী বলিয়া ধারণা করিতে পারে? যৌবনের সমস্ত শোভা সম্পদ ও লাবণ্যে তাঁহার মনোরম দেহ যেন কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক, আশরফ যখন ঐদিকে বেড়াইতে আসিলেন, তখন সমীরন আঙ্গিনার মধ্যবর্ত্তী উচ্চ কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়াইয়া সালেমার সহিত রহস্যালাপ করিতেছিলেন। সুতরাং ভগ্নপ্রাচীর পথে সমীরন সহজেই আশরফের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। তাঁহার বিমুক্ত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আশরফের চিত্ত একেবারে গলিয়া গেল। তিনি অনিমেষ নয়নে তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন ; সেই স্বর্ণচম্পক-লাঞ্ছিত কনককান্তি যুবতীর তুলনায় তাঁহার পরিচিত লিলি-ফ্লোরা প্রভৃতি তুষারশুভ্র ইউরোপীয় সুন্দরী যুবতীবৃন্দ মোলার প্রতিমার মত তুচ্ছ বোধ

সমীরন হাসিতে হাসিতে সালেমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ভাবি সাহেব! আপনার খুব শাস্তি হচ্ছে।"

স্মিতমুখী সালেমা বলিলেন,—"কি শাস্তি?"

সমীরন। কি শাস্তি, শুন্‌বেন? শাস্তি হচ্ছে জমিদার-বাড়ীর দ্বিতল কক্ষ হইতে একেবারে দরিদ্র স্বামীর গ্রাম্য কুটীরে পতিত হওয়া; তার উপর আগুনে পুড়িয়া রাঁধা! বুঝ্‌লেন?—তবে দোষ আপনার।

সালেমা। শাস্তি ত বুঝ্‌লাম; কিন্তু দোষ আমার কেন? আপনারাই ত শাস্তি দিচ্ছেন।

সমীরন। আমরা শাস্তি দিচ্ছি? না আপনিই ইচ্ছা করে নিচ্ছেন; বাপজান ও মা ত আপনাকে রোজ রাঁধ্‌তে নিষেধ করেন। ভাইজানও বলেন,—"অভ্যাস নাই, সুতরাং রোজ রোজ ওরূপ আগুনের কাছে গেলে অসুখ কর্‌তে পারে।" কিন্তু আপনি ত তা শুন্‌বেনই না!

সালেমা। ভাই-বোন্ দুজনেই সমান পণ্ডিত কিনা! জিজ্ঞাসা করি, কাজ না কর্‌লে অভ্যাস হয় কিরূপে?

সমীরন। আপনি বোধ হয় পণ্ডিত একটু কম? যাক, আপনার এত অভ্যাসের দরকার কি, শুনি?

সালেমা। আজ থাক; যে দিন প্রাণনাথের বাড়ী যাইবেন, সেইদিন দরকার মত শুনাইয়া দিব।

সমীরন কৃত্রিম ভাবে মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—"আমি বুঝি আপনার চোখের কাঁটা হয়েছি! এই রকমই।"

সালেমা সহাস্যে বলিলেন,—"রকম আবার কি? অমন রূপের ডালি সব সময়ে ভাইয়ের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ালে ভাই-বৌর একটু হিংসা হওয়া ত স্বাভাবিক! তাতে বিয়া দেওয়ার নাম নাই; মতলব কি, আজ শোনা যাবে।"

সমীরন। ছি ভাবি সাহেব! ভাইজান বাড়ী আসার পর আপনি কেমন হইয়া গেছেন!

সালেমা। তা যেন হয়েছি; কিন্তু আপনি কি চিরকাল ভাইবাড়ী থাক্‌তে চান?

সমীরন। তাতে আপনার ক্ষতি কি?

সালেমা। আমার ক্ষতি না হোক; আদরের ভাইজানের চোখ দুটোরও ত একটু ক্ষতি হ'তে পারে!

সমীরন। আপনার ভাইয়ের মত নয়।

সালেমা। কেন আমার ভাই কি মন্দ? দেখেছেন ত?

সমীরন। রূপের কথা বল্‌ছি না; ভগ্নীপতির অনুপস্থিতিতে বোন্‌কে অধিকার করার চেষ্টা সম্বন্ধেই বল্‌ছি।

সালেমা। তা ঠিক; বোনের এমন রূপের ডালি ননদ থাক্‌তে ভগ্নীর প্রতি দুর্ব্যবহারের ইচ্ছা অযোগ্যতারই পরিচায়ক বটে!

সমীরন। আপনি আমাকে কথায় কথায় ওরূপ বল্লে ত আর আপনার কাছে আস্‌ব না।

সালেমা। তা দেখা যাবে?

ইতিমধ্যে সমীরন সহসা পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতেই আশরফের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। উভয়ের চারি চক্ষু মিলিত হইল। সমীরন লজ্জা পাইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং আশরফও লজ্জিতভাবে প্রস্থান করিলেন।

আশরফ সালেমাকে অল্প সময়ের জন্য দুই তিনবার মাত্র দেখিলেও তাঁহাকে চিনিতেন; সুতরাং যুবতী যে সালেমা নহেন, তাহা তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিলেন। বিশেষতঃ সালেমার পক্ষে স্বামীর বাড়ীতে ঐরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আশরফ যুবতীর সম্বন্ধে জানিবার জন্য অধীর হইয়া দাসী গোলবাহারকে ডাকাইয়া জানিলেন, তিনি

আবুল ফজলের অবিবাহিতা ভগিনী সমীরন। তখন তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তাকাশে এক আশার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। তিনি পরদিন সহসা আবুল ফজলের নিকট বিদায় হইয়া বাড়ী গমন করিলেন। আবুল ফজল দলিলের কথা উত্থাপন করিলে আশরফ বলিলেন,—"এক সময়ে আসিয়া রেজিষ্ট্রী করিলেই চলিবে। ব্যস্ততার আবশ্যক কি?"

এদিকে সমীরন সহসা পশ্চাৎদিকে চাহিয়াই লজ্জিত ও সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া পড়িলেন দেখিয়া, সালেমা 'কে ওখানে'—বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া ভগ্নপ্রাচীর-পথে দেখিলেন, অদূরে বাগানের মধ্যপথ দিয়া মূল্যবান্ মনোরম হ্যাট, কোট ও তুর্কী টুপী বিভূষিত আশরফ চাকরের সহিত ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছেন। সালেমা সমীরনের লজ্জারঞ্জিত মুখে স্বীয় চম্পকতুল্য অঙ্গুলি প্রহার করিয়া বলিলেন,—"একি, অলক্ষ্যে শুভ দর্শনটা পর্য্যন্ত হইয়া গেল! কিন্তু নেহাইত সাহেব যে; মানাবে মন্দ না; বনিবে ত?"

সমীরন লজ্জা পাইয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন।

আশরফ বাড়ী গিয়া মাতা ও চাচীর নিকট সমীরনকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সে প্রস্তাবে তাঁহারাও সম্মত হইয়া উভয়েই একযোগে আফতাবউদ্দিন মিঞার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সালেমাকে চেষ্টা করিবার জন্য পৃথক্ পত্র দেওয়া হইল।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা আবুল ফজল ও সালেমার উপর সম্পূর্ণ ভারার্পণ করায় সালেমা আনন্দ ও আগ্রহের সহিত স্বামীর নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন; কিন্তু আবুল ফজল আশরফের ধর্ম্মজীবন ও নৈতিক চরিত্রের উপর অনাস্থা হেতু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন।

সালেমা স্বামীর সহিত অনেক বাদানুবাদ করিয়া শেষে ক্ষুণ্ণভাবে মাতার নিকট সকল কথা লিখিয়া জানাইলেন।

সালেমার পত্রের বিষয় অবগত হইয়া আশরাফ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি ভগ্নোদ্যম না হইয়া ম্যানেজারের দ্বারা আবুল ফজলকে অনুরোধ করাইলেন। সে অনুরোধও ব্যর্থ হইল। আবুল ফজল দুঃখ করিয়া লিখিলেন,—"যদি ভ্রাতা আশরফ আলি সাহেব ধর্ম্মজীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন; নিয়মিত রোজা, নামাজ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ এবং জাতীয় আচার ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদে অভ্যস্ত হন; ফল কথা সর্ব্বতোভাবে পবিত্র ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করিতে সমর্থ হন, তবে আমি আনন্দের সহিত এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি; নচেৎ কিছুতেই উহা হইবার সম্ভাবনা নাই।"

আশরফ এই উত্তর পাইয়া মহা চিন্তিত হইলেন। প্রায় এক মাস পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত থাকিয়া সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বয়ং সালেমার নিকট লিখিলেন—

"প্রিয়তম ভগিনি!

হতভাগ্য অকৃতজ্ঞ ভ্রাতার স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আমি তোমাদের নিকট মহা অপরাধে অপরাধী, তাহা জানি; কিন্তু আমি তজ্জন্য বহু পূর্ব্বেই ভ্রাতা আবুল ফজলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, তোমরা উভয়েই আমাকে ক্ষমা করিয়াছ। যদি আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত হইয়া থাকে, যদি তোমরা আমাকে ক্ষমা না করিয়া থাক, তবে আমার একান্ত অনুরোধ, এ পত্র আর পড়িও না; এখনই ইহা ছিন্ন করিয়া ফেল। কেননা সে অবস্থায় আমি তোমাদের নিকট কথা বলিবার অযোগ্য!

আর যদি আমি ক্ষমাপ্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকি; যদি শত অপরাধ সত্ত্বেও পিতৃকুলের একমাত্র বংশধর ভ্রাতার প্রতি তোমাদের কিছুমাত্রও স্নেহ থাকে; তবে আমার সুখ দুঃখ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমাদের চিন্তা করা উচিত; আশা করি, আমার আগ্রহপূর্ণ আবেদনে তোমরা

সুবিচার করিবে ; অন্ততঃ অনুতপ্ত ভ্রাতার প্রতি তোমার সহানুভূতি হইবে এবং তুমি একটু যত্ন করিলেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

তোমার ননদ সমীরনকে আমি দৈবক্রমে দর্শন করিয়াছি ; তাঁহার গুণগরিমা সম্বন্ধে অতি উচ্চ প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে পারিলে আমার জীবন ধন্য হইবে। আমার প্রাণের সকল সাধ পূর্ণ হইবে। বলিতে কি, তাঁহাকে না পাইলে আমার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। তোমার পিতৃবংশ লোপ পাইবে।

উন্নতহৃদয় ভ্রাতা আবুল ফজল যে সন্দেহ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার নৈতিক চরিত্র কখনও অপবিত্র হয় নাই। এবং ভবিষ্যতের জন্য শপথ করিতেছি, পবিত্র ইস্‌লামের আদর্শ হইতে আমি একটুও বিচ্যুত হইব না। ইস্‌লামী ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিব। যদি না করি, খোদাতালা যেন আমার জীবনকে অভিশপ্ত করেন।

ইহাতেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে আমাকে যেরূপ কঠোর সর্ত্তে ইচ্ছা বাঁধিয়া লও ; যেরূপ শক্তি প্রয়োগে সম্ভব, আয়ত্ত করিয়া লও ; কিংবা আমাকে যে সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছ, তাহা তোমাদের নিকট জামীন থাকুক ; অথবা সমীরনের নামেই তাহা লিখিয়া দাও। যাহাতে তোমরা সন্তুষ্ট হও, আমি তাহাতেই বাধ্য আছি।

এ প্রস্তাবে যদি তোমরা সম্মত না হও, তবে সত্যই বলিতেছি, আমি সম্পূর্ণভাবে দেশের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিব ; যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইব। তোমাদের প্রতিশ্রুত সম্পত্তিও আর গ্রহণ করিব না। ইতি—

সন্তপ্ত—আশরফ আলী।"

সালেমা চিঠি পড়িয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। সহানুভূতিতে তাঁহার কোমল হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি আবুল ফজলকে পত্র পড়িয়া

শুনাইলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া করুণ ভাবে বলিলেন,—"আমার অনুরোধ, সমীরনের বিবাহ কুসুমপুরেই দিতে হইবে।"

আবুল ফজল হৃদয়ময়ী পত্নীর সাগ্রহ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—"সমীরন বুদ্ধিমতী ও বয়স্থা। তাহার মত গ্রহণ কর।"

সালেমা হাসিয়া বলিলেন,—"আমার মত কি গ্রহণ করা হইয়াছিল?"

আঃ ফজল। মত অনেকরূপে গ্রহণ করা হয়; হয়ত কোনরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

সালেমা। বক্তৃতা কর্‌বার সময়ে বোধ হয়,—না?

আঃ ফজল। তখন কি তুমি আমাকে দেখেছিলে?—তুমি কোথায় ছিলে?

সালেমা। যেখানেই থাকি, তখন ত আপনাকে একজন মৌলবী-সাহেব মাত্র ভাবিয়াছিলাম। পরে বাপজানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানি।

আঃ ফজল। জিজ্ঞাসা করে জান্‌লে? লজ্জা হইল না?

সালেমা। ভারি ত লজ্জা? একজন বক্তার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তার আবার লজ্জা!

আঃ ফজল। কিন্তু পরে যখন জানিলে যে সেই সামান্য বক্তাই—

সালেমা বাধা দিয়া বলিলেন,—"থাক, অত কথার উত্তর দিবার সময় এখন নাই।"—বলিয়াই তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

সুযোগমত সালেমা সমীরনকে নির্জ্জনগৃহে আবদ্ধ করিয়া আশরফের পত্র তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলেন এবং তৎপর সমস্ত কথা বলিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। লজ্জায় সমীরন একেবারে মরিয়া গেলেন। তিনি কত বার ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সালেমার কবল হইতে মুক্ত হইতে

সালেমার উপদ্রবে অস্থির ও নিরুপায় হইয়া সমীরন বলিলেন, "ভাবি সাহেব! আপনার পায় ধরি, আমাকে আজ মাফ করুন; আর এক দিন বল্‌ব।"

সালেমা বলিলেন,—"আজই বল্‌তে হ'বে; নইলে ছাড়্‌ব না।"

সমীরন। আচ্ছা ছেড়ে দিন্‌। আপনি যা কর্‌বেন; আমি তাতেই রাজী আছি।

সালেমা। আমি যা করি তাই? আমি যদি এ রূপের ডালি এক চাষার মাথায় তুলে দেই?

সমীরন। আমি তাতেই রাজী; আপনি আমাকে ছাড়ুন; মা শুন্‌লে কি বল্‌বেন।

সালেমা হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলিলেন,—"তবে বল, ব্যারিষ্টার আশরাফ আলি চৌধুরীর সহিত রাজী।"

সমীরন। আপনি কি ভাইজানের সম্বন্ধে ঐরূপ বলেছিলেন?

সালেমা। আচ্ছা মনে করুন, বলেছিলাম।

"তবে মনে করুন, আমিও না হয় বলিলাম"—বলিয়াই সমীরন ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন। সালেমা হাসিতে হাসিতে কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। লজ্জায় সমীরন সালেমার নিকট হইতে দূরে দূরে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ইহার পরে যথাবিধি সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়া এক শুভদিনে আশরফ আলির সহিত সমীরনের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সালেমা সমীরনকে বিবাহ উপলক্ষে পাঁচ হাজার টাকার গহনা উপহার প্রদান করিলেন।

বিবাহান্তে যথাকালে নবদম্পতি নির্দ্দিষ্ট গৃহে একত্রিত হইলেন। উভয়ের হৃদয়নিহিত আকুল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। আশরফ সৌন্দর্য্য-ভারাবনতা লজ্জানম্রা ব্রীড়াময়ী সমীরনের

তাঁহার পুষ্পকোমল কমনীয় দেহের অমিয় স্পর্শে ধৈর্য্য হারাইয়া, মনোহর কোমলকণ্ঠে আদরমাখা চুম্বন-রেখা আঁকিয়া দিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিলেন, "প্রাণের সমীরন!—'সমীরণ' অর্থে ত প্রশান্ত বাতাস; কিন্তু এ যে অশান্ত ঝটিকা!"

স্বামীর কণ্ঠলগ্ন সমীরন সলজ্জভাবে অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"কেন, ঝটিকাবেগে কাহারও হৃদয়ভিত্তি বিচলিত হইয়াছে কি?"

আশরফ বলিলেন,—"সে কি আজ প্রিয়তম! যে দিন তুমি স্বর্গের সৌন্দর্য্য-প্রতিমার মত মধুর ভঙ্গিমায় চিত্তদাহী রূপের জ্বলন্ত-শিখা বিস্তার করিয়া সহস্র পতঙ্গের প্রাণ দগ্ধ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলে, সেই দিন এ হৃদয়-ভিত্তির মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছিল।"

সমীরন মধুর স্বরে বলিলেন,—"থাক, অত পতঙ্গের প্রাণ পোড়াইয়া কাজ নাই! এক পতঙ্গের উপদ্রবেই পরাণ অস্থির—প্রদীপের আলো ত নির্ব্বাপিত প্রায়!"

"বটে!"—বলিয়াই প্রেমোন্মত্ত আশরফ সমীরনের কম্পিত দেহলতাখানি আপন বক্ষে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার কপোলে-কণ্ঠে ও অধরে-গণ্ডে সহস্র চুম্বন বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন। সমীরনের রক্তগোলাপগঞ্জিত অধর দুখানিও অলক্ষ্যে আশরফের অধরপ্রান্তে সংযুক্ত হইল। পতির বক্ষলগ্ন আবেশবিহ্বল যুবতীর মুগ্ধপ্রাণ স্বামীর বিভোর প্রাণের দিকে সবেগে ধাবিত হইল এবং নিমিষের মধ্যে রক্তমাংসময় অস্থিপঞ্জর ভেদ করিয়া দুইটী আত্মা প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইল। তাঁহাদের প্রাণের তারে তারে এক আনন্দময় মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—সমস্ত দেহে শিহরণের চঞ্চল ঝটিকা বহিতে লাগিল। এক অবক্তব্য আনন্দের সুখময় সচেতন স্বপ্নে দম্পতির শুভবাসর অতিবাহিত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দান-প্রতিদান।

বিবাহের পর আশরফের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া বা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এখন আর কেহই বুঝিতে পারিবে না যে, "ইনিই সেই ইউরোপীয় ভাবোন্মত্ত সম্পূর্ণ সাহেবী ধরণের ব্যারিষ্টার আশরফ। সমীরনের ধর্ম্মভাবপূর্ণ আনন্দময় জীবনস্পর্শে তিনি এখন সম্পূর্ণ মোসলমান ও উদার উৎসাহী যুবকে পরিণত হইয়াছেন।

আবুল ফজল ও সালেমা কুসুমপুরে উপস্থিত হইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ সম্পত্তি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাহাতে মনোযোগী হইলেন না, বরং এক দিন তিনি স্পষ্টই বলিলেন,—"এত ব্যস্ততার কারণ কি; আপনাদের থাকিলে কি উহা আমার নহে?"

তাঁহার ঔদাসীন্য দেখিয়া অবুল ফজল স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া দলিল প্রস্তুত করিলেন এবং একটি দিন ঠিক করিয়া সবরেজিষ্টার আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

সবরেজিষ্টার আসিবার দুই দিন পূর্ব্বে সালেমা আবুল ফজলের নিকট উপস্থিত হইয়া আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন,—"প্রিয়তম! আমার একটী অনুরোধ রাখিতে হইবে; বলুন রাখিবেন?"

আবুল ফজল সাদরে সালেমার কর ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন,—"প্রিয়তম! কবে তোমার কোন্ অনুরোধ রাখি নাই?"

সালেমা। আপনি চিরকালই আমার সাধ পূর্ণ করিয়াছেন; বলুন আজিকার সাধটীও পূর্ণ করিবেন।

আঃ ফজল। বল; তোমার সাধ পূরণে আমার অসাধ নাই।

সালেমা। তবে পরশ্ব ভ্রাতা আশরফের সম্পত্তি যে সময়ে রেজিষ্টারী করিয়া দেওয়া হইবে, সেই সময়ে বাকী সম্পত্তিটুকু সমস্তই আপনার নামে লিখিয়া দিতে চাই; বলুন আপনি সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ করিবেন?

আবুল ফজল বিস্মিত ভাবে কিয়ৎক্ষণ সালেমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পরে বলিলেন,—"এ অনুরোধ কেন সালেমা! তোমার সম্পত্তি কি আমার নহে? তোমাতে আমাতে কি পার্থক্য আছে?"

সালেমা। তা নাই এবং খোদা যেন না করেন। স্বামী স্ত্রীর আবার পার্থক্য থাকিবে কেন? তথাপি আপ'ন আমার সাধটী পূর্ণ করুন।

আবুল ফজল। তোমার এ অনুরোধের কোন হেতু আছে কি?

সালেমা। আমি গত রাত্রে তাহাজ্জদের * নামাজ পড়িয়া যখন শয়ন করি, তখন সহসা আব্বাজানকে স্বপ্নে দেখিলাম! তিনি আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতেছিলেন। আমি নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি বলিলেন,—"মা! আমার আশীর্ব্বাদ পূর্ণ হইয়া তোমার জীবন ধন্য হইয়াছে ত? তোমার প্রতি আমার একটী উপদেশ আছে; মনে রাখিও, স্বামীর করুণার উপর রমণীর স্বর্গ অবস্থিত। যদি স্বামীর পূর্ণ করুণা লাভ করিতে চাও, তাঁহাকে পূর্ণভাবে সর্ব্বস্ব দান করিয়া তাঁহার করুণা ও প্রেমের উপর অবস্থান করিও। নারী-জীবনে ইহাই মুক্তির সোপান।" এই বলিয়াই তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তখন হইতে মনে মনে নানা আন্দোলন করিয়া আমি ইহাই স্বপ্নমর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছি। বলুন আপনি আমার সাধ পূর্ণ করিবেন কি না?

---

* গভীর নিশীথের একরূপ বিশেষ প্রার্থনা।

আবুল ফজল সালেমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন; সালেমার মুখে এক অনাবিল শান্তি ও আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সালেমা আপনার সমস্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ স্বামী ও এক তৃতীয়াংশ ভ্রাতার নামে লিখিয়া দিলেন। কিন্তু মূল জমিদারী এজমালী অবস্থায় পরিচালিত হওয়াই স্থির রহিল।

সম্পত্তি লেখাপড়া হইবার পরে আশরফ ও সমীরন দৃঢ়নির্ব্বন্ধের সহিত ব্যাঙ্ক হইতে আবুল ফজলের দ্বারা পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠাইয়া আলিনগরের মিঞা-বাড়ী পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন। আপাততঃ একটী দ্বিতল ও একটী একতল দালান এবং বহুদূরব্যাপী পাকা প্রাচীর দেওয়া হইল। সালেমা নিজ হইতে দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া বাহির বাটীতে সুদৃশ্য বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করিলেন। এই বৎসরেই সালেমা একটি পুত্র সন্তান লাভ করিলেন। নবকুমারের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। মহা ধূমধামে 'আকিকা' করিয়া শিশুর নাম রাখা হইল—ফজলর-রহমান।

পুত্রের জন্মের দুই তিন মাস পরে আবুল ফজল আরব্য ভাষায় এম-এ দিয়া ইংরাজীতে এম-এ, দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সতীশের দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি বি-এল পাস করিয়াছেন; কিন্তু অর্থাভাবে মাষ্টারী ত্যাগ করিয়া প্রাকৃটিস করিতে যাইতে পারিতেছেন না। আবুল ফজলের সৌভাগ্য উদয়ে তাঁহারা পরম সুখী; কিন্তু লজ্জাবশে তাঁহার নিকট কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। আবুল ফজল একদিন সতীশের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাঁহার কন্যা দুইটীকে আদর করিতে করিতে নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সতীশ এখনও প্রাকৃটিস কর্‌তে চাচ্ছে না কেন? এ ছাই মাষ্টারী করে আর কত কি হবে?"

নলিনী লজ্জা সঙ্কোচ ফেলিয়া বলিলেন,—"প্রায় এক বৎসর যাব যাব কোচ্ছেন, কিন্তু টাকা পয়সার অভাবে যেতে পার্‌ছেন না।"

নলিনীর কথায় আবুল ফজলের চমক ভাঙ্গিল। সতীশ ও নলিনীর উদারতার কথা স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাদের বর্ত্তমান অসচ্ছলতা ভাবিয়া আবুল ফজল লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি তখনই বাড়ী গিয়া সালেমার সহিত পরামর্শপূর্ব্বক সপ্তাহের মধ্যেই টাকা পয়সা দিয়া সতীশকে সদরে পাঠাইলেন। তাঁহার থাকিবার জন্য চৌধুরী আনোয়ার আলী সাহেবের নির্ম্মিত দুইখানি বাসার একখানি প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন কুসুমপুর এষ্টেটের মামলা-মোকর্দ্দমার জন্য আবুল ফজল সতীশকে বাৎসরিক হাজার টাকা নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন।

আবুল ফজলের এই অভূতপূর্ব্ব বন্ধু-প্রীতি, প্রত্যুপকার ও উদারতা গুণে সতীশ ও নলিনী যারপর নাই কৃতার্থ হইলেন। তাঁহাদের দিন ফিরিয়া গেল। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা উন্নতির পথে ধাবিত হইলেন।

অনন্তর আবুল ফজল আলিনগরের যে সমস্ত লোক বিপদ্‌গ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, নিজ সৌভাগ্য-উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাহাদিগের দুঃখ দূর করিলেন। দেখিতে দেখিতে সারা দেশ তাঁহার যশোগানে মুখরিত হইয়া উঠিল।

আবুল ফজল একদিন করিমনকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন আতাওর রহমান বাড়ী ছিলেন না। আবুল ফজলকে দেখিয়া করিমনের ভাশুর-পত্নী কমলা স্বামীর নির্দ্দেশে আবুল ফজলের নিকট আসিয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আবুল ফজল আনন্দের সহিত স্নেহপূর্ণ ভাষায় ক্ষমা করায় কমলা কাতর ভাবে বলিলেন, "আপনি যদি একবার দাদার সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন, আমি

বড়ই কৃতার্থ হইব।" আবুল ফজল তাহাতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সময়ে কমলার একটী পুত্র ও একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল।

ইহার পর একদা গভীর নিশীথে আবুল ফজলের অনুরোধে সতীশ কমলার সহিত দেখা করিলেন। সেই সাক্ষাতের ফলে ভ্রাতা-ভগ্নী উভয়েই কাঁদিলেন। কমলা পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করায় সতীশ ক্ষমা করিয়া তাঁহার পুত্র-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, "কমলা! ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াও যে পবিত্র ভাবে জীবনযাপন করিতেছ, ইহাতে আমি বড়ই সুখী হইলাম। ভগবান্ ধর্ম্মে যেন তোমার মতি রাখেন এবং জীবনে সুখী করেন। তুমি প্রতি বৎসর বর্ষাকালে একবার গোপনে আমার ও নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিও। কিন্তু সাবধান লোকে যেন ইহা জানিতে না পারে; কেননা আমাদের সমাজের বাঁধন বড় কঠোর!" কমলা কৃতার্থ হইয়া ভ্রাতাকে সালাম করিলেন। সতীশও পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্যথিত মনে বিদায় হইলেন।

ইহার পর প্রতি বৎসরান্তে একবার তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইত। তাঁহাদের আন্তরিক সদ্ভাব ক্রমেই বদ্ধমূল হইয়াছিল।

এই সমস্ত ঘটনার অল্পদিন পরেই জ্ঞানবৃদ্ধ ম্যানেজার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। আবুল ফজল ও আশরফ উভয়েই তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পুত্রটীকে এক সদর কাছারীর নায়েবী প্রদান করা হইল।

ম্যানেজারের বিদায়ের পর আবুল ফজল নব ম্যানেজার নিয়োগের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রদান করিলেন। দশ হাজার টাকা নগদ বা সম্পত্তি জামিনে একশত টাকা বেতন নির্দ্দেশ করা হইল। বিজ্ঞাপনে বিশেষ ভাবে লিখিত হইল, উপযুক্ত ও সম্ভ্রান্ত মোসলমানের আবেদন অগ্রগণ্য।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—o*o—

আবদুল হকের সাফল্য।

পাঠক! জমিদার ও জমিদার-বাড়ীর পরিজন প্রভৃতি বড় মানুষ শ্রেণীর নরনারীর বড় বড় কাণ্ড কারখানার বিপুল আবর্ত্তে পতিত হইয়া ঘোর ব্যতিব্যস্ত থাকা নিবন্ধন বহুদিন যাবৎ আমরা পল্লী-পরিবারের স্বভাবজাত প্রস্ফুটিত কুসুম রমণীরত্ন আজিজা ও তাঁহার স্বামি-পরিজনের সংবাদ লইতে পারি নাই। সংসারের নিয়মই এই যে, পল্লীগ্রামের দীন-দরিদ্রের কুটীরে বসিয়া বড়মানুষের চিরস্পর্শদোষশূন্য সরল পল্লীবাসী কৃষকগণ আপনাদের সুখ-দুঃখের যে সমস্ত গল্প করে, সেই সমস্ত পল্লী কাহিনীতেও রাজারাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যা ও ধনী জমিদারের কথাই অধিক শ্রুত হয়; নিরীহ ধর্ম্মপ্রচারকগণ ধর্ম্মপ্রচারার্থে যে সমস্ত করুণ ও পুণ্যকাহিনী বিবৃত করেন, তাহার মধ্যেও বাদশা, বেগম ও শাহজাদা-শাহাজাদির কাহিনীই অধিক থাকে, ধর্ম্মশীল মানব যখন তাঁহাদের সর্ব্বস্বহীন সংসারত্যাগী ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষের কথা প্রচার করেন, তখন ইতিহাসে কোন উদ্দেশ না থাকিলেও, তাঁহারা সেই মহা পুরুষের বংশতালিকাটী অন্ততঃ বহু সুদূরবর্ত্তী একজন রাজা-রাণীর সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া থাকেন; কবি যখন তাঁহাদের জাতীয় গাঁথা রচনা করেন, তখন তাঁহাদের কল্পনা-তুলিকায় জাতীয় অনুপম আদর্শ নর-নারীর পরিবর্ত্তে, আদর্শে অনেক হীন হইলেও সেই রাজা-রাণী ও বীর-বীরাঙ্গনার চিত্রই অধিক অঙ্কিত হয় এবং ভক্ত যখন ভক্তির প্রাবল্যে তাঁহাদের ভক্তি-

ভাজনের গুণগরিমা বর্ণনা করেন, তখন তাঁহাদের নিজ আন্তরিক বিমল ভক্তির পরিবর্ত্তে এক আধ জন বড় মানুষের কৃত্রিম ভক্তির কথাকেই গৌরবের সহিত বর্ণনা করেন। ইহাতে বুঝা যায়, সংসারের সহিত বড় মানুষের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; এবং তাঁহাদের প্রসঙ্গই লোকের চিত্তরঞ্জনে অধিক সমর্থ! বড় লোকেরা বিধাতার সমস্ত অনুগ্রহের অধিকারী না হইলেও, সংসারজীবনের বিশেষ অনুগ্রহ-সম্পদের অধিকারী বলিয়া কেহই তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। সুতরাং আমাদের পল্লী-কাহিনীতেও যদি কেবল পল্লীবাসী দীনদরিদ্রের কথার পরিবর্ত্তে বড় লোকের কথা একটু অধিক বর্ণিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য আমাদের প্রতি দোষারোপ না করিয়া চলুন, আমরা এই সুযোগে একবার সৈয়দ-বাটী ভ্রমণ করিয়া আসি।

কুলমর্য্যাদার গৌরবস্তম্ভ সৈয়দ নুরল হক সাহেব আর ইহজগতে নাই। কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি পুত্র, কন্যা ও সেবাপরায়ণা, স্নেহার্দ্র-হৃদয়া মমতাময়ী পুত্রবধূ আজিজার ভক্তিপাশ মুক্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। আজিজার ভক্তি, যত্ন ও সেবাগুণে শেষকালে সৈয়দ সাহেবের জীবন বড়ই সুখময় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে আজিজাকে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"মা, আমি যদি পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি এবং সাধ্যপক্ষে খোদা ও রসুলের আদেশ পালন করিতে পারিয়া থাকি, তবে আমি দোয়া করিতেছি, তোমার পুত্র আবদুল আজিজ যশ ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আমার কুল উজ্জ্বল এবং তোমার জীবন ধন্য করিবে।"

আজিজা কৃতজ্ঞতার সহিত শ্বশুরের অন্তিম আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর সৈয়দ সাহেবের দেহত্যাগের পরে যথাসাধ্য তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণকর ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করিলেন।

এখন সমস্ত সংসারের ভার সর্ব্বতোভাবে যুবক আবদুল হকের মাথায় পড়িল। পরিবারের মধ্যে পত্নী আজিজা ও সোফিয়া; আজিজার দুইটী পুত্র সন্তান, একটী দাসী ও চাকর। ইহার উপর সংসারের সমস্ত ব্যয় একাই অবদুল হককে বহন করিতে হইল। কিন্তু তিনি মাসে মাত্র চল্লিশটী টাকা মাহিনা পাইতেন; ইহাতে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া সংসার চালান দুষ্কর। বিশেষতঃ আবদুল হকের খরচের হাত একটু মুক্ত ছিল। এ অবস্থায় সংসারে অভাব অনাটন হওয়া সম্পুর্ণ স্বাভাবিক হইলেও আজিজার শৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতাগুণে একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দেই সংসার চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু পূর্ব্ব ঋণগুলি পরিশোধ ও সাংসারিক ভবিষ্যৎ উন্নতির কোনই সম্ভাবনা রহিল না।

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর আজিজাই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াছিলেন। সোফিয়া সে কর্ত্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। তিনি আজিজার ব্যবহার ও স্বভাবমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতে পুরুষোচিত আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত থাকা এবং অধিক বয়সে বিবাহ হওয়া নিবন্ধন তাঁহার সন্তানাদি হইল না; ভবিষ্যতে হইবার কোন লক্ষণও বুঝা গেল না। স্বীয় সন্তানাদি না হওয়ায় সোফিয়া আজিজার প্রথম পুত্র আবদুল আজিজকে স্বীয় গর্ভজাত সন্তানতুল্য ভালবাসিলেন;—অতিমাত্র আদর যত্ন করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ বশীভূত ও নিজস্ব করিয়া লইলেন। আজিজা সোফিয়াকে কনিষ্ঠ সহোদরার ন্যায় ভাল বাসিতেন; সুতরাং ইহাতে আপত্তি না করিয়া তিনি বরং আনন্দিতই হইলেন।

শ্বশুরের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে আজিজা আর একটী পুত্র সন্তান লাভ করেন। সৈয়দ সাহেব সূতিকাগৃহ হইতেই কোলে করিয়া

শিশুরত্নের নাম রাখিয়াছিলেন,—আজিজল হক। বিচক্ষণ সৈয়দ সাহেব শিশুর পিতা ও মাতার নাম সংযোগ করিয়া নাম রাখায় ঐ নাম সকলেরই মনঃপূত হইয়াছিল। আবতুল হক ও আজিজা উভয়েই এই শিশুরত্নকে তাঁহাদের বিচ্ছেদান্তক মিলনের দানস্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন।

পত্নীদ্বয়ের সাহচর্য্য-মাধুর্য্যে আবদুল হক জীবনে যারপর নাই সুখী হইলেন। একদিকে অনাবিল শান্তি, অন্যদিকে অপরিমিত সৌন্দর্য্য; একদিকে প্রশান্ত সুখ, অন্যদিকে প্রচুর আনন্দ; কিংবা একদিকে অনাহত আলোক অন্যদিকে অনুপম শোভা লাভ করিয়া তাঁহার জীবন আনন্দময় হইয়া উঠিল।

মাষ্টারী করিয়া বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অধিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই মনে করিয়া আজিজা আবতুল হককে আইন পড়িতে প্ররোচিত করিলেন। তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু কর্ম্মজীবনের প্রথমোদ্যম কঠোরভাবে প্রহৃত হওয়াবশতঃ আর পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষিপ্রতা ও ও উৎসাহের সহিত উহাতে ব্রতী হইতে পারিলেন না;—যেন আজিজার মন রক্ষার জন্যই কেবল আইন পড়িতে লাগিলেন।

একদিন রবিবার তুই প্রহরের সময় সৈয়দ-বাটীর এক গৃহে সোফিয়া আনন্দমনে বসিয়া পুত্র আবদুল আজিজকে সুন্দর কৌশলে বাঙ্গলা ও ইংরেজী বর্ণমালা শিক্ষা দিতেছেন। অন্য গৃহে আজিজা পালঙ্কের উপর শুইয়া শুইয়া শিশুপুত্র আজিজল হকের সহিত হাস্যামোদ করিতেছেন। শিশু জননীর বুকের উপর বসিয়া তুলিতে তুলিতে তুই হাতে তাঁহার তরঙ্গায়িত তুই গুচ্ছ কেশ টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা,—মামা?"

জননী। মামা নানার বাড়ী গেছে।

শিশু। নানা-বাড়ী গেছে?

জননী বলিলেন,—"হাঁ।"

শিশু—"আমি নানা-বালী দাব।" জননী—"বর্ষা কালে যেও।"

শিশু—"বল্‌ছা কালে?" জননী—"হাঁ।"

শিশু—"না, আমি আজি মামা-বালী যাব।" জননী—"তবে যাও।"

শিশু—"মা, তুমি তল।" জননী—"না, আমি যাব না।"

শিশু জননীর চুল ছাড়িয়া, নবনীতুল্য সুকোমল ক্ষুদ্র হস্তে জননীর মুখ ধরিয়া, ডাগর চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া আজিজাকে ভয় দেখাইয়া বলিল, "তল; ও! বাবা ডাক্‌ব; মাল্‌বে!"

বলিয়াই জননীর মুখ ছাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,—"বাবা, আব্বা!"

শিশুর আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই আবদুল হক স্মীতমুখে গৃহে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে আজিজার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এ কি, মাতাপুত্রে খুব আমোদ হচ্ছে বুঝি?"

"না হয় এবার পিতাপুত্রেই হোক্"—বলিয়া আজিজা শিশুকে বুকের উপর হইতে নামাইয়া নিকটবর্ত্তী পিতার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "যাও দুষ্ট ছেলে; নালিশ করগে।"

শিশু অভিমানভরে পিতার কোলে উঠিয়া, দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, পিতার মুখের কাছে সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কুসুমতুল্য নির্ম্মল সুষমামণ্ডিত মুখখানি লইয়া বলিলেন,—"বাব্বা, মালে মাল!"

পিতা—"কেন বাবা?" শিশু—"কথা তোলে না; মামা-বালী যায় না; আল্ আমালে মালে; তুমি মাল।"

পিতা হাসিয়া "এই মারি"—বলিয়া ফুল্লমুখী আজিজার গণ্ডে দুইটী অঙ্গুলির মৃদু প্রহার করিলেন।

আজিজা পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমাকে মার খাওয়ালে; দেখ্‌বো কোলে নেয় কে আর দুধ খাওয়ায় কে?"

শিশু। বাব্বা কোলে নেব্বে; বাব্বা দুধ খাওয়াবে।

জননী। আচ্ছা তাই দেখা যাবে; আমার কাছে এলে মার খাবে!

শিশু। বাব্বা ঐ ছোন; মাল্‌বে; তুমি মাল।

আবদুল হক আবার মারিবার ভাণ করিতেই আজিজা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কৃত্রিম স্বরে কাঁদিয়া বলিলেন,—"তবে আমি মরে যাই!"

জননীর ক্রন্দন দেখিয়া শিশুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; সে তাড়াতাড়ি পিতার কোল হইতে নামিয়া সজোরে জননীর মুখের উপর হইতে হাত সরাইয়া ব্যস্ততার সহিত বলিল,—"মা! কাঁদে না; আল্ মাল্‌বো না; বাব্বা ভাল না।"

জননী—"তবে আমার মুখে চুমা দেও, নইলে কাঁদব।" শিশু জননীর মুখে চুমু খাইতেই পিতা বলিলেন,—"আমাকে চুমু দিলে না?"

শিশু তখন পিতার কোলে উঠিয়া তাঁহার মুখে চুমু খাইল এবং অবিলম্বে নামিয়া আবার মাতার কাছে আসিল।

জননী আদরে শিশুর মুখচুম্বন করিলেন। মাতার আদরমাখা চুম্বন লাভ করিয়া শিশু পূর্ণ আনন্দ লাভ করিবার জন্য পিতার দিকে চাহিয়া বলিল,—"বাব্বা! তুমি চুমু দাও।" পিতা পুত্রের মুখে স্নেহ-পূর্ণ চুম্বন প্রদান করিলেন। কিন্তু সে চুম্বন পুত্র একাকী ভোগ করিয়া তৃপ্ত না হইয়া ব্যস্ততার সহিত বলিল,—"বাব্বা! মাকে চুমু দাও।"

শিশুর আব্দারে জনক-জননী উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। সেই হাসির কারণ বুঝিতে না পারিয়া শিশু উভয়ের মুখে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

এইরূপ কিছুক্ষণ খেলা ও আমোদ করিয়া শিশু ঘুমাইয়া পড়িল। তখন আবদুল হক আজিজার অর্দ্ধোন্মুক্ত বক্ষের উপর বাহু বিন্যস্ত করিয়া—প্রেমময়ী পত্নীর আনন্দোজ্জ্বল মুখের উপর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিয়া বলিলেন,—"আজিজা! এত সুখ, এত শান্তি তোমার মধ্যে? ইচ্ছা হয় তোমাতে বিলীন হইয়া যাই?"

আজিজা সহাস্যে বলিলেন,—"আপনার সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি! এতদিন পরে আবার আমার মধ্যে শান্তির উৎস কোথা হইতে উৎসারিত হইল যে, একেবারে বিলীন হইবার সাধ?"

আবদুল হক বলিলেন,—"সহসা উৎসারিত নহে; শান্তির ফোয়ারা চিরকালই তোমার মধ্যে বিরাজমান আছে।"

আজিজা। তা'হলে পূর্ব্বে তাহা চক্ষে পড়ে নাই কেন?

আঃ হক। পূর্ব্বে যে আমি অন্ধ ছিলাম।

আজিজা আবার হাসিয়া বলিলেন,—"তবুও ভাল যে, এতদিন পরে আপনার চোখ ফুটিয়াছে! তবে দাসীর মধ্যে শান্তির ফোয়ারাই থাক, আর সুখের পুষ্করিণীই থাক, সবই আপনার আছে। অপর কেহ তাহা লুটিয়া লইতে পারিবে না। কিন্তু আপনি এত তারিফ (প্রশংসা) করিবেন না। কারণ তারিফের তাপে অনেক সময়ে পুকুর-ফোয়ারা শুকাইয়াও যাইতে পারে।"

আবদুল হক বলিলেন,—"তাপে অগভীর কূপ শুষ্ক হইতে পারে, কিন্তু এ যে সুগভীর সরোবর!"

আজিজা। আচ্ছা আপনি তাই বুঝিয়া যদি সুখী হন, তবে সেই ভাল। কিন্তু আপনি আইন পড়ার কি করিতেছেন? চিরকালই কি এইরূপ মাষ্টারি করিয়া কাটাইতে চান?

আঃ হক। আইন-টাইন পড়া আর এ বয়সে ভাল লাগে না। মাষ্টারী করা মন্দ কি? এ ত কোন অসম্মানের কাজ নহে।

আজিজা। অসম্মানের কাজ নহে, তা' বুঝি; কিন্তু অসচ্ছল অবস্থাপন্ন ব্যক্তির কাজ নহে। যাঁদের অবস্থা ভাল, তাদের পক্ষে

ইহা খুব পবিত্র কাজ। কিন্তু আপনার অবস্থা তেমন নহে। তাতে ঘর-সংসার আছে, পরিবার-পরিজন আছে ; সন্তানাদি আছে। আপনি বা আমরা যেমন ভাবেই জীবন কাটাই না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না ; কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, দুইটী ছেলে হইয়াছে ; খোদা দিলে আরও হইতে পারে ; তা'দিগকে ত মানুষ কর্‌তে হবে? এখন হতে চেষ্টা না কর্‌লে পরে কি কর্‌বেন? বয়সের কথা কি বলছেন, বুড়া হইয়া গেলেন নাকি? আর হলেই বা দোষ কি? আর ত বিয়া করার দরকার নাই!

আঃ হক বলিলেন,—"লজ্জাই দাও আর যাই কর, ঐ সব উকিল-গিরির জোচ্চোরী ব্যবসা বোধ হয়, আমার দ্বারা হয়ে উঠ্‌বে না।"

আজিজা বলিলেন,—"বেশ, ওকালতী করা ভাল ও সৎ পেসা বলিয়া বোধ না হয়, অন্য কাজের জোগাড় করুন না কেন? দুনিয়ায় উন্নতি করার কত কাজ আছে।" আবদুল হক বলিলেন,—"অন্য কাজ আর কি কর্‌ব। গবর্ণমেণ্টের চাকুরী ত হয়ে উঠ্‌বে না। এক জমিদারী বিভাগ ভাল বটে, কিন্তু জামিনের যে চোট্, তাত হওয়া দায়।"

আজিজা—"আচ্ছা আপনি চেষ্টা করুন না কেন? বাপজানকে বলে জামিনের যোগাড় করা যাইবে।"

আঃ হক। অল্প জামিনে কি আর ভাল কাজ পাওয়া যায়? যদি দশ হাজার টাকার জামিন যোগাড় করিতে পারিতাম, তবে ত কুসুমপুর এষ্টেটের ম্যানেজারিই পাইতে পারিতাম।

আজিজা—"কোন্ কুসুমপুর?" আবদুল হক—"তোমাদের সেই আবুল ফজলের শ্বশুর-বাড়ীরই এষ্টেট্।"

আজিজা—"সে এষ্টেটের এখন মালিক কে?"

আঃ হক। জমিদার-কন্যা সালেমাই প্রকৃত মালিক ; তবে তিনি সমস্ত সম্পত্তি স্বামীর নামে লিখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আবুল ফজলই এখন

তাহার সর্ব্বময় কর্ত্তা।" অনন্তর সহাস্যে বলিলেন,—"দেখ আজিজা! যদি তাঁর সহিত তোমার বিবাহ হইত, তবে আজ কত বড় জমিদারপত্নী হইতে!"

আজিজা সালেমার অনুপম পতি-প্রীতি এবং আবুল ফজলের সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু স্বামীর শ্লেষে বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—"নিজের রুচি পরের উপর প্রয়োগ করিয়া ফল কি? আমি ত আর আপনার মত পরমা সুন্দরী স্ত্রীর পতি হইবার চেষ্টার ন্যায় জমিদারপত্নী হইবার জন্য কাঁদিয়া কাল কাটাই নাই।"

আঃ হক—"আমি ত কিছু দোষ ভাবিয়া বলি নাই; বিয়ার কথা হয়েছিল বলেই বল্‌লাম।"

আজিজা—"ওরূপ বিয়ার কথা অনেকেরই হ'য়ে থাকে।"

আঃ হক। আচ্ছা যদি বিবাহ হইত, তবে তুমি সুখী হইতে কি না?

আজিজা। সুখ দুঃখ অদৃষ্ট! আপনার পদপ্রান্তে স্থান পাইয়াও ক আমি যথেষ্ট সুখী হইয়াছি।

আঃ হক। আচ্ছা আজিজা! তুমি আবুল ফজলকে খুব ভাল-বাস্‌তে কি না?

আজিজা। নিশ্চয়ই;—ভগিনী যেমন সহোদর ভ্রাতাকে ভালবাসে, আমিও শিশুকাল হইতে তাঁহাকে সেইরূপ ভালবাসিতাম; এখনও তাঁহাকে তেমনই ভালবাসি ও ভক্তি করি।

আঃ হক। তিনি তোমাকে ভালবাসেন?

আজিজা। তিনি পূর্ব্বেও আমাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতেন, বোধ হয় এখনও করেন।

আঃ হক। আচ্ছা আজিজা! রাগ করিও না; বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তোমার মনে কোনরূপ দুঃখ হইয়াছিল কি না?

আজিজা। আপনি এ সমস্ত প্রশ্ন করিতেছেন কেন? আমি আপনার মনস্তুষ্টির জন্য মিথ্যা কথা বলিয়া অপরাধীও ত হইতে পারি।

আঃ হক। তুমি স্বামীর নিকট মিথ্যা কথা বলিবে, ইহা আমার ধারণা ও বিশ্বাসের অতীত।

আজিজা। তবে শুনুন; সেরূপ অবস্থায় মনের ভাবান্তর হওয়া স্বাভাবিক! সত্যই আমি মনে খুব দুঃখ পাইয়াছিলাম।—আজিজার চক্ষুর পাতা সিক্ত হইল।

আঃ হক। সে দুঃখ এখন মনে আছে?

আজিজা—"একটুও না। নারীজীবনের কর্ত্তব্যচিন্তার সহিত বহু দিন পূর্ব্বে সে ভাবের ক্ষীণ রেখাটীও মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছি।" রমণীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আঃ হক। আবুল ফজল সম্বন্ধে তোমার ধারণা কিরূপ? আমার সহিত কিন্তু পাঠ্যজীবনে তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না।

আজিজা। আমি তাঁহার সম্বন্ধে চিরকাল উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছি,—এখনও করি। আপনার চিত্তের তৎকালীন সঙ্কীর্ণতাই বোধ হয়, আপনার সহিত তাঁহার অসদ্ভাবের কারণ।

আঃ হক। তা মিথ্যা নয়; কারণ কলেজের সমস্ত ছেলেই তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী ছিল।

আজিজা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আপনি তাঁহার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে চেষ্টা করুন। আমার বিশ্বাস, তাঁহার জীবনের উন্নত ও উচ্চ আদর্শ আপনার পক্ষে কল্যাণকর হইবে।"

আঃ হক। কিন্তু এখন তিনি দেশের একজন খ্যাতনামা মহাবিদ্বান্। আরবি, ইংরাজী ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের এম-এ;—তার উপর বিপুল জমিদারীর মালিক। সুতরাং তিনি আমাকে গ্রাহ্য করিবেন কেন?

আজিজা। আপনি তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছেন। আমার যতদূর বিশ্বাস, বিদ্যা বা ধন সম্পদের গর্ব্বে তাঁহার স্বভাব একটুও পরিবর্ত্তিত হইবে না।

আবদুল হক বলিলেন,—"আমার পক্ষে এখন তাঁহার সহিত মিলিবার চেষ্টা করার অর্থ তাঁহার এষ্টেটের চাকুরিটী প্রার্থনা করা। কিন্তু যদি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন?" আজিজা একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"তিনি কিরূপ লোকের জন্য প্রার্থী এবং বেতন ও শর্ত্তাদি কিরূপ?"

আবদুল হক পকেট হইতে এক টুক্‌রা কর্ত্তিত খবরের কাগজ বাহির করিয়া আজিজার হাতে দিলেন। আজিজা সেই বিজ্ঞাপনটী পড়িয়া বলিলেন,—"বেশ আপনি প্রার্থী হন; তিনি না শুনেন, আমাদের ক্ষতি কি? আর শুনিলে ত আমাদের যথেষ্ট উপকার হইবে।"

আবদুল হক বলিলেন,—"আজিজা! তিনি ত তোমার ভ্রাতা; ভ্রাতার নিকট একটু সোপারিশ কর না কেন?"

আজিজা সগর্ব্বে বলিলেন,—"ভগিনী অনাবশ্যক স্থলে ভ্রাতার নিকট ভিখারিণী সাজিবে কেন? আপনি নিয়মিত প্রার্থনা করুন।"

আঃ হক। তাত করিব; যদি সোপারিশের আবশ্যক হয়?

আজিজা। তখন দেখিব।

আঃ হক। যদি সম্মত হইয়া জামিন প্রার্থনা করেন?

আজিজা। জামিন দিতে স্বীকার করিবেন?

আঃ হক—"দিব কোথা হইতে?" আজিজা—"পরে দেখা যাইবে?"

আঃ হক। প্রতিশ্রুত হইয়া যদি দিতে না পারি, তখন তাঁর এই আদরের বোন্‌টীকেই দিব কিন্তু!

আজিজা। বেশ তাই দিবেন; আপনার কাজ চলিলেই ত হইল!

আবদুল হক আজিজাকে প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিয়া বাহিরে গেলেন।

আবুল ফজল জমিদারীর ম্যানেজারের জন্য অনেকগুলি দরখাস্ত পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলি হিন্দু এম-এ, বি-এল উকিলেরও দরখাস্ত ছিল। উপযুক্ত মোসলমান প্রার্থীর অভাবে তিনি মনে করিয়াছিলেন, অগত্যা একজন হিন্দু উকিলকেই সেই পদ প্রদান করিবেন।

এমন সময়ে আবদুল হক আবুল ফজলের সহিত দেখা করিলেন। আবুল ফজল মহা সমাদর ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। পাঠ্য জীবনের পর বহুদিবস পরে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিবিধ কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল। আবুল ফজল অতি সহজ ভাবে আজিজার কথা, তাঁহার সন্তানাদির কথা, এবং আবদুল হকের চাকুরী ও সংসারের সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আবদুল হক সমস্ত কথার যথাযথ উত্তর দিবার পর আবুল ফজল বলিলেন, "আপনি আইন পড়্‌ছেন না কেন? ল পাস করে কোথাও বস্‌তে পার্‌লে যেমন তেমন করে মাসে দু-তিনশ' টাকা হতে পারে।"

আবদুল হক। আইন পড়িয়া প্রস্তুত হইয়াছি এবং শীঘ্রই পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা আছে; কিন্তু দিয়া কি হইবে? কোথাও বসিতে হইলে প্রথম প্রথম অনেক খরচের দরকার। তাই ভাব্‌ছি, কি করি।

আবুল ফজল। আপনি পাস করুন না কেন? সে খরচ চাচাজান সহজেই চালাইতে পারিবেন; অগত্যা ভগ্নী আজিজার স্বামী ও সন্তানাদির জন্য ঐ সাহায্যটুকু আমরাও করিতে পারিব।

আঃ হক। তা আপনি সচ্ছন্দে পারেন। কিন্তু আমার একটী কথা আছে; কুসুমপুরের এষ্টেটে কি বি-এল ম্যানেজারই নিযুক্ত করিবেন?

আবুল ফজল। না বি-এল বলিয়া ধরাবাধা নাই। আজকালকার নিয়মানুসারে ইংরাজী ভাল জানা এবং আইন কানুনে অভিজ্ঞতা থাকিলেই চলিতে পারে।

আঃ হক। আপনি যদি বলেন, আমি একখান দরখাস্ত করি?

আবুল ফজল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা আমি ভাবিয়া দেখি। যদি সঙ্গত বুঝি, দরখাস্তের আবশ্যক হইবে না।"

অনন্তর আবুল ফজলের অনুরোধে আবদুল হক সেই স্থানে আহারাদি করিয়া শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলেন। আবুল ফজল সালেমার নিকট আবদুল হকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

আবদুল হক আজিজাকে তাঁহাদের বিবাহবিভ্রাট প্রসঙ্গে যেরূপ নানা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সালেমাও সেইরূপ হাসি-রহস্যের নানা বাণে স্বামীকে আহত ও বিদ্ধ করিয়া শেষে যখন বুঝিলেন যে, স্বামীর ধর্ম্মপ্রাণতা ও উদারতা-বর্ম্মে তাঁহার সমস্ত আঘাত ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, তখন তিনি সহাস্যে বলিলেন,—"সম্পত্তি কিরূপে চালিত হইবে, তাহা আপনিই বুঝেন। তবে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে আজিজার মত উচ্চাশয়া রমণীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যের জন্য কিছু করা—অপরের না হোক, এমন হৃদয়বান্ ভ্রাতার ত একান্তই কর্ত্তব্য!"

আবুল ফজল। আর হৃদয়ময়ী ভ্রাতৃবধূ বুঝি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত? তাঁহার বুঝি কোনই কর্ত্তব্য নাই?

সালেমা। নাই কেন? আমার উপর যেটুকু ফেলিতে চান, আমি গ্রহণে রাজী আছি।

আবুল ফজল। তবে শুন; আবদুল হক সুশিক্ষিত, উৎসাহী ও তেজস্বী যুবক। তাঁহার উশৃঙ্খলতাও যথেষ্ট ছিল; কিন্তু আজিজার সংস্পর্শগুণে তাহা আর নাই বোধ হয়। সে যাহা হউক, জমিদারীর নিয়মানুসারে ম্যানেজারের জন্য জামিন লওয়া আবশ্যক; কিন্তু জামিন দেওয়া খুব সম্ভব তাঁহাদের অসাধ্য। এ অবস্থায় কি করা যায়?

সালেমা। করিবেন আর কি ? ভগিনীকে জামিন গ্রহণ করুন।

আবুল ফজল। ভ্রাতার পক্ষে ভগ্নীকে জামিন গ্রহণ করা—ও সব জমিদারদিগের মধ্যে চলিতে পারে; আমাদের মধ্যে নয়।

সালেমা। আচ্ছা বেশ! আমিই না হয় তাঁহার জন্য জামিন হইব; ভগ্নীর পরিবর্ত্তে স্ত্রীকে জামিন গ্রহণ করা,—এটুকু আপনাদের মধ্যে চলিবে ত? "অগত্যা সেটুক চালাইতে হইবে"—বলিয়া আবুল ফজল বাহিরে আসিলেন। আজিজার একটু উপকার করিতে পারিলেন বলিয়া তাঁহার জীবন কৃতার্থ বোধ হইতে লাগিল।

তিনি পরদিন আবদুল হক্‌কে ডাকিয়া তাঁহাকে নিয়োগ-পত্র প্রদান করিলেন। আবুল ফজলের উদারতা ও মহত্ত্ব দর্শনে তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

সালেমা আবদুল হকের জন্য জামিনস্বরূপ দশ হাজার টাকার জামিননামা লিখিয়া আবুল ফজলকে প্রদানের জন্য আজিজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি আজিজাকে লিখিলেন :—

"প্রিয়তম ভগিনি! অপরিচিতা ভ্রাতৃবধূর প্রীতি-সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আপনার মত মহীয়সী মহীলার সহিত সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই। ভ্রাতার মুখে ভগিনীর যে উচ্চ প্রশংসা, তাহা শুনিলে ভ্রাতৃবধূ কেন, একান্ত নির্লিপ্তারও হিংসা হয়। ভাগ্যবান্ তিনি, এমন উচ্চপ্রকৃতির রমণী-রত্ন যাঁহার সহধর্ম্মিণী।

ভগিনীপতিকে সামান্য একটী চাকরী দেওয়া উপলক্ষে সামান্য দশ হাজার টাকা জামিনের জন্য ভ্রাতা ত ভাবিয়াই অস্থির!—ভগিনীপতির অসমর্থতার দোষে ভগিনীকেই বা জামিন গ্রহণ করিতে হয়, এই আশঙ্কায় মহা বিপর্য্যস্ত! তাই বিপদাপন্ন ভ্রাতাকে বিপন্মুক্ত করার জন্য অগত্যা দীনা ভ্রাতৃবধূই সে ভার গ্রহণ করিল। আশা করি, প্রতিদান স্বরূপ

ভ্রাতৃবধূকে স্নেহাশীর্ব্বাদ এবং যখন আলিনগরে কিংবা কুসুমপুরে আসিবেন, তখন একটীবার দেখা দিয়া কৃতার্থ করিতে ভুলিবেন না।

আপনার পুত্রগণে আমার শত শত স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। আর আপনার স্বামীকে—যিনি অমন গুণবতী পত্নী থাকিতেও আবার—থাক, আর কাজ নাই!—ভ্রাতৃবধূর চপলতা ক্ষমা করিয়া আপনাদের কুশল জানাইবেন। ইতি প্রীতি-প্রার্থী—সালেমা।"

সালেমার পত্র পড়িয়া আবদুল হক ও আজিজা উভয়েই মুগ্ধ হইলেন। আবদুল হক বলিলেন,—"ধন্য ইহাদের দাম্পত্য-জীবন! এইরূপ নর-নারীই জগতের অলঙ্কার।"

আজিজা সহাস্যে বলিলেন,—"আর আমরা?"

আবদুল হক। তুমি অবশ্যই; কিন্তু আমি সে দাবীর যোগ্য নহি।

আজিজা। কেন, আপনার আবার কি হইল?

আবদুল হক। তোমার ও আমার পার্থক্য ঐ পত্রেই দেখ।

"থাক আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ক'রে কাজ নাই"—বলিয়া আজিজা অতি সংযত ভাষায় সালেমার পত্রের উত্তর দিলেন। তিনি লিখিলেন :—

"মাননীয় ভাবী সাহেবা! দীনা ভগিনীর শত শত আদাব ও সালাম গ্রহণ করুন। করুণহৃদয়া ভ্রাতৃবধূর অনুপম স্নেহ ও দয়ার পরিবর্ত্তে দরিদ্রা ভগিনী তাহার হৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা ভিন্ন আর কি নিবেদন করিবে?

যেদিন শুনিয়াছিলাম, আপনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াও স্বামীকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন, সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম, আপনি নারীকুলের অতুলনীয় রত্ন। আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম; আজ বু'ঝিলাম, ভাইজান মহা ভাগ্যবান্—যেহেতু আপনি দেশমান্য স্বামীর যোগ্যতম সহধর্ম্মিণী! ইহা অপেক্ষা আর কি উচ্চ প্রশংসা করিব?

আপনাদের দয়া, আপনাদের করুণার কথা জীবনেও ভুলিতে পারিব না। ইহার প্রতিদান নাই। যদি থাকে, তাহা খোদাতালা আপনাদিগকে প্রদান করুন। আপনাদের জীবন আনন্দময় হউক।

ভ্রাতার নিকট আবার ভ্রাতৃবধূর জামিন কিসের? ভাইজানের নিকট ইহা পাঠাইয়া আপনার আদেশ পালন করিলাম মাত্র।

আলিনগরে আসিলেই খেদমতে উপস্থিত হইব। মনের উচ্চ কল্পনা-গুলি মুছিয়া ফেলিয়া এক সাধারণ পল্লী-রমণীর কৃতজ্ঞতা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

ভাইজানের খেদমতে আমার শত শত ভক্তিপূর্ণ আদাব ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবেন এবং আপনার পুত্ররত্নটীকে আমার প্রাণভরা স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবেন! ক্রটী ক্ষমা করিবেন। ইতি— চিরানুগত—আজিজা।"

আবদুল হক আজিজার ভাষার বান্ধনী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পত্র ও জামিননামা আবুল ফজলের নামে প্রেরিত হইল।

আবুল ফজল পত্র পাইয়া সালেমাকে সহাস্যে বলিলেন,—"তোমার দুষ্টামি আজিজাকে পর্য্যন্ত গিয়া আঘাত করিয়াছে?"

ফুল্লমুখী সালেমা পত্রখানি পড়িয়া সুমধুর হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলিলেন,—"আপনার ন্যায় পরাজিত অরিকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করার চেয়ে এরূপ একটী জীবন্ত শত্রুকে আঘাত করায় বেশ আনন্দ আছে।"

আবুল ফজলও হাসিয়া বলিলেন,—"কিন্তু এরূপ বীরাঙ্গনার আনন্দ যে অনেকের কাছে উপদ্রব হইতেও ভীষণ! বেচারী সমীরন ত অস্থির। তবে এবার বোধ হয়, যোগ্য পাত্রের হাতে পড়েছ।"

স্বামী-স্ত্রী রহস্যালাপে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে থাকুন। আমরা ততক্ষণ নিজ কাজে গমন করি।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মক্ষেত্রে।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকে! আমাদের আখ্যায়িকার ঘটনা-প্রবাহ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কেবল কল্পজগতের বৈচিত্রময়ী মনোমুগ্ধকর ক্ষণস্থায়ী ছায়াচিত্র প্রদর্শনের ইচ্ছা হইলে আমরা এইখানেই এই দৃশ্য-পটের যবনিকা নিপাতিত করিতে পারিতাম এবং চিত্রকলার হিসাবে তাহাই বোধ হয় সমধিক মনোরম হইত। কারণ কাহারও নিকট কোন নির্জ্জন কক্ষে একটী পূর্ণ যুবতী সৌন্দর্য্যময়ী কামিনীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তা-ধীন ভাবে উপস্থিত করা অপেক্ষা, কোন অগম্য গবাক্ষ-পথে সেই সুন্দরীর সুষমাদীপ্ত মুখখানি অসম্পূর্ণ ভাবে প্রদর্শন করা যেমন অধিক মনোহর, সেইরূপ কাব্যজগতে কোন নায়ক-নায়িকার আদি অন্ত জীবনতত্ব না দেখাইয়া তাঁহাদের জীবনের সার-সম্পদ্ ও শোভা-সৌন্দর্য্যটুক জীবনের কোন সন্ধিক্ষণে প্রদর্শন করাই অধিক চিত্তস্নিগ্ধকর! কিন্তু আমরা যখন সংসার-চিত্র আঁকিতে বসিয়াছি, একদল সুশিক্ষিত নর-নারীর দ্বারা সমাজের একটী পূর্ণ উন্নত আদর্শ সৃষ্টি করিবার কল্পনা লইয়া লেখনি ধারণ করিয়াছি, তখন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া নায়ক নায়িকার সংসার-জীবনের শোভা-সৌন্দর্য্যের মিলন-সেতু ছাড়াইয়া আরও একটু অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাতে যদি এ ঘটনাপ্রবাহ কোন বিশুষ্ক মরুভূমে কিংবা কোন দুর্গম কণ্টক বনে যাইয়াও নিঃশেষিত হয়, আমরা নিরূপায়! কারণ কাব্যকলার ক্ষণস্থায়ী চঞ্চল সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করার পরিবর্ত্তে সমাজে উচ্চ আদর্শ সৃষ্টি করাই ইহার প্রধানতম উদ্দেশ্য।

আবুল ফজল সালেমা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ জমিদারীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া দেশ ও সমাজের নানা হিতকর কার্য্য করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় সমস্ত সদনুষ্ঠানেই তাঁহার নাম সগৌরবে সংযোজিত হইল—সর্ব্বত্রই তাঁহার যশঃ ও খ্যাতি উচ্চরবে উচ্চারিত হইতে লাগিল।

কিন্তু এই সমস্ত সাংসারিক ব্যাপারে বিশেষরূপে বিজড়িত হইয়াও আবুল ফজলের বিদ্যোৎসাহ প্রদমিত হইল না। তিনি ভাষাতত্ত্বে এম-এ পাস করিয়া অন্যান্য বিষয়েও এম-এ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু একদা প্রিয়পত্নী সালেমার বিদ্রূপে আর কতকগুলি পাসের মালা গাঁথিয়া গলায় পরিবার অসারতা উপলব্ধি করিয়া তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন। ডিগ্রি-লাভের বিধিবদ্ধ পাঠ ত্যাগ করায় তাঁহার নিকট বিশ্ব-সাহিত্যের বিমল রসাস্বাদনের সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি এখন হইতে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন-বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক অমূল্য গ্রন্থরাজি আনাইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিশ্বজগতের প্রথিতনামা জ্ঞানসমুদ্র-মন্থনকারী মহামনস্বীদিগের আজীবন সাধনা-সঞ্চিত রত্নরাজির সহিত তাঁহার পরিচয় হইতে লাগিল; সেই জ্ঞানসমুদ্র-মথিত অমূল্য সুধাপানে তাঁহার জীবন ধন্য ও আত্মা কৃতার্থ হইল।

জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট আবুল ফজলের উপর অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে লাগিলেন; দেশ ও সমাজের হিতসাধন এমন কি, গূঢ় রাজ-নীতিক ব্যাপারেও আবুল ফজলের পরামর্শ লওয়া সাহেবের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। তিনি একপ্রকার জোর করিয়াই আবুল ফজলকে জিলাবোর্ডের বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিলেন। এবং জিলার অন্যান্য বে-সরকারী কার্য্যসমূহেও তাঁহাকেই মনোনীত করিতে লাগিলেন। ইহাতে সমস্ত জিলায় আবুল ফজলের প্রভাব

প্রতিপত্তি যেরূপ বাড়িয়া উঠিল, সেইরূপ অন্যদিকে যে সমস্ত অকর্ম্মা, অজ্ঞ ও হতভাগা ক্ষীণজীবীর দল গোলে গোজামিল দিয়া কোনমতে মান রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি গুরুতর রূপে বিনষ্ট হইয়া গেল। দিনমণির প্রখর কিরণমালার সম্মুখে তারকার ম্লানজ্যোতি ও খদ্যোতের ক্ষীণদীপ্তি কতক্ষণ প্রতিভাত হইতে পারে? সুতরাং অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি সর্ব্বসাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া জিলার সর্ব্ববাদিসম্মত নেতা রূপে বরিত হইলেন।

আবুল ফজলের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ও উদার অন্তঃকরণবিশিষ্ট যোগ্যতম ব্যক্তি সমাজের নেতৃপদে বরিত হওয়ায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতি ও সমাজের ভাগ্য-গগনে অনুদিন সৌভাগ্যের উজ্জ্বল অরুণিমা প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশের সর্ব্বত্র—এমন কি, পল্লীর প্রতি কেন্দ্রে শিক্ষালয় সংস্থাপিত হইল; দেশের প্রত্যেক দুর্গম ও সুগম স্থানে রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ ও পুকুর পুষ্করিণী খনিত হইয়া লোকের উৎসাহ, উদ্যম, চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বাস্থ্য-সম্পদ অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দেশের প্রতি কেন্দ্রে এক উৎসাহের অপ্রতিহত জোয়ার বহিতে লাগিল এবং সেই জোয়ারের সঞ্জীবনী শক্তিস্পর্শে পল্লীলক্ষ্মীর নিরানন্দ মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল; নির্জ্জীবতার তাপতপ্ত বঙ্গীয় মরু-প্রান্তরে সজীবতার শান্ত স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত হইল।

কিন্তু একটী জিলার মধ্যে সীমাবদ্ধ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আবুল ফজল তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিশ্বব্যাপ্ত বিরাট্ হৃদয়ে যে অপরিসীম আশা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল, তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভার সহিত যে সমস্ত অদম্য কল্পনা জড়িত ছিল, তাহাতে এই ক্ষুদ্র কার্য্যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে কেন? তিনি অহরহঃ চিন্তা করিতেন, কেমন করিয়া আমার স্বজাতির অন্তঃকরণে

তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার বীজ নিহিত করিব? যদিই বা নিক্ষেপ করা যায়, এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত সহায়-সম্পদ্‌শূন্য জাতির মরু-ভূমিতুল্য শুষ্ক হৃদয়ে সে বীজ অঙ্কুরিত হইবে কি? এ আত্মবিস্মৃত জাতি আর কি তাহার পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিতে পারিবে? আর কি এ দুর্ভাগ্যতমসাচ্ছন্ন জাতির ভাগ্য-গগনে সৌভাগ্যের অরুণ-আভা ফুটিবে?

অনেক দিন চিন্তার পর আবুল ফজল স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, মোসলমান কেন জাগিবে না? যুগযুগান্তের আত্মাহীন মৃত জাতি শ্মশানভস্মের মধ্য হইতে গাঝাড়া দিয়া উঠিতেছে; তাঁহাদের জাতীয় জীবনের, তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের চিহ্নমাত্র নাই, তবু তাঁহারা দমিতেছেন না; তাঁহারা অসীম উৎসাহে জাতীয় কীর্ত্তিকলাপের অনন্তকাল বিলুপ্ত সমাধিভূমি খনন করিয়া ক্ষীণ অবলম্বনগুলিরও অনুসন্ধান করিতেছেন; একখানি মাত্র পাথর বা একখণ্ড মাত্র ইষ্টক ও কাষ্ঠ পাইলেই তাহাতে ভর দিয়া জাতীয়তার ভিত্তি পত্তন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পক্ষান্তরে চিরপ্রত্যাখ্যাত চির-অবজ্ঞাত যে সমস্ত জাতির ভবিষ্যতের কোনই আশা ছিল না, তা'রাও আজ কেবল বর্ত্তমান জগতের আদর্শ অনুসরণ করিয়া উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে। আর মোসলমান? মোসলমানের কি না আছে? তাঁহার নয়নযুগল আলস্যের তন্দ্রাস্পর্শে অভিশপ্ত হইলেও চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয় নাই। জীবনীশক্তির সামান্য সঞ্চালনে, জাতীয়তার কয়েকবিন্দু মাত্র সলিলপ্রক্ষেপেই তাঁহার এ ঘোর কাটিয়া যাইতে পারে। তারপর তাঁহার অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয় কোরান আছে; অতুলনীয় সঞ্জীবনী শক্তিপূর্ণ হাদিস আছে, কোরান হাদিস রূপ জ্ঞান-তত্ত্ব-নীতি-সমুদ্র মথিত অমিয়পূর্ণ ফেকা আছে; বিশ্বসাহিত্যের অতুলনীয় রত্ন সদৃশ তাঁহার আবিষ্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে; আর আছে তাঁহার জাতীয় জীবনের সমুজ্জ্বল ইতিহাস,—যাহা প্রাচীন জাতির মধ্যে কেবল তাঁহারাই

আছে। আর আছে, বিশ্ববক্ষে তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্য ও কীর্ত্তি-কলাপের অলৌকিক ও লোকচমকিত নিদর্শনসমূহ। সুতরাং একটু চেষ্টা করিলেই যে এ জাতির জাতীয় অভ্যুত্থান হইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে?

কিন্তু তথাপি কিরূপে জাতীয় অভ্যুত্থান সম্ভবপর, আবুল ফজল তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, 'ইস্‌লাম' অর্থ শান্তি। ইস্‌লাম আসিয়াছে জগতে শান্তি বিলাইতে। কিন্তু ইস্‌লাম শান্তি বিলাইবে কি? ইস্‌লাম-ভক্তগণ নিজেরাই যে অশান্তির অনলে পুড়িয়া মরিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ, মোসলমান সম্পূর্ণ ইস্‌লামী শিক্ষা হারা হইয়াছে; তাই তাঁহাদের এ দুর্গতি; তাই তাঁহাদের এ অধঃপতন; তাই নানা অনাচার-অত্যাচারে তাঁহারা অভ্যস্থ—নানা পাপে তাঁহারা জর্জ্জরিত। অতএব যদি আবার মোসলমান জাতিকে ইস্‌লামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়,—ইস্‌লামের বিশ্বহিতকর জাতীয় শিক্ষার বিদ্যুৎপ্রবাহ তাঁহাদের অন্তরমধ্যে ঢালিয়া দেওয়া যায়, তবে আবার মোসলমান জাগিয়া উঠিবে; আবার তাঁহারা বিশ্বের সমস্ত জাতিকে নিজেদের বিশ্বব্যাপ্ত বিরাট ক্রোড়ে স্থান দিয়া জগতে শান্তি বিলাইতে পারিবে। কিন্তু তাঁহাদিগকে ইস্‌লামী শিক্ষায় শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করা যাইবে কিরূপে? অনন্তর তিনি বহু চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে শিক্ষালয় স্থাপনপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও জাতীয় ভাবপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রদান করিতে পারিলেই আবার সমাজের জাতীয়তা ও আত্মবোধ জাগিয়া উঠিবে। এই চিন্তার ফলে তিনি আলিনগরে একটী আদর্শ পল্লী-কলেজ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়া সালেমার সহিত কুসুমপুরে গমনপূর্ব্বক আশরফ ও আবদুল হকের নিকট স্বীয় ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন এবং সতীশের মত জানিবার জন্য তাঁহার নিকট পত্র লিখিলেন।

আশরফ এই সময়ে বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি ফরিদপুরে থাকিয়া প্রাক্‌টিস করিতেন; এবং হাতে কাজকর্ম্ম না থাকিলেই সমীরনের আগ্রহে কুসুমপুরে আসিয়া বাস করিতেন।

এদিকে আবদুল হক ম্যানেজারী প্রাপ্ত হইয়া মহোৎসাহে কুসুমপুরে গমন করেন। কার্য্যগ্রহণের পরেই তিনি দুই তিন সহস্র টাকা 'নজর' প্রাপ্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে আইন পরীক্ষা পাস করিয়া ফেলেন। জমিদারী কার্য্যে তাঁহার প্রতিভা অনুদিন স্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত জমিদারী-সেরেস্তার অভিনব শৃঙ্খলা বিধান করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তথায় আজিজা ও সোফিয়াকে লইয়া আসিলেন।

আজিজা ও সোফিয়া ইতিপূর্ব্বে আলিনগরেই ছিলেন। আলিনগরেই সালেমার সহিত আজিজার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উভয়ের গুণগরিমায় উভয়েই মুগ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে সহোদরা তুল্য ভালবাসিয়া ছিলেন। যাহা হউক, আশরফ ও আবদুল হক্ কেহই আবুল ফজলের পল্লীকলেজ স্থাপনের কল্পনা সমর্থন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা সমবেত ভাবে মত প্রদান করিলেন, পল্লীগ্রামে এরূপ কলেজ স্থাপন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত এমন কি, সর্ব্বস্বান্ত হইবারও বিশেষ আশঙ্কা আছে।

আশরফ ও আবদুল হকের মন্তব্যে আবুল ফজল কথঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইয়া বাড়ীর মধ্যে গমনপূর্ব্বক সালেমার নিকট স্বীয় হৃদয়ের কথা জানাইলেন। সালেমা স্বামীর সহিত গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিলেন।

আবুল ফজল বলিলেন,—"প্রিয়তমে! তুমি যে আমার ইচ্ছার বিরোধী হইবে না, তাহা জানি; কিন্তু আমার এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া যদি তোমার সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া ফেলি, তখন কি মনে করিবে?"

সালেমা বলিলেন,—"আমার সম্পত্তি নষ্ট করিবেন? কেন, সম্পত্তি কি আপনার নহে?"—অলক্ষ্যে সালেমার প্রফুল্ল মুখখানি একটু ভারি হইল।

আবুল ফজল তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সস্নেহে বলিলেন, "প্রিয়তমে! আমি ত অন্যায় কথা কিছুই বলি নাই, তুমি অসন্তুষ্ট হইতেছ কেন? সম্পত্তি আমারই না হয় হইল; কিন্তু আমার সম্পত্তি কি তোমার নহে? তোমার আমার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?"

সালেমা মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া ফুল্লমুখে সকরুণ প্রেমপূর্ণ মধুর দৃষ্টি পতির মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"জীবনসর্ব্বস্ব! তাহা হইলে কেবল তুচ্ছ জড় সম্পত্তি কেন? আমিও ত আপনারই এক ক্ষুদ্র সম্পত্তি! আমি এবং আমার দেহ-মন ও ধনসম্পদ যাহা কিছু আছে সে সমস্তই ত আপনার; ইহাই ত আমার বিশ্বাস। আপনার সম্পত্তি আপনি ব্যয় করিবেন, তাহার আবার জিজ্ঞাসা কি? আপনি পার্থক্যের কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু মনে করিয়া দেখুন, আপনিই এ দাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, স্ত্রী স্বামীর অংশবিশেষ; খোদাতালা আদি পিতা আদমের দেহাস্থি হইতেই আদি জননী হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আপনার সে কথা যদি সত্য হয় এবং স্বামি-স্ত্রীর যদি ইহাই সম্বন্ধ হয়, তবে উভয়ের মধ্যে কতটা পার্থক্য থাকিতে পারে, তাহা আপনিই ভাবিয়া দেখুন।"

আবুল ফজল সপ্রেম আবেগে সালেমার কপোলদেশ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"প্রিয়তমে! সে কথা একটুও মিথ্যা নহে; কিন্তু তথাপি সংসারজীবনে স্বামি-স্ত্রীর একটা স্বতন্ত্র স্বার্থ—একটু স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এবং সেটুকু রক্ষা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। তাই বলিতেছিলাম, আমার কোন কার্য্যে যদি তোমার মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কারণ থাকে, তবে সে কার্য্যে আমাকে বিশেষ বিবেচনার সহিত হস্তক্ষেপ করাই উচিত।"

সালেমা—"আপনার কার্য্যে—বিশেষতঃ এমন দেশহিতকর মহৎ কার্য্যে আমি অসন্তুষ্ট বা প্রতিবন্ধক হইব, আপনার এ বিশ্বাস এখনও আছে ?"

আবুল ফজল সহাস্যে বলিলেন,—"এখন নাই বটে, কিন্তু একদিন ছিল ত !"

সালেমা দীনতাপুর্ণ দৃষ্টির সহিত কাতর ভাবে উত্তর করিলেন, "নিষ্ঠুর ! একদিন আপনার চরণে অপরাধ করিয়াছিলাম ; কিন্তু হৃদয়বান্ আপনি আজও তাহা ভুলিতে বা সে অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন নাই।"

আবুল ফজল সালেমাকে বাহুবদ্ধ করিয়া সস্নেহে বলিলেন,—"ভয় নাই সালেমা ! আমার স্মরণশক্তি তত প্রবল নহে যে, সে অপরাধগুলিকে চিরতরে অন্তরে আঁকিয়া রাখিতে পারিব। তারপর এতকালের তামাদি অপরাধের শাস্তি হওয়াও আইনবিরুদ্ধ ; সুতরাং তোমার আশঙ্কার কারণ অতি অল্প !"

সালেমা—"এই বয়সেও তোতার বুলির মত বই মুখস্থ করিয়া পাসের মালা গলায় পরিবার সাধ যাঁহার একটুও কমে নাই, তাঁহার স্মরণশক্তি দুর্ব্বল বটে ! তবে তামাদি অপরাধের শাস্তি আইনবিরুদ্ধ, এই যা ভরসা। সে যাই হউক, আপনি আপনার ইচ্ছা সম্বন্ধে অন্য সকলের মতামত গ্রহণ করিয়াছেন ত ?"

আবুল ফজল। অন্য সকলের মধ্যে আবদুল হক, আশরফ ও সতীশ বাবুর মত জিজ্ঞাসা করিয়াছি। প্রথম দুই মহাত্মা ত ইহাকে অসম্ভব কল্পনা বলিয়া হাসিয়াই উড়াইয়াই দিয়াছেন। তৃতীয় মহাত্মার মত এখনও পৌঁছে নাই।

সালেমা। সাধে কি বলি যে, আর গোটা কতক পাসের টুপী মাথায় দিলে গুণ-গরিমা বাড়িবার আশা অতি অল্প। যে মহাত্মাদিগকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন, তাঁহারা যে অনেকাংশে আত্মাহীন মহাত্মা! তাঁহাদিগকে যদি স্ব স্ব আত্মাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া মত দিতে বলিতেন, বোধ হয় অনুকূল মতই পাইতেন।

আবুল ফজল বলিলেন,—"গুরুতর ভুল বটে! কিন্তু এ ভুল আমার দ্বারা সংশোধন হওয়া সম্ভব নহে। দয়া করিয়া তুমি যদি—" পার্শ্বস্থ পর্য্যঙ্কের উপর দম্পতির সর্ব্বোত্তম রত্ন পঞ্চম বর্ষীয় শিশুপুত্র ফজলর রহমান ও এক বৎসর বয়স্কা কন্যা রোকেয়া শায়িতা ছিল। শিশু ভ্রাতার হাতের আঘাত লাগিয়া রোকেয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন সালেমা ব্যস্ততার সহিত "আচ্ছা দেখা যাইবে"—বলিয়া পর্য্যঙ্কের উপর গমনপূর্ব্বক কন্যাকে দুগ্ধ দান করিয়া তাঁহার ক্রন্দন থামাইলেন, এবং সতর্কতার সহিত পুত্রের হাত ধরিয়া একটু সরাইয়া শোয়াইলেন। কিন্তু তাহাতেই শিশুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং শয্যা ছাড়িয়া শায়িতা জননীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতার কোলে গিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মধুর অপত্যস্নেহে উভয়ে সব কথা বিস্মৃত হইলেন।

* * * * *

আশরফ গৃহে গিয়া সমীরনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"শুন তোমার ভ্রাতৃবরের অদ্ভুত কল্পনা?"

সমীরন—"আমার ভাইজান অদ্ভুত কল্পনা করেন না।"

আশরফ। না ছি; পল্লীগ্রামে কলেজ করার কল্পনাটা নিতান্ত সদ্ভুত বটে!

সমীরন। এতেই আপনার এরূপ বুদ্ধিভ্রম! তিনি ইচ্ছা করিলে হেলায় দুই একটা কলেজ স্থাপন করিতে পারেন।

আশরফ। হাঁ, এই ভগ্নী যেমন কথায় কথায় ভাইকে স্বর্গে তুলিয়া ধরিতে পারেন। মাফ করো সমীরন! জমিদার-ভগ্নী বিবাহ করিয়া

জমিদার হওয়ায়, আর পল্লীগ্রামে কলেজ স্থাপন করিয়া জমিদারের অসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করায় আকাশ পাতাল পার্থক্য।

সমীরন। তা সত্য বটে; কিন্তু এদেশের অন্তঃসারশূন্য জমিদারদিগের সহিত আমার ভ্রাতারও আকাশ পাতাল পার্থক্য!

আশরফ। আমার অপেক্ষা ভ্রাতাকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছ; তিনি কি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

সমীরন। আমার নিকট না হউক, দেশের নিকট জাতির নিকট অবশ্যই।

আশরফ। বটে? পতিনিন্দা! অমার্জ্জনীয় অপরাধ!

"অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দিন্,—" বলিয়া আনন্দময়ী চঞ্চলা সমীরন পতির বাহুলীন হইলেন। প্রেমমুগ্ধ আশরফ সহস্র চুম্বনে সমীরনকে আকুল করিয়া তাঁহার চপলতার শাস্তি প্রদান করিলেন।

* * * * *

সতীশ প্রভাত-নলিনীকে আবুল ফজলের পত্রের মর্ম্ম জানাইলেন। নলিনী সহাস্যে বলিলেন,—"এটা নেহাত পাড়াগেঁয়ে কল্পনা! পাড়াগাঁয়ে থেকে তোমার বন্ধুবরের বুদ্ধিখানা নেহাত মোটা হয়ে গিয়েছে।"

সতীশ। মোটা হ'তে পারে; কিন্তু শহরের সূক্ষ্ম বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা হ'তে ইহার মাধুর্য্য অনেক অধিক।

নলিনী। শহর সম্বন্ধে ভগিনীর সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা ক্রমে দেখ্‌ছি, ভ্রাতার উপর অতি মারাত্মকরূপে সংক্রামিত হচ্ছে।

সতীশ। তা হোক; কিন্তু তোমার মধ্যে না হলেই মঙ্গল।

নলিনী। আচ্ছা ওসব এখন থাক্। ফজলু সাহেবের প্রস্তাবে তোমার মত কি?

সতীশ। আমি ত আগে তোমার মতই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

নলিনী। শহরের সূক্ষ্ম মত পছন্দ হইবে ত?

সতীশ। গ্যারান্টি দেওয়াটা সম্ভব নহে।

নলিনী। কেন ভয় কি? এত আর ডেপুটী বাবুর কাছে জামীন-নামা দেওয়া নহে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

সতীশ। তুমি ভারি সময় নষ্ট কর।

নলিনী। বেশ, তবে এখন কোর্টে যাও। আমার কাছে সময়ের ফিস পাওয়ার আশা অতি কম।

সতীশ নলিনীর দুই হাত ধরিয়া বলিলেন,—"দুষ্টামী ত্যাগ করে কি লিথ্‌ব তাই বল।"

নলিনী সহাস্যে বলিলেন,—"হাতে শৃঙ্খল দেওয়া কেন? এ যে ওকালতী ছেড়ে দারোগা বাবুর স্বীকারোক্তি গ্রহণ-প্রণালী!"

সতীশ। পাত্রানুযায়ী ব্যবস্থা! যেখানে যেমন আবশ্যক।

নলিনী। আচ্ছা বেশ, তাঁহার কল্পনাটীর গুরুত্ব এবং আয় ব্যয়ের বিরাট্ ব্যাপারগুলি বুঝাইয়া চিঠি লেখ। আর লিখিয়া দাও, এরূপ দেশহিতকর কার্য্যে আমাদের সহানুভূতির অভাব নাই। বিশেষতঃ তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

সতীশ ঠিক ঐ কথাগুলিই বিশ্লেষণ করিয়া লিখিলেন।

* * * * *

আবদুল হকের নিকট আজিজা সমস্ত কথা অবগত হইয়া বলিলেন, "আপনাদের মনের দুর্ব্বলতা এখনও দূরীভূত হয় নাই। এরূপ মহৎ কার্য্যে প্রতিকূল মত প্রদান করিয়া আপনারা কি ভাল কাজ করিয়াছেন? আর ইহা অসম্ভবই বা কেন। প্রথমে কোন গুরু কার্য্যই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আন্তরিক সদুদ্দেশ্য এবং দৃঢ় আন্তরিকতা থাকিলে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

আবদুল হক। কিন্তু কার্য্যটী কত গুরুতর তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। এরূপ বিরাট্ কার্য্যে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে জমিদারীতে অতি অল্প টাকাই সঞ্চিত আছে। এ অবস্থায় এরূপ বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কি সঙ্গত?

আজিজা। সব সময়ে সঙ্গত অসঙ্গত ভাবিতে গেলে কাজ করাই চলে না। তারপর একের পক্ষে যাহা অসম্ভব, দশজনে মিলিয়া করিলে তাহা সহজ ও সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। বিশেষতঃ ইহা দেশের কাজ; দেশবাসীরাও ত ইহার আংশিক ব্যয়ভার বহন করিবে। আপনারাও এ কার্য্যে ভাইজানকে দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সাহায্য করিতে পারিবেন।

আবদুল হক ত্রুটী স্বীকার করিয়া বলিলেন,—"আমরা এতটা চিন্তা করিয়া দেখি নাই। পুনশ্চ দেখা হইলে এ সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিব।"

আজিজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইহার দুই তিন পরেই তিনি সালেমা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া জমিদার-বাড়ী গমন করিলেন। সমীরনও নিমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন। পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপনে তাঁহারা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিলেন। আজিজা আবুল ফজলের কলেজ স্থাপনের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সালেমাকে বিশেষ ভাবে উত্তেজিত করিলেন। সালেমা সহাস্যে বলিলেন,—"ভ্রাতা ভগিনীরা যখন একমত, তখন ভ্রাতৃবধূ তাহার বিরোধী হইবে না। কিন্তু আপনাদের অনুরোধে একার্য্য করিলে আপনারা আমাকে কি পুরস্কার দিবেন?"

আজিজা। আপনি যে অতুলনীয় অনুপম পুরস্কার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহাই এ কার্য্যের চরম পুরস্কার।

সালেমা। ও সব পুরাতন পুরস্কারের আর কত কাল গৌরব করিবেন? নূতন কি দিবেন, তাই বলুন?

আজিজা—"আপনি যা চান, তাই দিব।"

সালেমা—"সাত রাজার ধন আর এক রাজকন্যা যদি চাই।"

আজিজা সহাস্যে বলিলেন,—"তাই দিব।"

সালেমা হাসিমুখে আজিজার দশমবর্ষীয় প্রফুল্ল পুষ্পতুল্য পুত্ররত্ন আবদুল আজিজের প্রতি স্নেহভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা যথাসময়ে প্রার্থনা করিব।"

সমীরন সুমধুর হাসির লহর তুলিয়া শিশু রোকেয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তবে আর উল্টা বোল কেন? বলুনই না যে, আমার এই রাজকন্যাটীর জন্য আপনার রাজপুত্রটীকেই আমি চাই।"

সালেমা সমীরনের উপর তীব্র কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেরী নাই; যদি রাজ-কন্যাই হয়, তবে তোমাকেও না হয় একটী রাজপুত্র জুটাইয়া দিব।" —সমীরন তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

আজিজার কোলে সালেমার পুষ্পপরাগরঞ্জিত নবনীতুল্য শিশু ফজলর রহমান আনন্দে খেলা করিতেছিল। তিনি মৃদু হাস্যে সমীরনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তবে আর জুটাইয়া দেবার ওজর কেন? সে শুভ কল্পনা পূরণের জন্য এই রত্নরূপী সাহেব-জাদাটীই ধরা থাকিল।"

লজ্জায় সমীরনের মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। উভয়ের রহস্যাঘাতে তিনি মুখ নত করিয়া গৃহান্তরে পলায়ন করিলেন। সালেমা ও আজিজা সমীরনকে অপ্রস্তুত করিয়া অনেকক্ষণ হাস্য করিলেন। অনন্তর সকলে বিদায় লইয়া নিজ নিজ আবাসে গমন করিলেন।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

ইস্‌লামিয়া কলেজ।

আজিজার পরোক্ষ এবং সালেমার প্রত্যক্ষ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আবুল ফজল এইবার তাঁহার কলেজ স্থাপনের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি অবিলম্বে আলিনগরে হাই স্কুল স্থাপনের কথা ঘোষণা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সালেমা এই কার্য্যের জন্য ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা হইতে দশ হাজার টাকা স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। আবুল ফজল ঐ টাকার দ্বারা আলিনগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আলমডাঙ্গা ঝিলের উত্তরের সুবিধাজনক উচ্চ-সমতল ভূমির একশত বিঘা জমি ক্রয় করিলেন। তাঁহার নির্দ্ধারিত একশত বিঘা বেষ্টনীর মধ্যে যাহার যাহার জমি পতিত হইল, তাহারা সকলেই উপযুক্ত মূল্য লইয়া আবুল ফজলকে আনন্দের সহিত জমি প্রত্যর্পণ করিল। ঐ সীমানার মধ্যে বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিন সাহেবের দশ বিঘা পরিমাণ একখণ্ড জোত ছিল। তিনি ইদানীং আবুল ফজলের এমন 'গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ঐ জোত খণ্ড তাঁহাকে বিনামূল্যেই প্রদান করিলেন। আবুল ফজল কৃতজ্ঞতার সহিত বড়মিঞা সাহেবের সাহায্য গ্রহণ করিলেন এবং সেই বৎসরের মধ্যেই বিরাট্ করোগেট আয়রনের আটচালা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্কুল খুলিয়া দিলেন। স্কুলের নাম "ইসলামিয়া হাই স্কুল" রাখা হইল।

আবুল ফজল স্বয়ং হেড্‌মাষ্টারের কার্য্য করিবেন বলিয়া প্রচার করায় চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে ছাত্র আসিয়া জুটিতে লাগিল। সুতরাং তিনি বহু শত টাকা খরচ করিয়া স্কুল স্থাপনের পর বৎসরই স্কুল মঞ্জুর করাইয়া

লইলেন। বিদেশী ছাত্রগণের অবস্থান জন্য বিরাট্ ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইল। দরিদ্র ও অসমর্থ প্রতিভাশালী ছাত্রদিগের জন্য তিনি জমিদারী হইতে বহুসংখ্যক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিলেন। যাহাতে শিক্ষা ত্রুটীশূন্য ও সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য তিনি পাঁচ জন বিচক্ষণ মোসলমান এবং চারিজন বহুদর্শী হিন্দু গ্রাজুয়েটকে সহকারী শিক্ষক রূপে গ্রহণ করিলেন। হিন্দুদিগের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একজন প্রবীণ কাব্য-রত্নাকর, সাধারণ বাঙ্গলা শিক্ষার জন্য দুইজন নর্ম্মাল পরীক্ষোত্তীর্ণ পণ্ডিত এবং মোসলমান ছাত্রগণের ধর্ম্ম ও দ্বিতীয় ভাষা আরবি, ফারসী শিক্ষার জন্য একজন ফারসীর এম-এ, ও দুইজন মাদ্রাসা পাস 'হাদিসজ্ঞ' 'মোহাদ্দেস' নিযুক্ত হইলেন। আরবি অধ্যাপকগণের মধ্যে আবুল ফজলের ভগ্নীপতি মওলানা খোন্দকার আতাওর রহমান অন্যতম। এই সমস্ত যোগ্যতম অধ্যাপক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে আবুল ফজলকে প্রথম দুই বৎসর কয়েক সহস্র টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। কিন্তু তৃতীয় বৎসর ছাত্রসংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে, কেবল ছাত্রবেতনেই স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। স্কুলের জন্য আরও দুইখানি বিরাট্ গৃহ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা অনুমিত হইল।

এইরূপ অপরিমিত ছাত্রবৃদ্ধির প্রধান কারণ—স্কুলের ত্রুটীহীন শিক্ষা। স্কুল হইতে যত ছাত্র শেষ পরীক্ষা দিতেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই সগৌরবে উত্তীর্ণ হইতেন। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে অবস্থানের খরচও যথেষ্ট কম ছিল। বালকগণের চরিত্র বিকৃত হইবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। এই সমস্ত নানা কারণে দিন দিন স্কুলের অবস্থার আশাতীত উন্নতি হইতে লাগিল। পঞ্চম বৎসরে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় সহস্র পূর্ণ হইয়া আসিল; কারণ নিকটবর্ত্তী জোড়াতাড়া দেওয়া কয়েকটী হাই স্কুল ভাঙ্গিয়া উহার সমস্ত ছাত্রই আলিনগরে সমবেত হইল। সুতরাং এখন

হইতে প্রতি বৎসর যে শতাধিক ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ রহিল না।

স্কুল স্থাপনের ষষ্ঠ বৎসরে প্রকৃতই একশতাধিক ছাত্র আলিনগর স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তন্মধ্যে সৈয়দ আবদুল হকের পুত্র সৈয়দ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সকলকেই চমকিত করিলেন। আবদুল আজিজ গৃহে বিমাতা সোফিয়ার নিকট পড়িয়া স্কুল স্থাপনের দ্বিতীয় বর্ষে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। জননী আজিজার প্রতিভা ও গাম্ভীর্য্য, পিতা সৈয়দ আবদুল-হকের তেজস্বিতা এবং বিমাতা সোফিয়ার সুমার্জ্জিত রীতি-নীতি ও সুরুচি একাধারে এই শিশুরত্নের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। তদুপরি আবুল ফজলের সযত্ন শিক্ষা এই বালককে প্রোজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ করিয়া তুলিয়াছিল। সালেমা আবদুল আজিজকে প্রাণোপম ভালবাসিতেন এবং আজিজা কিংবা সোফিয়া আলিনগরে না থাকিলে তাঁহাকে নিজের নিকট নিয়া রাখিতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ব্যয়ভূষণ সমস্তই সালেমা প্রদান করিতেন।

আবদুল আজিজ যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর। এই সময়েই তাঁহার সহিত স্বীয় অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা রোকেয়ার বিবাহ দিবার জন্য সালেমা একান্ত আগ্রহান্বিত হইয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। আবুল ফজল ও আজিজা বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না ; তজ্জন্য তাঁহারা পরে বিবাহ হওয়া উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সালেমা বলিলেন,—"যাহা পরে হইবে, তাহা এখন হইলেই বা দোষ কি ? বাল্যবিবাহের একঘেয়ে নিন্দা এবং যৌবন-বিবাহের অন্ধ পোষকতা আজ কালকার একটা ফ্যাশন বিশেষ! সত্যতা ও অভিজ্ঞতার সংস্রব উহার মধ্যে খুব কম। যৌবন

বিবাহে যেমন কতকটা গুণ এবং কতকটা দোষও আছে। সেইরূপ বাল্যবিবাহে কোন কোন বিষয়ে একটু কুফল পরিদৃষ্ট হইলেও উহার সুফলও নিতান্ত কম নহে।”

সালেমার প্রস্তাব আফতাব-উদ্দিন মিঞা ও বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিন উভয়েই একান্ত আগ্রহের সহিত সমর্থন করায় আবুল ফজল বা আজিজা আর কোন আপত্তি করিলেন না। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

এই বিবাহের উদ্যোগ আয়োজনের মধ্যেই বড়মিঞা গিয়াসুদ্দিনের পুত্র মতিয়র-রহমান ইংলিস অনারে বি-এ পাস করিয়া বাড়ী আসিলেন। আজিজার অনুরোধে আবুল ফজলের ভাগিনেয়ী—মওলানা আতাওর রহমানের দ্বাদশ বর্ষীয়া পরমাসুন্দরী কন্যা জোহরার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ সুস্থির হইল এবং উভয় বিবাহের আয়োজনই এক সঙ্গে চলিতে লাগিল।

রাজ্যাভিষেকে উৎসবময়ী ফুল্লনগরীর ন্যায় পল্লী-রাণী আলিনগরের প্রফুল্ল শ্যামল বক্ষে কয়েকদিন ব্যাপিয়া আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল এবং সেই ফোয়ারা-উৎসারিত প্রমোদ-প্রবাহে চতুর্দ্দিকে বহুদূরব্যাপী প্লাবন হইল। মহা ধূমধামে আবদুল আজিজের সহিত রোকেয়ার এবং মতিয়র রহমানের সহিত জোহরার বিবাহ সম্পন্ন হইল। এই বিবাহ যুগলে দেশবাসী সকলেই আনন্দের অতলস্পর্শ কূপে নিমগ্ন হইলেন। বহু বহু দিন পরে—কত হর্ষ-বিষাদ অন্তে বড়মিঞা গিয়াসুদ্দিন ও আফতাব উদ্দিন মিঞা গভীর আন্তরিকতার সহিত প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন। উভয়ের চক্ষু হইতে অবিরল ধারে আনন্দাশ্রু নির্গত হইয়া উভয়েরই শ্বেত শ্মশ্রু ও শিথিল বক্ষ সিক্ত হইয়া গেল।

বিবাহকার্য্য সম্পাদনের পর আবুল ফজল মতিয়র রহমানের উপর স্কুলের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহার পল্লী-কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে

উদ্যোগী হইলেন। সালেমা এবারও স্বামীকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিলেন; এমন কি, তাঁহার পিতার সঞ্চিত নগদ অর্থসমষ্টির অতি অল্পই অবশিষ্ট রহিল। আজিজা আবদুল হকের দ্বারা জমিদারীর মধ্য হইতে বহু সহস্র টাকা চাঁদা তুলিয়া দিলেন। আশরফ, সমীরন, সতীশ ও নলিনী এবং তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনেরাও বহু অর্থ সাহার্য্য করিলেন। এইরূপে লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হওয়ায় আবুল ফজলের উৎসাহ ও উদ্যম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে সভা করিয়া অনলোদগারিণী বক্তৃতার বৈদ্যুতিক আকর্ষণী প্রভাবে দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি স্বীয় সঙ্কল্পের প্রতি আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। দেশে এক অবক্তব্য উত্তেজনা ও উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত হইল। বহু সহৃদয় যোগ্য ব্যক্তি আবুল ফজলের জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাণ-পণ চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমে এক বৎসরের মধ্যে একমাত্র ফরিদপুর জেলা হইতেই প্রায় দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইল।

আবুল ফজল কলেজ স্থাপনের জন্য একেবারে আত্মোৎসর্গ করিলেন। তিনি স্ত্রী-পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বাড়ীঘর সমস্ত ভুলিয়া সঙ্কল্প সাধনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হওয়ায় তিনি কার্য্য পরিচালনার্থ এক কমিটী গঠিত করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। বিরাট্ কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ইষ্টকাদি নির্ম্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য আবশ্যকীয় সরঞ্জাম সংগৃহীত হইতে লাগিল। আবুল ফজল এইবার বঙ্গের সমস্ত জেলা পরিভ্রমণ করিয়া অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। জীবনের অভাবনীয় সাফল্য এবং দেশহিতকর কার্য্যে গভীর আন্তরিকতা ও আত্মোৎসর্গের ফলে আবুল ফজল ইতিপূর্ব্বেই দেশবাসীর অনাবিল ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার খ্যাতিতে দেশ ভরিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি অতি অল্প আয়াসেই বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। দেশের শিক্ষিত হিন্দু মোসলমান ও জমিদারগণ আনন্দের সহিত অর্থ সাহায্য করিলেন।

অনন্তর আবুল ফজল প্রাসাদতুল্য বিরাট্ কলেজ-গৃহ ও সুবিস্তৃত ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে মঞ্জুরী গ্রহণপূর্ব্বক কলেজ খুলিয়া দিলেন। নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়া দেওয়ায় বহু সংখ্যক ছাত্র সমবেত হইল। আবুল ফজল স্বয়ং প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করিলেন। কলিকাতা কলেজের জনৈক খ্যাতনামা প্রোফেসারকে স্বীয় সহকারী পদে বরিত করিলেন। মতিয়র রহমান ও স্কুলবিভাগের সুযোগ্য শিক্ষকদিগের মধ্য হইতে কয়েকজনকে প্রোফেসর নিযুক্ত করিলেন। অন্যান্য আবশ্য-কীয় পদসমূহের জন্য উপযুক্ত লোকসকল নিযুক্ত হইল। কলেজের নাম রাখা হইল---"আলিনগর ইসলামিয়া কলেজ।"

আবুল ফজল কলেজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে সমস্ত অনুষ্ঠানের আবশ্যক, তাহার কিছুই বাকী রাখিলেন না। কলেজের সঙ্গে মোসলমান বালকদিগের থাকিবার জন্য ছাত্রাবাস পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইবার সতীশের বিশেষ অনুরোধে আবুল ফজল হিন্দু-ছাত্রাবাস স্থাপন করিলেন। সতীশ এই কার্য্যের জন্য আবুল ফজলকে তিন সহস্র টাকা সাহায্য করিলেন। অন্যান্য শিক্ষিত হিন্দুগণও প্রচুর সাহায্য করিলেন। ইহার পরে ক্রমে ক্রমে উদ্যান, সরোবর, লাইব্রেরী ও রাস্তাঘাটসমূহ নির্ম্মিত ও স্থাপিত হইতে লাগিল। আবুল ফজল এই সমস্ত বিরাট্ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সালেমার বস্ত্রালঙ্কার ও জমিদারী ভিন্ন আর প্রায় সমস্তই ব্যয় করিয়া জগতে স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।

পল্লীকলেজ স্থাপন আবুল ফজলের পার্থিব জীবনের এক প্রধান ব্রত ছিল। ইসলামিয়া কলেজ স্থাপনে সফলকাম হইয়া তাঁহার সেই ব্রত পূর্ণ হইল এবং এই একমাত্র দেশহিতকর কার্য্যেই তাঁহার সুনাম দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বঙ্গ-ভারত তথা সমগ্র সভ্যজগতে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রচারিত হইয়া পড়িল।

কলেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর একদা আবুল ফজল সালেমাকে সপ্রেম মৃদুহাস্যে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"প্রিয়তমে! জানি না তুমি আমার সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ কর। কারণ আমি চেষ্টা করিলে বোধ হয়, তোমার সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিতাম; তোমাকে ঐশ্বর্য্য ও গৌরব-শৈলের সমুন্নত সুখবিলাসপূর্ণ কিরীট-শীর্ষে স্থাপন করিতে পারিতাম; খোদার ফজলে ইহা আমার পক্ষে তদ্রূপ অসম্ভব ছিল না; কিন্তু তাহা না করিয়া আমি তোমার ধন-সম্পদের বিপুল অংশ স্বীয় অভিলষিত কার্য্য সাধনে ব্যয় করিয়াছি; তোমাকে ভোগের উচ্চ প্রাসাদ হইতে নামাইয়া ত্যাগের নিম্নতম ক্ষুদ্র কুটীরে স্থাপন করিয়াছি। প্রিয়ে! সত্য বল, তুমি এতদ্দ্বারা কখনও বিরক্ত হইয়াছ কি না? মনে কোন প্রকার দুঃখ অনুভব করিয়াছ কি না?"

সালেমার মাধুর্য্যমণ্ডিত ফুল্ল মুখখানিতে গাম্ভীর্য্যের স্পষ্ট আভা প্রতিভাসিত হইল। তিনি সকরুণ চক্ষু দুটী পতির পদপ্রান্তে স্থাপন করিয়া শান্ত কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"প্রিয়তম! আপনার দাসী সালেমার দেহ-মন সর্ব্বস্ব আপনার পবিত্র চরণে উৎসৃষ্ট হওয়া ভিন্ন আমার যদি অন্য কোন ব্রত ও আকাঙ্ক্ষা থাকে, আপনার মহান্ উদ্দেশ্যসমূহ সাধনে যদি আমার চিত্তে একটুও বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে নরকের কাল হুতাশনে জ্বলিয়া পবিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত যেন সে আত্মা পরকালে আপনার পদপ্রান্তে স্থান না পায়। ইহা অপেক্ষা কোন্ যোগ্য ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত

করিবার ক্ষমতা আমার নাই। জীবন-সর্ব্বস্ব! আপনার প্রতি আমি কি ভাব পোষণ করি, পার্থিব কিংবা আমার জ্ঞানগত পারলৌকিক কোন বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া আমি তাহা প্রকাশ করিতে পারিব না। আমি জানি না, স্বামীর দেশবিশ্রুত কীর্ত্তি অপেক্ষা স্ত্রীর নিকট আর কোন্ সম্পদ মূল্যবান্ হইতে পারে? নাথ! আপনার সাহচর্য্যে দাসীর জীবন যেমন ধন্য হইয়াছে, তেমনি আমার কোন ত্রুটীতে আপনার জীবন বিপর্য্যস্ত না হইলেই আমার জীবন সার্থক হইবে। প্রিয়তম! আমার ভোগ-বিলাস সমস্তই এখন আপনার স্নেহদৃষ্টি, আপনার বিমল প্রেম! এবং উহাই আমার জীবনের একমাত্র কাম্য। যদি আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও আমি এই কাম্যবস্তু হইতে বঞ্চিত না হই, ইহ-পরকালে আমার দেহ ধন্য এবং আত্মা কৃতার্থ হইবে।”

আবুল ফজল আবেগের মুখে সালেমার অন্তরের অভিব্যক্তি অবগত হইয়া—তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতা ও মহত্বের পরিচয় পাইয়া—স্পষ্টভাষায় তাঁহার অনাবিল ভক্তি ও গভীর প্রেমমূলক উক্তি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। তিনি গভীর আবেগে সালেমাকে বাহুবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—“প্রিয়তমে! এত হৃদয়-মহত্ব তোমার? এত গভীর প্রেম তোমার অন্তরে? আজ স্পষ্ট বুঝিলাম, তোমার মত ভাগ্যবতী ও গুণবতী পত্নী লাভ করিয়া আমারও জীবন ধন্য হইয়াছে।”

পতির বক্ষলগ্ন সালেমা আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না। “আমার ভাগ্য আপনি; আমি যদি গুণবতী হই, সে আপনারই গুণে” কথা কয়টী আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াই আবেশে পতির উপর আত্মসমর্পণ করিলেন। বিমুগ্ধ আবুল ফজল গভীর আবেগে সর্ব্বসমর্পিতা বিহ্বল পত্নীর সমুজ্জ্বল ললাটে স্বীয়, অমিয়পূর্ণ অধর-দুখানি সংলগ্ন করিলেন।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

জীবনের সাফল্য।

আবুল ফজলের প্রাণপণ চেষ্টায় ইস্‌লামিয়া কলেজ উন্নতির উচ্চতম সোপানে অধিষ্ঠিত হইল। দেশ-বিদেশে কলেজের খ্যাতি প্রচার হইতে লাগিল। ইস্‌লামিয়া কলেজ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ কর্ম্মজীবনের প্রত্যেক বিভাগে অতুলনীয় যোগ্যতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অমায়িকতা, সরলতা, আড়ম্বরহীনতা, সচ্চরিত্রতা ও পবিত্র ধর্ম্মজীবনের আদর্শ দেশবাসী শিক্ষিত সমাজ ও সর্ব্বসাধারণের অনুকরণীয় হইয়া উঠিল। ফলে প্রত্যেক বৎসরই বহুসংখ্যক ছাত্র দিগ্‌দেশ হইতে শিক্ষালাভার্থ আলিনগরে সমবেত হইতে লাগিলেন।

আবুল ফজল ছাত্রগণের চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন গঠনে শিক্ষাপ্রদান হইতেও বিশেষ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি আবশ্যক কঠোরতা অবলম্বনেও বিচলিত হইতেন না। কলেজের পার্শ্বেই বৃহৎ জামে-মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবুল ফজল নিয়ম করিয়াছিলেন, অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত প্রত্যেক ছাত্রকেই দৈনিক পঞ্চবার জামাতে নামাজ পড়িতে হইবে। সাপ্তাহিক জুমার নামাজেও এই নিয়ম। যিনি এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহার কোন আপত্তিই গ্রাহ্য হইবে না। কোন সঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিতে অক্ষম হইলে অপরাধীকে

গুরুতর অর্থদণ্ড প্রদান করিতে অথবা কলেজ হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে। রমজানের রোজা সম্বন্ধেও এইরূপ কঠোর বিধান অবলম্বিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার ফলে কলেজের মোসলমান ছাত্রগণের জীবন নিয়মবদ্ধ ও সংযমিত হইয়া উঠিল। তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও চেহারা শ্রীসম্পন্ন, পুষ্ট ও প্রফুল্ল মূর্ত্তি ধারণ করিল।

এদিকে আবদুল আজিজ আলিনগর স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ধাপগুলি অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া এম-এ উপাধিতে ভূষিত হইলেন; তৎপর অসম সাহসে নির্ভর করিয়া রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ প্রতিযোগিতার পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক দেশবাসী হিন্দু-মোসলমানদিগকে চমকিত করিয়া মোস্লেম-সমাজের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সেই বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে আবদুল আজিজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উচ্চ চাকুরী গ্রহণার্থে অনুরুদ্ধ হইলেন। আবুল ফজল তদ্বিষয়ে আজিজার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"লেখা পড়া শিখিয়া চাকুরী করিবার লোক দেশে অনেক আছে। কিন্তু দেশের মুখ চাহিয়া সমাজসেবা করিবার লোক অতি বিরল। আবদুল আজিজ জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট না হইয়া যদি আপনার পবিত্রতম আদর্শ অনুসরণপূর্ব্বক দেশ ও জাতির সেবা করিতে পারে, তাহা হইলেই আমি অধিক কৃতার্থ হইব।"

আবুল ফজল এ সম্বন্ধে আবদুল আজিজের মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বলিলেন,—"আমি মা'র সদিচ্ছা পূর্ণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিলেই নিজের জীবন সার্থক মনে করিব।"

অনন্তর আবুল ফজল আড়াই শত টাকা বেতনে আবদুল আজিজকে স্বীয় কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের প্রোফেসার নিযুক্ত করিলেন এবং দুই

বৎসর সর্ব্বদা নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া কলেজ পরিচালনের যাবতীয় কার্য্য শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকেই পাঁচশত টাকা বেতনে স্থায়ী প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করিয়া স্বীয় কর্ম্মজীবনের অদম্য স্রোত অন্য পথে প্রবাহিত করিলেন।

আবুল ফজল এখন নিশ্চিন্ত মনে আইন-কানুন সম্পর্কীয় রাজনীতি চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন। দেশের উন্নতি সাধন ও জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণ কল্পে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সদস্যের পদ প্রার্থী হইলেন। প্রতিষ্ঠাপন্ন উকিল-ব্যারিষ্টার ও ধনশালী জমিদারগণ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু লোকমতের নিকট অন্য যাবতীয় প্রভাব অবলীলাক্রমে ভাসিয়া গেল। তিনি বেসরকারী সদস্যরূপে প্রাণপণ চেষ্টায় বিবিধ জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণ ও দেশহিতকর বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ করাইয়া দেশের মহা কল্যাণ সাধন করিলেন এবং তৎপরে গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে কয়েক বৎসরের জন্য সরকারী সদস্যের পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া সমগ্র ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে কয়েকটী নূতন অধ্যায় যোগ করিয়া দেশময় খ্যাতি ও দেশবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণপূর্ব্বক রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

আবুল ফজল যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সরকারী সদস্য ছিলেন, তখন আজিজা সমীরনের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশে ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারের জন্য আবদুল হক ও আশরফের দ্বারা কুসুমপুরে একটী উচ্চশ্রেণীর মাদ্রাসা স্থাপন করিলেন। আবুল ফজল ও সালেমা ঐ মাদ্রাসার জন্য এককালীন দশ হাজার টাকা প্রদান করিলেন। আবদুল হক জমিদারীর মধ্য হইতে উহার জন্য বহু শত টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন।

মাদ্রাসার অন্যান্য সমস্ত ব্যয়ই আশরফ ও সমীরন বহন করিতে লাগিলেন। আবুল ফজলের সহিত আন্তরিক সদুদ্দেশ্যমূলক প্রতিযোগিতা-প্রভাবে আশরফ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া মাদ্রাসার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিলেন। আবুল ফজলের পরামর্শে মাদ্রাসায় আরবি, ফারসী ও ধর্ম্ম-শিক্ষার সহিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-ইতিহাস শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইল। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই কুসুমপুরের মাদ্রাসা বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসায় পরিণত হইল।

আবুল ফজল যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ভাবে আলিনগরে অবস্থানপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন, তখন আবদুল হকও কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত আলি-নগরে আসিয়া ধর্ম্মাচরণ ও দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইলেন। ম্যালে-রিয়া প্রভৃতি পল্লীধ্বংসী রোগপ্রভাবে কমলাবতী গ্রাম ক্রমে বিজন কাননে পরিণত হওয়ায় আবদুল হক আজিজার সহিত পরামর্শ করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু আলিনগরেই স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। আবুল ফজলের ইচ্ছায় কুসুমপুরের ম্যানেজারী আজিজার দ্বিতীয় পুত্র আজিজল হক প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এই সময়ে এম-এ, বি-এল পাস করিয়া শহরে ওকালতি করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; কিন্তু আবুল ফজল ও জননীর আদেশে জমিদারীর কার্য্যভার গ্রহণপূর্ব্বক কুসুমপুরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আজিজা আলিনগরে আসিয়া লক্ষ্য করিলেন, আবুল ফজলের চেষ্টায় দেশের পুরুষ-সমাজ যেরূপ উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় নারী-সমাজ অতি নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। এই অসম দৃশ্য তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত করিল। তিনি অবিলম্বে স্বীয় আবাস-বাটীতে একটী বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া সোফিয়াকে উহার শিক্ষয়িত্রী

পদ গ্রহণ জন্য অনুরোধ করায় তিনি সানন্দে সম্মতি প্রদান করিলেন। বালিকাদিগকে কোরান শরীফ ও মস্‌লা-মসায়েল শিক্ষা দেওয়ার জন্য জনৈক প্রবীণ মৌলবী নিযুক্ত হইলেন। আজিজার কার্য্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি পতিত হইল। আবুল ফজল, আবদুল হক, সালেমা, আবদুল-আজিজ ও সমীরন প্রভৃতি সকলেই আন্তরিক ভাবে আজিজার বালিকা স্কুলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই আজিজার স্কুলটী একটী উচ্চশ্রেণীর বালিকাস্কুলে পরিণত হইল। কতিপয় উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী সংগৃহীত হইয়া স্কুলের শিক্ষাদান কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল।

আবুল ফজল এই সময়ে ধর্ম্ম, সমাজ, ইতিহাস ও দর্শন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতিপয় মূল্যবান্ পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিলেন। তাঁহার গভীর-গবেষণাপ্রসূত রত্নরাজির প্রভাবে দেশের মহদুপকার সাধিত হইল। সমগ্র বিশ্বে এক নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গেল।

আজ দেশের কি সৌভাগ্য! ক্ষুদ্রপল্লী আলিনগরের জন্য সমগ্র ফরিদপুর,—ফরিদপুরের জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ আজ জগতের নিকট গৌরবান্বিত! পল্লীগ্রামের একটী অজ্ঞাতনামা বালক জীবনে এমন অভূতপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিবেন,—একটী লোকের জীবনের অর্দ্ধাংশ সময়ের মধ্যে একখানি নগণ্য পল্লীগ্রামের এমন কল্পনাতীত উন্নতি সাধিত হইবে, এ কথা পূর্ব্বে কে বিশ্বাস করিতে পারিত? চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে অসম্ভব সম্ভব হইয়া উঠে,—কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়। একাগ্রতা ও যত্ন থাকিলে লোকে উন্নতির কত উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে, আবুল ফজল স্বীয় জীবনের অর্দ্ধাংশ সময় অতীত হইতে না হইতেই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। লোকের চক্ষু খুলিল; তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশ ও সমাজ দ্রুত উন্নতিমার্গে ধাবিত হইতে লাগিল।

পাঠক! এই সুযোগে আপনারাও একবার আলিনগরের দিকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ঠিক করিয়া গন্তব্যপথে ধাবিত হউন! গ্রন্থের প্রথমে আমরা আলিনগরের যে দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছি, কল্পনার চক্ষে তাহার সহিত একবার বর্ত্তমান দৃশ্যের তুলনা করুন;—দেখুন, কি অভূতপূর্ব্ব উন্নতি, কি কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন! যেখানে কেবল কয়েকটী ক্ষুদ্রপল্লী এবং পল্লীবাসী কয়েক ঘর ভদ্রাভদ্র লোকের বসবাস ছিল, সামান্য একটী স্কুলও যেখান হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, আজ সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত দেশবিখ্যাত কলেজ!—তাহার সহিত ছাত্রাবাস, উদ্যান, সরোবর, মসজেদ ও লাইব্রেরী। আজ দেখুন, চতুর্দ্দিক্ হইতে দিগন্তস্পর্শী রাজপথসমূহ সগৌরবে আসিয়া সেই গ্রামকে সাগ্রহে চুম্বন করিতেছে। পল্লীর চালাগৃহের স্থলে অভ্রভেদী অট্টালিকাসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। যেখানে সামান্য একটী বিদ্বান্ও ছিল না, আজ সেখানে দেশের গৌরব-স্বরূপ,—প্রতিভার অবতারস্বরূপ বিদ্বৎকুলশিরোমণিগণ পুঞ্জীভূত! আজ পাড়ায় পাড়ায় উকিল-মোক্তার,—গৃহে গৃহে মৌলবী-মাষ্টার। যেখানে বিবাদ, বিসম্বাদ, হিংসা, বিদ্বেষ ও আত্মকলহ চির আসন গাড়িবার আয়োজন করিতেছিল, আজ সেখানে প্রেম, প্রীতি, একতা ও ভ্রাতৃভাব সুপ্রতিষ্ঠিত! অশান্তি ও অশিক্ষার কলুষরাজ্যে শান্তি ও শিক্ষার পুণ্য-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে। যে স্থানে 'মার্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্য-বোধে'র ক্ষীণ রেখাও কখন প্রতিবিম্বিত হইবার আশা ছিল না, আজ সেই স্থান 'রূপ-রাগ-রস-শব্দ-স্পর্শ ও ছন্দ-গন্ধের' লীলা-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে! ঐকান্তিক আগ্রহ ও যত্ন এমন করিয়াই সাফল্য লাভ করে; প্রতিভা ও গুণের এমনই বিকাশ হয়; কাল এমনই পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ।

—•⁞•⁞•—

সমাজে কমলার স্থান।

সহৃদয় পাঠক! চলুন এই সুযোগে আমরা একবার আমাদের নব-দীক্ষিতা ভগিনী কমলার সংবাদ লইয়া আসি। অন্য ধর্ম্মের উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে কমলা ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে জাতি-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাদের সমাজে আশ্রয় লইয়াছেন,—স্বীয় সম্ভ্রম ও মানমর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে আমাদের করে অর্পণ করিয়াছেন, আমাদের সংসার-জীবনের এই শুভক্ষণে আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারি কি?

ইস্‌লামের শিক্ষাবর্জ্জিত কুলমর্য্যাদার ধ্বজাধারী মূর্খগণ কমলাকে হিন্দুকুলোদ্ভবা বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন, স্বার্থপর বিকৃতরুচিসম্পন্ন মানবেরাও তাঁহাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন, এবং অন্ধবিশ্বাসী কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজও হয় ত নব মোস্‌লেমা কমলাকে প্রত্যাখ্যান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, কিন্তু আমাদের নিকট কমলা অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার পাত্রী নহেন; ধর্ম্ম এবং সমাজ-সংসারেও তাঁহার স্থান কাহারও নিম্নে অবস্থিত হইবে না; বরং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে যে সকল মোসলমান-নামধারী স্বেচ্ছাচারী বর্ব্বরের সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদের তুলনায় কমলা শতগুণ গৌরবের পাত্রী। কমলার ন্যায় উচ্চবর্ণ ও সুশিক্ষিত নরনারী মোসলেম-সমাজে যত প্রবেশ করিবে, ধর্ম্ম ও সমাজের গৌরব ততই বৃদ্ধি পাইবে।

সত্য বটে, একদা কমলার চিত্তে পুঞ্জীভূত হিংসা-বিদ্বেষ সঞ্চিত ছিল ; সাময়িক আবেগ ও উত্তেজনার বশে তাঁহার পদস্খলনও হইবার উপক্রম হইয়াছিল ; কিন্তু ঐরূপ একটী ভয়ঙ্কর সন্ধিক্ষণ জীবনে উপস্থিত হয় না, সংসারে এরূপ ভাগ্যবান্ নরনারী কয়টী আছেন ?

তারপর পবিত্র ইস্‌লামের বিশ্বব্যাপী চিরশান্তিময় সুশীতল ক্রোড়ে স্থান পাইয়া কমলার কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়াছে ! তিনি এখন আমাদের সংসারের একটী আদর্শ ধর্ম্মপরায়ণা পতিপ্রাণা পত্নী এবং পুত্র-কন্যার স্নেহময়ী জননী। ইহা অপেক্ষা একটী রমণীর জীবনে আর কি সৌভাগ্য উদয় হইতে পারে ?

ধর্ম্মত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে কমলা সংসারের সকল সম্বন্ধ হারাইয়াছিলেন। ত্রিসংসারে তাঁহার আপন বলিতে কেহই ছিল না। ভ্রাতা-ভ্রাতৃবধূর সহিত তাঁহার যে ক্ষীণ মায়া-মমতার বন্ধনটুকু ছিল, তাহা অতি গোপনে—অতি সন্তর্পণে ; জগৎ উহার অস্পষ্ট আভাস জানিলেও সর্ব্বনাশ !

কমলার আর একটুখানি মায়ার বন্ধন ছিল—আজিজার সহিত। কয়েকদিনের প্রথম দর্শনেই কমলা সেই মহীয়সী মহিলার নিকট হইতে যে প্রাণভরা স্নেহ ও মনজুড়ান সহানুভূতি পাইয়াছিলেন, এবং তাহার প্রতিদানস্বরূপ কমলা আজিজাকে যে অনাবিল ভক্তি নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কালক্রমে উভয়ের অবস্থার অসামান্য পরিবর্ত্তন হইলেও তাঁহাদের সেইভাব—সেই সৌহার্দ্দ্য একটুও মলিন হয় নাই। আজিজা আলিনগরে আসিলেই কমলাকে নিজের নিকট লইয়া গিয়া আদর-আপ্যায়ন করিতেন। কমলাও তাঁহার অবলম্বনশূন্য জীবনে মাঝে মাঝে আজিজার নিকট গিয়া একাধারে জননীর স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসা ও আত্মীয়ের প্রীতি উপভোগ করিয়া আসিতেন।

কমলার উপর আর একটুখানি স্নেহদৃষ্টি ছিল আবুল ফজলের; কিন্তু সে স্নেহটুকু সর্ব্বদা বহির্জ্জগতে প্রকাশিত হইবার কোনই উপায় ছিল না।

তথাপি একথা সত্য যে, একমাত্র স্বামী ভিন্ন কমলার প্রকৃত বন্ধু, সহায় ও অবলম্বন বলিতে সংসারে আর কেহই ছিল না, সুতরাং তিনি স্বামীকেই সর্ব্বস্ব-স্বরূপ ভালবাসিতেন। পিতামাতার প্রাপ্য ভক্তি, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রাপ্য স্নেহ-ভালবাসা, আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য সৌহার্দ্দ্য এবং পতির প্রাপ্য প্রেম-প্রীতি—কমলা একাধারে সমস্তই পতিকে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। স্বামী ভিন্ন অন্য কোন প্রকৃত হিতৈষী না থাকায় কমলা সময়ে সময়ে স্বামীর সামান্য রুষ্ট বাক্যে যেমন অশ্রুপ্রবাহে বুক ভাসাইতেন, তেমনি অনেক সময়ে তাঁহার গুরুতর তিরস্কারও বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতেন। আফসার এই সব কারণে প্রাণান্তেও পত্নীর মনঃকষ্টকর বাক্য উচ্চারণ করিতেন না। এইরূপ সুখে দুঃখে একটী দম্পতির,—একটী ক্ষুদ্র পরিবারের সংসার-জীবন অতিবাহিত হইতেছিল।

ক্রমে আফসার ও কমলার দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল এবং জ্যেষ্ঠা কন্যাটী পঞ্চদশ, কনিষ্ঠাটী দশ ও পুত্রটী সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। পিতামাতা উভয়েই শ্রীসম্পন্ন থাকা হেতু পুত্র-কন্যাগণের চেহারা অতি সুন্দর হইয়াছিল। কন্যা দুইটীর নাম যথাক্রমে মরিয়ম ও হাজেরা এবং পুত্রটীর নাম নূর-মহম্মদ রাখা হইয়াছিল।

যাহা হউক, মরিয়মের বয়স দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইলেই আফসার তাঁহার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন; নানাস্থানে সৎপাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু দীর্ঘ:তিন বৎসর চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলকাম হইতে পারিলেন না।

যে খোন্দকার বংশের সহিত সম্বন্ধ করিবার জন্য দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের পক্ষে আগ্রহান্বিত হওয়াই স্বাভাবিক,—যে বংশের আতাওর রহমানের লায়লা নাম্নী দশম বর্ষীয়া কনিষ্ঠা কন্যাটীকে লাভ করিবার জন্য দেশের শত শত লোক ওমেদার,—কেবল কমলার গর্ভজাত বলিয়া সেই বংশের—সেই আতাওর রহমানের সহোদর ভ্রাতার উপযুক্ত রূপ-গুণবতী সুশিক্ষিতা কন্যা মরিয়মের জন্য কোন সৎপাত্র পাওয়া যাইতেছে না. আফসার ও কমলা ইহাতে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন।

আতাওর রহমান ভ্রাতৃকন্যার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। ধর্ম্মের কথা কেহ শুনিতে চায় না দেখিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"যে সমাজে আমার ভ্রাতৃকন্যার বিবাহ হইবে না, সেই ইস্‌লামী শিক্ষাবর্জ্জিত সমাজে আমিও স্বীয় কন্যার বিবাহ দিব না।"

ক্রমে কথাটা আবুল ফজলের কাণে উঠিল। তিনি বলিলেন, "ইসলামের মর্য্যাদা ও উদারতার সম্মান জন্য মরিয়মকে যেরূপেই হউক, উপযুক্ত পাত্রেই সম্প্রদান করিতে হইবে।" কিন্তু উপযুক্ত পাত্র কোথায়?

অবশ্য ইহার মধ্যে দুই একটী শিক্ষিত নামের কলঙ্ক কাপুরুষ আত্মবিক্রয় করিয়া অর্থ লাভের আশায় মরিয়মের পাণিপ্রার্থী হইলেন বটে, কিন্তু আবুল ফজল মত প্রকাশ করিলেন,—"বিবাহ ফরজ বা ওয়াজেব নহে। সুতরাং সমাজে দুই একটী মেয়ে চিরকুমারী থাকাও ভাল, তবু বরপণ বা ক'নেপণরূপ মহাপাপের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।"

ইতিমধ্যে একদিন আজিজা 'মিলাদ' উপলক্ষে কমলাকে পুত্রকন্যা সহ নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। 'মিলাদ' অন্তে কমলা যখন বিদায় চাহিলেন, তখন আজিজা যৌবন-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ মরিয়মকে দেখিয়া বলিলেন,—"ভগিনি! মেয়ের বিবাহ দিতেছেন না কেন? এই ত বিবাহের উপযুক্ত বয়স।"

আজিজার কথা কমলার প্রাণে বাজিল; অলক্ষ্যে কয়েক বিন্দু অশ্রু তাঁহার কোমল গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল। তিনি অশ্রুমুখে আজিজার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলেন। কমলার বিষাদ-কাহিনী শুনিয়া আজিজার করুণ হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। তিনি আবেগ ভরে কমলার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"ভগিনি! আর কোন চিন্তা করিও না। মোসলমান সমাজের এতদূর অধঃপতন হইয়াছে, তা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, তোমার কন্যা আমারও কন্যা তুল্য। তাহার বিবাহের ভার আমিই গ্রহণ করিলাম।"

কমলা কৃতজ্ঞ চিত্তে আজিজার করচুম্বন করিয়া বিদায় হইলেন। এতদিন পরে যেন তাঁহার হৃদয়-ভার কমিয়া গেল।

অনন্তর আজিজা স্বামী এবং পুত্র আবদুল আজিজের দ্বারা মরিয়মের জন্য সৎপাত্র অন্বেষণ করিয়া যখন বিফলমনোরথ হইলেন, তখন তিনি মনে এক অসম্ভব কল্পনা আটিয়া সোফিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজিজের মা! বলত মরিয়ম মেয়েটী কেমন?"

সোফিয়া—"বু-জান! অমন প্রতিভাশালিনী মেয়ে আমাদের বালিকা-স্কুলে আর দুটী নাই! যেমন রূপ তেমনি গুণ। আরবি, ইংরাজী ও বাঙ্গলা—তিনটী ভাষায়ই সুন্দর জ্ঞান লাভ করেছে।"

আজিজা—"আচ্ছা আমি আজিজল হকের সহিত মরিয়মের বিবাহ দিতে চাই। তুমি কি বল?"

সোফিয়া। সে অতি সুন্দর হয়। সচরাচর এমন মেয়ে দুর্লভ। এ বিবাহ দিলে আমাদের দুটী পুত্রবধূই সমান হইবে;—যেমন আমাদের আবদুল আজিজের বৌ রোকেয়া, তেমনি আজিজল হকের বৌ মরিয়ম। কিন্তু তিনি ও আজিজল হক সম্মত হইবেন ত?

আজিজা। আজিজল-হক আমাদের পুত্র; আমাদের কথার অবাধ্য হইবে কেন? তবে তার স্বাধীন মতের উপর অকারণে আমরা হস্তক্ষেপ করিব না। কিন্তু সমাজ ও জাতির জন্য একটু উদারতা দেখাইতে, একটু আত্মত্যাগ করিতে না পারিলে পুত্রের পুত্রত্ব ও মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে কোথায়? আর তাঁহাকে সম্মত করা—তা আমি না পারি, সে ভার তোমার উপর!

সোফিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"যোগ্য পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন বটে, আচ্ছা তাহাই হইবে। কিন্তু হিন্দুকুলোদ্ভব রমণীর গর্ভজাত মেয়ের সহিত ছেলের বিবাহ দেওয়ায় কোন দোষ নাই ত?"

আজিজা। কিছুই না। ইস্‌লাম বিশেষ কোন দেশ বা জাতির প্রতি নির্দ্দিষ্ট নহে; পৃথিবীর সকল দেশ ও সকল জাতির মুক্তির জন্যই ইস্‌লাম।

এমন সময়ে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমতী প্রতিমার মত লাবণ্যে গৃহ উদ্ভাসিত করিয়া পুত্রবধূ রোকেয়া আজিজার নিকট উপস্থিত হইয়া নতমুখে মধুর স্বরে বলিলেন,—"আম্মাজান! হজরত সাহেব খাইয়া শুইয়াছেন; আপনারা আসুন, খাবার ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে।"

আজিজা ও সোফিয়া এক মুহূর্ত্ত সেই মধুর মূর্ত্তিখানি নয়ন ভরিয়া দেখিলেন। অনন্তর আজিজা বলিলেন,—"মা! তোমার শরীরে ওসব সইবে কি না, আমার তাই ভয় হয়। আমরাও রাঁধতে খাওয়াতে পারি; দাসীও ত আছে, সেও কর্‌তে পারে। কিন্তু তুমি কিছুই শুন্‌ছ না। নিজ হাতেই সব কর্‌বে। বড় মানুষের মেয়ে, শেষে কোন রকম অসুখ বিসুখ কর্‌লে বাপ মার কাছে যেয়ে বলিও যে, আমার শ্বশুর-শাশুড়ীরা খাটাইয়া খাটাইয়া আমার অসুখ বানাইয়া দিয়াছেন।"

সোফিয়া। আমিও কয়েক দিন বৌমাকে তা বলেছি, কিন্তু ওনার বাপজান নাকি কি মন্ত্র শিখাইয়া দিয়াছেন যে, নিজ হাতে শ্বশুর-শাশুড়ীকে খাওয়াতে হ'বে। তা না হইলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন।

আজিজা। সকলেই যদি ছেলে-মেয়েকে ঐরূপ মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারেন, তাহ'লে এই সংসারেই স্বর্গসুখ ভোগ করা যায়। এখন আমার আজিজল হকের বৌটী যদি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসে, তবেই আমরা ধন্য হইতে পারি।

সোফিয়া! আমি নিশ্চয় বল্তে পারি, সে মেয়ে নিশ্চয় বৌমার মত শিষ্ট, শান্ত বরং একটু বেশী কর্ম্মঠ হইবে।

রোকেয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত মাথা নীচু করিয়াছিলেন। দেবরের বিবাহ-প্রসঙ্গে সহসা মাথা তুলিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"আম্মাজান! মেজে মিঞার বিবাহ সম্বন্ধ আসিয়াছে নাকি?"

আজিজা। আসিয়াছে ত অনেক। চল রাত হইয়া যাইতেছে; আহার করিতে করিতে তোমাকে বলিব।

রমণীত্রয় আহার করিতে গমন করিলেন। আহারান্তে আজিজা স্বামীর নিকট আলোচ্য বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। আবদুল হক প্রথমে হিন্দুকুলোদ্ভব মায়ের মেয়ে, অসম-গোত্র প্রভৃতি নানা অবান্তর আপত্তি তুলিলেন; কিন্তু আজিজা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান ও ঐতিহাসিক প্রমাণ তুলিয়া ঐরূপ বিবাহ যে আদৌ অসিদ্ধ বা দোষাবহ নহে, তাহা দৃঢ়তার সহিত প্রতিপন্ন করিয়া আবদুল হকের আপত্তি খণ্ডন করিলেন।

তখন আবদুল হক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে ধর্ম্মশাস্ত্রে 'কফু' অর্থাৎ সমগোত্র-সম্বন্ধীয় বিধান বিবৃত হইয়াছে কেন?"

আজিজা ধীর ভাবে উত্তর করিলেন;—"সে বিধানের উদ্দেশ্য মহৎ; ধর্ম্মের মর্য্যাদা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা সংরক্ষণই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

আবদুল হক আবার বলিলেন,—"কিন্তু ঢাকার একজন জমিদার এবং ফরিদপুরের একজন ডেপুটীর মেয়ের সহিত যে আজিজল হকের সম্বন্ধ উপস্থিত আছে; তাঁহাদিগকে কি বলা যাইবে?"

আজিজা। ধন-সম্পদ খোদাতালারই দান! সুতরাং খোদাতালার প্রদত্ত ধনে ধনী হইয়া তাঁহার দরিদ্র বান্দার প্রতি অনুগ্রহ না করিলে তাহা অপেক্ষা আর অকৃতজ্ঞতা কি হইতে পারে? তার পর জমিদারকন্যা ত গৃহে আনিয়াছেনই। মা রোকেয়ার অপেক্ষা ভাল জমিদারকন্যা আপনি কোথায় পাইবেন? সুতরাং এখন একটী দরিদ্র ভদ্রকন্যা গৃহে আনিলে কোনই দোষ হইবে না।

আবদুল হক। দোষ না হউক; কিন্তু আবদুল আজিজের শ্বশুর আপত্তি করিবেন না ত?

আজিজা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আপত্তি না করিয়া বরং আনন্দিত হইবেন।

আবদুল হক। বেশ, তবে আজিজল হকের মত লইয়া কর; আমার আর কোন আপত্তি নাই।

আজিজা স্বামীর সম্মতি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন এবং পরদিনই পুত্রের মত গ্রহণ জন্য তাঁহাকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন।

আজিজল হক মাতার পত্র পাইয়া সেই দিনই কুসুমপুর হইতে বাড়ী রওয়ানা হইলেন এবং যথাসময়ে বাড়ী উপস্থিত হইয়া পিতামাতার চরণ চুম্বন করিলেন। আবদুল আজিজ ও আজিজল হক সহোদর ভ্রাতা হইলেও উভয়ের চরিত্রগত অনেক পার্থক্য ছিল। আবদুল আজিজ ধীর, শান্ত ও নম্র স্বভাবযুক্ত এবং গুরুজনের প্রতি অত্যন্ত নির্ভরশীল; কিন্তু আজিজল হক তেজস্বী, বিচক্ষণ ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তথাপি মাতার নিকট উভয় পুত্রই একান্ত অনুগত ও বাধ্য ছিলেন।

আজিজা সুযোগ মত আজিজল হকের নিকট স্বীয় বাসনা ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু এক বিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসক এম-এ, বি-এল পাস করা তেজস্বী আজিজল হক মাতার মুখের উপর কোনই উত্তর দিলেন না। আজিজা তখন সস্নেহে বলিলেন,—"বাবা, এখন না বলিতে চাও, তুমি ভালমত চিন্তা করিয়া দেখ; তার পরে আমাদিগকে তোমার মত জানাইও।"

তাহাই হইল। আজিজল হক তখন মাতাকে কিছুই বলিলেন না। মাতার প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি মনে মনে অনেক আন্দোলন করিতে লাগিলেন। পরদিন আজিজার সঙ্কেতে সোফিয়া আজিজল হকের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। বলা বাহুল্য, পুত্রদ্বয় মাতা অপেক্ষা বিমাতার নিকট অধিক মুক্তভাবে কথা বলিতেন। সুতরাং তিনি সোফিয়াকে বলিলেন, "আপনারা যদি বলেন, আমাকে এ বিবাহ করতেই হ'বে।"

সোফিয়া। কেন বাবা! তোমার নিজের কি কোন মত নাই?

আজিজল হক। তা আছে বৈ কি; কিন্তু তাতে যদি আপনারা অসন্তুষ্ট হন!

সোফিয়া। তুমি উপযুক্ত পুত্র; সুতরাং তুমি বুঝিয়া সুজিয়া কাজ করিলে আমরা অসন্তুষ্ট হইব কেন?

আজিঃ হক। তবে আমি কয়েকটা বিষয় জেনে পরে বল্‌ব।

সোফিয়া। জানার মধ্যে মেয়েটী বড় লোকের মেয়ে নয়! তা ভিন্ন আর কোনই ত্রুটী নাই।

আজিজল হক। আমিত বড়লোকের কথা বল্‌ছি না।

সোফি বলিলেন,—"তবে আর কি? চেহারা অতি সুন্দর; লেখা-পড়া অতি উত্তমরূপে জানে।"—বলিয়া মরিয়মের লিখিত কয়েকটী রচনা সোফিয়া আজিজল হকের হাতে প্রদান করিলেন। আজিজল হক সুন্দর

হস্তাক্ষরে দুই তিনটী ভাষায় একটী বিষয়ের নির্ভুল রচনা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু দেখিতে কিরূপ, তাঁহার মনের এই ধাঁধাটুকু তখনও ঘুচিল না। তদ্দর্শনে সোফিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা তুমি একবার বিকাল—চারটার সময়ে আমার সাতে দেখা কর্‌তে বালিকা-স্কুলে এসো; আমি তখন মরিয়মকে এনে আমার কাছে রাখ্‌ব।"

আজিজল হক্ বলিলেন,—"যদি মা ও বাপজান জান্‌তে পারেন, তবে আমি দেখ্‌তে চাই না।"

সোফিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"আচ্ছা মা'র মধ্যে আমি ছাড়া আর কেহই জানিবে না।"

* * * *

যথা সময়ে আজিজল হক ছলনা করিয়া সোফিয়ার গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক অনিন্দ্যসুন্দরী মরিয়মকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং বিবাহে সম্মতি দিয়া কুসুমপুরে চলিয়া গেলেন।

আবুল ফজল মরিয়মের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও পাত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না; এমন সময়ে আজিজল হকের সহিত মরিয়মের বিবাহের প্রস্তাব হওয়ায় সমাজে এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। আবুলফজল, সালেমা ও আশরফ প্রভৃতি আজিজার মহত্ব ও আজিজল হকের স্বার্থত্যাগ দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আফসার-উদ্দিন ও কমলা আজিজার নিকট এক অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইলেন।

অনন্তর মহা ধূমধামে আজিজল হকের সহিত মরিয়মের বিবাহ সম্পন্ন হইল; পাত্রীপক্ষের প্রায় সমস্ত ব্যয় আবুল ফজল বহন করিলেন। সতীশ ও নলিনী ইস্‌লামের সাম্য ও সামাজি-কতার উদার আদর্শে মুগ্ধ হইয়া কমলার সৌভাগ্যে তাঁহারাও

সৌভাগ্য বোধ করিলেন এবং হিন্দুসুলভ সঙ্কীর্ণ সামাজিকতা বিস্মৃত হইয়া মরিয়মকে সহস্র মুদ্রার অলঙ্কার উপহার প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন আবুল ফজল, সালেমা, আশরফ, সমীরন, আবদুল আজিজ ও রোকেয়া নব দম্পতিকে প্রচুর যৌতুক ও উপহার প্রদান করিলেন। সকলের শুভ আশীর্ব্বাদ ও প্রীতি-সম্ভাষণে দম্পতির জীবন আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল। আজ কমলার সকল দৈন্য, সকল বিষাদ দূরীভূত হইল। আনন্দে তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। তিনি আনন্দাশ্রুপ্লাবিত নয়নে মরিয়মকে আজিজল হকের করে সমর্পণ করিলেন। মরিয়ম মনোমত স্বামী পাইয়া যেমন নিজেকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন, আজিজল হকও তেমনি রূপবতী, গুণবতী ও সুশিক্ষিতা পত্নী লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

এই বিবাহের পর আলিনগরে আর একটী আনন্দপূর্ণ বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল। এই বিবাহের পাত্র আবুল ফজলের পুত্র ফজলর রহমান এবং পাত্রী আশরফের কন্যা জিনাতন। সালেমা, সমীরন ও আশরফের উদ্যোগে পূর্ব্বেই "আকৃদ্‌বস্ত" করিয়া ফজলর রহমানকে বিলাতে পাঠান হয়। বিলাত হইতে আই-এস-সি পাস করিয়া আসিবার পর মহাধুমধামে দম্পতির 'রুখ্‌সৎ' ও 'রসুমত' সম্পন্ন হইল। এই বিবাহোৎসবের উৎসব আড়ম্বর বর্ণনা করিতে আমরা একান্তই অসমর্থ। কারণ এ পর্য্যন্ত আমাদের পল্লীসংসারে যে কয়টী পরিণয়োৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার কোনটীই ইহার সহিত তুলিত হইবার যোগ্য নহে।

যাহা হউক, বিবাহের অল্পদিন পরেই ফজলর রহমান উত্তর বঙ্গের এক জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া পত্নীসহ কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিলেন। এই চাকুরী গ্রহণে আশরফ ও সমীরনের খুব উৎসাহ ছিল ; কিন্তু আবুল ফজল ও সালেমার তদ্রূপ উৎসাহ না থাকিলেও তাঁহারা নিষেধ করিলেন না।

চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

সাধনা ও সিদ্ধি।

আবুল ফজল ধর্ম্ম-চর্চ্চার সহিত সাহিত্যানুশীলনের উপকরণ সংগ্রহার্থে সমাজের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এত দিন তিনি কেবল সমাজ-শরীরের বাহ্ উন্নতি সাধনের জন্যই চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন; সুতরাং উহার আভ্যন্তরিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে অতি অল্পই সুযোগ পাইয়াছিলেন। এখন তিনি সহজেই লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইলেন যে, সমাজের পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার আকাশ পাতাল পার্থক্য ঘটিয়াছে এবং সে পার্থক্য অনুদিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আবুল ফজল বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সমাজে শিক্ষা-বিস্তারের সহিত যেমন কতকগুলি কুনীতি ও কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে, তাহার স্থলে আবার তেমনি কতকগুলি দুর্নীতি ও অনাচার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ শিক্ষিত দলের মধ্যে ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ কমিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতেছে; স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের নামে স্বেচ্ছাচার ও স্বার্থান্ধতা স্বীয় আসন গাড়িতেছে; আত্মপ্রতিষ্ঠার নামে আত্মপ্রাধান্যের মন্ত্র সকলের মুখেই উচ্চারিত হইতেছে। ক্রমে সকলেরই ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে; রোজা নামাজে তেমন ভক্তি, 'শরা-শরিয়ত' পালনে তেমন আগ্রহ কিংবা সাধন ভজনে তেমন আস্থা কাহারও নাই। অনেকেই রোজা নামাজ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের নামে নামান্তরে নাস্তিকতার অনুসরণ করিতেছে। যাহার তাহার মুখে কোরান-হাদিস, প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রকটিত হইতেছে। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন

জড়পূজক ও আধ্যাত্মিকতার উচ্চ জ্ঞান বিতরণের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। আদব কায়দা, ভক্তি-নম্রতা প্রভৃতি সুকোমল মানবীয় বৃত্তিসমূহ যেন তাহারা বিসর্জ্জন দিবার জন্য বূহবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

আবুল ফজল শিক্ষিত সমাজের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া যারপর নাই মর্ম্মাহত হইলেন। প্রাণপাত পরিশ্রম ও উদ্যম চেষ্টার ফলে তিনি দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, শিক্ষিত সমাজের লক্ষ্যহীন জীবন ও ধর্ম্মহীন চরিত্রের জন্য তাহা সমস্তই তিনি পণ্ডশ্রম মনে করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, কলেজ যদি কেবল এইরূপ ধর্ম্মহীন নাস্তিকের দল প্রসব করে, তবে উহার দ্বারা সমাজের কি উপকার হইবে? ইহারা যে সমাজকে অধঃপতনের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করিবে? অতএব এরূপ কলেজ তুলিয়া দেওয়াই সঙ্গত।

কিন্তু তিনি আবার ভাবিয়া দেখিলেন, কালোপযোগী মানব-সমাজ গঠন করিতে হইলে এই আদর্শে শিক্ষাদান ভিন্ন গতি নাই। প্রাচীন আদর্শের মানব বা প্রাচীন আদর্শের জ্ঞানবিজ্ঞান কখনও এই নব জগতের নব জ্ঞান-বিজ্ঞানমণ্ডিত উন্নতিশীল জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় টক্কর দিতে পারিবেন না। কিন্তু এই নব শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সুশৃঙ্খলিত করিয়া ধর্ম্মের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার উপায় কি? কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহারা স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার উৎকট পন্থাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া সদাচার ও সংযমের সরল পথে চলিবে, নাস্তিকতা ও ধর্ম্মদ্রোহ পরিত্যাগ করিয়া আস্তিক ও ধর্ম্মশীল হইবে? শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনে? অসম্ভব! কেননা আধুনিক কালোপযোগী আধুনিক প্রণালীর সুশিক্ষা ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান ইহারা ত সকলেই জানে; ধর্ম্মতত্ত্বেও ইহারা অনেকেই বেশ অভিজ্ঞ; সে সমস্ত বিষয় ইহারা অনেককে শিক্ষাও দিতে পারে। কিন্তু হইলে কি

হয়, ইহাদের যে ভক্তি ও বিশ্বাস একটুও নাই; অথচ ভক্তি ও বিশ্বাস বিহনে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপ যে সকলই ব্যর্থ! কিসে ইহাদের হৃদয়ে ভক্তি এবং অন্তরে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইবে; কিসে ইহারা ভ্রান্তির বিলয়-বারিধি উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তির পুণ্য-তটে উপনীত হইবে?

তিনি বহু দিন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কত চিন্তা করিলেন; বন্ধুবান্ধব ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের নিকট কতরূপ উপদেশ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সদুপায় বা সুযুক্তি নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপ চিন্তা ও কল্পনায় কত সুদীর্ঘ দিবস,—কত বিনিদ্র রজনী অনন্ত কাল-সাগরে মিশিয়া গেল; কিন্তু আবুল ফজলের চিত্তের প্রগাঢ় চিন্তা-তমসা কিছুতেই অপসারিত হইল না।

ইতিমধ্যে একদা মওলানা শাহ জাফর হোসেনী সাহেবের আগমন-সংবাদে ফরিদপুরের পল্লী-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দিগ্‌দিগন্তে ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনার সুমধুর কল্লোল উত্থিত হইল। মওলানা সাহেবের প্রত্যেক সভায় তাঁহার অতুলনীয় 'ওয়াজ-নসিহত' শুনিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইতে লাগিল। শত শত লোক আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন মহামনস্বী মওলানা সাহেবের পবিত্র করস্পর্শ করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া ধন্য হইল। তাড়িত শক্তিস্পর্শে বিজুলি-বাতির গর্ভস্থিত সূক্ষ্ম শুষ্ক তারে যেমন মনোহর আলোক-রেখা জ্বলিয়া উঠে, সন্ধ্যানীলের মৃদু পরশে যেমন উদ্যানে কুসুম ফুটে, মওলানা সাহেবের আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃপূর্ণ-হৃদয়ের শক্তিসম্পাতে পাষাণ-হৃদয় অবিশ্বাসীর শুষ্ক অন্তঃকরণেও সেইরূপ ভক্তি ও বিশ্বাসের জ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল; প্রেম ও প্রীতির সৌরভে তাঁহাদের হৃদয় ভরপুর হইয়া উঠিল।

মওলানা জাফর হোসেনী সাহেব আমাদের অপরিচিত নহেন। আবুল ফজল বাল্যজীবনে ফরিদপুরে এই মওলানা সাহেবের হস্তে 'মুরিদ' হইয়াই

আজিজার সহিত বিবাহ না হওয়া-জনিত ক্ষোভবিদগ্ধ প্রাণে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। মওলানা সাহেবের উপদেশ ও সাধনাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াই তিনি স্বীয় উন্নত চরিত্র উচ্চতর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং ধর্ম্মবিশ্বাস ও কর্ম্মপ্রণালী স্থির রাখিয়া ধর্ম্ম ও সংসার-জীবনের এরূপ অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেই সাধনায় পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই; সুতরাং অন্য কাহাকে দীক্ষা প্রদানের শক্তি ও অধিকার তাঁহার ছিল না। তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য মওলানা সাহেবের নিকট সর্ব্বদাই যাইবার ইচ্ছা পোষণ করিতেন, কিন্তু নানা কার্য্যে জড়ীভূত ও ব্যতিব্যস্ত থাকা নিবন্ধন সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, মওলানা সাহেবের আগমন-সংবাদে আবুল ফজলের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, তিনি অবিলম্বে শাহ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া পরম ভক্তির সহিত তাঁহার করচুম্বন করিলেন এবং মহা সমাদরের সহিত সদলবলে তাঁহাকে আলিনগরে লইয়া আসিলেন। আবুল ফজলের ঐকান্তিক যত্নে মওলানা সাহেব প্রায় পনর দিন আলিনগরে থাকিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ের মধ্যে আবুল ফজল তাঁহার নিকট হৃদয়ের সমস্ত বেদনা জ্ঞাপন করিলেন; মওলানা সাহেব তাঁহার হৃদয়ের আভ্যন্তরিক আবেগ শুনিয়া—তাঁহার জীবনের অতুলনীয় সাফল্যের নিদর্শনস্বরূপ কৃতকার্য্যগুলি দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আবুল ফজলের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণাম সম্বন্ধে কলেজ-প্রাঙ্গণে দুই দিন সুমধুর বক্তৃতা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মজীবনের স্বর্গীয় আদর্শ সকলকে অতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। মওলানা সাহেবের উপদেশে সকলে এমন মুগ্ধ হইলেন যে, আন্তরিক আগ্রহের প্রাবল্যে কলেজের সমস্ত ছাত্রই তাঁহার পবিত্র

করস্পর্শ করিয়া দীক্ষিত হইলেন। যে সমস্ত ছাত্র ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারাও কৌতূহলবশতঃ দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন; এবং এইরূপ অলক্ষ্যে সকলেই ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক শক্তিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য আত্মোৎসর্গ করা হেতু আবুল ফজলের প্রতি মওলানা সাহেব অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আলিনগরে অবস্থান কালেই অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে আবুল ফজলের হৃদয়স্থিত মায়া-মোহের স্থূল আবরণগুলি অপসৃত করিয়া তদীয় হৃদয়াকাশ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। সেই নির্ম্মল আকাশে তখন সৃষ্টিরহস্য ও তত্ত্বজ্ঞানের কোটী কোটী চন্দ্র-সূর্য্য সমুদিত হইয়া অজ্ঞানতা ও অবিশ্বাসের প্রগাঢ় তমিস্রা চিরতরে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। অহরহ প্রতি মুহূর্ত্তেই বিধাতৃ-মহিমায় অসংখ্য উজ্জ্বল নিদর্শন তাঁহার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া জীবন ধন্য হইল; তাঁহার মনের সকল কামনা পূর্ণ হইল। খোদাতালার অনুগ্রহে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন।

মওলানা সাহেব আবুল ফজলকে প্রাদেশিক শিষ্যগণের উপর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিলেন। তিনি প্রচলিত সর্ব্বজনমান্য চারিটী তরিকায় সিদ্ধিলাভ করিয়া দেশবাসীকে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দেশে ধর্ম্মের শান্তিময় মধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইল; অবিশ্বাস; অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজ-শরীর হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইল। আবুল ফজল এত দিন কেবল দেশহিতৈষী নেতৃরূপে সম্পূজিত হইতেছিলেন; এক্ষণ হইতে তিনি সর্ব্বজনমান্য পীর ও মোরশেদরূপে দেশবাসীর ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সংসার।

সংসার অতি সমস্যার স্থান! ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য এই সংসারে থাকিয়াই সম্পন্ন করিতে হয়; সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ এবং স্বাস্থ্য ও রোগ জীবে এই সংসার-জীবনেই ভোগ করে। হাসি-কান্না, উৎসাহ-নিরানন্দ, প্রেম-হিংসা ও স্নেহ-বিরাগের পাশাপাশি দৃশ্য এই সংসারেই দেখিতে পাওয়া যায়। উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি ও উদয়-অস্তের চিত্র এই সংসারেই অহরহঃ প্রতিভাত হয়। তাই বলিতে ছিলাম, সংসার অতি সমস্যার স্থান!

সংসার পরিবর্ত্তনশীল! আজ যেখানে অতলস্পর্শ বারিধির বিপুল জলরাশি অদম্য স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে,—বাত্যাহত বিশালকায় তরঙ্গ-মালা দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া যাইতেছে, কাল দেখিবে সেইস্থানে বিশালকায় মরুভূমি সৌরকরে উত্তপ্ত হইয়া যেন বিশ্ব গ্রাস করিবার জন্য হাহাকার করিতেছে। আবার দুই দিন পরে হয়ত দেখিবে, সেই বিশ্বত্রাশ মরুবক্ষে শ্যামল পল্লী ও সুশোভন নগরী সংস্থাপিত হইয়াছে। আবার একটী যুগ গত হইতে না হইতেই দেখিবে, সেই নগরী ও পল্লী বিজন বিপিনে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে সমুদ্রবক্ষে পর্ব্বতমালা উৎকীর্ণ হয়; নগরী ও পল্লী শ্মশান হইয়া যায়; বিশালকায় ভূভাগ ধসিয়া গিয়া অগাধ সমুদ্রে পরিণত হয়। তাই বলিতেছিলাম, সংসার পরিবর্ত্তনশীল!

সমস্যাপূর্ণ অনিত্য সংসারের সকলই অনিত্য ও সমস্যাপূর্ণ; সকলই পরিবর্ত্তনশীল। সামান্য একটী বীজ অঙ্কুরিত হইয়া একটী বৃক্ষ সৃষ্টি হয়; পরিবর্ত্তনশীলতা প্রভাবে সেই বৃক্ষই ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠে; তাহাতে কত মধুর মধুর ফল ধরে। কিন্তু কালে সে ফুল ঝরিয়া যায়—ফল পড়িয়া যায়—পাতা শুকাইয়া বৃক্ষেরও জীবনলীলা ফুরাইয়া যায়; তাহার প্রত্যক্ষ আর কোনই অস্তিত্ব থাকে না! কিন্তু যে বীজে সেই বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল,—থাকে তেমন অসংখ্য বীজ।

যত্ন করিলে সেই বীজের দ্বারা তেমন শত শত বৃক্ষ উৎপন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু যত্ন না করিলে—কোন অবলম্বন না পাইলে সে বীজে কিছুই হইবে না;—কালের প্রভাবে সেই বীজের উৎপাদিকা শক্তিও নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপে সংসারে কত অনাবশ্যক বীজ কোটী কোটী গুণে আপনার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে;—আবার কত অমূল্য বীজের অস্তিত্ব চিরদিনের মত বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

একটী গাছে যখন ফুল ধরে, তখন তাহার একটী মুকুল লইয়া ছিঁড়িয়া দেখ,—ফুলের শোভা ও সৌন্দর্য্য তাহার মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাইবে; কিন্তু যদি ফুলটীকে সযত্নে রক্ষা করিয়া—তাহাকে আপন মনের মত ফুটিতে দাও,—দেখিবে দুদিন পরে সে আপন গৌরবে আপনিই ফুটিয়া উঠিবে;—শোভা ও সৌন্দর্য্যে দিক আলো করিবে;—কত ছন্দের মধুময় সঙ্গীত তাহার পাশে পাশে আপনি প্রতিধ্বনিত হইবে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে ইহাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য,—ইহাই তাহার জন্মের সার্থকতা,—ইহাই তাহার জীবনের শেষ! ইহার পরে সে ঝরিয়া পড়ুক বা শুকাইয়া যাক,—তাহাতে তাহার কিছুই আসে যায় না। ইহার পরের কর্ত্তব্য, পরের লাভ তোমার। তুমি তাহার শোভা-সৌন্দর্য্য, গন্ধ-মাধুর্য্য-টুকু ধরিয়া রাখিতে পার, তুমিই উপকৃত হইবে,—না পার সে সম্পদে তুমিই বঞ্চিত থাকিবে। পরিবর্ত্তনশীল সংসারে ফুলের কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিবে না। সময়ে ফুল আবার ফুটিবে—আবার গন্ধ বিতরণ করিবে; কিন্তু তুমি তাহা সম্ভোগ করিতে পারিবে কিনা, তোমার ভাগ্য জানে।

অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল সংসারের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—সংসার-সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্—মানব-পুষ্পও এই নিয়মের অধীন। সে ফুলের মতনই গঠিত, মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হয়; আবার সময়ে ফুলের মতই ঝরিয়া—শুকাইয়া যায়। জন্ম, জীবন ও মৃত্যু—এই মুকুলিত হওয়া, ফুটে উঠা ও ঝরে পড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মানুষ জন্মে, জীবিত থাকে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিন্তু ভাগ্য সকলের একরূপ নহে। সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না, সকলেরই জীবনের সাফল্য ও সার্থকতা সাধিত হইতে পারে না;

সকলের একরূপ পরিণতিও ঘটে না; এইখানেই সমস্যা! এই সমস্যা সমাধান করিবার জন্যই মানুষ অতি মানুষের আদর্শ অনুশীলন করে; ধর্ম্মপিপাসু ধার্ম্মিকের দৃষ্টান্তের অনুকরণকারী হয়; কর্ম্মানুরক্ত কর্ম্মীর উৎসাহ-উদ্দীপনার অনুসন্ধান করে। এই জন্যই জগতে রসুল-নবী, এমাম-বোজর্গ ও পীর-ফকিরের আবির্ভাব; এইজন্যই মানব-সমাজ, মহামানব মহাপুরুষগণের অনুসরণ করেন। কারণ তাঁহাদের শিক্ষা ও উপদেশই মানবতার বীজ;—তাঁহাদের আদর্শ ও কর্ম্মই জীবন-পুষ্পের সুবাস। সাধারণ মানবের জীবনতরু অঙ্কুরিত করিতে হইলে,—প্রাণপুষ্প ফুটাইতে হইলে,—সেই আদর্শ ও সেই শিক্ষার প্রয়োজন; তাহা ভিন্ন সাধারণ মানবের জীবন বিকসিত হইতে পারে না; তাহাদের জীবন ফলে-ফুলে বিশোভিত হইতে পারে না; ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের অভিব্যক্তি—এই ভাবের প্রতিচ্ছায়াই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র 'সংসারে' প্রতিফলিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

আমরা ভিন্ন ধর্ম্ম ও ভিন্ন জাতির আদর্শ ও সমাজ-সংসারের সমালোচনা করিতে প্রয়াস পাই নাই; আমাদের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ (সঃ) স্বীয় জীবনতরু হইতে আমাদের জন্য যে সমস্ত অমৃত ফল এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনার যে সমস্ত অমূল্য বীজ রাখিয়া গিয়াছেন, পবিত্র কোরান ও হাদিসে তাঁহার জীবন-কুসুমের যে অতুলনীয় শোভা ও সুবাস সঞ্চিত রহিয়াছে,—সেই সমস্ত অবলম্বন করিলে ইস্‌লামের বিশ্বকুঞ্জ কিরূপ অপরূপ শোভা ও সম্পদ-কুসুমে বিশোভিত ও বিভূষিত হইতে পারে; ফলকথা ইসলামের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক শিক্ষা অবলম্বন করিলে মোসলেম-সন্তান জগতে কিরূপ উন্নত আদর্শ সংস্থাপন করিতে পারেন, তৎপ্রদর্শন কল্পেই আমরা "পল্লীসংসার" বা ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীর সংসার-জীবনের পুণ্যচিত্র অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কেমন করিয়া বলিব, আমাদের সেই উদ্দেশ্য কতদূর পূর্ণ হইয়াছে?

* * * * *

জীবন-সন্ধ্যা ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে বুঝিয়া আফতাবউদ্দিন মিঞা ও বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিন একত্রে 'হজ' সম্পাদনার্থ পুণ্যভূমি মক্কা যাইবার

ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। আবুল ফজল, সালেমা, আজিজা, মতিয়র রহমান প্রভৃতি সকলেই এ শুভকল্পনা পূরণের জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইল; সকলের প্রাণেই এক বিষাদানন্দ-মিশ্রিত আকুলতা জাগিয়া উঠিল। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিনে উভয়েই আত্মীয়-স্বজন ও পরিজনদিগের নিকট অশ্রুমুখে বিদায় লইতে লাগিলেন। সে এক করুণ দৃশ্য! আফতাব-উদ্দিন মিঞা অশ্রুমুখী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূকে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ করিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন। বড় মিঞা গিয়াসুদ্দিনও পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূর অশ্রুস্নাত হইয়া যাত্রা করিলেন। গ্রামবাসী সকলেই গ্রামের আশ্রয়স্বরূপ সেই প্রবীণ বৃদ্ধদ্বয়কে ব্যথিত প্রাণে বিদায়সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিলেন। উভয়ের অভাবে আলিনগর যেন আশ্রয়চ্যুত হইয়া পড়িল।

আবুল ফজল, আশরফ, আবদুলকে ও মতিয়র রহমান উভয়ের সঙ্গে বোম্বাই পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক তথা হইতে তাঁহাদিগকে জাহাজে উঠাইয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আবুল ফজল অশ্রুতে বুক ভাসাইয়া পিতার পদচুম্বন করিলেন। আফতাব-উদ্দিন মিঞাও পুত্রকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর আবুল ফজল বড়মিঞার নিকট বিদায় লইয়া সকলের সহিত ক্ষুণ্ণ মনে দেশে যাত্রা করিলেন।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা ও বড়মিঞা উভয়ে একত্রে পুণ্যভূমি মক্কাশরীফে উপস্থিত হইয়া হজ সম্পাদন করিলেন এবং তথা হইতে মদীনাশরীফ গমন করিয়া বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ রসুলোল্লার (সঃ) স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যো-দ্ভাসিত পুণ্যময় সমাধি দর্শন করিলেন। সেই পুণ্যভূমির আকর্ষণে আফতাব-উদ্দিন মিঞা পার্থিব সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইলেন এবং সেই মুক্তিক্ষেত্রে দেহ মিলাইবার জন্য তাঁহার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল। তিনি অধীর ভাবে রসুলের পদপ্রান্তে স্থান পাইবার জন্য খোদাতালার দরগায় প্রার্থনা করিলেন। ভক্তের আকুল প্রার্থনা করুণাময় খোদা-তালার দরবারে বিফল হইল না। কয়েকদিন পরেই জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া আফতাব-উদ্দিন মিঞা পবিত্র মদীনায় দেহ ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তীর্থক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত দ্রব্যসমূহ পুত্রকে প্রদান করিবার জন্য বড়মিঞার নিকট প্রদান করিয়া সকলের প্রতি 'ওসিয়ৎ'

(অন্তিম উপদেশ) করিলেন।—বড়মিঞা গিয়াসুদ্দিন আফতাব-উদ্দিন মিঞাকে যথাবিধি সমাধি প্রদানান্তর যথাসময়ে দেশে উপস্থিত হইয়া আফতাব-উদ্দিন মিঞার সংবাদ প্রদান করিলেন। মিঞাবাড়ী ও আলিনগরে শোকের ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইল।

হজ হইতে আসিয়া বড়মিঞা গিয়াসুদ্দিনও আর প্রাণে শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। সমবয়সের আত্মীয়-স্বজন ও সহযোগিণ একে একে সকলেই মহাপ্রস্থান করিতেছে দেখিয়া সংসারের প্রতি তাঁহার আসক্তি কমিয়া গেল। কোন্ এক অজ্ঞাত আকর্ষণে—এক অজানা দেশের গমন-পথের পথিক হইবার জন্য তাঁহার প্রাণও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি দেশে আসিবার কয়েক মাস পরেই রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার জীবনের আশা কমিয়া আসিতে লাগিল। একদা তিনি একান্ত অসুস্থতা বোধ করিয়া মতিয়র-রহমানের দ্বারা আবুল ফজলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বড় মিঞার আহ্বানে আবুল ফজল তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার অবস্থা ভাল নহে। পরিজনেরা চিন্তাক্লিষ্ট মুখে তাঁহার চারি পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছে এবং আজিজা অশ্রুসিক্ত ম্লানমুখে পিতার শ্বাস-যাতনারুদ্ধ বক্ষে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। আবুল ফজল গৃহে প্রবেশ করিতেই বড় মিঞা তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া আজিজা ভিন্ন অন্য সকলকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। সকলে বাহিরে গেলে বড় মিঞা আবুল ফজলের হাত ধরিয়া এবং আজিজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বাবা আবুল ফজল! মা আজিজা! আমি বোধ হয় আর বাঁচিব না! খোদাতালা তোমাদের মঙ্গল করুন। কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বে আমি তোমাদের উভয়ের মনে বড়ই কষ্ট দিয়াছিলাম। তজ্জন্য আমার মনে চিরকালই একটা অনুতাপ রহিয়াছে। খোদাতালার নিকটেও আমি উহার জন্য নিশ্চয়ই অপরাধী আছি। বৎস! আমার সেই কার্য্যে তোমরা মনে যে কষ্ট পাইয়াছিলে এবং সে জন্য এখনও মনে যদি কোন দুঃখ থাকে, তবে আল্লাহতালা তোমাদের পার্থিব জীবনেই যে মহৎ দান—যে মহা অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়াও তোমরা আমাকে মার্জ্জনা কর; আমাকে শান্তিতে মরিবার সহায়তা কর।"

এক মুহূর্ত্ত আবুল ফজল বা আজিজা কেহই কথা বলিতে পারিলেন না। অলক্ষ্যে এক বৈদ্যুতিক আন্দোলনে তাঁহাদের হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ আন্দোলিত হইয়া গেল। কিন্তু আজিজা মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন,—"বাপজান! আমার দেহ মন আপনার কল্যাণার্থে উৎসর্গ হউক। সে অপ্রিয় প্রসঙ্গ বহুদিন পূর্ব্বেই আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। খোদার ফজলে আমরা প্রত্যেকেই জীবনে প্রচুর সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাইজানকে আমি চিরকালই সহোদর ভ্রাতার দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি; এখনও সেই দৃষ্টিতে দেখি। পিতঃ অদৃষ্টক্রমে তিনি এখন আমার অতি ঘনিষ্ঠ ও নিকটতম আত্মীয়! ইহার অধিক অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না এবং এখনও নাই; সুতরাং আমার মনে একটুও ক্ষোভ বা বিকার নাই। তথাপি আমি সেজন্য সর্ব্বতোভাবে খোদাতালার নিকট আপনার পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করিতেছি।"

এইবার বড়মিঞা আবুল ফজলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আবুল ফজল তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন,—"চাচাজান! আমার সহোদরা-তুল্য ভগিনী আজিজা যাহা বলিলেন, তাঁহার অধিক আমার আর কিছুই বলিবার নাই। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার মনে একটুও দুঃখ নাই। খোদাতালার অনুগ্রহে আমরা প্রত্যেকেই জীবনে সুখী হইয়াছি; তাঁহার ইচ্ছা লঙ্ঘন করিতে আমাদের কাহারও কোন অধিকার নাই। খোদাতালার মর্জীতে সন্তুষ্ট থাকাই মানবের কর্ত্তব্য। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমরা সে কর্ত্তব্য পালন করিতে শিক্ষা করিয়াছি। তবুও অলক্ষ্যে যদি আপনি আমাদের বহুদিনবিস্মৃত মনঃকষ্টের কোন হেতুর কারণ হইয়া থাকেন, প্রার্থনা করি, খোদাতালা আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনিও আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা এই ভাবে—এমনই সৌহার্দ্যের সহিত পুণ্যময় আদর্শে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।"

বড়মিঞার মুখখানি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া আবুল ফজলকে বলিলেন, "বাবা, আমি তোমার মত ধর্ম্মশীল, চরিত্রবান্ ও উদার যুবক কখনও দেখি নাই। আমি জীবনে অনেক স্বেচ্ছাচারিতা করিয়াছি; সুতরাং তোমার

হাতে 'তওবা' করিতে পারিলে আমার প্রাণে অনেক শান্তি হইবে। তুমি আমাকে 'তওবা' করাও।"

আবুল ফজল সম্মত হইলে বড়মিঞা সকলকে ডাকিতে বলিলেন। আজিজার আহ্বানে সকলে গৃহে প্রবেশ করিলে আবুল ফজল বড়মিঞাকে 'তওবা' পড়াইয়া তাঁহার মুক্তির জন্য প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সকলেই যুক্তকর উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সেই প্রার্থনায় যোগদান করিলেন।

সেইদিন রাত্রেই বড়মিঞা সাহেব পার্থিব দেহ ত্যাগ করিলেন।

* * * *

আফতাবউদ্দিন মিঞা ও বড়মিঞা গিয়াসুদ্দিনের পরলোকগমনের পর বহুদিন গত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সমবয়সী ও সহযোগিগণের প্রায় সকলেই তাঁহাদের অনুসরণপূর্ব্বক সেই অনন্তপথে যাত্রা করিয়াছেন। সংসারে তাঁহাদের অস্তিত্বের তেমন কোনই নিদর্শন বিদ্যমান নাই। তাঁহাদের সংসার-জীবনের সুখ দুঃখ ও সদসৎ কর্ম্ম-কীর্ত্তিগুলির অস্পষ্টস্মৃতি মানবের স্মৃতিপট হইতে ক্রমেই মুছিয়া যাইতেছে।

আফতাব-উদ্দিন মিঞা ও বড়মিঞা গিয়াসুদ্দিনের তিরোধানের পর আলিনগরের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুদক্ষ কৃষকের কর্ষিত প্রান্তর যেমন নয়নস্নিগ্ধকর শ্যাম শোভায় হাসিয়া উঠে,—সুনিপুণ মালীর তত্ত্বাবধানে সুসজ্জিত পুষ্পোদ্যান যেমন মনোহর ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠে, আবুল ফজলের চেষ্টায় পল্লীরাণী আলিনগর শোভা-সৌন্দর্য্য ও সৌরভে-গৌরবে তেমনি ভরিয়া উঠিয়াছে;—সুখ, সমৃদ্ধি, আনন্দ, শান্তি, একতা ও প্রীতির মাধুর্য্যে তাহার আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া গিয়াছে!

আফতাব-উদ্দিন মিঞার পরিবর্ত্তে আলিনগরের ভাগ্য-গগনে এখন আবুল ফজল মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও প্রভাব প্রতাপ সহ সুপ্রতিষ্ঠিত। বড়মিঞা গিয়াসুদ্দিনের স্থলে তৎপুত্র মতিয়র রহমান ও জামাতা আবদুল হক, খোন্দকার পীর মহাম্মদ সাহেবের স্থলে তৎপুত্র আফতাব-উদ্দিন ও আতাওর রহমান, তারিণীচরণ রায়ের স্থলে তৎপুত্র সতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি নক্ষত্রমালা বিরাজমান। ইহারা সকলেই আবুল ফজলের উজ্জ্বল প্রভায় প্রভাবিত! পাঠক! কুসুমপুরের জমিদার-কুলরত্ন

আশরফকেও একবার এই সঙ্গে স্মরণ করুন! আবুল ফজলের জ্যোতি-স্পর্শে আশরফ দেশের পক্ষে সমুজ্জ্বল চন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকে! এক্ষণে একবার আমাদের সংসার-চিত্রের বাহ্যদৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া উহার পট উন্মোচনপূর্ব্বক অন্তর্জগতে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করুন। দেখুন সেখানেও কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মহিমাময়ী রাবিয়া, পুণ্যবতী জয়নাব প্রভৃতি আদর্শ রমণীগণ ইতিপূর্ব্বে যে পবিত্র সংসার আলো করিয়াছিলেন, সেই সংসারে আজ তাঁহাদের স্থলে—তাঁহাদেরই কন্যা-পুত্রবধূ—জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমা-রজনীর ন্যায় শান্তিময়ী আজিজা, শারদায় নির্ম্মল নৈশাকাশের উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রিমার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী সালেমা এবং সমুজ্জ্বল তারকারূপিনী সোফিয়া, জোহরা প্রভৃতি উচ্চপ্রকৃতি রমণীপুঞ্জ বিরাজমানা। এই সঙ্গে নব বসন্তের সদ্য-প্রস্ফুটিত যূঁথিকাতুল্য প্রভাতনলিনী এবং শরতের শিশিরস্নাত শুভ্র শেফালিকাতুল্য আনন্দময়ী সমীরনের কথাও আপনাদের মনে পড়ে না কি?

কিন্তু আবুল ফজল, আজিজা, আবদুল হক, আশরফ, সালেমা ও মতিয়র-রহমান প্রভৃতিকে আমরা প্রথমে সংসার-জীবনের যে মধুময় স্থানে প্রাপ্ত হইয়া "পল্লী-সংসার" সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সে স্থান কি শূন্য পড়িয়া আছে? অসম্ভব! সংসারের প্রকৃতিই তাহা নহে। আবুল ফজল-আবদুল হক প্রভৃতি আখ্যায়িকা আরম্ভ কালে যেখানে অবস্থিত ছিলেন, আজিজা, সালেমা প্রভৃতি যে মনোহর গৃহকুঞ্জে লীলাখেলা করিয়াছিলেন;—আজ সেই মধুময় স্থানে "পল্লী-সংসারের" সর্ব্বোত্তম রত্ন—আবদুল আজিজ, আজিজল হক ও ফজলর রহমান এবং সংসারের সেই সুরম্য নিকুঞ্জে স্বর্গোদ্যানের নির্ম্মল পারিজাত—রোকেয়া, মরিয়ম, জিনাতন প্রভৃতি—তাঁহাদেরই হৃদয়-রত্ন পুত্র-কন্যাগণ বিরাজমান! "প্রকৃতির পরিহাসে, এক যায় আর আসে"—ইহাই সংসারের নিয়ম।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকে! আমাদের আর বলিবার কিছুই নাই। আমাদের সংসার-জীবনের আখ্যায়িকা এতক্ষণে শেষ হইল; এখন আর দুটো কথা বলিয়াই আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

আবুল ফজল মওলানা সাহেবের অলৌকিক দীক্ষা প্রভাবে ইসলামের আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যে অতি গৌরবপূর্ণ আসন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার

ইহপারলৌকিক জীবনের পূর্ণতা সাধিত হইল; পত্নী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ও সহস্র সহস্র লোক তদীয় জীবনের উন্নত আদর্শ ও পবিত্র শিক্ষা-দীক্ষার অনুসরণ করিয়া মুক্তিপথে প্রধাবিত হইতে লাগিলেন।

আর আমাদের পুণ্যবতী আজিজা সুখ-সৌভাগ্যের গৌরবপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও আত্মবিস্মৃত হন নাই। তিনি মাতার আদর্শ ও ধর্ম্মের প্রেরণায় সংসার-জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়াও খোদা-প্রাপ্তির পথে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিলেন। খোদা-তালার করুণায় অল্প আয়াসেই তাঁহার জন্য মুক্তির দ্বার খুলিয়া গেল।

প্রিয় বঙ্গীয় মোস্‌লেম ভ্রাতা ভগিনীগণ! আসুন, আমরা সকলে "পল্লী-সংসারের" এই পবিত্রতম আদর্শ অনুসরণ করি। আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে আমরা এই আদর্শে উন্নীত করিয়া—আমাদের দুঃখ-দৈন্য-জর্জ্জরিত—শোকতাপদগ্ধ—ব্যাধিবিষাদক্লিষ্ট জীবন এবং অশান্তি ও নিরানন্দময় সংসারকে আমাদের পরিকল্পিত শোভা-সম্পদ ও সুখ-শান্তিপূর্ণ প্রেম-প্রীতি ও আনন্দময় মধুরতর—আদর্শ মোস্‌লেম-সংসারে পরিণত করিতে আত্মোৎসর্গ করি।

আর সেই সঙ্গে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লাহতালার নিকট প্রার্থনা করি,—আমাদের পুণ্য-সংসারের ঘরে ঘরে আবুল ফজল ও আজিজার ন্যায় আদর্শ নর-নারী সৃষ্ট হইয়া বিশ্বজগতে পবিত্র ইস্‌লামের গৌরব-গরিমা বৃদ্ধির সহিত মোসলমান-জাতির মুখ উজ্জ্বল হউক।

সমাপ্ত